রিচার্ড ডকিন্স এর

দি গড ডিল্যুশন

অনুবাদ প্রচেষ্টা: কাজী মাহবুব হাসান

শীর্ষ ছবি কিংবা প্রচ্ছদ : আসমা সুলতানা

প্রথম অধ্যায়
দ্বিতীয় অধ্যায়

তৃতীয় অধ্যায়
চতুর্থ অধ্যায় (প্রথম পর্ব) , চতুর্থ অধ্যায়(দ্বিতীয় পর্ব) ,
চতুর্থ অধ্যায় (তৃতীয় পর্ব) , চতুর্থ অধ্যায় (চতুর্থ পর্ব) , চতুর্থ অধ্যায় (শেষ পর্ব)
পঞ্চম অধ্যায় (প্রথম পর্ব), পঞ্চম অধ্যায়(দ্বিতীয় পর্ব) , পঞ্চম অধ্যায় (তৃতীয় পর্ব)
পঞ্চম অধ্যায় (চতুর্থ পর্ব) , পঞ্চম অধ্যায় (পঞ্চম পর্ব) ,পঞ্চম অধ্যায় (ষষ্ঠ পর্ব)
ষষ্ঠ অধ্যায় (প্রথম পর্ব) ; ষষ্ঠ অধ্যায় (দ্বিতীয় পর্ব); ষষ্ঠ অধ্যায় (শেষ পর্ব)
সপ্তম অধ্যায় (প্রথম পর্ব) ; সপ্তম অধ্যায় (দ্বিতীয় পর্ব) ; সপ্তম অধ্যায় (তৃতীয় পর্ব) ;
সপ্তম অধ্যায় (চতুর্থ পর্ব) ; সপ্তম অধ্যায় (শেষ পর্ব)
অষ্টম অধ্যায় (প্রথম পর্ব) ; অষ্টম অধ্যায় (দ্বিতীয় পর্ব) ; অষ্টম অধ্যায় (তৃতীয় পর্ব)
অষ্টম অধ্যায় (চতুর্থ পর্ব) ; অষ্টম অধ্যায় (পঞ্চম পর্ব) ; অষ্টম অধ্যায় (শেষ পর্ব)

গভীরভাবে ধার্মিক একজন অবিশ্বাসী:

By K M Hassan

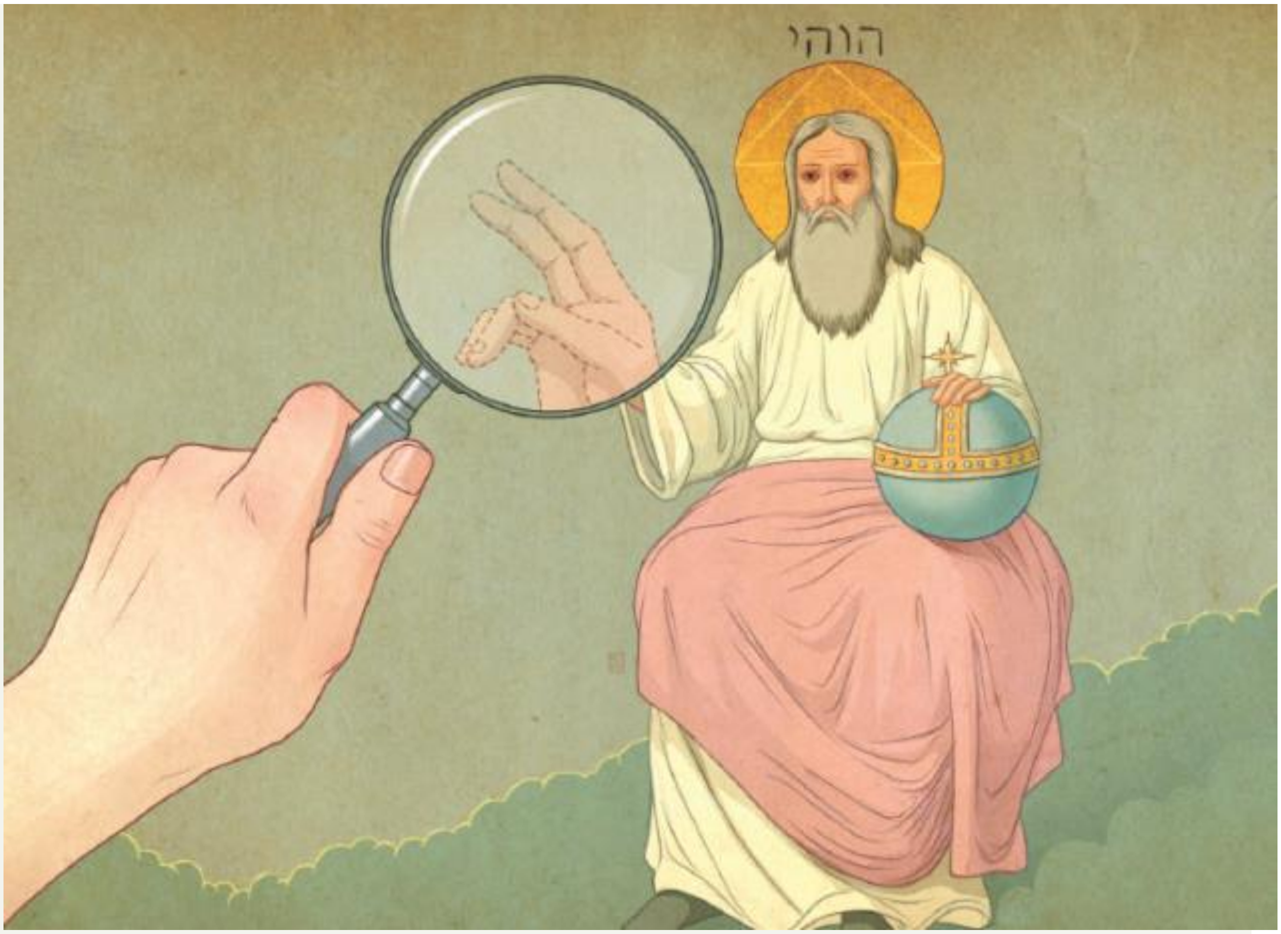

(ছবি সূত্র: নিউ সায়েন্টিষ্ট, ১৭ মার্চ, ২০১২ ইলাসট্রেশন: Richard Wilkinson)

(অনুবাদকের কথা: নীচে ধারাবাহিক খন্ডে খন্ডে লেখা প্রথম অধ্যায়টির অনুবাদ একসাথে পোষ্ট করলাম। একজায়গায় থাকলে অনুবাদের ভুলগুলো শুধরানো সহজ হবে। ইউনিকোড ফন্টে লেখা এটি আমার প্রথম লেখা ছিল। এছাড়া এটি রিচার্ড ডকিন্স এর ৭১ তম জন্মবার্ষিকীতে আমার ব্যক্তিগত শ্রদ্ধান্জ্ঞলি)

রিচার্ড ডকিন্স এর দি গড ডিল্যুশন : প্রথম অধ্যায়

The God Delusion by Richard Dawkins

(অনুবাদ প্রচেষ্টা: কাজী মাহবুব হাসান)

:গভীরভাবে ধার্মিক একজন অবিশ্বাসী:

‘আমি কোন ব্যক্তিগত ঈশ্বরকে কল্পনা করার চেষ্টা করিনা; আমাদের অপর্যাপ্ত ইন্দ্রিয়গুলো যতটুকু বোঝার সুযোগ দেয়,সেটুকু দিয়েই এই মহাবিশ্বের গঠন দেখে বিস্ময়ে হতবাক হওয়াটাই যথেষ্ঠ।’ আলবার্ট আইনস্টাইন

The gods worshipped by billions either exist, or they do not; if they exist they must have observable consequences (Victor J. Stenger)

: যে ‘শ্রদ্ধা’ পাওয়ার যোগ্য :

হাতের উপর চিবুক রেখে, ঘাসের উপর উপুড় হয়ে শুয়ে আছে ছেলেটি, জট পাকানো ঘাসের কান্ড আর শিকড় দেখতে দেখতে হঠাৎ করেই তীব্র একটা অনুভূতিবোধ তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলে: তার চোখের সামনে যেন ক্ষুদ্র কোন পৃথিবীর এক বনভূমি । রুপান্তরিত এক জগত, পিপড়া আর গুবরে পোকাদের এবং এমনকি – যদিও সেই সময় তার বিস্তারিত কিছু জানা ছিল না – লক্ষ কোটি ব্যাকটেরিয়ার, যারা নীরবে, সবার অগোচরে ক্ষুদ্র এই বিশ্বের অর্থনীতির গুরুদায়িত্ব বহন করে যাচ্ছে। হঠাৎ করে ঘাসের ক্ষুদ্রকায় এই বনভূমি বিশালাকৃতি ধারণ করে এক হয়ে মিশে গেল মহাবিশ্ব আর ভাবনারত ছেলেটির মুদ্ধ বিমোহিত মনের সাথে। এই অভিজ্ঞতাকে সে ব্যখা করে ধর্মীয় দৃষ্টেকোন এবং পরবর্তীতে বেছে নেয় ধর্মযাজকের জীবন। অ্যাঙ্গলিকান পাদ্রী হিসাবে দীক্ষা নেবার পর তিনি আমার স্কুলে চ্যাপলেইন হিসাবে যোগ দেন। তার মত কয়েকজন ভদ্র, উদার ধর্মযাজকের জন্য কেউ কখনো দাবী করতে পারবে না, আমাকে জোর করে আমাকে ধর্ম শেখানো হয়েছে [১]।

অন্য কোন সময়ে আর স্হানে, তারা ভরা আকাশের নীচে, এই ছেলেটি হতে পারতাম আমি: ওরাইওন, ক্যাসিওপিয়া আর উরসা মেজরের চোখ ধাধানো সৌন্দর্যে মুগ্ধ, মিল্কি ওয়ের অশ্রুত সঙ্গীতের মূর্ছণায় আবেগের অশ্রুভরা চোখ, আফ্রিকার বাগানে ফ্রাঙ্গিপানি আর ট্রাম্পেট ফুলের রাতের গন্ধে মাতাল । কেন সেই একই আবেগ আমার চ্যাপলেইনকে নিয়ে গেছে একদিকে আর আমাকে অন্য আরেক দিকে, সে প্রশ্নের উত্তর দেয়া সহজ নয়। প্রকৃতির প্রতি এধরনের প্রায়-আধ্যাত্মিক প্রতিক্রিয়া বিজ্ঞানী কিংবা যুক্তিবাদীদের প্রায়ই দেখা যায়। তার সাথে কিন্তু অতিপ্রাকৃত বিশ্বাসের কোনই যোগসূত্র নেই। অনুমান করতে পারি, অন্ততঃ তার শৈশবে চ্যাপলেইনের (এবং আমারও না) ‘ ‘দি অরিজিন অব স্পেসিস” এর শেষ পংক্তিগুলো জানা ছিল না – বিখ্যাত “দি এনট্যাঙ্গলড ব্যাঙ্ক””[২] অনুচ্ছেদ, “ঝোপের মধ্যে গান গাচ্ছে পাখিরা, এদিক সেদিক উড়ছে নানা জাতের পোকা মাকড়, ভেজা মাটির মধ্যে হামাগুড়ি দিয়ে চলছে কেচো” ; যদি তার জানা থাকতো, তাহলে নিঃসন্দেহে সে তার অভিজ্ঞতার সাথে মিল খুজে পেতো, ধর্মযাজকের পেশার বদলে হয়তো ডারউইনের দৃষ্টিভঙ্গীর সাথে একমত হতে পারতেন যে, সবকিছুরই‘ ‘সৃষ্টি আমাদের চারপাশে কাজ করে যাওয়া প্রাকৃতিক নিয়মের মাধ্যমে”:

> এইভাবে, প্রকৃতির যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ আর মৃত্যু থেকেই আমাদের পক্ষে ভাবা সম্ভব এমন সবচেয়ে মর্যাদা সম্পন্ন বস্তু, যেমন উন্নত প্রানীর সৃষ্টি, সরাসরি জড়িত। জীবনকে এইভাবে দেখার মধ্যে আছে একধরনের বিশালতা। (জীবন) তার বহুমুখী ক্ষমতা দিয়ে সে সুচনা করেছিল এক কিংবা কয়েকটি আকার নিয়ে; খুব সাধারণ সেই সূচনা থেকে সেটাই, এই গ্রহটি যখন মধ্যাকর্ষনের ধরাবাধা নিয়ম মেনে মহাকাশে চক্রাকারে ঘুরে চলেছে, বিবর্তিত হয়েছে যা কিছু ছিল আর বর্তমানে আছে এমন অগনিত সুন্দর আর বিস্ময়কর নানা আকার আর প্রকৃতির জীবনে।

কার্ল সাগান তার “পেল ব্লু ডট” এ লিখেছিলেন:

> কেন এরকম হলো যে, প্রধান ধর্মগুলোর প্রায় কোনটাই বিজ্ঞানকে অন্ততঃ সামান্য হলেও একটু বোঝার চেষ্টা করেছে এবং এই সিদ্ধান্তে আসতে পেরেছে , “আমরা যা ভেবেছিলাম এটাতো তার চেয়েও অনেক ভালো! এই মহাবিশ্বতো আমাদের নবীরা যা বলে গেছেন তার চেয়েও অনেক বিশাল, আরো সুক্ষ আর অভিজাত”; বরং বলেছে, “না, না, না! আমার ইশ্বর হলো ছোট ইশ্বর আর আমরা চাই সে সেভাবেই থাকুক” ; কোন ধর্ম, নতুন কিংবা পুরাতন যাই হোক, যা কিনা আধুনিক বিজ্ঞানের মাধ্যমে উন্মোচিত এই মহাবিশ্বের অসাধারণত্বকে গুরুত্ব দিয়েছে, হয়তো চিরাচরিত বিশ্বাস যা পারেনি তার চেয়ে অনেক বেশী শ্রদ্ধার জন্ম দিতে পারতো।

কার্ল সাগান সব বইগুলোই আমাদের সর্ব্বোচ্চ বিস্ময়গুলোকে সরাসরি স্পর্শ করে, যার উপর গত শতাব্দীগুলোতে একচ্ছত্র দখল ছিল ধর্মগুলোর। আমার নিজের বইগুলো সেভাবে সবাইকে স্পর্শ করুক সেটা আমারো কাম্য। সম্ভবতঃ সে কারনে একজন গভীরভাবে ধার্মিক বলে আমাকে প্রায়ই বর্ণনা করা হয় বলে শুনেছি। একজন

আমেরিকান ছাত্রী আমাকে লিখেছিল, তার এক অধ্যাপককে, আমার সম্বন্ধে কোন মতামত আছে কিনা জানতে চেয়েছিল। ‘অবশ্যই”, তিনি উত্তর দিয়েছিলেন“তার ইতিবাচক বিজ্ঞান ধর্মের সাথে সঙ্গতিপুর্ণ নয় ঠিকই, কিন্তু, প্রকৃতি আর মহাবিশ্ব নিয়ে তিনি যেভাবে তিনি আবেগময় উচ্ছাস প্রকাশ করেন, আমার কাছে, সেটাইতো ধর্ম”’; কিন্তু ‘ধর্ম’ শব্দটা কি সঠিক এক্ষেত্রে ? আমি সেটা মনে করি না। নোবেল পুরষ্কার বিজয়ী পদার্থবিজ্ঞানী (এবং একজন নীরিশ্বরবাদী) স্টীফেন ওয়াইনবার্গ তার “ড্রিমস অব ফাইনাল থিওরী” অনেকের মতই এই প্রসঙ্গে লিখেছিলেন:

ঈশ্বর সম্বন্ধে কিছু মানুষের ধারনা এত ব্যপক আর নমনীয় যে, এটা অবশ্যম্ভাবী যে তারা যেদিকে খুজবে সেখানেই ইশ্বরকে খুজে পাবে। মাঝে মাঝে শোনা যায়, ‘ইশ্বরই চুড়ান্ত’ অথবা ‘ইশ্বর আমাদের ভালো অংশ’ বা ‘ইশ্বরই এই মহাজগত’; অবশ্যই, অন্য যে কোন শব্দের মতোই ইশ্বর শব্দটিকে আমরা আমাদের ইচ্ছামতন অর্থ করতে পারি। আপনি যদি বলতে চান বলতে পারেন যে ‘ইশ্বরই শক্তি’, তাহলে আপনি ইশ্বরকে এক টুকরো কয়লার মধ্যে পেতে পারেন।

স্টীফেন ওয়াইনবার্গ অবশ্যই সঠিক, যদি ‘ইশ্বর’ শব্দটা আমরা পুরোপুরি অব্যবহারযোগ্য করে ফেলতে না চাই, তাহলে একে ব্যবহার করতে হবে ঠিক সেভাবে, যেভাবে বেশিরভাগ মানুষ সাধারণতঃ শব্দটা অর্থ করে: অর্থাৎ একজন অতিপ্রাকৃত সৃষ্টিকর্তাকে বোঝাতে, যিনি ‘আমাদের উপাসনার উপযুক্ত’।

অনেক দুর্ভাগ্যজনক জটিলতা সৃষ্টি হয় যখন আমরা আইনস্টাইনীয় ধর্ম আর অতিপ্রাকৃত ধর্ম, এই দুটোর মধ্যে পার্থক্য করতে পারিনা। আইনস্টাইন মাঝে মাঝে ইশ্বর শব্দটা ব্যবহার করেছেন (এবং শব্দটা ব্যবহার করার ক্ষেত্রে তিনিই একমাত্র নীরিশ্বরবাদী বিজ্ঞানী না), অতিপ্রাকৃতবাদীদের সুযোগ করে দিয়েছেন ভুল ব্যথা করার জন্য, যারা এমনিতেই বিশেষভাবে আগ্রহী এর অপব্যথা করার জন্য এবং এমন একজন বিখ্যাত মনীষিকে তাদের মতবাদী বলে দাবী করার জন্য। স্টিফেন হকিন্স এর ‘দি ব্রীফ হিষ্টরী অব টাইম’ এর নাটকীয় (নাকি দুষ্টামী ?) শেষ বাক্য ‘*এবং তখনই আমরা ইশ্বরের মনের কথা জানতে পারবো’*[৩] ; উক্তিটি অপব্যথার জন্য বিশেষভাবে কুখ্যাত, অনেকের মনেই এটি হকিন্স একজন ‘ধার্মিক’ মানুষ, এমন ধারনার (অবশ্যই ভুলভাবে) জন্ম দিয়েছে। কোষ জীববিজ্ঞানী উরসুলা গুডইনাফ এর ‘দি স্যাকরেড ডেপথ অফ নেচার’ আইনস্টাইন কিংবা হকিন্স এর চেয়েও আরো বেশী ধার্মিকতার ভূল ধারনা দেয়, গীর্জা, মসজিদ আর মন্দির তার খুবই পছন্দের, তার লেখার অনেক অংশই অনায়াসে অপব্যথা করে অতিপ্রাকৃত ধর্মের পক্ষে ব্যবহার করা যেতে পারে। এমনকি নিজেকে একজন ধার্মিক প্রকৃতিবিজ্ঞানী হিসাবে পরিচয় দিতে তিনি দ্বিধা করেননি। কিন্তু একটু মনোযোগ দিয়ে তার লেখা পড়লেই বোঝা যায়, তিনি আসলে আমার মতই একজন গোড়া নীরিশ্বরবাদী।

‘প্রকৃতিবিজ্ঞানী’ শব্দটি খুবই অস্পষ্ট। আমার জন্য শব্দটি আমার ছোট বেলার নায়ক হিউ লফটিং এর ডক্টর ডুলিটল –এর কথা মনে করিয়ে দেয় (যিনি কিন্তু কিছুটা এইচ এম এস বীগলের সেই দার্শনিক প্রকৃতিবিজ্ঞানীর মতন ছিলেন); অষ্টাদশ এবং উনবিংশ শতাব্দীতে প্রকৃতিবিজ্ঞানী বলতে যা বোঝাতো, এখনও আমাদের বেশীর ভাগ মানুষের কাছে সেটাই অপরিবর্তিত আছে : প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের (প্রানীবিজ্ঞান ও উদ্ভিদবিজ্ঞান) শিক্ষার্থী। সেই গিলবার্ট হোয়াইট থেকে, প্রকৃতিবিজ্ঞানীরা অধিকাংশ সময়েই পেশায় ছিলেন ধর্মযাজক। তরুন ডারউইনেরও ধর্মযাজক হবার কথা ছিল, আশা ছিল কোন গ্রামের প্যারিশের পারসন[৪] বা যাজকের নির্ঝনঝাট একটা জীবন হবে তার, পছন্দের গুবরে পোকাদের নিয়ে গবেষনা করার সুযোগ পাবেন। কিন্তু দার্শনিকরা ‘প্রকৃতিবিজ্ঞানী’ শব্দটা ব্যবহার করেন অন্য অর্থে, তা অবশ্যই অতিপ্রাকৃতবিজ্ঞানীর বিপরীতার্থে। জুলিয়ান ব্যাগিনি তার ‘অ্যাথেইজম: এ ভেরী শর্ট ইন্ট্রোডাকশন’ এ ব্যাখ্যা করেছিলেন, প্রকৃতিবাদের প্রতি নীরিশ্বরবাদীদের অঙ্গীকার:

“নীরিশ্বরবাদীরা যা বিশ্বাস করে তা হলো, মহাবিশ্বে কেবল একটি জিনিষ আছে, যা ভৌতিক, এর থেকেই উৎপত্তি হয়েছে, মন, সৌন্দর্য্য,অনুভূতি, ন্যায় অন্যায়বোধ – সংক্ষেপে সবকিছুই, সকল বিস্ময়কর বস্তু যা মানব জীবনকে করেছে অসাধারণ’।

মানুষের চিন্তাশক্তি এবং অনুভূতির উদ্ভব হয়েছে মস্তিষ্কের ভিতরে অবস্থিত সত্যিকারের অস্তিত্ব আছে,এমন কিছুর (নিউরোন) অতিজটিল পারস্পরিক সংযোগের মাধ্যমে। তাহলে দার্শনিক প্রকৃতিবিজ্ঞানী – এই অর্থে একজন নীরিশ্বরবাদী হচ্ছেন সেই জন যিনি বিশ্বাস করেন এই প্রাকৃতিক বা ভৌত মহাবিশ্বের বাইরে আর কোন কিছুরই অস্তিত্ব নেই, আমাদের পর্যবেক্ষনক্ষম মহাবিশ্বের অন্তরালে অতিপ্রাকৃত সৃজনশীল, বুদ্ধিমান কোন সৃষ্টিকর্তা লুকিয়ে নেই, শরীরের মৃত্যুর পর কোন আত্মারই অস্তিত্ব থাকেনা এবং নেই কোন অলৌকিক ঘটনা –শুধুমাত্র তা প্রাকৃতিক কোন ঘটনা ছাড়া– যা এখনও ব্যথা করা সম্ভব হয়নি। যদি এমন কিছু থাকে যা মনে হচ্ছে প্রাকৃতিক নিয়মের বাইরে, তা বর্তমানে আমাদের বোঝার সীমাবদ্ধতা মাত্র। আমরা আশা করি একদিন আমরা বুঝতে পারবো এবং প্রাকৃতিক কোন ঘটনা হিসাবে তা আমরা স্বীকার করে নেব । আমরা রংধনুর রহস্যকে ভেদ করেছি, সেজন্য রংধনুর মুগ্ধ করার ক্ষমতা কিন্তু কমে যায়নি।

আমাদের সময়ে অনেক বড় মাপের বিজ্ঞানীরা যাদের কথা শুনলে আপাতঃ দৃষ্টিতে ধার্মিক মনে হতে পারে , কিন্তু তাদের বিশ্বাসগুলি গভীরভাবে যাচাই করে দেখলে স্পষ্ট হয় ঠিক এর বীপরিতটাই। আইনস্টাইন এবং হকিন্স এর ক্ষেত্রে কথাটা বিশেষভাবে সত্যি। বর্তমান রয়্যাল অ্যাস্ট্রোনমার এবং রয়্যাল সোসাইটির সভাপতি মার্টিন রিস আমাকে বলেছিলেন, তিনি চার্চে যাতায়াত করেন একজন ‘অবিশ্বাসী অ্যাঙিলকান... স্বগোত্রের প্রতি আনুগাত্য প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে’; তার কোন ধরনেরই ঈশ্বরে বিশ্বাস নেই, কিন্তু যে বিজ্ঞানীদের নাম আমি ইতিমধ্যে উল্লেখ করেছি, তাদের মতই, তার মনেও এই মহাজগত এক ধরনের কাব্যিক, প্রকৃতিবাদী অনুভূতির জন্ম দেয়। সম্প্রতি টেলিভিশনে একটি টক শোতে আমি আমার বন্ধু রবার্ট উইনস্টোনকে, একজন প্রখ্যাত ধাত্রীবিশেষজ্ঞ, যিনি ব্রিটিশ ইহুদী সমাজের একজন নেত্রীস্থানীয় সদস্য, চ্যালেন্জ্ঞ করেছিলাম, স্বীকার করে নিতে যে, তার ইহুদীবাদ ঠিক এধরনেরই এবং তিনি আদৌ অতিপ্রাকৃত কোন কিছুতেই আসলে বিশ্বাস করেন না। প্রায় স্বীকার করতে করতে একেবারে শেষ পর্যন্ত এসে তিনি পিছিয়ে গেছেন (মানতেই হবে, তার সাক্ষাতকার নেবার কথা আমাকে, উল্টোটা না)[৫]; আমি যখন তাকে জোর করলাম কিছু বলার জন্য, সে বলেছিল, ইহুদীবাদ তার জীবনকে ঠিকমত সাজাতে প্রয়োজনীয় শৃঙ্খলা দিয়েছে । হয়তো সেটা ঠিক, কিন্তু অবশ্যই, শুধুমাত্র সেটাই, এর (ইহুদীবাদ) অতিপ্রাকৃত অবস্থানের সত্যতার পক্ষে দাবীদার হওয়ার জন্য ক্ষুদ্রতম কোন ভূমিকাই রাখেনা। অনেক বুদ্ধিজীবি ইহুদী আছেন যারা নিজেদের ইহুদী পরিচয় দিতে গর্ব বোধ করেন এবং ধর্মীয় আচারও পালন করেন হয়ত প্রাচীন ঐতিহ্য মেনে বা নিহত স্বজনদের স্মরণে। কিন্তু এছাড়াও অন্য কারনটি হলো, ধর্মকে ‘সর্বেশ্বরবাদ’ হিসাবে চিহ্নিত করে বিশেষ শ্রদ্ধার একটা অবস্থান দেয়ার জন্য আমাদের কিছু বিভ্রান্তি বা বিভ্রান্তিকর ইচ্ছা বা প্রবণতা , যা এর সবচেয়ে বিশিষ্ট সমর্থক আলবার্ট আইনস্টাইন এর মত আমরা অনেকেই অনুভব করি। তারা হয়তো বিশ্বাস করেন না, কিন্তু দার্শনিক ড্যানিয়েল ডেনেট এর একটা উদ্ধৃতি ব্যবহার করে বলা যায়, তারা “ ‘একটি বিশ্বাসকে বিশ্বাস করে’[৬]।

অতি আগ্রহের সাথে আইনস্টাইনের একটি উদ্ধৃতি প্রায়ই ব্যবহৃত হয়, ‘বিজ্ঞান ধর্ম ছাড়া পঙ্গু, আর ধর্ম বিজ্ঞান ছাড়া অন্ধ’, কিন্তু আইনস্টাইন আরো বলেছিলেন:

> আমার ধর্ম বিশ্বাস সম্বন্ধে, আপনারা যা পড়ে থাকবেন, তা অবশ্যই মিথ্যা। এই মিথ্যার বার বার একইভাবে পূনরাবৃত্তি হয়েছে। আমি কোন ব্যক্তিগত ঈশ্বরকে বিশ্বাস করিনা এবং আমি কখনোই এই কথাটা অস্বীকার করিনি বরং সুস্পষ্টভাবে ব্যথা করেছি। যদি আমার মধ্যে এমন কিছু থাকে যাকে বলা যেতে পারে ধর্মবোধ, সেটা নিঃসন্দেহে, বিজ্ঞান যতটুকু উন্মোচন করেছে সেই মহাবিশ্বের গঠন এর প্রতি আমার অসীম মুগ্ধতা।

মনে হচ্ছে কি আইনস্টাইন স্ববিরোধী বক্তব্য দিয়েছেন ? আর বিতর্কের উভয় পক্ষ সমর্থনের জন্য কি তার বক্তব্যকে বেছে বেছে ব্যবহার করা যেতে পারে? না । সাধারনতঃ যে অর্থে 'ধর্ম' শব্দটি ব্যবহৃত হয়, তিনি সেই অর্থে শব্দটিকে ব্যবহার করেননি। আমি যখন একদিকে অতিপ্রাকৃত ধর্ম আর অন্যদিকে আইনস্টাইনীয় ধর্মের মধ্যে পার্থক্য ব্যখা করছি, মনে রাখবেন, যে আমি 'অতিপ্রাকৃত' ইশ্বরদেরকেই কেবল বিভ্রান্তিকর বলছি।

আইনস্টাইনের ধর্মের স্বরুপ বোঝাতে আমি এখানে আরো কিছু আইনস্টাইনের উদ্ধৃতি উল্লেখ করছি :

আমি গভীরভাবে ধার্মিক একজন অবিশ্বাসী। এটাই একটা নতুন কোন ধরনের ধর্ম।

আমি কখনই প্রকৃতির উপর কোন উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য আরোপ করিনা অথবা এমন কিছু যা মানবিক গুনাবলী বলে মনে হতে পারে। আমি প্রকৃতিতে যা দেখি তা হলো এর অসাধারন গঠন, যা আমরা খুব সামান্যই বুঝতে পারি, যে কোন চিন্তাশীল মানুষকে যা বিনম্র হতে বাধ্য করে। এটা অবশ্যই ধর্মীয় একটা অনুভূতি কিন্তু এর মধ্যে কোন অতিপ্রাকৃত রহস্যময়তা নেই।

ব্যক্তিগত কোন ঈশ্বরের ধারনা আমার কাছে খুবই অপরিচিত আর এমনকি মনে হয় ছেলেমানুষী।

তার মৃত্যুর পর ধর্মীয় আত্মপক্ষসমর্থনকারীরা বোধগম্য কারনেই আরো বেশী বেশী করে আইনস্টাইনকে তাদের নিজেদের একজন বলে দাবী করেছে। তার সমসাময়িক ধর্ম সমর্থকরা কিন্তু তাকে দেখেছে ভিন্নভাবে। 'আমি কোন ব্যক্তিগত ইশ্বরকে বিশ্বাস করিনা' কথাটিতে ব্যখা করার জন্য, ১৯৪০ সালে তিনি তার বিখ্যাত লেখাটি লেখেন। এটি এবং এই ধরনের কিছু বক্তব্যের জন্য তাকে গোড়া ধর্ম সমর্থকদের তীব্র সমালোচনার মুখে পড়তে হয়। সমালোচনা মুখর অসংখ্য চিঠি পান তিনি, যার অনেকগুলোতে তার ইহুদী জন্ম ইতিহাসের প্রতি সুস্পষ্ট ইঙ্গিত ছিল। ম্যাক্স জ্যামার এর 'আইনস্টাইন এবং ধর্ম' বইটি থেকেই এখানে উল্লেখিত তথ্যগুলো পাওয়া যায় (ধর্ম সম্বন্ধে আমার ব্যবহৃত আইনস্টাইনের বিভিন্ন উদ্ধৃতির উৎসও এই বইটি) ; ক্যানসাস সিটির রোমান ক্যাথলিক বিশপ মন্তব্য করেছিলেন, 'দুঃখজনক একটা ব্যপার, একটা মানুষ, যে কিনা ওল্ড টেস্টামেন্টে বর্নিত জাতির সদস্য, সেই এই জাতির মহান ঐতিহ্যকে অস্বীকার করছে'; অন্য ক্যাথলিক ধর্মযাজকরাও যোগ দিয়েছিলেন সমালোচনায়: ' ব্যক্তিগত ঈশ্বর ছাড়া অন্য কোন ঈশ্বর নেই...আইনস্টাইন নিজেই জানেন না কি বিষয়ে কথা বলছেন। পুরোটাই ভুল তিনি। কিছু মানুষ মনে করেন , কোন এক বিষয়ে সর্ব্বোচ্চ জ্ঞান অর্জন করলেই, সব বিষয়ে তারা মত প্রকাশের যোগ্যতা অর্জন করে ফেলেছেন', অর্থাৎ ধর্ম যেন একটা বিশেষ বিষয় আর কেউ এই বিশেষ বিষয়ে নিজেকে বিশেষজ্ঞ দাবী করতে পারেন, যিনি সব বিতর্কের উর্দ্ধে। ধারনা করা যেতে পারে, ঐ পাদ্রী পরীদের পাখার সঠিক আকৃতি বা রং এর বিষয়ে কোন আত্মস্বীকৃত 'পরীবিশেষজ্ঞ' র পরামর্শ নিতে অপেক্ষা করেন না। তিনি এবং বিশপ দুজনই বলছেন, আইনস্টাইন যেহেতু ধর্মীয় তত্ত্বে প্রশিক্ষিত নয় সুতরাং ঈশ্বরের প্রকৃতি সম্বন্ধে তার ধারণা ভুল। কিন্তু আইনস্টাইন খুব ভালো ভাবে জানতেন ঠিক কোন বিষয়টিকে তিনি অস্বীকার করছেন।

একজন অ্যামেরিকান রোমান ক্যাথলিক আইনজীবি যিনি একটি একুমেনিকাল[৭] কোয়ালিশন এর পক্ষে কাজ করেন তিনি আইনস্টাইনকে লিখেছিলেন:

আমরা অত্যন্ত দুঃখ পেয়েছি আপনার এধরনের একটি মন্তব্য করেছেন .. যেখানে আপনি ব্যক্তিগত ঈশ্বরের ধারনাটিকে উপহাস করেছেন। বিগত দশ বছরে আপনার এই বক্তব্যের মত আর কোন কিছুই, মানুষকে এই চিন্তা করার সুযোগ দেয়নি যে, ইহুদীদের বহিষ্কার করার পেছনে হিটলারের নিশ্চয়ই কোন কারন ছিল। আপনার যে কোন কিছু বলার অধিকার আছে, এই কথা স্বীকার নিয়ে বলছি; এধরনের বক্তব্য আপনাকে অ্যামেরিকায় বিতর্কের অন্যতম প্রধান কারন হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

নিউ ইয়র্কের একজন রাবাই বলেছিলেন, ‘আইনস্টাইন নিঃসন্দেহে একজন মহান বৈজ্ঞানিক, কিন্তু তার ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি ইহুদীবাদের একেবারে বীপরিত’।
‘কিন্তু’ ? ‘*কিন্তু*’? ‘এবং’ কেন নয়।

নিউ জার্সী হিস্টোরিকাল সোসাইটির সভাপতি তার লেখা চিঠিটা পড়লে ধর্মীয় মানসিকতার দূর্বলতার স্বরুপটা এতই স্পষ্ট হয় যে, দ্বিতীয় বার পড়া যেতে পারে:

ডঃ আইনস্টাইন, আমরা আপনার প্রজ্ঞাকে সন্মান করি। কিন্তু মনে হচ্ছে একটা জিনিস আপনার শেখা হয়নি: ঈশ্বর হচ্ছে আত্মার মত, নিরাকার সত্বা,যা কেউ টেলিস্কোপ বা মাইক্রোস্কোপ দিয়ে খুজে পাবেনা, যেমন মানুষের চিন্তা আর অনুভতি আবেগ মস্তিষ্ক পরীক্ষা নিরীক্ষা করে পাওয়া যায়না। সবাই জানে ধর্মের ভিত্তি হলো ‘বিশ্বাস’, যুক্তিনির্ভর জ্ঞান নয়। চিন্তাক্ষম সব মানুষই, হয়ত কোন না কোন এক সময়ে ধর্ম সংক্রান্ত সন্দেহে আক্রান্ত হয়। আমার নিজের বিশ্বাসই নাড়া খেয়েছে বেশ কয়েকবার । কিন্তু আমি কখনোই আমার এই বিশ্বাসের সংকটের কথা কাউকে বলিনি দুটি কারনে: (১) আমার শঙ্কা ছিল এ বিষয়ে আমার সামান্যতম মন্তব্য কিছু মানুষের জীবন ও তাদের আশাকে ক্ষতিগ্রস্থ করবে। (২) কারন আমি সেই লেখকের সাথে একমত, যিনি বলেছিলেন ‘যারা অন্য কারো বিশ্বাসকে ধ্বংশ করে তাদের চরিত্রে অন্যের ক্ষতি করার প্রবণতা আছে’..... আশা করি ডঃ আইনস্টাইন, আপনার বক্তব্যটিকে সঠিকভাবে উপস্থাপন করা হয়নি এবং আপনি নিশ্চয়ই অসংখ্য অ্যামেরিকানদের উদ্দেশ্যে ভালো কিছু বলবেন, যারা আপনাকে সন্মান জানানোর উদগ্রীব।

কি ভয়াবহ রকমের চারিত্রিক দুর্বলতা উন্মোচন করা একটি চিঠি, যার প্রতিটি পংক্তিতে নৈতিক আর বুদ্ধিবৃত্তিক ভীরুতা ও কাপুরুষতা ঝরে পড়ছে। আরেকটু কম কাপুরুষোচিত কিন্তু বেশী জঘন্য চিঠিটি লিখেছিলেন, ওকলাহোমার ক্যাভার্লী ট্যাবেরন্যাকল অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠাতা:

অধ্যাপক আইনস্টাইন, আমি বিশ্বাস করি অ্যামেরিকার প্রত্যেকটি খৃষ্টান আপনাকে উত্তর দেবে,‘আমরা আমদের ঈশ্বর আর তার পুত্র যীশু খৃষ্টর উপর বিশ্বাস পরিত্যাগ করবো না, কিন্তু আপনাকে আমন্ত্রন জানাচ্ছি, যদি আপনি এই জাতির ঈশ্বরকে বিশ্বাস না করেন, তাহলে যেখান থেকে আপনি এসেছেন সেখানে ফেরত চলে যান’; ইসরায়েলের ভালোর জন্য যা করা সম্ভব আমি করেছি , ধর্মকে অসন্মান করে আপনার মুখ থেকে উচ্চারিত এই বক্তব্য নিয়ে আপনি বিতর্কে যোগ দিলেন। ইসরায়েলপ্রেমী খৃষ্টানদের এইদেশ থেকে ইহুদী–বিদ্বেষ নির্মূল করার সব প্রচেষ্ঠা সত্বেও, এই বক্তব্য আপনার জাতির জন্য আরো বেশী ক্ষতিকর প্রমানিত হবে। অধ্যাপক আইনস্টাইন, অ্যামেরিকার প্রত্যেকটি খৃষ্টান আপনাকে তাৎক্ষনিক উত্তর দেবে, ‘আপনার এই সব বাতিকগ্রস্হ, বিবর্তনের ভুল তত্ব নিয়ে জার্মানী চলে যান, যেখান থেকে আপনি এসেছেন অথবা এই দেশের মানুষদের, যারা আপনি যখন নিজের দেশ ছেড়ে পালাতে বাধ্য হয়েছিলেন, এই দেশে স্বাগত জানিয়েছিল আপনাকে, সেই সব মানুষদের বিশ্বাসকে আঘাত করার চেষ্ঠা বন্ধ করুন’।

তাঁর ঈশ্বরবাদী এবং ধর্মবিশ্বাসী সব সমালোচকরা একটা বিষয় কিন্তু সঠিক ধরতে পেরেছিলেন, আইনস্টাইন, তাদের দলের কেউ নন। বার বার তিনি ক্ষুদ্ধ হয়েছেন যখনই তাকে থেইষ্ট বা ঈশ্বরবিশ্বাসী বলা হয়েছে। তাহলে তিনি কি ডেইষ্ট বা একাত্মবাদী, ভলতেয়ার আর দিদেরো’র মতন ? কিংবা প্যানথেইষ্ট বা সর্বেশ্বরবাদী, স্পিনোজার মতন, যার দর্শনকে তিনি শ্রদ্ধা করতেন: ‘আমি স্পিনোজার ঈশ্বরকে বিশ্বাস করি, যিনি নিজেকে উন্মোচন করেন অস্তিত্ব আছে এমন সকল কিছুর মধ্যে সুশৃঙ্খল সংহতিতে, কিন্তু সেই ঈশ্বরে নয়, যিনি মানুষের নিয়তি আর কর্ম নিয়ে ব্যতিব্যস্ত’?

কিছু শব্দের অর্থ আমরা আবার মনে করে নেই; একজন থেইষ্ট বা ঈশ্বরবাদী সেই ব্যক্তি, যিনি অতিপ্রাকৃত, অতিবুদ্ধিমান কোন ইশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন, যিনি তার প্রধান কাজ , প্রথমতঃ এই মহাবিশ্বকে সৃষ্টি করা ছাড়াও, তার সেই সৃষ্টির দেখাশোনা এবং পরবর্তীতে এর নিয়তিকে প্রভাবিত করার জন্য যিনি এখনও সর্বশক্তিসহ বিরাজমান। ঈশ্বরবাদীদের বিশ্বাসের কাঠামোতে, মানুষের যাবতীয় কর্মকান্ডে এই ঈশ্বর ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। তিনি প্রার্থনার জবাব দেন, পাপের শাস্তি দেন বা ক্ষমা করেন, অলৌকিক ঘটনার মাধ্যমে পৃথিবীর নানা কর্মকান্ডে হস্তক্ষেপ করেন, তার সৃষ্টির ভালো আর খারাপ কর্মকান্ড নিয়ে তিনি চিন্তাভাবনা করেন এবং তিনি জানেন আমরা কখন এসব করছি (অথবা এমনকি অর্ন্তযামী হিসাবে তিনি এও জানেন এমন কি কখন আমরা এসব করার চিন্তাভাবনা করছি) ; একজন দেইষ্ট বা একাত্মবাদীও , অতিপ্রাকৃত, অতিবুদ্ধিমান, সর্বশক্তিমান ঈশ্বরকে বিশ্বাস করেন, তবে তার কর্মকান্ড সীমাবদ্ধ শুধুমাত্র সৃষ্টির আদিতে মহাবিশ্ব পরিচালনাকারী নিয়মকানুনগুলো সুনির্দিষ্ট করার মধ্যেই। কিন্তু এরপর একাত্মবাদীদের ঈশ্বর তার সৃষ্টিতে আর কোন ধরনের হস্তক্ষেপ করেন না এবং অবশ্যই মানুষের কর্মকান্ডে তার কোন বিশেষ কোন আগ্রহও নেই। প্যানথেইষ্টরা বা সর্বেশ্বরবাদী কোন অতিপ্রাকৃত, অতিবুদ্ধিমান ইশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন না তবে ‘ঈশ্বর’ শব্দটি তারা ব্যবহার করেন একটি অলৌকিকতার ইঙ্গিতমুক্ত প্রতিশব্দ হিসাবে প্রকৃতি বা মহাজগত বা মহাজগতের সকল কর্মকান্ডগুলোকে নিয়ন্ত্রনকারী সুশৃঙ্খলতাকে বোঝাতে । একাত্মবাদীদের ঈশ্বরের সাথে ঈশ্বরবাদীদের ঈশ্বরের পার্থক্য হলো, তাদের ঈশ্বর প্রার্থনার উত্তর দেন না, পাপপুণ্য বা আমাদের পাপের স্বীকারোক্তি নিয়ে আদৌ মাথা ঘামান না, আমাদের মনের কথাও জানার চেষ্টা করেন না, খেয়ালখুশী মত কোন অলৌকিক ঘটনা ঘটিয়ে আমাদের জীবনে কোন হস্তক্ষেপ করেন না। একাত্মবাদীরা সর্বেশ্বরবাদী থেকে আলাদা কারন একাত্মবাদীদের ‘ঈশ্বর’ হল কোন এক ধরনের মহাজাগতিক বুদ্ধিমত্তা, সর্বেশ্বরবাদীদের মত মহাবিশ্বের সুশৃঙ্খল নিয়মকানুন এর *রুপকধর্মী বা কাব্যিক* কোন প্রতিশব্দ না। সর্বেশ্বরবাদ অনেকটা আকর্ষনীয় আর গ্রহনযোগ্য নিরীশ্বরবাদ অন্যদিকে একাত্মবাদ হল দূর্বল ঈশ্বরবাদ।

অবশ্যই চিন্তা করার যুক্তিসঙ্গত কারন আছে যে, কিছু বিখ্যাত ‘আইনস্টাইনবাদ’ যেমন: ‘‘ঈশ্বর সুক্ষ এবং চতুর কিন্তু তিনি কারো ক্ষতি করার মনোভাব পোষন করেন না’’ অথবা ‘‘তিনি কোন জুয়া খেলেননি’’ বা ‘এই মহাবিশ্ব সৃষ্টিতে ইশ্বরের কি কোন বিশেষ পছন্দ ছিল?’ গুলো সর্বেশ্বরবাদী, একাত্মবাদী নয়, আর ঈশ্বরবাদীতো অবশ্যই নয় । ‘ঈশ্বর কোন জুয়া খেলেননি’-এর ব্যখা করা উচিত ‘ মহাজগতের সব কিছুরই কেন্দ্র কিন্তু এলোমেলো লক্ষ্যহীন নয়’ – এইভাবে । ‘‘এই মহাবিশ্ব সৃষ্টিতে কোন ঈশ্বরের কি বিশেষ পছন্দ ছিল ?’’ এর মানে ‘‘মহাবিশ্ব কি আর অন্য কোনভাবে শুরু হতে পারতো?’’, আইনস্টাইন ‘ঈশ্বর’ শব্দটি ব্যবহার করেছেন সম্পুর্নভাবে *রুপক বা কাব্যিক* অর্থে। স্টিফেন হকিং ও তাই করেছেন, এছাড়াও অন্য আরো অনেক পদার্থবিজ্ঞানী, যারা প্রায়ই ধর্মীয় রুপক ব্যবহার করেছেন তাদের ভাষায় । পল ডেভিস এর ‘‘দি মাইন্ড অফ গড’’, যে বইটার জন্য তিনি টেম্পলটন পুরষ্কার পেয়েছেন , অবস্থান করছে আইনস্টাইনীয় সর্বেশ্বরবাদ আর অস্পষ্ট একটা একাত্মবাদের মাঝামাঝি একটা অবস্থানে (প্রতি বছর বেশ বড় অঙ্কের একটা অর্থ পুরষ্কার হিসাবে দিয়ে থাকে টেম্পলটন ফাউন্ডেশন, সাধারনতঃ ধর্ম সম্পর্কে সুন্দর কিছু কথা বলার জন্য তৈরী কোন বিজ্ঞানীকে) ।

আইনস্টাইনেরই আরেকটি উদ্ধৃতি দিয়ে আমি তার ধর্মভাবনা নিয়ে আলোচনা শেষ করতে চাই: ‘সবকিছু যা আমরা অনুভব করতে পারি, পেছনে এমন কিছু আছে যা আমাদের বুদ্ধির ব্যখাতীত, যার সৌন্দর্য্য, বিশালতা আর মহিমময়তা আমাদেরকে স্পর্শ করে পরোক্ষভাবে, ক্ষীন কোন ভাবনা রুপে, সেটা বোঝা আর অর্থ খুজে বের করাটাই ধার্মিকতা; এই অর্থে আমি ধার্মিক’; এই অর্থে আমিও ধার্মিক, তবে একটু আপত্তি সাপেক্ষে, ‘‘বুদ্ধির ব্যাখাতীত’’ এর অর্থ ‘’চিরকালই বুদ্ধির ব্যাখাতীত’ হতে হবে এমনটা না। কিন্তু আমি নিজেকে ধার্মিক বলে পরিচয় দিতে চাই না কারন এর অপব্যখা হবার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। অপব্যাখ্যাটা ক্ষতিকর কারন, অসংখ্য মানুষের কাছে ধর্ম বলতে অতিপ্রাকৃত ধর্মকেই বোঝায় । কার্ল স্যাগান সুন্দর ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন: ‘যদি ঈশ্বর বলতে কেউ যদি বোঝাতে চায় এক গুচ্ছ প্রাকৃতিক নিয়মাবলী যা মহাবিশ্বকে নিয়ন্ত্রন করছে, সেক্ষেত্রে অবশ্যই এরকম একজন ঈশ্বর আছেন।

এই ঈশ্বর অবশ্যই আবেগগত দিক থেকে সন্তুষ্টি দিতে ব্যর্থ, মধ্যাকর্ষণ আইনের কাছে কিছু প্রার্থনা করার নিশ্চয়ই খুব একটা অর্থ হয়না’।

মজার ব্যপার হলো স্যাগান এর শেষ বক্তব্যটির পূর্বাভাস কিন্তু আগেই করেছিলেন, অ্যামেরিকান ক্যাথলিক ইউনিভার্সিটির একজন অধ্যাপক, রেভারেন্ড ডঃ ফুলটন জে শীন, ১৯৪০ সালে আইনস্টাইনের ব্যক্তিগত ইশ্বরের ধারনাকে অস্বীকার করার ঘটনার তীব্র সমালোচনার অংশ হিসাবে। তিনি ব্যঙ্গাত্মক ভাষায় জানতে চেয়েছিলেন, এমন কি কেউ আছে, যে মিল্কি ওয়ের জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করতে পারে? তিনি মনে করেছিলেন বক্তব্যটি তিনি আইনস্টাইনের বিপক্ষে বলছেন, পক্ষে না। তিনি আরো বলেছিলেন, ‘তার এই ‘‘কসমিক্যাল বা Cosmical’’ ধর্মে একটি মাত্র ভুল আছে,তিনি কেবল একটি বাড়তি অক্ষর ব্যবহার করেছেন শব্দটিতে, “S“ হলো সেই অক্ষরটি ” [অর্থাৎ Cosmical না Comical] । আইনস্টাইনের বিশ্বাসের মধ্যে অবশ্যই কোন ‘‘কমিক্যাল’’ ব্যপার নেই।

তাসত্ত্বেও, আশা করি,পদার্থবিজ্ঞানীরা তাদের বিশেষ রুপকঅর্থে ‘ঈশ্বর’ শব্দটি ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকবেন। পদার্থবিদদের রুপকার্থে ব্যবহৃত বা সর্বেশ্বরবাদের এই ‘ঈশ্বর’’ , বাইবেলে বর্ণিত, সবকিছুতে সরাসরি হস্তক্ষেপকারী, অলৌকিক কর্মকান্ড ঘটানোতে পারদর্শী, অন্তর্যামী, পাপের শাস্তি প্রদানকারী, প্রার্থনার উত্তরদাতা, পাদ্রী, মোল্লাদের বা রাবাইদের বা সাধারন ভাষার ‘ঈশ্বর’ থেকে বহু আলোকবর্ষ দুরে। আমার মতে, ইচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে এই দুই পৃথক ‘ঈশ্বর’ এর ধারনার মাঝে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা একটি মারাত্মক বুদ্ধিবৃত্তিক বিশ্বাসঘাতকতা।

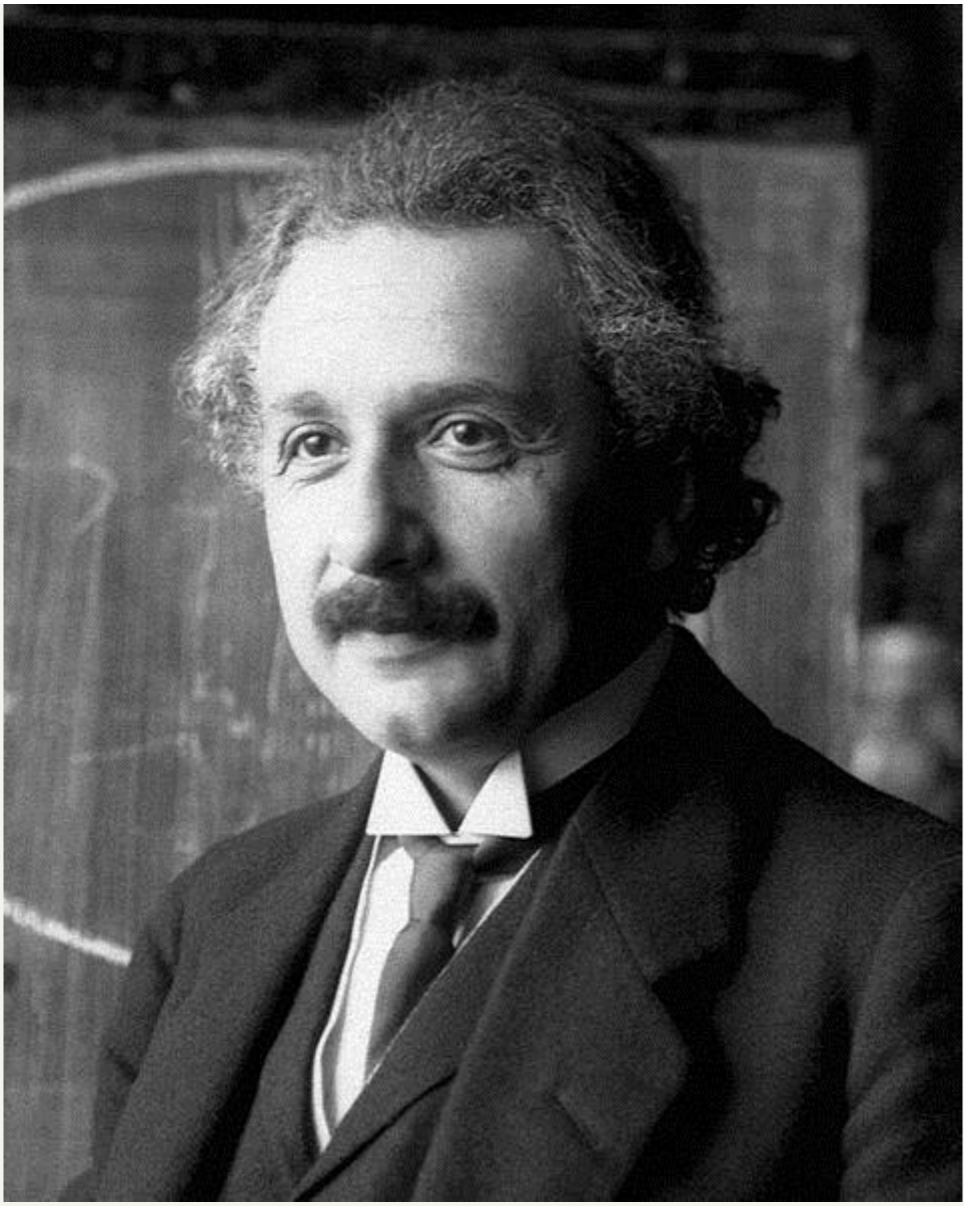

আলবার্ট আইনস্টাইন

: যে ‘শ্রদ্ধা’ পাওয়ার অযোগ্য :

আমার এই বইটির শিরোনাম ‘দি গড ডিল্যুশন’ এর গড বা ঈশ্বর আইনস্টাইনের বা আগের অনুচ্ছেদগুলোয় উল্লেখ করা কোন জ্ঞানালোকপ্রাপ্ত বিজ্ঞানীদের ঈশ্বর নয়। বিভ্রান্তি সৃষ্টি করার পুর্বপ্রমানিত ক্ষমতা আছে বিধায় আমি আগে ভাগেই আইনস্টাইনের ধর্ম ব্যাখ্যা করে নিলাম। এই বই এর বাকী অংশে আমি শুধু ‘অতিপ্রাকৃত’ ঈশ্বরদের কথা বলবো, এদের মধ্যে, আমার বেশীর ভাগ পাঠক যার সাথে পরিচিত, তিনি হলেন ওল্ড টেস্টামেন্টের ঈশ্বর ‘ইয়াওয়ে’; এ বিষয়ে কথা বলার আগে এবং এই প্রথম অধ্যায় শেষ করার আগে পাঠকদের সাথে আরেকটা বিষয় আমার স্পষ্ট করা উচিৎ, নয়ত পুরো বইটির অপব্যখা করার সুযোগ থেকে যাবে। এবারের বিষয়টি ভদ্রতার। আমি যা বলতে চেয়েছি তা সম্ভবতঃ ধর্মবিশ্বাসী অনেক পাঠককে আহত করবে। মনে হতে পারে বইটিতে তাদের নিজেদের বিশ্বাসের (হয়ত তাদের বিশ্বাস অন্য অনেকের কাছে মুল্যবান নাও হতে পারে) প্রতি অপর্যাপ্ত

সন্মান দেখানো হয়েছে। খুবই দুঃখজনক হবে যদি সেকারনে তারা বইটি না পড়তে চান, সুতরাং শুরুতেই ব্যপারটার ব্যাখ্যা দিতে চাই।

একটি ব্যপকভাবে বিস্তৃত ধারণা, যা সমাজের প্রায় সবাই – যারা ধার্মিক না তারাও – মেনে নিয়েছেন, তা হলো, ধর্মীয় বিশ্বাস যে কোন ধরনের আক্রমনে খুব সহজেই ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে এবং সেই জন্য শ্রদ্ধার মোটা দেয়াল দিয়ে ধর্মকে সুরক্ষিত রাখা উচিৎ। এই শ্রদ্ধার প্রকৃতি মানুষের প্রতি মানুষের পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ থেকে সম্পুর্ন আলাদা শ্রেনীর। মৃত্যুবরণ করার কিছুদিন আগে কেমব্রিজ এ একটি উপস্থিত বক্তৃতায় ডগলাস অ্যাডামস এর সুন্দর ব্যখা দিয়েছিলেন [৮]; তার বক্তব্য সবার সাথে ভাগ করে নেবার ব্যপারে আমি কখনই ক্লান্তি বোধ করিনা:

ধর্ম .. এর কেন্দ্রে কিছু বিশেষ ধারনা আছে যা আমরা নাম দিয়েছি, পরম শ্রদ্ধেয় বা পবিত্রইত্যাদি। যার সার কথাটা হলো, ‘এই যে এটা হচ্ছে একটা ধারনা বা অভিমত, যার বিরুদ্ধে আপনার কোনই অনুমতি নেই খারাপ কিছু বলার’; আপনি বলতে পারবেন না ব্যস। কেন না, কি কারনে? -কারন আপনি বলতে পারবেন না ! এটাই শেষ কথা। কেউ যদি এমন কোন দলকে ভোট দেয় যার সাথে আপনি একমত না। সেক্ষেত্রে আপনি কিন্তু যত খুশি তত তর্ক করতে পারবেন; সবারই কোন না কোন নিজস্ব মতামত আছে, কেউই কিন্তু কোন রকম বিশেষ দুঃখ পায় না সেই বিতর্কে। কেউ যদি মনে করে ট্যাক্স বাড়ানো বা কমানো উচিৎ, সে বিষয়ে যে কোন ধরনে যুক্তিতর্ক উপস্থাপন বা মতামত প্রকাশের অধিকার আপনি আছে। কিন্তু কেউ যদি বলে, ‘শনিবারে আলো জালানো জন্য সুইচটাও আমার ধরা উচিৎ না, আপনি বলবেন, ‘আমি সেটা শ্রদ্ধা করি’;কেনইবা এটা সম্পুর্নভাবে ন্যায়সঙ্গত হবে যেমন, লেবার পার্টি কিংবা কনসারভেটিভ পার্টিকে সমর্থন করা, কিংবা রিপাবলিকান বা ডেমোক্র্যাট দের, অর্থনীতির এই মডেল বা অন্যটাকে, উইনডোজ এর পরিবর্তে ম্যাকিনটশকে; কিন্তু যখনই কিভাবে মহাবিশ্বের শুরু হলো আর কে এই মহাবিশ্ব সৃষ্টি করলো,এই বিষয়ে কোন মতামত পোষন করা হচ্ছে.........না, কারন এটা পবিত্র একটা বিষয় ? ....সাধারণতঃ ধর্মীয় কোন বিষয়কে চ্যালেন্জ্ঞ না করাটাই আমাদের নিয়ম। কিন্তু সত্যি বিষয়টা দারুন কৌতুহলের কারন হয়, যখন রিচার্ড এর সেই কাজটাই করার জন্য হৈ চৈ পড়ে যায়! প্রত্যেকে প্রচন্ড উত্তেজিত হয়ে যায়, কারন এধরনের কোন কথা বলার আপনার অনুমতি নেই। অথচ যুক্তি মেনে বিষয়টা ভাবলেই দেখা যাবে, ঐ সব বিষয়গুলো নিয়ে অন্য যে কোন বিষয়ের মত কেন বিতর্ক করা যাবেনা, তার কিন্তু কোন কারনই নেই। শুধুমাত্র আমরা নিজেরাই নিজেদের মধ্যে কোনভাবে একমত হয়ে এটা ঠিক করেছি যে এটা করা যাবেনা।

ধর্মের প্রতি সমাজের অতিমাত্রায় শ্রদ্ধা প্রদর্শনের একটা গুরুত্বপূর্ন উদহারন দেই। যুদ্ধকালীন সময়ে সামরিক দ্বায়িত্ব পালন এড়াতে ‘বিবেকজনিত কারনে বিরোধিতা’[৯] করার অবস্থান পাবার সবচেয়ে সহজ উপায় হল ‘ধর্মীয়’ কারন দেখানো। আপনি হতে পারেন একজন বিখ্যাত নীতিশাস্ত্রবিদ দার্শনিক, হতে পারে আপনার পুরষ্কার পাওয়া নীরিক্ষাধর্মী কোন ডক্টরাল থিসিস আছে যুদ্ধের ক্ষতিকর দিকগুলো নিয়ে, তারপরও ড্রাফ্ট বোর্ড আপনার ‘বিবেকজনিত কারনে যুদ্ধের বিরোধিতা’ র মুল্যায়ণ করতে বেশ ঝামেলা করবে। কিন্তু আপনি যদি বলেন আপনার বাবা ও মা দুজন অথবা তাদের একজন কোয়েকার [১০], তাহলে ব্যপারটা পানির মত সহজ হয়ে যাবে আপনার জন্য । সেক্ষেত্রে শান্তিবাদ এর তত্বের উপর বা এমনকি কোয়েকারিজম এর উপরেও আপনার সামান্যতম জ্ঞান থাকুক বা না থাকুক।

শান্তিবাদের আবার একেবারে বীপরীতপ্রান্তে, পারস্পরিক যুদ্ধরত পক্ষগুলোর ধর্মীয় নাম ব্যবহার করার ভীরু অনীহা প্রায়শই লক্ষ করা যায়। যেমন উত্তর আয়ারল্যান্ডে, ক্যাথলিক আর প্রটেষ্টান্টরা নিজেদের নামকরন করেছে যথাক্রমে ‘ন্যাশনালিষ্ট‘ আর ‘লয়ালিষ্ট’; ‘ধর্ম’ শব্দটাই সুকৌশল সেন্সরশীপের মাধ্যমে পরিবর্তিত করে ব্যবহার করা হচ্ছে ‘সমাজ’ বা ‘গোত্র’ শব্দের একার্থক হিসাবে, যেমন: ‘আন্তঃগোত্র যুদ্ধ; ২০০৩ সালে ইঙ্গ–মার্কিন আগ্রাসনের পর ইরাকে শিয়া এবং সুন্নী মতাবলম্বী মুসলিমদের মধ্যেই গোত্রভিত্তিক গৃহযুদ্ধের সূচনা হয় – সুস্পষ্ট ভাবে ধর্মীয় মতাদর্শের সংঘাত

– অথচ ২০০৬ সালের ২০ মে ইনডিপেন্ডেন্ট পত্রিকা তাদের প্রথম পাতার প্রধান শিরোনাম ও খবর, দুটোতেই গোত্রবিত্তিক গৃহযুদ্ধকে বর্ণনা করেছিল ‘‘জাতিগত বিশোধন’’ হিসাবে। এক্ষেত্রে জাতিগত শব্দটি আরেক সুভাষন বা গ্রহনযোগ্য প্রতিশব্দ মাত্র। ইরাকে আমরা যা দেখছি, সেটা আসলে ধর্মীয় বিশোধন। ‘‘জাতিগত বিশোধন’’ , শব্দটির মুল ব্যবহারক্ষেত্র প্রাক্তন ইয়োস্লাভিয়ায়, তর্কসাপেক্ষে বলা যেতে পারে অর্থডক্স সার্ব, ক্যাথলিক ক্রোয়াট, মুসলিম বসনিয়ীয়দের ‘ধর্মীয় বিশোধন’ এর একটি সুভাষন বা গ্রহনযোগ্য প্রতিশব্দ।

গনমাধ্যম এবং সরকারের সামাজিক নৈতিকতা বিষয়ে যে কোন ধরনের সাধারন আলোচনায় ধর্মকে বিশেষ সুযোগ দেয়া হয়ে থাকে, এই বিষয়টার প্রতি আমি আগেও সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করেছি[১১]; যখনই যৌন বা প্রজনন বিষয়ক ব্যক্তিগত নৈতিকতা সংক্রান্ত কোন ধরনের বিতর্ক হয়, আপনি বাজী রাখতে পারেন যে, বিভিন্ন ধর্মবিশ্বাসী দলকে প্রতিনিধিত্বকারী ধর্মীয় নেতাদের সবসময়ই, প্রভাবশালী কমিটিগুলোতে, রেডিও বা টেলিভিশনের প্যানেল আলোচনায় গুরুত্বপুর্ণ পদে দেখা যায়। আমি বলতে চাচ্ছিনা যে, উদ্দেশ্যমুলকভাবে এদের মতামতগুলোকে আমাদের নিয়ন্ত্রন করা উচিৎ; কিন্তু আমার প্রশ্ন, কেন সমাজ মতামতের জন্য এদের দ্বারস্থ হয়, কেনই বা আমরা এমন ভাবি যে, নীতিশাস্ত্রীয় দার্শনিক, কিংবা পারিবারিক আইনে পারদর্শী আইনজীবি অথবা একজন চিকিৎসকের সাথে তুলনা করা যেতে পারে এমন যোগ্যতা এদের আছে ?

ধর্মকে বিশেষ সুবিধা দেবার আরেকটা আজব উদহারন দেই: ২০০৬ সালে ২০ ফেব্রুয়ারী যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রীম কোর্ট সংবিধান অনুযায়ী রুল জারী করে, নিউ মেক্সিকোর একটি চার্চ হ্যালুসিনোজেনিক মাদকদ্রব্য ব্যবহার সংক্রান্ত রাষ্ট্রীয় আইনের আওতায় পড়বে না, যা বাকী সবার জন্য প্রযোজ্য [১২];‘সেন্ট্রো এসপিরিটা বেনেফিসিয়েন্টে উনিয়াও দো ভেজেটাল (ইউভিডি)’ এর বিশ্বাসী সদস্যরা মনে করেন ঈশ্বরকে বুঝতে হলে তাদের অবশ্যই হোয়াসকা চা [১৩] পান করতে হবে, যার মধ্যে অবৈধ হ্যালুসিনোজেনিক ড্রাগ ডাইমিথাইল ট্রিপ্টামিন আছে। লক্ষ্য করার বিষয় হলো, তারা যে বিশ্বাস করে এটা তাদের ঈশ্বরকে বোঝার ক্ষমতা বৃদ্ধি করে, সেই বিশ্বাসটাই যথেষ্ট, এর জন্য কোন আদালতে তাদের প্রমান দাখিল করতে হয়নি। আরেকদিকে ক্যানাবিস, কেমোথেরাপী পাচ্ছে এমন ক্যানসার আক্রান্ত রোগীদের বমি বমি ভাব এবং কিছু অস্বস্তিকর উপসর্গ কমাতে সাহায্য করে তার পক্ষে পর্যাপ্ত প্রমান থাকা সত্ত্বেও যুক্তরাষ্ট্রের এই সুপ্রীম কোর্টই ২০০৫ এ সংবিধান অনুযায়ী রুল জারী করেছিল, যারা চিকিৎসা হিসাবে ক্যানাবিস ব্যবহার করছে তাদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রীয় আইনে বিচার করা যেতে পারে (এমনকি সেই সব অঙ্গরাজ্যেও যেখানে বিশেষ ক্ষেত্রে ক্যানাবিসের ব্যবহার আইনসিদ্ধ); ধর্ম, সবসময়ের মতই এখানেও ট্রাম্প কার্ড। কল্পনা করুন তো কি সম্ভাব্য ফলাফল হতে পারে, যদি কোন শিল্পকলা সমঝদার গ্রুপ এর সদস্যরা কোর্টে আবেদন করে, যে তারা ‘বিশ্বাস’ করেন, ইম্প্রেশনিষ্ট বা সুরিয়ালিষ্টদের শিল্পকর্ম ভালোভাবে বোঝার জন্য অবশ্যই তাদের হ্যালুসিনোজেনিক ড্রাগ ব্যবহার করা প্রয়োজন । অথচ যখন কোন চার্চ একই ধরনের প্রয়োজনের জন্য দাবী জানালো, তা সমর্থন করলো দেশটির সর্বোচ্চ আদালত। এরকমই শক্তি ধারন করে ধর্ম, তাবিজের মতন।

ডগলাস অ্যাডামস

প্রায় আঠারো বছর আগে ছত্রিশ জন লেখক এবং শিল্পী দলের আমিও একজন ছিলাম, যাদের নিউ স্টেটসম্যান পত্রিকা থেকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল প্রখ্যাত লেখক সালমান রুশদীর সমর্থনে কিছু লেখার জন্য [১৪]; একটি উপন্যাস লেখার জন্য তখন সালমান রুশদীর উপর মৃত্যুদন্ডের ফতোয়া । খৃষ্টান ধর্মীয় নেতাদের এবং বেশকিছু ধর্ম নিরেপক্ষ মতবাদীদের, মুসলিম জনগনের ধর্মবিশ্বাসে ‘‘আঘাত‘ আর ‘‘অপমান’‘ এর জন্য ‘সমবেদনা’ প্রকাশের ভাষা দেখে ক্ষুদ্ধ হয়ে এরকমই তুলনা করেছিলাম:

যদি বর্ণবাদের সমর্থকরা একটু বুদ্ধিমান হত, তারা যদি দাবী করতো, -আমি যেটা সত্যি বলে জানি–, মিশ্র বর্ণের জাতি তাদের ধর্মের বিরুদ্ধে। সেক্ষেত্রে বর্ণবাদ বিরোধীদের বড় একটা অংশ শ্রদ্ধার সাথে নীরবে সরে যেত। এধরনের তুলনা করা সঠিক হবে না কারন বর্ণবাদের কোন যৌক্তিক ভিত্তি নেই–আমার মনে হয় এধরনের দাবী করাটা অর্থহীন হবে । ‘যৌক্তিক ভিত্তিহীনতা’ হল ধর্মীয় বিশ্বাসেরও সারকথা, এর শক্তি এবং প্রধানতম গৌরব।আমাদের সবাইকে আমাদের সকল সংস্কার বা প্রেজুডিসের ব্যাখ্যা বা আত্মপক্ষ সমর্থন করতে হয়, কিন্তু যখনই আপনি একজন ধর্মীয় ব্যক্তিকে তার বিশ্বাসের যৌক্তিক ভিত্তি ব্যখা করতে বলবেন, তখনই আপনি তার ‘ধর্মীয় স্বাধীনতায়’ হস্তক্ষেপ করার অভিযোগে অভিযুক্ত হবেন।

এরকমই কিছু একটা যে ঘটবে একবিংশ শতাব্দীতে তখন ,আমার জানা ছিল না । লস এন্জেলেস টাইমস (১০ এপ্রিল ২০০৬) রিপোর্ট প্রকাশ করে যে, যুক্তরাষ্ট্রে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে অসংখ্য ক্যাম্পাস নির্ভর খৃষ্টীয় সংগঠনগুলো তাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে মামলা করছে ‘সমকামীদের হয়রানি আর নির্যাতন’ নিষিদ্ধ করে প্রনীত ‘বৈষম্যবিরোধী আইন’ প্রয়োগ শুরু করার জন্য। এ ধরনের আদর্শ উদহারণ হিসাবে উল্লেখ করা যেতে পারে: ২০০৪ সালে ওহাইও র ১২ বছরের একজন কিশোর, জেমস নিক্সন স্কুলে ‘‘সমকামীতা হচ্ছে পাপ’, ‘‘‘‘ইসলাম হলো মিথ্যা’ ‘গর্ভপাত মানে হত্যা’’ এবং ”কিছু কিছু বিষয় এমন স্পষ্ট সাদা আর কালো” – [১৫] লেখা টি–শার্ট পরে স্কুলে যাবার অধিকার জিতে নিয়েছিল আদালতে। স্কুল কর্তৃপক্ষ তাকে এধরনের বিদ্বেষ পোষন করা টি–শার্ট পরে স্কুলে আসা নিষিদ্ধ করলে তার বাবা মা স্কুল কর্তৃপক্ষর বিরুদ্ধে মামলা করেন। বিবেকের কাছে কিন্তু অনেক বেশী গ্রহনযোগ্য হত যদি তারা মামলা ভিত্তি হিসাবে ব্যবহার করতো সংবিধানের প্রথম সংশোধনী, যা স্বাধীন মতামত প্রকাশ করার অধিকার নিশ্চিৎ করে। কিন্তু তারা তা করেননি, বরং নিক্সনের আইনজীবি আদালতে আবেদন করেছিল যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের যে ধারায় ‘ধর্ম পালনের স্বাধীনতার পুর্ণ অধিকার আছে’, সেই ধারায়। সফল এই মামলাটা পরিচালনায় পৃষ্টপোষকতা করেছিলো, অ্যালিয়ন্স ডিফেন্স ফান্ড অফ অ্যারিজোনা, যাদের অন্যতম প্রধান কাজ হলো ‘ধর্মীয় স্বাধীনতার জন্য আইনী লড়াই চালিয়ে যাওয়া’।

রেভারেন্ড রিক স্কারবোরো, এধরনের অনেকগুলো খৃষ্টিয় ও ধর্মীয় মদদপুষ্ট আইনী লড়াই, যা ‘সমকামী’ ও অন্যান্য গ্রুপদের প্রতি বৈষম্যমুলক আচরনের আইনসম্মত যুক্তিযুক্ত কারন হিসাবে ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করেছে, সমর্থন করে এদেরকে চিহ্নিত করেছেন, ‘একবিংশ শতাব্দীর নাগরিক অধিকার আদায়ের সংগ্রাম’ হিসাবে: ‘খৃষ্ট ধর্মানুসারীরা খৃষ্টান হবার অধিকার আদায়ের সংগ্রামে দৃঢ় অবস্থান নিবে’[১৬]; আবারো এই মানুষগুলো যদি স্বাধীনভাবে মত প্রকাশের অধিকার দাবীতে তাদের অবস্থান নিত, হয়ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও অনেকেই সমর্থন জানাতো। কিন্তু ব্যপারটা সম্পুর্ণ ভিন্ন। ‘খৃষ্ঠান হবার অধিকার’ এই ক্ষেত্রে ’অন্য মানুষের ব্যক্তিগত জীবনে নাক গলানোর অধিকার’; সমকামীদের বিরুদ্ধে বৈষম্যমুলক আচরনের পক্ষে মামলা এখন উল্টো ব্যবহার করা হচ্ছে তথাকথিত ধর্মীয় বৈষম্যমুলক আচরনের মামলা হিসাবে ! আইনেরও সায় আছে বলে মনে হচ্ছে ব্যপারটায়। আইনের হাত থেকে আপনি রেহাই পাবেন না, যদি বলেন, ‘সমকামীদের অপমান করা থেকে আমাকে নিষেধ করার চেষ্টা করা মানে আমার সংস্কার বা ঘৃণা প্রকাশ করার অধিকারে হস্তক্ষেপ করা’; কিন্তু আপনি রেহাই পেতে পারেন যদি বলেন, ‘এটা আমার ধর্মীয় স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা হচ্ছে’; যখন আপনি চিন্তা করবেন পার্থক্যটা আসলে কোথায়? এখানে আবারো, ধর্ম সবকিছুকেই ট্রাম্প করে।

একটি বিশেষ কেস স্টাডি দিয়ে এই অধ্যায়টি শেষ করছি, যা বিশেষ করে প্রমান করে ধর্মের প্রতি সাধারন মাত্রার মানবিক শ্রদ্ধার অনেক উপরে অবস্থান করছে সমাজের মাত্রারিক্ত শ্রদ্ধা। ঘটনাটি বিশাল আকার ধারন করে বিস্ফোরিত হয়েছিল ফেব্রুয়ারী ২০০৬ এ – হাস্যকর এই ঘটনা,যা চুড়ান্ত কমেডি আর ট্রাজেডির মাঝে দিকপরিবর্তন করেছে অপ্রত্যাশিত উন্মত্ততায়; এর আগের বছর সেপ্টেম্বর (২০০৫) মাসে, ড্যানিশ দৈনিক, ‘*জিল্যান্ডস পোস্টেন*’, প্রফেট মোহাম্মদকে নিয়ে ১২টা কার্টুন প্রকাশ করে। এর পরবর্তী তিন মাস ডেনমার্কে বসবাসকারী অল্প কিছু সংখ্যক মসুলমান, খুব সাবধানে ধীরে ধীরে পদ্ধতিগতভাবে পৃথিবীর প্রায় সকল মুসলিম দেশগুলোতে এর বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলে। এদের নেতৃত্ব দেন দুই ইমাম, যাদের একসময় নিরাপদ আশ্রয় দিয়েছিল দেশটি [১৭]। ২০০৫ সালে অনিষ্ট করার মানসিকতা নিয়ে এই দুই নির্বাসিত ইমাম ডেনমার্ক থেকে মিসর আসেন একটি ফাইল নিয়ে । সেখানে যা কপি করে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে দেয়া হয়, বিশেষ করে ইন্দোনেশিয়ায়। এই ফাইলে ছিল, ডেনমার্কে মসুলমানদের উপর তথাকথিত নির্যাতনের বানোয়াট বর্ণনা এবং একটি উদ্দেশ্যমুলক মিথ্যাচার যে‘*জিল্যান্ডস পোস্টেন*’ একটি ডেনিশ সরকার নিয়ন্ত্রিত পত্রিকা।

এছাড়াও এর সাথে সেই ১২ টা কার্টুন তো ছিলই এবং সবচে গুরুত্বপুর্ন, ইমামরা এর সাথে যোগ করেন আরো ৩টা অতিরিক্ত কার্টুন, যার উৎপত্তি খুবই রহস্যজনক এবং অবশ্যই ডেনমার্কের সাথে তার কোনই যোগাযোগ নেই। মুল ১২ কার্টুনের চেয়ে এই ৩ টি কার্টুনগুলো আরো বেশী অপমানজনক ছিল বা হতে পারতো – যদি– এই উৎসাহী প্রচারণাকারীদের অভিযোগ মতে –সেগুলো সত্যি সত্যি মোহাম্মদকে ব্যঙ্গ করে আকা হতো; এদের মধ্যে বিশেষ করে ক্ষতিকরটি আদৌ কোন কার্টুনই না. শুকরের নকল নাক ইলাস্টিক দিয়ে মুখে বাধা দাড়িওয়ালা মানুষের একটা ফ্যাক্স করে পাঠানো একটা ফটোগ্রাফ । পরবর্তীতে প্রমান হয়, ছবিটা আসলে অ্যাসোসিয়েট প্রেসের তোলা ফ্রান্সের একটা গ্রাম্য মেলায় ‘পিগ স্কুইলিং’ প্রতিযোগীতায় অংশ নিতে আসা একজন ফরাসী ব্যক্তির ছবি[১৮]; ছবির সাথে মোহাম্মদের কোন ধরনের যোগাযোগ নেই, ইসলাম ধর্মের কোন সম্পর্ক নেই আর ডেনমার্কেরও কোন সম্পর্ক তো নেই। কিন্তু মুসলিম অ্যাক্টিভিস্টরা তাদের ঝামেলা পাকানো কায়রো সফরে এই ছবির সাথে এই তিনটি সম্পর্কই জোড়া লাগায় ..... ফলাফল যা ধারনা করা হয়েছিল তাই হলো।

মুল ১২ কার্টুনের প্রকাশের পাচ মাস পর খুব সাবধানে সাজানো এই ”আঘাত” এবং “আক্রমন” এর ব্যপক বিস্ফোরণ ঘটে সারা বিশ্বব্যপী। পাকিস্থান আর ইন্দোনেশিয়ায় বিক্ষোভকারীরা ডেনমার্কের পতাকা পোড়ায় (কার কাছ থেকে তারা জোগাড় করেছিল সেই পতাকা?) ; ডেনিশ সরকারের প্রতি উন্মত্ত দাবী জানানো হল, ক্ষমা চাইবার জন্য (কিসের জন্য ক্ষমা চাইবে, ডেনিশ সরকারতো কার্টুনগুলো আকেনি বা প্রকাশও করেনি। শুধু ডেনিশ নাগরিকরা এমন একটা দেশে বসবাস করে, যেখানে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা আছে, যা অনেক ইসলামী দেশের

বসবাসকারীদের পক্ষে খুব সহজে বোঝা সম্ভব না); নরওয়ে,জার্মানী, ফ্রান্স এমনকি যুক্তরাষ্ট্রেও (কিন্তু উল্লেখযোগ্য ভাবে ব্রিটেনে না) বেশ কিছু দৈনিক *জিল্যান্ডস পোষ্টেন* এর সাথে একাত্মতা ঘোষনা করে কার্টুন গুলো পূনপ্রকাশ করে বিক্ষোভের আগুন আরো উসকে দেয়। দুতাবাস ভাংচুর, ড্যানিশ দ্রব্য বয়কট, ডেনিশ নাগরিকদের, মুলতঃ সকল পশ্চিমাদের শারীরিক আক্রমনের ভয় দেখানো হয়। পাকিস্থানে খৃষ্টানদের গীর্জা পোড়ানোর ঘটনা ঘটে, যাদের সাথে ইউরোপিয়ান বা ডেনিশদের কোন সম্পর্কই নেই। লিবিয়ার বেনগাজীতে ইতালিয়ান কনসুলেট এ দাঙ্গাকারীদের আক্রমনের সময় মারা যায় নয় জন। জেরমাইন গ্রীয়ার লিখেছিলেন ‘এই মানুষগুলো যা করতে পছন্দ করে আর যেটা ভালো করতে পারে তা হলো, বিশৃঙ্খলা’[১৯] ।

ডেনিশ কার্টুনিষ্টকে হত্যা করার জন্য এক পাকিস্থানী ইমান ১ মিলিয়ন ডলার পুরষ্কারও ঘোষনা করে–বোঝাই যাচ্ছে কোন ধারনা ছিল না যে, একজন না, ১২ জন কার্টুনিষ্টর আকা ছিল সেই কার্টুনগুলো আর অবশ্যই কোন ধারনা ছিল না যে, তিনটি বিশেষভাবে আপত্তিজনক ছবিগুলো কিন্তু আদৌ ডেনিশ না (আর, প্রসঙ্গক্রমে, ঐ মিলিয়ন ডলার যোগাড় হবে কোথা থেকে?); নাইজেরিয়াতে ডেনিশ কার্টুনের বিরুদ্ধে মুসলিম বিক্ষোভকারী বেশ কিছু চার্চ ধ্বংশ করে এবং ম্যাশেটে (এক ধরনের ছুরি) দিয়ে রাস্তায় খৃষ্টানদের (কালো নাইজেরীয়) আক্রমন ও হত্যা করে। একজন খৃষ্টানকে রাবারের টায়ারে মধ্যে বেধে রেখে তার গায়ে পেট্রল ঢেলে জীবন্ত দগ্ধ করা হয়। ব্রিটেনে অনুষ্ঠিত প্রতিবাদের ছবি সংবাদপত্রগুলোতে প্রকাশিত হলে দেখা যায় “হত্যা করো যারা ইসলামকে অপমান করে”, “জবাই করো যারা ইসলামকে ব্যঙ্গ করে”, “ইউরোপকে এর শাস্তি পেতে হবে”; লেখা ব্যনার হাতে বিক্ষোভকারীদের ছবি। সৌভাগ্য যে, ইসলাম যে শান্তি আর দয়ার ধর্ম সেটা আমাদের মনে করিয়ে দেবার জন্য রাজনীতিবিদরা বেশ তৎপর ছিলেন।

এই সব ঘটনার পরবর্তীতে সাংবাদিক অ্যান্ড্রু মুয়েলার ব্রিটেনের নেতৃত্বস্থানীয় ‘মধ্যপন্থি’ বা মডারেট মুসলিম নেতা স্যার ইকবাল স্যাকরানির সাক্ষাৎকার নেন [২০]; আজকের ইসলামের মাপকাঠিতে হয়ত তিনি ‘মধ্যপন্থি’ হতে পারেন, কিন্ত অ্যান্ড্রু মুয়েলার এর সাক্ষাৎ অনুযায়ী তিনি এখনও তার, সালমান রুশদীকে মৃত্যুদন্ডর ফতোয়া দেয়ার সময় করা সেই মন্তব্য থেকে সরে আসেননি : ‘মৃত্যুদন্ড তার জন্য হয়ত অনেক সহজ শাস্তি’; এই মন্তব্য তাকে অসন্মানের সাথে পৃথক করে দেয় তার সাহসী পুর্বসুরী প্রয়াত ডঃ জাকী বাদাওয়ী থেকে, যিনি তার নিজের বাসায় সালমান রুশদীকে নিরাপদ আশ্রয়ের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। সাকরানী মুয়েলারকে মন্তব্য করেছিলেন, তিনি ডেনিশ কার্টুন নিয়ে খুবই চিন্তিত, মুয়েলার নিজেও চিন্তিত, কিন্তু ভিন্ন কারনে: ‘আমি চিন্তাগ্রস্থ কারন অখ্যাত কোন এক স্ক্যান্ডিনিভিয়ান পত্রিকায় প্রকাশিত এই সব আদৌ হাস্যকর নয় এমন কতগুলো কার্টুন যে ভাবে অদ্ভুতরকমের মাত্রা ছাড়ানো প্রতিক্রিয়া ঘটিয়েছে তা স্পষ্ট করে দেয়....... ইসলাম এবং পশ্চিম আসলে মুলভাবগতভাবেই অসমন্বয়যোগ্য’; স্যাকরানি অপরদিকে ব্রিটিশ গণমাধ্যমের প্রশংসা করেছে কার্টুনগুলো পুনঃপ্রকাশ করা থেকে বিরত থাকতে, প্রত্যুত্তরে মুয়েলার ব্রিটেনের অধিকাংশ মানুষের সন্দেহকে কন্ঠ দিয়ে বলেছেন, ‘কার্টুনগুলো পুনপ্রকাশ না করার ক্ষেত্রে ব্রিটিশ পত্রিকাগুলোর সংযম প্রদর্শনের কারন মুসলিমদের প্রতি সমমর্মিতা নয়, বরং তারা কেউ তাদের জানালা ভাঙ্গুক সেটা আসলে তারা সেটা চাননি’।

স্যাকরানি ব্যখা করেন, ‘নবীকে (তার উপর শান্তি বর্ষিত হোক), সমস্ত মুসলিম জগত গভীর ভাবে শ্রদ্ধা করে, যে ভালোবাসা কোন শব্দ দিয়ে ব্যখা করা যায় না। যা পিতামাতা, প্রিয়জন, সন্তান থেকেও বেশী। এটা বিশ্বাসেরই অঙ্গ। এছাড়াও সুস্পষ্টভাবে ধর্মীয় নিষেধাজ্ঞা আছে নবীর কোন প্রতিকৃতি আকার ব্যপারে’; এর মানে মুয়েলারের ভাষায়:

> ইসলামের মুল্যবোধ অন্য যে কারোর মুল্যবোধের উপরে অবস্থান করে –অন্য যে কোন ধর্মের অনুসারীরা যেমন করে বিশ্বাস করেন, তাদেরটাই একমাত্র পথ, সত্য আর আলোকময়, সেভাবে ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসীরাও সেটাই মনে করেন । যদি কেউ ৭ম শতাব্দীর একজন ধর্মপ্রচারককে তাদের নিজেদের পরিবারের সদস্যদের চেয়ে বেশী

ভালোবাসতে ইচ্ছা পোষন করেন, সেটা শুধুমাত্র তাদের ব্যপার; বিষয়টিকে গুরুত্ব দেবার জন্য অন্য আর কেউ বাধ্য নয় ।

শুধুমাত্র পার্থক্য, আপনি যদি ব্যপারটা গুরুত্বর সাথে না নেন, এবং প্রয়োজনীয় সন্মান না দেখান সেক্ষেত্রে আপনাকে শারীরিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ করার হুমকি দেয়া হবে, এবং সেটা এমন এক মাত্রায় যা মধ্যযুগ পরবর্তী আর কোন ধর্মেই আর কখনো দেখা যায়নি। যে কাউকেই বিষয়টা চিন্তা করতে বাধ্য করে, কেন এই ধরনের সহিংসতা প্রয়োজন, কারন, মুয়েলারের পর্যবেক্ষন: ‘যদি আপনাদের মধ্যে কোন ভাড়, যদি সত্যি হন ধর্মের ব্যপারে, সেক্ষেত্রে এই কার্টুনিষ্টরাতো নরকেই যাবে, সেটাই কি যশেষ্ট না ? আর ততক্ষন মুসলিমদের উপর নির্যাতনের ব্যপারে যদি আপনাদের উত্তেজিত হতে একান্ত ইচ্ছাই করে, তাহলে সিরিয়া আর সৌদি আরবের উপর অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের রিপোর্টটা পড়লেই হয়’।

অনেক মানুষই বিস্মিত হয়ে লক্ষ্য করেছে, স্নায়ুবিকারগ্রস্থের মত ‘ধর্মীয় বিশ্বাসে ‘আঘাত’ এর কথা বলা মুসলিম আর আরব মিডিয়ায় গৎবাধা ইহুদী বিরোধী কার্টুন ছাপানোর ক্ষেত্রে অতিরিক্ত উৎসাহ প্রদর্শনের মধ্যকার পার্থক্যটা। পাকিস্থানে ডেনিশ কার্টুনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভের একটা ছবিতে দেখা যায়, কালো বোরখা পরা একজন মহিলার হাতে ব্যনার, তাতে লেখা, ‘ঈশ্বর হিটলারকে আশীর্বাদ করুন’।

এইসব বিশ্বব্যাপী উন্মত্ত বিশৃঙ্খলার প্রতিক্রিয়ায়, ভদ্র উদারপন্থী দৈনিকগুলো সহিংসতাকে নিন্দা আর বাকস্বাধীনতার উপর দায়সারা গোছের মন্তব্য করেছে মাত্র। কিন্তু একই সাথে তারা তাদের ‘শ্রদ্ধা’ আর ‘সমবেদনা’ প্রকাশ করেছে মসুলমানদের এই গভীর ‘আঘাত’ ও ‘অপমান’ সহ্য করবার জন্য। মনে রাখতে হবে এই ‘আঘাত’ এবং ’কষ্ট’ কিন্তু কোন ব্যক্তিদের না, যারা সহিংসতা সহ্য করেছে বা কোন ধরনের সত্যিকার যন্ত্রনা সহ্য করেছে : বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির লক্ষ্যে উদ্দেশ্যমুলকভাবে প্রচারনা ছাড়া, ডেনমার্কের বাইরে কেউই কোনদিন নামই শুনতো না এমন অখ্যাত এক খবরের কাগজে ছাপা কয়েক ফোটা কালি দাগে ছাড়া যা আর কিছুই নয়।

আমি কাউকে অপমান বা আঘাত করার খাতিরে অপমান বা আঘাত করার পক্ষপাতী নই। কিন্তু খুবই অবাক হই আর রহস্যময় মনে হয়, আমাদের এই অন্য প্রায় সব অর্থেই ধর্মনিরপেক্ষ সমাজগুলোয় ধর্মকে কেন এই মাত্রাতিরিক্ত সুযোগ দেয়া হয়। সব রাজনীতিবিদরাই হেয় করা কার্টুনের শিকার হয়, কিন্তু তাদের সমর্থনে তো কোন দাঙ্গা হয় না। ধর্মর কি এমন যোগ্যতা আছে যে তাকে এই বিশেষ মর্যাদা দিতে হবে। যেমন, এইচ এল মেনকেন বলেছিলেন, ‘অন্য কারো ধর্মকে অবশ্যই আমাদের শ্রদ্ধা করতে হবে কিন্তু সেটা শুধুমাত্র তার স্ত্রী সুন্দরী এবং তার ছেলেমেয়েরা বেশী বুদ্ধিমান, তার নিজস্ব এই তত্বটিকে যে অর্থে এবং যতটুকু আমরা শ্রদ্ধা করি ঠিক সেটুকুই’।

‘ধর্মের প্রতি সমাজে এধরনের অতুলনীয় শ্রদ্ধা বিদ্যমান’ [২১] এই পূর্বধারনার আলোকেই আমি এই বইয়ের জন্য আমার নিজস্ব দ্বায়দ্বায়িত্বের সীমা নির্ধারন করে নিচ্ছি। আমি কাউকে আঘাত করার জন্য এই বই লেখার মুল উদ্দেশ্যর বাইরে যেমন যাবো না, তেমনি আমি ধর্ম নিয়ে আলোচনা করার সময় আর অন্য যে কোন বিষয় নিয়ে যেভাবে আলোচনা করতাম তার চেয়ে হালকাভাবেও করবো না।

---

[১] আমাদের জন্য মজার একটা খেলা ছিল, ক্লাসে পড়ানোর সময় তাকে বাইবেল থেকে সরিয়ে ফাইটার কম্যান্ড আর দি ফিউ”“ র** শিহরন জাগানো গল্পের দিকে নিয়ে যাওয়া। যুদ্ধের সময় তিনি রয়্যাল এয়ার ফোর্সে কাজ করেছিলেন। কিছুটা পরিচিত আর স্লেহর মত কোন একটা অনুভূতি দিয়ে আমি আজও চার্চ অফ ইংল্যান্ডকে মনে রেখেছি (অন্ততপক্ষে অন্য সব প্রতিপক্ষদের তুলনায়)।

পরবর্তীতে আমি জন বেটজামিন এর কবিতায় পড়েছিলাম:

Our padre is an old sky pilot;
Severely now they’ve clipped his wings’
But still the flagstaff in the rec’try garden
points to higher things …

*** The Few is a term used to describe the Allied airmen of the British Royal Air Force (RAF) who fought the Battle of Britain in the Second World War. It comes from Winston Churchill’s phrase “never was so much owed by so many to so few”.*

[২] *It is interesting to contemplate an entangled bank, clothed with many plants of many kinds, with birds singing on the bushes, with various insects flitting about, and with worms crawling through the damp earth, and to reflect that these elaborately constructed forms, so different from each other, and dependent on each other in so complex a manner, have all been produced by laws acting around us. These laws, taken in the largest sense, being Growth with Reproduction; inheritance which is almost implied by reproduction; Variability from the indirect and direct action of the external conditions of life, and from use and disuse; a Ratio of Increase so high as to lead to a Struggle for Life, and as a consequence to Natural Selection, entailing Divergence of Character and the Extinction of less-improved forms. Thus, from the war of nature, from famine and death, the most exalted object which we are capable of conceiving, namely, the production of the higher animals, directly follows. There is grandeur in this view of life, with its several powers, having been originally breathed into a few forms or into one; and that, whilst this planet has gone cycling on according to the fixed law of gravity, from so simple a beginning endless forms most beautiful and most wonderful have been, and are being, evolved. (An Entangled Bank. From the conclusion of Darwin’s Origin of Species First Edition, 1859)*

[৩] *However, if we discover a complete theory, it should in time be understandable by everyone, not just by a few scientists. Then we shall all, philosophers, scientists and just ordinary people, be able to take part in the discussion of the question of why it is that we and the universe exist. If we find the answer to that, it would be the ultimate triumph of human reason — for then we should know the mind of God. (A Brief History of Time, Stephen Hawkins, p.193)*

[৪] *Parson : An Anglican cleric with full legal control of a parish under ecclesiastical law; a rector*
[৫] টেলিভিশন ডকুমেন্টরী, ইন্টারভিউ যার একটা অংশ। Winstone R (2005). The Story of God. London. Transworld/BBC.
[৬] Dennett DC (2006), Breaking The Spell: Religion as Natural Phenomenon. London: Viking.
[৭] Ecumenical: promoting or tending toward worldwide Christian unity or cooperation

[৮] পুরো বক্তৃতা টা আছে অ্যাডামস (২০০৩) ‘‘কৃত্রিম ঈশ্বর বলে কেউ কি আছে’’ শিরোনামে। Adams, D.(2003). The Salmon of Doubt.London.Pan

[৯] A conscientious objector (CO) is an “individual [who has] claimed the right to refuse to perform military service” on the grounds of freedom of thought, conscience, or religion.

[১০] QUAKERS, A Christian sect founded by George Fox about 1660; commonly called Quakers, also known as The Religious Society of Friends. The name is used by a range of independent religious organizations which all trace their origins to a Christian movement in mid-17 century England and Wales. A central belief was that ordinary people could have a direct experience of the eternal Christ. Today, the theological beliefs among the different organizations vary, but include broadly evangelical Christian, liberal Protestant, Christian Universalist and non-Christian Universalist beliefs. Some of these organizations also use the name Quaker or Friends Church.

[১১] 'Dolly and the clothes head' : A Devil's Chaplain: Selected essays. London: Weidenfeld and Nickolson.

[১২] http://www.oyez.org/cases/2000-2009/2005/2005-04-1084/. In early November 2005, justices of the US Supreme Court heard arguments for and against the importation of hoasca tea. Hoasca contains dimethyltryptamine (DMT), an illegal, hallucinogenic drug. The tea is used by members of the Brazil-based church called O Centro Espirita Beneficiente Uniao do Vegetal (UDV) during religious ceremonies. There are only 130 members of the church in the United States (http://faculty.washington.edu/chudler/hoas.html)

[১৩] Hoasca tea is made by brewing two Amazonian plants called *Psychotria viridis* and *Banisteriopsis caapi*. The plants are considered to be sacred to the UDV and the tea is used for religious purposes only. In May 1999, US Custom agents seized three drums of hoasca tea sent from Brazil to the UDV in the US. After lower courts debated the legality of the seizure, the US Supreme Court heard arguments about whether the Religious Freedom Restoration Act of 1993 should permit the importation, distribution, possession, and use of hoasca by the UDV (http://faculty.washington.edu/chudler/hoas.html).

[১৪] R. Dawkins, 'The irrationality of faith', New Statesman (London), 31 March 1989

[১৫] Columbus Dispatch, 19 Aug. 2005.

[১৬] Los Angeles Times, 10 April 2006.

[১৭] http://gatewaypundit.blogspot.com/2006/02/islamic-society-used-fake.html.

[১৮] http://news.bbc.co.uk/2/hi/south_asia/4686536.stm;

[১৮] http://www.neandernews.com/?cat=6.

[১৯] The Independent, 5 Feb, 2006.

[২০] Andrew Mueller. `An Argument with Sir Iqbal', Independent on Sunday, 2 April 2006, Sunday Review Section, 12-16

[২১] এই পেপারব্যাক এর যখন প্রুফ দেখা হচ্ছে, তখন নিউ ইয়র্ক টাইমস এই ধরনের বিশেষ সন্মান প্রদর্শনের একটা ঘটনা প্রকাশ করে। ২০০৭ এর জানুয়ারীতে, এক জার্মান মহিলা দ্রুত বিবাহ বিচ্ছেদের আবেদন জানায় আদালতে, তার অভিযোগ ছিল তার স্বামী তাদের বৈবাহিক জীবনের শুরুর থেকেই তাকে প্রায়ই ভয়ঙ্কর রকমের মারধোর করে। এই ঘটনা মেনে নিয়েই বিচারক ক্রিষ্টা দাট-ভিন্টার কোরানের উদ্ধৃতি উল্লেখ করে তার আবেদন নাকচ করে দেন। এধরনের অভূতপুর্ব রায়ের মাধ্যমে মুসলিম প্রথা আর ইউরোপিয়ান আইনের মধ্যকার দন্দ্বকে প্রকাশ করে। বিচারক ক্রিষ্টা দাট-ভিন্টার বলেন এই দম্পতিরা মরোক্কর সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলের, যে সংস্কৃতিতে তার

মতে স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে প্রহার স্বাভাবিক একটি ঘটনা। তার ভাষায় কোরান এধরনের শারীরিক নির্যাতনের অনুমতি দিয়েছে (নিউ ইয়র্ক টাইমস, ২৩ জানুয়ারী, ২০০৭)। এই অবিশ্বাস্য ঘটনা প্রকাশ পায় মার্চে যখন মহিলার আইনজীবি বিষয়টি প্রকাশ করেন গণমাধ্যমে। দ্রুততার সাথেই ফ্র্যাঙ্কফুর্ট কোর্ট এই বিচারককে এই কেস থেকে অপসারন করে। তাসত্ত্বেও, নিউ ইয়র্ক টাইমস এর প্রতিবেদনটি মন্তব্য করে, এই ঘটনা অন্যান্য নির্যাতনের শিকার মুসলিম মহিলাদের জন্য ব্যপক ক্ষতি করবে: যারা অনেকেই স্বামীর বিরুদ্ধে আদালতে যেতে এমনিতেই ভয় পায়। সেখানে বেশকিছু ‘ পারিবারিক সন্মানের জন্য হত্যার’ ঘটনাও ঘটেছে, যেখানে তুর্কী পুরুষদের হাতে নিহত হয়েছে মহিলারা। বিচারক ক্রিষ্টা দাট–ভিল্টার এর উদ্দেশ্য ব্যখা করা হয়েছে ‘সাংস্কৃতিক সংবেদনশীলতা’ হিসাবে, কিন্তু আরেকভাবে একে বলা যায় ‘অপমানের পৃষ্ঠপোষকতা’ করা । ‘অবশ্যই আমরা ইউরোপিয়ানরা এধরনের ব্যবহার করার কথা স্বপ্নেও ভাবতে পারিনা, কিন্তু বৌ–পেটানো ‘‘‘তাদের সংস্কৃতির’’ একটা অংশ, ‘‘তাদের ধর্মে’’এর অনুমতি আছে, আমাদের সেটা ‘‘শ্রদ্ধা’’ করা উচিৎ।

ঈশ্বর হাইপোথিসিস

By K M Hassan

পিটার ইয়াঙ এর তোলা রিচার্ড ডকিন্স এর একটি প্রোর্টেট। (জন্ম: ২৬ শে মার্চ, ১৯৪১);
এই বৃটিশ বিবর্তন জীববিজ্ঞানী আমাদের চিন্তা করার প্রক্রিয়াটি আমুল বদলে দিয়েছেন।

(অনুবাদকের কথা: নীচে ধারাবাহিক খন্ডে খন্ডে লেখা দ্বিতীয় অধ্যায়টির অনুবাদ একসাথে পোষ্ট করলাম। একজায়গায় থাকলে অনুবাদের ভুলগুলো শুধরানো সহজ হবে)

রিচার্ড ডকিন্স এর দি গড ডিল্যুশন : দ্বিতীয় অধ্যায়

The God Delusion by Richard Dawkins

(অনুবাদ প্রচেষ্টা: কাজী মাহবুব হাসান)

:ঈশ্বর হাইপোথিসিস:

“এক যুগের ধর্ম পরবর্তী যুগের আনন্দদানকারী সাহিত্যকর্ম” – রালফ ওয়ালদো এমারসন

সকল কাহিনীর মধ্যে ওল্ড টেষ্টামেন্টের ঈশ্বরই হলো তর্কসাপেক্ষে সবচেয়ে বেশী অপ্রীতিকর একটা চরিত্র: হিংসুটে এবং এর জন্য গর্বিত, সংকীর্ণমনা,অন্যায়কারী, ক্ষমা প্রদর্শনে অক্ষম, সবকিছু নিয়ন্ত্রন করার মানসিক দোষে দুষ্ট; একজন প্রতিহিংসা পরায়ন, রক্তপিপাসু জাতিগত বিশোধনকারী; একজন নারী বিদ্বেষী, সমকামীদের প্রতি ঘৃনা

পোষনকারী (হোমোফোবিক), বর্ণবাদী, শিশুহত্যাকারী, গনহত্যাকারী, সন্তানহত্যাকারী, বিশ্রী রকমের বিরক্তকর, নিজেকে অতি বড় ভাবার প্রবণতা বা অতিআত্মম্মন্যতায় আক্রান্ত, স্যাডোম্যাসোকিস্ট (ধর্ষ–মর্ষকামী); খামখেয়ালী পরশ্রীকাতর, দূর্বলের উপর অত্যাচারকারী। আমরা যারা শৈশব থেকে তার কাহিনীর সাথে পরিচিত, এসব ভীতিকর ঘটনার প্রতি তাদের সংবেদনশীলতা হ্রাস পেতে পারার সম্ভাবনা আছে। একজন অবুঝ, যে একটি নিষ্পাপ দৃষ্টিভঙ্গীর দ্বারা আশীর্বাদপুষ্ট, এই বিষয়ে সে একটা অপেক্ষাকৃত নিরপেক্ষ এবং সুস্পষ্ট ধারনা পোষন করতে সক্ষম। উইনস্টোন চার্চিল এর পুত্র রানডলফ সুকৌশলে বাইবেল সম্বন্ধে নিজেকে পুরোপুরি অজ্ঞাত রাখতে পেরেছিল, যতক্ষন না পর্যন্ত, ইভলিন ওয়াহ ও অন্য একজন বন্ধু সামরিক অফিসার, যারা তার সাথে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় একই জায়গায় কর্মরত ছিলেন– তারা চার্চিলকে চুপ রাখার জন্য ব্যর্থ প্রচেষ্ঠা হিসাবে তার সাথে বাজী রেখেছিলেন, তিনি পনেরো দিনের মধ্যে বাইবেল পড়ে শেষ করতে পারবেন না: ‘দুর্ভাগ্যজকভাবে যা ঘটলো তা আমরা আশা করিনি। যেহেতু এটা আগে সে একটুও পড়েনি এবং পড়া মাত্রই ভয়াবহ আনন্দিত হয়েছিল; এবং বারবার বিভিন্ন উদ্ধৃতি জোরে জোরে পড়ে শোনানো শুরু করলো, ‘আমি নিশ্চিৎ, তোমরা জানতে না এই কথাটা বাইবেল থেকে এসেছে’ অথবা শুধু শুধু হাসি আর তালি বাজিয়ে স্বগোতক্তি করতো: ‘ঈশ্বর! ঈশ্বর কি যাচ্ছেতাই রকমের জঘন্য, তাই না!’[১] টমাস জেফারসন–আরো বেশী পড়াশুনা ছিল তার, একই মতামত পোষন করতেন, মোজেস এর ঈশ্বরকে তিনি বর্ণনা করেছিলেন, ‘ভয়ানক এক চরিত্র– নিষ্ঠুর, প্রতিহিংসাপরায়ন,খামখেয়ালী, অন্যায়কারী’।

এরকম একটা সহজ নিশানাকে আক্রমন করা হয়তো সঠিক হচ্ছে না। ঈশ্বর হাইপোথেসিস প্রমান হবে কি, হবে না, তা এর সবচাইতে অপ্রিয় উদহারন, ইয়াওয়ে বা এর নীরস বিপরীত খৃষ্টীয় রুপ, ‘ভদ্র, নম্র ও নরম স্বভাবের জেসাস’ এর উপর নির্ভর করা উচিৎ না। (মানতে হবে এই নীরিহ গোবেচারা‘*ব্যাক্তিস্বটি*’, জেসাসের চেয়েও তার ভিক্টোরিয়ান অনুসারীদের কাছে বেশী ঋণী); মিসেস সি এফ আলেক্সান্ডার এর ‘খৃষ্টান সব শিশুরা সবাই তার মত অবশ্যই নম্র, অনুগত, ভালো হতে হবে’ এর চেয়ে বিরক্তিকর ভাবপ্রবন কি কিছু হতে পারে?) আমি ইয়াওয়ে বা জেসাস বা আল্লাহ, বা নির্দিষ্ট কোন দেবতা যেমন, বা’ল, জিউস বা ওটান এর বিশেষ কোন গুনাবলীকে আঘাত করছি না। তার পরিবর্তে ঈশ্বর হাইপোথেসিসকে সঙ্গায়িত করব এমন ভাবে যার পক্ষে আরো খানিকটা বেশী বিতর্ক করা সম্ভব, সেভাবে: এমন একজন অতিমানবীয়, অতিপ্রাকৃত বুদ্ধিমত্তার অস্তিত্ব আছে, যিনি তার ইচ্ছামত এই মহাজগত পরিকল্পনা এবং আমাদের সহ, এর মধ্যে অস্তিত্বশীল সব কিছু সৃষ্টি করেছেন।এই বইটি এর একটি বিকল্প দৃষ্টিভঙ্গীর স্বপক্ষে আলোচনা করবে। ‘যে কোন সৃজনশীল বুদ্ধিমত্তা, যা যথেষ্ট পরিমান জটিল এবং সবকিছু পরিকল্পনা ও সৃষ্টি করার ক্ষমতা রাখে, তার নিজেরই সৃষ্টি হওয়া সম্ভব শুধুমাত্র একটি সুদীর্ঘ প্রক্রিয়ার ক্রম বিবর্তনের শেষ উৎপন্ন হিসাবে। সৃজনশীল বুদ্ধিমত্তা একটি ক্রম বিবর্তন উৎপাদন বিধায় মহাবিশ্বে তার আগমন ঘটবে অবশ্যই অনেক পরে, সুতরাং সে কোনভাবেই বাকী সবকিছুর পরিকল্পনা ও সৃষ্টি করার জন্য দায়ী হতে পারে না। ঈশ্বর, যে অর্থে সঙ্গায়িত করা হয়েছে তা হচ্ছে: একটি বিভ্রান্তি বা ডিল্যুশন; এবং পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে ক্রমান্বয়ে আরো সুস্পষ্ট হবে, একটি ভয়ানক ক্ষতিকর বিভ্রান্তি।

আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই, যার ভিত্তি সুস্পষ্ট প্রমানহীন ব্যক্তিগত কোন গুপ্ত আবিষ্কারের স্থানীয় লোকাচারে, ঈশ্বর হাইপোথেসিসও এর নানা রুপে বিদ্যমান। ধর্মের ইতিহাসবিদরা চিহ্নিত করেছেন এর বিবর্তন, আদিম অ্যানিমিজম বা সর্বপ্রাণবাদ থেকে বহুঈশ্বরবাদ, যেমন, গ্রীক, রোমান, নরওয়েজীয়রা, ও তার থেকে একেশ্বরবাদ যেমন: জুডাইজম ও তার উপজাত খৃষ্টধর্ম ও ইসলাম।

বহুঈশ্বরবাদ বা পলিথেইজম:

ব্যপারটা স্পষ্ট নয়, কেন বহুঈশ্বরবাদ থেকে একেশ্বরবাদ কে ধরে নেয়া উচিৎ একটি স্বতঃসিদ্ধ ক্রম উন্নয়ন হিসাবে। কিন্তু এরকমই একটা ধারনা ব্যাপকভাবে প্রচলিত, ইবনে ওয়ারাক (‘হোয়াই আই অ্যাম নট এ মুসলিম’ এর লেখক) যে কারনেই বুদ্ধিদীপ্ত অনুমান করেছিলেন যে, একেশ্বরবাদ ও শেষ পর্যন্ত তার উত্তরণের পথে আরো

একটি ঈশ্বরকে বাদ দিয়ে নিরীশ্বরবাদে পরিণত হবে। *ক্যাথলিক এনসাইক্লোপেডিয়া* বহুঈশ্বরবাদ এবং নিরীশ্বরবাদকে নির্বিকারে একই কাতারে দাড় করিয়ে ভিত্তিহীন আখ্যা প্রদান করেছে : ‘ আনুষ্ঠানিক গোড়া নিরীশ্বরবাদ স্ববিরোধী এবং বাস্তবে কখনোই উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মানুষের সমর্থন আদায় করতে পারেনি, বহুঈশ্বরবাদও পারেনি একই ভাবে, যদিও সাধারন মানুষের কল্পনাকে তা আলোড়িত করেছে, কিন্তু একজন দার্শনিকের মনকে কখনোই পারেনি সন্তুষ্ট করতে’ [২]।

একেশ্বরবাদীদের উগ্র আত্ম অহংকার অতি–সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত্য ইংল্যান্ড ও স্কটল্যান্ডের চ্যারিটি আইনেও সুস্পষ্ট ছিল, করের আওতামুক্ত অবস্থানের জন্য যা বহুঈশ্বরবাদী সংগঠনগুলোর সাথে বৈষম্যমুলক আচরন করেছে, ফলাফলে একচেটিয়া সুযোগ পেয়েছে একেশ্বরবাদীদের ধর্ম প্রচারণার দাতব্য প্রতিষ্ঠানগুলো; এমনকি তারা সুকৌশলে এড়াতেও পেরেছে সরকারের কঠিন তদারকী যা যে কোন ধর্মনিরেপক্ষ সংগঠনগুলোর জন্য বাধ্যতামুলক। আমার একটা বিশেষ লক্ষ্য ছিল, ব্রিটেনের সন্মানজনক হিন্দু সমাজের কোন সদস্যকে রাজী করাবো বহুঈশ্বরবাদীদের বিরুদ্ধে এধরনের অবজ্ঞাসুলভ বৈষম্যকারী আইনের বিরুদ্ধে নাগরিক অধিকার আইনে মামলা করতে।

অবশ্যই তার থেকে অনেক বেশী উত্তম কাজটি হবে, দাতব্য সংস্থার করের আওতামুক্ত অবস্থানের কারন হিসাবে ধর্মীয় প্রচারণার কাজটি সম্পুর্নরুপে পরিত্যাগ করা। এধরনের কর্মকান্ড বন্ধ হলে অনেক উপকার পাবে সমাজ, বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্রে, সেখানে যে পরিমান করমুক্ত অর্থ চার্চগুলো শুষে নেয়, এবং সেই অর্থ এমনিতেই ধনী সব টেলিভ্যানজেলিষ্টদের সম্পদ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করে চলেছে, অনায়াসে বলা যেতে পারে তার মাত্রা অশ্লীল পর্যায়ে পৌছেছে। উপযুক্তভাবে নামকৃত ওরাল রবার্টস একবার তার টেলিভিশন দর্শকদের বলেছিল যে, ঈশ্বর তাকে হত্যা করবে যদিনা তারা তাকে ৮ মিলিয়ন ডলার না দেন। প্রায় অবিশ্বাস্যভাবে, তার মুখের কথায় কাজও হয়েছিল, করমুক্ত ! রবার্টস এখন খুবই ভালো আছেন, তুলসা অ্যারিজোনায় ‘ওরাল রবার্টস বিশ্ববিদ্যালয়’ ও ভালো আছে। যার বিভিন্ন ভবনগুলো, মুল্য হবে প্রায় ২৫০ মিলিয়ন ডলার, সরাসরি ইশ্বরের এই নির্দেশনায় নির্মিত হয়েছে: ‘আমার কন্ঠ শোনার জন্য তোমার শিক্ষার্থীদের গড়ে তোল, আমার কন্ঠ শোনার জন্য, যেখানে, আমার আলো যেখানে ক্ষীন, আমার কন্ঠ দুর্বল, আমার আরোগ্যদানের শক্তি অজানা, পৃথিবীর সর্বশেষ সীমা পর্যন্ত্য, সেখানে যাওয়ার জন্য তাদের প্রস্তুত করো। তাদের কর্ম তোমার কর্মকেও ছাড়িয়ে যাবে এবং এতেই আমি মহাসন্তুষ্ট’।

বিষয়টা নিয়ে ভাবলে দেখা যাবে, আমার কাল্পনিক হিন্দু ধর্মাবলম্বী সম্ভবত ‘যদি তাদের হারাতে না পারো, তাহলে তাদের সাথে যোগ দাও’ এই যুক্তিটা তার পক্ষে কাজ করাতে উৎসাহী হবেন। তার বহুঈশ্বরবাদ আসলে তো বহুঈশ্বরবাদ না, বরং ছদ্মবেশে একেশ্বরবাদ। সেখানেও কেবল একজনই ঈশ্বর – দেবতা ব্রহ্মা, যিনি সৃষ্টিকর্তা, দেবতা বিষ্ণু, যিনি রক্ষক, দেবতা শিব, যিনি ধ্বংশকারী, দেবী সরস্বতী, লক্ষী, পার্বতী (ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব–এর সহধর্মিনী), দেবতা গনেশ (হাতি দেবতা) এবং আরো শত শত দেবদেবী, সবাই একই ঈশ্বরের বহুরুপ বা অবতার।

খৃষ্ট ধর্মানুসারীদের বিষয়টার প্রতি সহমর্মী হওয়া উচিৎ। মধ্যযুগে, রক্তের কথাতো বাদই দিলাম, কয়েকটা নদী সমান কলমের কালি, অপচয় করা হয়েছে ‘ট্রিনিটি’র ‘রহস্য’ ব্যাখ্যা করতে যেয়ে আর এর ব্যাতিক্রমের ভিন্নমতকে দমন করতে, যেমন, এরিয়ান হেরেসি বা ভিন্নমত। খৃষ্ট জন্ম পরবর্তী চতুর্থ শতাব্দীতে আলেক্সান্দ্রিয়ার এরিয়াস, অস্বীকার করেন, জেসাস ঈশ্বরের ‘কনসাবস্ট্যানশিয়াল’ (অর্থাৎ একই সাবস্টান্স বা এসেন্স দিয়ে তৈরী)। আশ্চর্য্য ! এর সম্ভাব্য কি অর্থ হতে পারে, আপনি সম্ভবত জিজ্ঞাসা করতে পারেন? পদার্থ বা সাবস্টান্স ? কি ‘সাবস্টান্স’? এই মুল বা এসেন্স বলতে কি আসলে আপনি কি বোঝাতে চাচ্ছেন? ‘খুব সামান্য’ সম্ভবতঃ মোটামুটি একটা উত্তর হতে পারে। তারপরও এই বিতর্ক এক শতাব্দী ধরে খৃষ্টধর্মকে বিভক্ত করে রেখেছিল। এবং সম্রাট কনস্টান্টিন এরিয়াসের বই এর সব কপি পুড়িয়ে ফেলার নির্দেশ দেন। খৃষ্টধর্মকে বিভক্ত করা এমন তুচ্ছ অযৌক্তিক বিতর্কে – ধর্মতত্ত্বেরনিয়ম চিরকালই এরকম ছিল।

আমাদের (খৃষ্ট ধর্মাবলম্বী) তাহলে, তিন অংশে বিভক্ত এক ঈশ্বর আছেন নাকি একের মধ্যে তিন ঈশ্বর ? *ক্যাথলিক এনসাইক্লোপেডিয়া* আমাদের জন্য ব্যাপারটা স্পষ্ট করেছে ধর্মতত্ত্বের একটি অসাধারন উৎকৃষ্ট আবদ্ধ যুক্তি বা ক্লোস রিজনিং মাধ্যমে:

ঈশ্বরের একাত্মতায় তিনটি সত্ত্বার অবস্থান, পিতা, পুত্র এবং পবিত্র আত্মা, তিনটি সত্ত্বাই পরস্পর থেকে সত্যিকার অর্থে পৃথক। এভাবেই অ্যাথানেসিয়ার ক্রীড এর ভাষা অনুযায়ী : ‘ পিতা ঈশ্বর, পুত্র ঈশ্বর এবং পবিত্র আত্মা ঈশ্বর কিন্তু তা সত্বেও তিন জন ঈশ্বর নেই, একজনই ঈশ্বর।’

যেন বিষয়টি এতেই যথেষ্ঠ স্পষ্ট হয়নি, *এনসাইক্লোপেডিয়া* তৃতীয় শতাব্দীর ধর্মতাত্ত্বিক সেইন্ট গ্রেগরী, দি মিরাকল ওয়ার্কার এর উদ্ধৃতি উল্লেখ করেছে:

সুতরাং কোন কিছুর সৃষ্টি হয়নি, ‘ট্রিনিটি’র কেউ কারো পরাধীন নয়, এমন কোন কিছু এর সাথে সন্নিবিষ্টও হয়নি, যার আগে কোন অস্তিত্ব ছিল না কিন্তু পরবর্তীতে যোগ হয়েছে : সেকারনে পিতা কখনো পুত্র ব্যাতীত ছিল না তেমনই পুত্র ছিল না কখনো পবিত্র আত্মা ছাড়া। এবং এই ট্রিনিটি রুপান্তরিত হয়না এবং সবসময়ই অপরিবর্তনশীল।

যে অলৌকিক কর্মকান্ড ঘটানোর জন্য সেইন্ট গ্রেগরী তার উপাধিটা অর্জন করুক না কেন,আর যাই হোক সেই অলৌকিক ঘটনাগুলোর মধ্যে অন্তত সত্যিকারের মানসিক সুস্থতা ছিলনা। তার শব্দগুলো সুস্পষ্টভাবে ধর্মতত্ত্বের অস্পষ্টতাপ্রীতি প্রকাশ করে, যা, বিজ্ঞান কিংবা মানুষের জ্ঞানের অন্য যে কোন শাখার মত, গত আঠারো শতাব্দী ধরে একটুও অগ্রসর হয়নি। টমাস জেফারসন প্রায়ই এই ঠিক কথাটা বলতেন, ‘কোন নির্বোধ ধারনার বিরুদ্ধে একমাত্র যে অস্ত্রটি ব্যবহার করা যেতে পারে তা হল ব্যাঙ্গ। যুক্তি প্রয়োগের পূর্বে ধারণাটাকে অবশ্যই সুস্পষ্ট হতে হবে; এবং কোন মানুষেরই ট্রিনিটি সম্বন্ধে সুস্পষ্ট কোন ধারণাই কখনো ছিল না। এটা শুধুমাত্র ধাপ্পাবাজদের ছলচাতুরী যারা নিজেদের জেসাসের পুরোহিত বলে ডাকে’ ’।

আরেকটা বিষয় নিয়ে মন্তব্য না করে পারছিনা তা হলো, ধার্মিকরা অতি সুক্ষতম বিষয়ে অতিমাত্রায় আত্মবিশ্বাসের সাথে মন্তব্য করে, যে বিষয়ে তাদের কোন প্রমান নেই এবং কোন প্রমানই থাকতে পারেনা। ধর্মেতত্ত্বের মতামতের পক্ষে কোন প্রমান নেই যা তার ভিত্তি হতে পারে, এই সত্যটাই হয়তো সামান্যতম ভিন্নমতাবলম্বীদের বিরুদ্ধে ধর্মের স্বভাবসুলভ কঠোর অসহিষ্ণুতা পোষন করার কারন। বিশেষকরে এটা দেখা যায় ট্রিনিটারিয়াজমের ক্ষেত্রে।

জেফারসন এই মতবাদ নিয়ে অনেক ব্যাঙ্গ করেছেন, ক্যালভানিজম এর সমালোচনা করার সময় মন্তব্য করেন: ‘এখানে তিন জন ঈশ্বর বিদ্যমান’; খৃষ্টধর্মের রোমান ক্যাথলিক শাখা এই বহুঈশ্বরবাদ এর নিয়ে বার বার নাড়াচাড়া করে বিষয়টিকে অনেক বেশী ফাপিয়ে ফেলেছে। ট্রিনিটি র (দের?) সাথে যোগ দিয়েছেন মেরী, ‘স্বর্গের রাণী’, শুধুমাত্র নাম ছাড়া পুরো অর্থে একজন দেবী, যিনি মানুষের প্রার্থনার নিশানা হিসাবে ঈশ্বরকে ঠেলে সরিয়ে দিয়েছেন নিকটবর্তী দ্বিতীয় স্থানে । প্রায় দেবদেবীর সম্ভার আরো স্ফীত হয়েছে বহু সেইন্টের যোগদানে, যাদের আছে অন্যের পক্ষ হয়ে ঈশ্বরের কাছে আবেদন করার বিশেষ ক্ষমতা। যা তাদের যদি অর্ধদেবতা হিসাবে প্রতির্ষ্ঠিত যদি না করেও থাকে,তারা তাদের স্ব স্ব ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ হিসাবে ভক্তদের কাছে বিশেষ মর্যাদা আদায় করে নিয়েছেন। ক্যাথলিক কমিউনিটি ফোরাম আমাদের সাহায্যকল্পে প্রায় ৫১২০ জন সেইন্টের নাম, তাদের বিশেষ বিশেষ ক্ষমতার ক্ষেত্র অনুযায়ী তালিকাভুক্ত করেছে [৩], তাদের মধ্যে আছে,পেটে ব্যাথা হলে, নির্যাতনের শিকার মানুষদের জন্য, ক্ষুধাহীনতা, অস্ত্রব্যাবসায়ী, কামার, হাড় ভাঙ্গলে, বোমার কারিগর,পেটের অসুখ, এর বেশী আপাতত আর আগানো গেল না। এছাড়া আমাদের নয়টি অর্ডারে সাজানো চার স্তরের এনজেলিক (ফেরেশতাগন) হোষ্টরাও আছেন: সেরাফিম, চেরুবীম, থ্রোনস, ডমিনিয়নস, ভার্চু, পাওয়ারস, প্রিন্সিপালিটিস, আর্কঅ্যান্জেলস (সবার প্রধান যারা)

এবং আছে সাধারন ফেরেশতার দল, যার মধ্যে আছে আমাদের প্রিয় বন্ধু, সদাজাগ্রত, গার্ডিয়ান অ্যান্জেলস বা অভিভাবক ফেরেশতা। ক্যাথলিকদের পুরাণ কাহিনীর যে জিনিসটা আমাকে মনে দাগ কাটে সেটা কিছুটা এর রুচিহীন অসারতার জন্য, কিন্তু মুলতঃ যে কপট নির্লিপ্ততার সাথে এই সব মানুষগুলো ক্রমান্বয়ে বানোয়াট খুটিনাটিগুলো যোগ করেছে । সব কিছু অতি নির্লজ্জভাবে উদ্ভাবিত।

গত বেশ কয়েকটা শতাব্দী যোগ করলে দেখা যায়, দ্বিতীয় পোপ জন পল একাই তার সব পূর্বসুরীদের সবার চেয়ে বেশী সেইন্ট তৈরী করেছিলেন। কুমারী মাতা মেরীর বিশেষ ভক্ত ছিলেন তিনি। বহুঈশ্বরবাদের প্রতি তার বিশেষ আকর্ষন নাটকীয়ভাবে প্রকাশিত হয়েছিল, যখন ১৯৮১ সালে রোমে তাকে একজন আততায়ী হত্যার চেষ্টা করে। মৃত্যুর হাত থেকে তার বেচে আসার জন্য তিনি মনে করেন, আওয়ার লেডী অফ ফাতিমার প্রত্যক্ষ অবদান ছিল (পর্তুগালের ফাতিমায় মা মেরীর অশরীরি রুপ দেখা গিয়েছিল বলে দাবী করে তিন জন স্থানীয় মেষপালক শিশু): মাতৃসুলভ হাত বুলেটটির গতিপথ নিয়ন্ত্রন করেছিল।একটা বিষয় অবশ্য না ভেবে পারা যাচ্ছে না, তিনি কেন বুলেটটা পুরোপুরি লক্ষভ্রষ্ট করে দিলেন না। কেউ কেউ ভাবতে পারেন, যে শল্যচিকিৎসকের দলটি তার শরীরে ছয় ঘন্টা অস্ত্রোপচার করেছে তারাও আংশিকভাবে এই কৃতিত্বের দ্বাবীদার; কিন্তু হয়তো অস্ত্রোপচারের সময় তাদের হাতকে নিয়ন্ত্রন করেছেন তার মাতৃসুলভ হাত। কিন্তু উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হলো, পোপের মতে, তিনি শুধুই 'আমাদের লেডী' কুমারী মেরী নন, যিনি এই বুলেটের গতিপথ বদলে দিয়েছেন, বরং সুনির্দিষ্টভাবে 'আওয়ার লেডী অফ ফাতিমা'; ধরে নেয়া যাতে পারে, 'আওয়ার লেডী অফ লুর্ডস', 'আওয়ার লেডী অফ গুয়াদালুপ', 'আওয়ার লেডী অফ মেডজুগরজে', 'আওয়ার লেডী অফ জেইতুন', 'আওয়ার লেডী অফ গারাবানডাল' এবং 'আওয়ার লেডী অফ নকস' এসময়ে অন্য কাজে ব্যাস্ত ছিলেন।

গ্রীক, রোমান আর ভাইকিং রা কেমন করে এই বহুধর্মতত্বীয় ধাঁধার সাথে সমঝোতা করেছিল? ভেনাস কি আফ্রোদাইতির আরেকটি নাম শুধু নাকি তারা আলাদা দুইজন প্রেমের দেবী? হাতুড়ী সহ থর কি ওটান এরই অবতার নাকি আলাদা দেবতা? কার কি আসে যায় এতে? এক কল্পকাহিনী থেকে বহু কল্পকাহিনীর মধ্যে পার্থক্য নিয়ে মাথা ঘামানোর জন্য জীবনটা অনেক ছোট। বহুঈশ্বর নিয়ে ইঙ্গিত করার পর, কোন বিশেষ একজনকে অবজ্ঞা করার অভিযোগ এড়াতে এ বিষয়ে আমি আর বেশী কিছু বলবো না। সংক্ষিপ্ত করার স্বার্থে, আমি সব দেবদেবীদের , তা সেটা বহু বা এক ঈশ্বরবাদ, যাই হোক না কেন, আমি শুধু 'ঈশ্বর' বলেই সম্বোধন করবো। আরেকটা বিষয়েও আমি সচেতন আছি তা হলো আব্রাহাম এর ঈশ্বর (একটু রেখে ঢেকে বলতে গেলে), আগ্রাসী পুরুষ, আর সে কারনে সর্বনাম ব্যবহার করার অর্থে আমি ঈশ্বরকে পুংলিঙ্গ হিসাবে ধরে নেব। অনেক পরিনত আর জটিল ধর্মতাত্বিকরা দাবী করেন ঈশ্বরের কোন লিঙ্গ নেই, অপরদিকে নারীবাদী ধর্মতাত্বিকরা ঐতিহাসিক অবিচারকে সঠিক করার লক্ষ্যে তাকে নারী হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। কিন্তু অস্তিত্বই নেই এমন কিছু নারী না পুরুষ কি আসে যায় তাতে? আমার মনে হয়, ধর্মতত্ব আর নারীবাদের খামখেয়ালী বোকামীর অবাস্তব মিলনক্ষেত্রে সত্যি সত্যি অস্তিত্ব হয়তো বা লিঙ্গ অপেক্ষা কম গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট হতে পারে।

আমার অজানা নেই, যে ধর্মের সমালোচকরা, ধর্মীয় ঐতিহ্যর আর বিশ্ব-দর্শন এর উর্বর বৈচিত্রময়তা যাকে ধার্মিকতা বলে, তার সঠিক মুল্যায়ন করতে ব্যর্থ হয়েছেন এমন অভিযোগে অভিযুক্ত হতে পারেন। নৃতত্ববিদ্যার উল্লেখযোগ্য কাজ, স্যার জেমস ফ্রেজারের 'গোল্ডেন বোহ' থেকে প্যাসকাল বয়েরের 'রেলিজিয়ন এক্সপ্লেইনড' অথবা স্কট আটরানের ' ইন গডস উই ট্রাস্ট' চমৎকারভাবে লিপিবদ্ধ করেছে অদ্ভুত কুসংস্কারের আর আচারের ফেনোমেনোলজী[৫]। এই বইগুলো পড়ুন আর বিস্মিত হোন মানুষের সহজ বিশ্বাসপ্রবণতার ব্যপকতা দেখে।

কিন্তু এই বইয়ের উদ্দেশ্য ভিন্ন। যে কোন রুপের অতিপ্রাকৃততাকে আমি খুবই অপছন্দ করি, কিন্তু আলোচনাকে প্রাসঙ্গিক রেখে অগ্রসর হবার সবচেয়ে কার্য্যকর পথ হবে, অতিপ্রাকৃততার যে রুপটার সাথে আমার পাঠকদের পরিচিত হবার সম্ভাবনা বেশী, যা আমাদের সবধরনের সমাজের উপর ভয়াবহ প্রভাব বিস্তার করে রেখেছে, সেটার

উপরই বেশী গুরুত্ব দেয়া। আমার বেশীরভাগ পাঠকই এসময়ের তিনটি ‘মহান’ একেশ্বরবাদী ধর্মের (চারটি, যদি মর্মনিজমকে ধরা হয়) মধ্যে কোন না কোন একটিতে প্রতিপালিত হয়েছেন। এই ধর্ম তিনটির প্রত্যেকটি তাদের উৎসে সেই পূরাণের মহাপিতা আব্রাহামকে খুজে পাবে। এবং এই পারিবারিক ঐতিহ্যেগুলোর ধারা মনে রাখতে পারলে এই বইটার বাকী অংশ পড়তে সুবিধা হবে।

এখানে একটা উপযুক্ত মুহুর্ত হতে পারে একটা আগাম প্রতিরোধ ব্যবস্থা নেয়া, নাহলে, দিনের পর যেমন রাত্রি আসে তেমনই আমি নিশ্চিৎ অবশ্যই কেউ না কেউ কোন পর্যালোচনায় এই বইটার প্রতি অবশ্যম্ভাবী কিছু দ্রুত মন্তব্য করতে পারে : ‘ডকিন্স যে ঈশ্বরকে বিশ্বাস করেন না, সেই ঈশ্বরকে আমিও বিশ্বাস করিনা। আকাশের মধ্যে বসবাসকারী লম্বা দাড়িওয়ালা বুড়ো মানুষকে আমি বিশ্বাস করিনা’; ঐ বুড়ো মানুষটা অপ্রাসঙ্গিক একটি মুল বিষয় থেকে মনোযোগটাকে সরানোর কৌশল, এবং তার দাড়ি যেমনই লম্বা তেমন বিরক্তিকর। সত্যি, মনোযোগ বিক্ষিপ্ত করাটা অপ্রাসঙ্গিকতা থেকে আরো অসহনীয়। এর সেই গুরুত্বহীন তুচ্ছতা সুপরিকল্পিতভাবে পাঠকের মনোযোগ কে আসল সত্য থেকে বিক্ষিপ্ত করবে, তা হলো এই বক্তা আসলে যেটা বিশ্বাস করে তা কিন্তু অনেক কম তুচ্ছ। আমি জানি আপনি মেঘের উপর বসে থাকা কোন দাড়িওয়ালা বুড়োকে বিশ্বাস করেন না, সুতরাং এটা নিয়ে কোন সময় নষ্ট করার দরকারই নেই। আমি ঈশ্বর বা ঈশ্বরদের কোন বিশেষ একটি রুপকে আক্রমন করছিনা, আমি ঈশ্বর, সকল ঈশ্বরদেরকে আক্রমন করেছি, যেকোনকিছু এবং সবকিছু যা অতিপ্রাকৃত বা অলৌকিক, যেখানে বা যে সময়েই তারা ছিলেন বা ভবিষ্যতে তৈরী হবেন’।

একেশ্বরবাদ বা মনোথেইজম

আমাদের সংস্কৃতির/সভ্যতার কেন্দ্রে সবচেয়ে বড় অনুল্লেখযোগ্য ক্ষতিকারক বিষয়টি হলো একেশ্বরবাদ। বর্বর সেই ব্রোন্জ্ঞ যুগের বই যার নাম ‘ওল্ড টেষ্টামেন্ট’, এর থেকেই তিনটি মানবতা বিরোধী ধর্মের বিবর্তন হয়েছে। এই সবগুলোই “ আকাশ-দেবতা’ র ধর্ম। প্রত্যেকটি আক্ষরিকভাবে পিতৃতান্ত্রিক – ঈশ্বর মহান অসীমক্ষমতাধর পিতা – একারনেই আকাশ-দেবতা ও তার পুরুষ প্রতিনিধি দ্বারা আক্রান্ত সকল দেশে ২০০০ বছর ধরে নারীবিদ্বেষ বিদ্যমান। – গোর ভিদাল

তিনটি আব্রাহামীয় ধর্মের মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন এবং সুস্পষ্টভাবে বাকী দুটির পূর্বসুরী, হলো জুডাইজম বা ইহুদীবাদ: আদিতে মুলতঃ কাল্ট বা গোত্র যারা একজন ভয়ঙ্কর বিরক্তিকর ঈশ্বর, যে যৌনতা সংক্রান্ত নানাবিধ বাধানিষেধ নিয়ে মানসিক বিকারগ্রস্থ, পোড়া মাংশের গন্ধযুক্ত, প্রতিদ্বন্দী অন্য ঈশ্বরদের উপর নিজের শ্রেষ্ঠত্ব জাহির করতে সদা তটস্থ, যিনি শুধু মাত্র একটি নির্বাচিত মরু জাতির পৃষ্ঠপোষক। প্যালেষ্টাইনে রোমের শাসনামলে টারসাসের পল খৃষ্টধর্মের পত্তন করেন, এর চেয়ে কম নিষ্ঠুর, আরেকটু সার্বজনীন ইহুদীবাদের একটি একেশ্বরবাদী অংশ রুপে।

নতুন এই ধর্ম ইহুদীদের থেকে আরো বাকী সারা বিশ্বব্যাপী বহির্মুখী ছিল। কয়েক শতাব্দী পরে মোহাম্মদ ও তার অনুসারীরা আবারো মুল ইহুদীবাদের আপোষহীন একেশ্বরবাদীতায় ফিরে যায়, কিন্তু এর নির্দিষ্ট গোত্রকেন্দ্রিকতাকে পরিত্যাগ করে প্রতিষ্ঠা করে ইসলাম, নতুন পবিত্র গ্রন্থ কোরান উপর ভিত্তি করে, যা বিশ্বাসের প্রসারে সামরিক শক্তি প্রয়োগের শক্তিশালী মতবাদ যোগ করে। খৃষ্টধর্মও প্রচারিত হয়েছিল তলোয়ারের সাহায্যে, প্রথমতঃ রোমানদের হাতে, যখন সম্রাট কনস্টান্টিন একে একটি অদ্ভুত গোষ্ঠির আচার থেকে উত্তীর্ণ করে রাষ্ট্রীয় ধর্মের মর্যাদা দেন। পরবর্তীতে তলোয়ার ধরে ক্রুসেডাররা এবং তাদের পর কনকুইস্টাডোররা, ও অন্যান্য ইউরোপীয় আগ্রাসনকারী ও বসতি স্থাপনকারীরা, মিশনারীদের সহায়তায় । আমার প্রায় সব ব্যাখার জন্য, তিনটি আব্রাহামীয় ধর্মকে একই রকম ধরে নেয়া যেতে পারে। আলাদাভাবে উল্লেখ না করলে,এখানে আমি মুলতঃ খৃষ্টধর্ম নিয়ে কথা বলবো, কিন্তু শুধুমাত্র এর সাথে আমি একটু বেশী পরিচিত সে কারনে। আমার উদ্দেশ্য অনুযায়ী মিলটাই বেশী জরুরী অমিল অপেক্ষা। অন্য ধর্মগুলো যেমন, বুদ্ধধর্ম, কনফুসিয়ানবাদ নিয়ে কোন আলোচনায় যেতে চাইনা। আসলে, এই সব ধর্মগুলো

আসলে ধর্ম হিসাবে না চিন্তা করে এদেরকে বরং কোন নৈতিক ব্যবস্থা বা জীবন দর্শন হিসাবে চিহ্নিত করার জন্য কিছু বলা যেতে পারে।

ঈশ্বর হাইপোথেসিস এর খুব সরল যে সংজ্ঞা দিয়ে আমি শুরু করেছি, সেখানে আব্রাহামীয় ঈশ্বরকে খাপ খাওয়াতে হলে আমাক এর সাথে আরো বিস্তারিক ব্যাখ্যা যোগ করতে হবে। তিনি শুধু এই মহাবিশ্ব সৃষ্টিই করেননি, তিনি তারমধ্যে বা হয়তো এর বাইরে (এটা বলতে যা বোঝাতে চায় ধর্ম) ব্যক্তিগত ঈশ্বর হিসাবে বসবাসও করছেন, এবং ইতিপুর্বে উল্লেখিত করা হয়েছে এমন অনেক অপছন্দনীয় মানবিক গুনাবলীও ধারন করেন।

ব্যক্তিগত গুনাবলী, তা ভালো কিংবা খারাপ যাই হোক না কেন, তা ভলতেয়ার এবং টমাস পেইনের ডেইস্ট বা একাত্মবাদী ঈশ্বরের কোন অংশ না। ওল্ড টেষ্টামেন্টে বর্ণিত মানসিক বিকারগ্রস্থ দুষ্কৃতকারীর তুলনায় উনবিংশ শতাব্দীর এনলাইটেনমেন্ট এর সময় একাত্মবাদী বা ডেইস্টদের ঈশ্বর পুরোপুরি আরো মহান একটি সত্বা: তার মহাজাগতিক সৃষ্টির সুযোগ্য সৃষ্টিকর্তা, মানুষের দৈনন্দিন জীবন যাপন নিয়ে যার কোন মাথাব্যাথা নেই, আমাদের ব্যক্তিগত চিন্তা, আশা আকাঙ্খা থেকে তিনি সম্পুর্নভাবে নিজেকে বিচ্ছিন্ন রেখেছেন বা আমাদের নোংরা পাপ এবং অস্পষ্ট নিজমরে বিড়বিড় করে বলা অনুশোচনা নিয়ে আদৌ চিন্তিত নন। একাত্মবাদীদের ঈশ্বর একজন পদার্থবিজ্ঞানী, তার হাতেই পদার্থবিদ্যার শুরু ও শেষ, শীর্ষতম, আলফা এবং ওমেগা গনিতজ্ঞ, মহিমান্বিত পরিকল্পনাকারী এবং শিল্পী, এখন অতি দক্ষ প্রকৌশলী যিনি মহাবিশ্বের সকল আইন এবং ধ্রুব নির্দিষ্ট করেছেন, এবং তাদের অতি অসাধারন দক্ষতায় এমন সুক্ষ মাত্রায় সাজিয়েছেন এবং প্রাকধারনা নিয়ে বিস্ফারিত করেছেন, যাকে আমরা এখন অতি উষ্ণ বিগ ব্যাং বলছি। এরপর তিনি অবসর গ্রহন করেন এবং তার সৃষ্টির সাথে আর কোন যোগাযোগই রাখেননি। যখন শক্ত বিশ্বাসের প্রশ্ন আসে একাত্মবাদীরা নীরিশ্বরবাদীদের থেকে আলাদা কিছুনা বলে অভিযুক্ত হন। *ফ্রি থিংকার: এ হিস্টোরী অব আমেরিকার সেকুলারিজম* এ সুজান জ্যাকোবী দুর্ভাগা টম পেইনের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত কতগুলো দুর্নাম এর তালিকা করেছিলেন: জুডাস, সরীসৃপ, শুকর, পাগলা কুত্তা, মহা জানোয়ার, অসভ্য এবং অবশ্যই অবিশ্বাসী। তার একসময়ের রাজনৈতিক সুহৃদরা তার অ খৃষ্টীয় মনোভাবের জন্য বিব্রত হতেন। অসহায় অবস্থায় হয়ে মারা যান টম পেইন, শুধু ব্যতিক্রমী জেফারসন ছাড়া আর কেউ তার পাশে ছিল না। ইদানীং এত বেশী পট পরিবর্তন হয়েছে যে, আগের মত আর কেউই ডেইষ্টদের নীরিশ্বরবাদীদের সাথে এক কাতারে দাড় করাবে না বরং ঈশ্বরবাদীদের সাথেই তাদের একই ভাবে দেখবে। কারন, সর্বোপরি তারাও তো ঈশ্বরবাদীদের মত সর্ব্বোচ্চ বুদ্ধিমত্তার একজন সত্বায় বিশ্বাস করে, যিনি এই মহাবিশ্ব সৃষ্টি করেছিলেন।

ধর্মনিরপেক্ষবাদ বা সেকুল্যারিজম, যুক্তরাষ্ট্রের জাতির পিতারা এবং ধর্ম

অনেকটা প্রথাসিদ্ধ ভাবে অনুমান করা হয় অ্যামেরিকা প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা পিতারা ছিলেন ডেইষ্ট বা একাত্মবাদী। সন্দেহ নেই অনেকেও তাই ছিলেন, যদিও বিতর্ক আছে, এদের মধ্যে সবচেয়ে মহান ছিলেন যারা, তারা হয়তো ছিলেন নিরীশ্বরবাদী । সমসাময়িক সময়ের প্রেক্ষাপটে ধর্ম নিয়ে তাদের লেখা পড়লে কোন সন্দেহর অবকাশ থাকে না, যে তাদের বেশীর ভাগই এই সময়ে নিরীশ্বরবাদী চিহ্নিত হতেন। কিন্তু সেই সময়ে তাদের নিজেদের ধর্মবিশ্বাস যাই হোক না কেন, তারা গোষ্ঠিগত ভাবে নিসন্দেহে ধর্মনিরপেক্ষবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। এই অংশে আমি এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করবো। শরু করছি ১৯৮১ সালে সিনেটর ব্যারী গোল্ডওয়াটার এর হয়ত একটা চমক লাগানো উদ্ধৃতি দিয়ে, স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে এই অ্যামেরিকার রক্ষণশীলতার নেতা প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী কত দৃঢ় তার বিশ্বাসে প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার ধর্মনিরেপেক্ষতান ঐতিহ্য সম্মুন্নত রাখার প্রত্যয়ে:

> নিজস্ব ধর্মবিশ্বাসের মত মানুষের আর তেমন কোন অনঢ় অবস্থান নেই। যীশু অথবা ঈশ্বর অথবা আল্লাহ্ অথবা যে নামেই পরিচিত হোক এই মহাশক্তিশালী সত্বা, যে কোন বিতর্কে এদের মত ক্ষমতাশালী আর কিছুকে মিত্র বলে কেউ দাবী করতে পারেনা। কিন্তু অনেক শক্তিশালী অস্ত্রের মত ঈশ্বরের নাম নিজের পক্ষে ব্যবহার করার ক্ষেত্রে

সতর্ক হওয়া উচিৎ। আমাদের সারা দেশজুড়ে যে ধর্মীয় গোষ্ঠীর বিস্তার লাভ করছে তারা তাদের ধর্মীয় প্রভাব খুব একটা বিচক্ষনের মত ব্যবহার করছে না। তারা দেশ পরিচালনাকারী নেতাদের শতকরা একশত ভাগ তাদের অবস্থান অনুসরন করার জন্য জোর খাটাচ্ছে। কারো যদি এইসব ধর্মীয় গোষ্ঠীগুলোর সাথে নির্দিষ্ট কোন নৈতিক বিষয় নিয়ে মতবিরোধ হয়, তারা অভিযোগ করে; ভোট কিংবা অর্থ সাহায্য দুটোই প্রত্যাহার করার হুমকি দেয় । আমি আসলেই সারা দেশজুড়ে এইসব রাজনৈতিক ধর্মপ্রচারকদের উপর বিরক্তির চরম সীমায় পৌছে গেছি, যারা নাগরিক হিসাবে আমাকে বলছে, আমাকে নীতিবান মানুষ হতে গেলে আমাকে অবশ্যই এ বি সি এবং ডি কে বিশ্বাস করতে হবে। এরা আসলে নিজেদের কি মনে করে? এবং কেমন করেই বা তারা মনে করে,আমার উপর তারা তাদের নৈতিক মুল্যবোধ চাপিয়ে দেবার অধিকার আছে বলে দাবী করতে পারে; একজন আইনপ্রণেতা হিসাবে আমি আরো ক্ষুদ্ধ হই যখন প্রত্যেকটা ধর্মগোষ্ঠীর হুমকি সহ্য করতে বাধ্য হই, যারা ভাবে তাদের কোন ঈশ্বর প্রদত্ত অধিকার আছে সিনেটের যে কোন অধিবেশনে আমার ভোট নিয়ন্ত্রন করার। আমি তাদের সতর্ক করে দিতে চাই আজ; আমি তাদের সর্বত্র প্রতিরোধ করবো যদি তারা তাদের নৈতিক বিশ্বাস সকল আমেরিকানদের উপর চাপিয়ে দেয় রক্ষণশীলতার দোহাই দিয়ে। (৬)

নিজেদের স্বপক্ষে ইতিহাসকে স্বাক্ষী করার প্রচেষ্ঠায় জাতির পিতাদের ধর্মীয় বিশ্বাস বর্তমানে আমেরিকায় দক্ষিনপন্হীদের প্রচারকদের কাছে বেশ উৎসাহব্যাঞ্জক একটি বিষয়। তাদের দৃষ্টিভঙ্গির বিপরীতটা আসলে সত্যি, আমেরিকা খৃষ্টানদের দেশ হিসাবে পত্তন হয়নি, প্রথম তা সুষ্পষ্ট উল্লেখিত হয় ত্রিপোলী চুক্তিতে (ট্রিটি অব ত্রিপোলী) , ১৭৯৬ তে যা জর্জ ওয়াশিংটন সময়ে রচনা করা হয়, ১৭৯৭ সালে জন অ্যাডামস যা স্বাক্ষর করেন:

যেহেতু যুক্তরাষ্ট্রের সরকার কোন অর্থেই খৃষ্ট ধর্মের উপর ভিত্তি করে স্থাপিত হয়নি, এবং যেহেতু এর মধ্যে মসুলমানদের আইন, ধর্ম, শান্তির বিরুদ্ধে কোন ধরনের শত্রুতা নেই, এবং পূর্বেই বলা হয়েছে মোহাম্মদের অনুসারী কোন রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র কোন সময়ই কোন যুদ্ধ বা শত্রুভাবাপন্ন আচরণ করেনি; উভয় পক্ষ ঘোষনা করছে যে,ধর্মীয় মতামতের কারনে উদ্ভুত কোন ঘটনাই দুই দেশের মধ্যে বিদ্যমান সৌহার্দ্যপুর্ণ সম্পর্কে কখনই কোন বিঘ্নতা সৃষ্টি করবে না।

এই উদ্ধৃতির প্রথমাংশ ওয়াশিংটনের বর্তমান ক্ষমতাশীনদের মধ্যে রীতিমত শোরগোল ফেলে দিত সন্দেহ নেই কোন, কিন্তু এড বাকনার বিশ্বাসযোগ্যভাবে প্রমান করেছেন,সেই সময় এ বিষয় নিয়ে না রাজনীতিবিদ কিংবা জনগন,কারো মধ্যে কোন মতবিরোধ দেখা যায়নি [৭]; যুক্তরাষ্ট্রে এই ধরনের প্যারাডক্স এবং বিপরীতমুখীতা প্রায়ই দেখা যায়,ধর্মনিরপেক্ষবাদের উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা এই দেশটি এখন খৃষ্টজগতের সবচেয়ে বেশী ধর্মনির্ভর রাষ্ট্র, অপরদিকে ইংল্যান্ড, যেখানে প্রতিষ্ঠিত চার্চ-এর নেতৃত্ব দিচ্ছে সাংবিধানিক রাজতন্ত্র, সবচাইতে কম ধর্মনির্ভর রাষ্ট্রর মধ্যে একটি । আামি প্রায়ই প্রশ্নটা করি, কেন এমন হলো? এবং এর উত্তর আমার জানা নেই। আমার মনে হয়, সম্ভবত এই পরিস্থিতি হতে পারে: ইংল্যান্ড, ধর্মের প্রতি বীতশ্রদ্ধ, তার আন্তবিশ্বাস এবং গোত্রগত ধর্মীয় সহিংসতার ভয়ঙ্কর ইতিহাসে, প্রটেষ্টান্ট আর ক্যাথলিকরা পালাক্রমে প্রাধান্য বিস্তার করে পরস্পরকে হত্যা করেছে। আরেকটি ব্যাখার উৎপত্তি হলো একটি পর্যবেক্ষন, আমেরিকা প্রধানতঃ অভিবাসীদের সৃষ্টি একটি জাতি, এক সহকর্মী আমাকে ব্যাখ্যা করেছিলেন, অভিবাসীরা, ইউরোপে তাদের সম্প্রসারিত পরিবার, সামাজিক নিরাপত্তা আর স্থিতিশীলতা থেকে শিকড়চ্যুত হয়ে প্রবাসে ফেলে আসা স্বজনদের বিকল্প হিসাবে হয়তো চার্চকেই বেশী আপন করে নিতে পারে; অবশ্যই কৌতুহলোদ্দীপক একটা ধারনা যা আরো গবেষনার দাবীদার। কোন সন্দেহ নেই আমেরিকায় অনেকেই তাদের চার্চকে স্থানীয় ঐক্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতীক হিসাবে মনে করে, যার আসলেই সম্প্রসারিত পরিবারের মত বেশ কিছু গুনাবলী আছে। আরো একটি হাইপোথেসিস হলো প্যারাডক্সীয়ভাবে আমেরিকার ধর্মীয় উদ্দীপনার উৎস দেশটির সংবিধানের ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ। যেহেতু আমেরিকা আইনগতভাবে ধর্মনিরপেক্ষ, ধর্ম সম্পুর্নভাবে পরিনত হয়েছে স্বাধীন উদ্যোগে; প্রতিদ্বন্দী চার্চগুলো একে অপরের সাথে প্রতিযোগিতা করে কংগ্রেগেশনের আকৃতি বা সদস্য সংখ্যা বাড়াতে, বলাবাহুল্য সেই সাথে মোটা উপার্জনের ও কোন অংশেই কম নয়। এই প্রতিযোগীতা চলে বাজারের

আক্রমনাত্মক ক্রয়-বিক্রয়ের বা মার্কেটিং কৌশলের মতই। সাবানের গুড়া বিক্রী যেমন করে চলে, ঈশ্বরের ক্ষেত্রেও তেমন। আর এর ফলাফল বর্তমানে প্রায় কম শিক্ষিত শ্রেনীর মধ্যে বিস্তৃত ব্যপক আকারের ধর্মীয় উন্মাদনা। অপরদিকে ইংল্যান্ডে প্রতিষ্ঠিত চার্চের অভিরক্ষনে ধর্ম সামাজিক আচারের চেয়ে খুব বেশী কিছু না, আদৌ একে ধর্মীয় একটি বিষয় হিসাবে সহজে চিহ্নিত করা যাবে না। গাইলস ফ্রেজার একজন অ্যাংলিক্যান ভাইকার (ধর্মযাজক) ও একই সাথে অক্সফোর্ডে দর্শনের টিউটর, এই ইংরেজ আচারের সুন্দর ব্যাখা দিয়েছিলেন গার্ডিয়ান পত্রিকায় একটি লেখায়, যার শিরোনাম, *দি এস্টাবলিশমেন্ট অফ দি চার্চ অব ইংল্যান্ড টুক গড আউট অফ দি রেলিজিয়ন বাট দেয়ার আর রিস্ক ইন মোর ভিগোরাস অ্যাপ্রোচ টু ফেথ:*

একটা সময় ছিল যখন গ্রামের ভাইকার ইংরেজী নাটকের নিয়মিত চরিত্র ছিল, এই চা-পানকারী, নীরিহ, ক্ষ্যাপাটে, পালিশ করা জুতা পরা মানুষটা তার ভদ্র ব্যবহার সহ এমন একটি ধর্মকে প্রতিনিধিত্ব করত, যা আদৌ ধর্মপরায়ন না এমন ধরনের মানুষরা তেমন কোন অসস্তি বোধ করত না। তিনি আদৌ ধর্মনাশ হচ্ছে বলে অতিরিক্ত চিন্তিত হতেন না বা আপনাকে দেয়ালের সাথে চেপে ধরে জিজ্ঞেস করতেন না, আপনি কি রক্ষা পেতে চান। কোন সর্বশক্তিমান এর পক্ষে চার্চের পালপিট থেকে ধর্মযুদ্ধ শুরু করা বা রাস্তার পাশে বোমা পেতে রাখাতো বহু দুরের কথা।

(বেটজেমান এর 'আমাদের পাদ্রী' র ছায়া আছে এই বর্ণনায়, প্রথম অধ্যায়ের শুরুতে আমি যে উদ্ধৃতি দিয়েছিলাম); ফ্রেজার আরো বলেন যে, এই ভদ্র ভাইকার আসলে এক বিশাল প্রকৃতঅর্থে বিশাল সংখ্যক ইংরেজদের জন্য খৃষ্টধর্মের বিরুদ্ধে প্রতিষেধক হিসাবে কাজ করেছে। তিনি তার রচনাটি শেষ করেন দুঃখ প্রকাশ করে যে ইদানীং ধর্মকে পুনরায় বেশী গুরুত্ব দেবার প্রবণতা লক্ষ্য করা করা যাচ্ছে এবং তার শেষ বাক্যটি ছিল সাবধানবানী: 'চিন্তার বিষয় হল, কয়েক শতাব্দী ধরে সুপ্ত ইংরেজদের ধর্মীয় উন্মাদনার দানবটাকে না আমরা আবার প্রাতিষ্ঠানিক বাক্স থেকে মুক্ত করে দেই।'

বর্তমান সময়ের এই আমেরিকায় ধর্মীয় উন্মত্ততার দানবের প্রতাপ সর্বত্র এবং যা অবশ্যই জাতির পিতাদের ভীত সন্ত্রস্ত করতো। এই বৈপরীত্যকে মেনে নেয়া কিংবা তাদের সৃষ্ট সংবিধানকে অভিযুক্ত করা সঠিক না ভুল, যাই হোক না কোন, যুক্তরাষ্ট্রের জাতির পিতারা সন্দেহাতীতভাবে ধর্মনিরপেক্ষবাদী ছিলেন, যারা বিশ্বাস করতেন ধর্মকে রাজনীতি থেকে পৃথক রাখা উচিৎ, আর এটাই তাদের অবস্থানকে সুদৃঢ় করে, যারা এর ব্যতিক্রমকে প্রতিবাদ করছে তাদের পক্ষে; যেমন, সরকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে টেন কমান্ডমেন্ডের উদ্দেশ্য প্রনোদিত প্রদর্শনীর ক্ষেত্রে। ধারনা করতে ইচ্ছা হয়, প্রতিষ্ঠাতাদের কেউ কেউ হয়ত একাত্মবাদ বা ডেইজম এর বিশ্বাসকে অতিক্রম করে গিয়েছিলেন, হয়তো তারা ছিলেন অ্যাগনষ্টিক বা অজ্ঞেয়বাদী অথবা এমনকি পুরোপুরি নিরীশ্বরবাদী? যাকে আজকের যুগে আমরা অ্যাগনোষ্টিকবাদ বলি, জেফারসনের নীচের লেখাটির সাথে তার কোন পার্থক্য করা যায় না।

নিরাবয়ব বায়বীয় কোন কিছুর অস্তিত্ব নিয়ে কথা বলাই অর্থহীন। মানুষের আত্মা,ফেরেশতা,ঈশ্বর আবয়বহীন বলাই মানে বলা এর অস্তিত্বহীনতাকে মেনে নেয়া অর্থাৎ আসলেই কোন ঈশ্বর নেই, নেই কোন ফেরেশতা বা আত্মা। আর কোনভাবেই এর পক্ষে যুক্তি দাড় করানো সম্ভব না যদি না, স্বপ্ন আর ভৌতিক জগতের অতল গহবরে নিজেকে নিমজ্জিত না করি। যাদের অস্তিত্ব থাকতে পারে কিন্তু আমার কাছে যার কোন প্রমান নেই, এমন কিছু নিয়ে নিজেকে যন্ত্রণা আর দুর্ভোগ দেয়া ছাড়াই, আমি সন্তুষ্ট আর যথেষ্ট ব্যস্ত আছি অন্য অনেক বিষয় নিয়ে।

ক্রিষ্টোফার হিচেন্স, তার রচিত জেফারসনের জীবনী, 'থমাস জেফারসন:অথর অফ অ্যামেরিকা' তে ধারনা করেন, সম্ভবতঃ জেফারসন নাস্তিক ছিলেন, এমনকি তার সময়েও যে বিশ্বাস ধারন করা আরো বেশী কঠিন ছিল।

তিনি নাস্তিক ছিলেন কিনা, তার বিচার করতে আমাদের অবশ্যই সংযত হতে হবে, শুধুমাত্র তার রাজনৈতিক জীবনে তাকে যে বিচক্ষণতার এবং ভদ্রতার পরিচয় দিতে বাধ্য করেছে, সেজন্যই। কিন্তু সেই ১৭৮৭ সালে তার

ভাইপো পিটার কার-কে লেখা চিঠিতে তিনি উল্লেখ করেন: কারোরই উচিৎ হবে না, শুধুমাত্র ফলাফলের কথা চিন্তা করে এমন কোন প্রশ্নতে ভয় পাওয়া, 'যদি এর শেষ হয় এমন কোন বিশ্বাসে যে ঈশ্বর নেই, তুমি অবশ্যই উদ্দীপ্ত হবে, এধরনের অনুশীলনের মধ্যে সুখ আর স্বস্তি এবং অন্যদের ভালোবাসা অর্জন করার গুনাবলী অন্বেষনে।

পিটার কার কে লেখা এই উপদেশটা আমাকে আরো বেশী নাড়া দেয়:

ঝেড়ে ফেল সব দাসোচিত যত সংস্কারের ভীতি, যার ভারে ক্রীতদাসের মত নত হয়ে থাকে দুর্বল সব মন। যুক্তিকে দৃঢ়ভাবে তার আসনে বসাও, তার উপর বিচারের ভার ছেড়ে দাও সকল তথ্য আর প্রত্যেকটি মতামতের। সাহসের সাথে প্রশ্ন করো এমনকি ঈশ্বরের অস্তিত্ব নিয়েও, কারন যদি এমন কেউ থাকে, তিনিও অন্ধ ভীতির চেয়ে যুক্তির প্রতি এধরনের শ্রদ্ধা প্রদর্শনকে অনুমোদন করবেন।

জেফারসনের কিছু মন্তব্য যেমন,' খৃষ্টধর্ম হলো মানুষের উপর চাপানো সবচেয়ে বিকৃত একটি পদ্ধতি' , যেমন দেইজম বা একাত্মবাদের সাথে সামন্জস্যপুর্ন, তেমনি নিরীশ্বরবাদের সাথে। জেমস ম্যাডিসনের শক্ত অ্যান্টি-ক্লারিকালিজমও (ধর্মীয় যাজকদের রাজনৈতিক ক্ষমতার বিরোধীতা) তেমন: ' প্রায় পনের শতাব্দী ধরে খৃষ্টীয় আইনী প্রতিষ্ঠান বিচারাধীন, কি সুফল তারা দিতে পেরেছে? কমবেশী সব জায়গায় পাদ্রীদের অহংকার আর অলসতা; সাধারন জনগনের অজ্ঞতা আর অন্ধ দাসত্ব, উভয় পক্ষের কুসংস্কার, গোড়ামী আর নীপিড়ন', একই কথা বলা যেতে পারে বেনজামিন ফ্রাঙ্কলিন এর 'বাতিঘরগুলোও চার্চ থেকে অনেক বেশী কার্য্যকরী'; জন অ্যাডামস সম্ভবত কঠিন ক্লারিকালিজম বিরোধী একাত্মবাদী ('এক্লেসিয়াসটিকাল কাউন্সিলে ভয়ঙ্কর যন্ত্র....') এবং তিনি নিজেও খৃষ্টীয় ধর্মে বিরুদ্ধে অনেক দীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করেছে, বিশেষ করে : '' খৃষ্টধর্ম সম্বন্ধে আমি যেটুকু বুঝি, এটা এখন এবং আগেও বলা হয় ঈশ্বরের প্রকাশ, কিন্তু কেমন করে লক্ষ লক্ষ উপকথা,কাহিনী,কিংবদন্তী মিশ্রিত হয়েছে ইহুদী এবং খৃষ্টধর্ম উভয়ের তথাকতি ঐশী প্রকাশে, এবং তাদের পরিনত করেছে এযাবৎকালের সবচেয়ে রক্তাক্ত ধর্ম হিসাবে?' এবং জেফারসনকে লেখা একটা চিঠিতে: 'আমি রীতিমত কেপে উঠি, মানবজাতির ইতিহাসে সুরক্ষিত করেছে এমন একটি শোকের অপব্যবহারে সবচেয়ে ভয়াবহ উদহারনটির ঈঙ্গিত দিতে – ক্রস। চিন্তা করে দেখুন শোকের এই যন্ত্র কত বিপর্যয়ের কারন"।

জেফারসন এবং তার সহযোগীরা ঈশ্বরবাদী, একাত্মবাদী, অ্যাগনস্টিক বা নিরীশ্বরবাদী যাই হোক না কেন তারা প্রত্যেকেই প্রবলভাবে ধর্মনিরপেক্ষবাদী, যারা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন, প্রেসিডেন্ট এর ধর্মবিশ্বাস বা বিশ্বাসহীনতা তার একান্ত ব্যাক্তিগত ব্যাপার। জাতির পিতাদের প্রত্যেকের যার যা ধর্মবিশ্বাস থাকুক না কেন, তারা, জর্জ বুশ সিনিয়র এর উত্তরের উপর সাংবাদিক রবার্ট শেরমান রিপোর্টটি পড়ে অবশ্যই বিস্মিত হতেন, যখন শেরমান তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তিনি কি অন্য আমেরিকানদের মত নিরীশ্বরবাদীদেরও একই রকম নাগরিক অধিকার বা দেশপ্রেম আছে বলে মনে করেন কিনা?: 'না, আমি জানিনা নাস্তিকদের এদেশের নাগরিক বা দেশপ্রেমিক বিবেচনা করা উচিৎ হবে কিনা? [৮] আমেরিকা ঈশ্বরের অধীনে এক জাতি'; ধরে নেই শেরমানের বিবরণ সঠিক, (দুঃখজনকভাবে তিনি টেপরেকর্ডার ব্যবহার করেননি,এবং অন্য কোন সংবাদ পত্রিকা এ সংক্রান্ত কোন খবরও ছাপায়নি) , আগের বাক্যে নাস্তিক শব্দটি ইহুদী বা মুসলিম বা কৃষ্ণাঙ্গ শব্দগুলো দিয়ে প্রতিস্থাপিত করে একটা পরীক্ষা করা যায়। এর মাধ্যমে পরিমাপ করা সম্ভব আমেরিকার নিরীশ্বরবাদীদের কি ধরনের সংস্কার আর বৈষম্য সহ্য করতে হচ্ছে। নিউ ইয়র্ক টাইমস এ প্রকাশিত নাতালী আনজিয়ার্স এর কনফেশনস অব দ্য লোনলি এথিষ্ট,বর্তমান আমেরিকায় একজন নাস্তিক হিসাবে তার বিচ্ছিন্নতার অভিজ্ঞতা আর অনুভূতির একটি বেদনাদায়ক আর মর্মস্পর্শী বিবরণ [৯]; কিন্তু আমেরিকায় নাস্তিকদের বিচ্ছিন্নতা কিন্তু একটি বিভ্রান্তি, যা অত্যন্ত পরিশ্রমের মাধ্যমে সৃষ্টি করেছে এর বিরুদ্ধের পুর্বসংস্কার। বেশীর ভাগ মানুষ যা ধারনা করেন, আমেরিকায় নাস্তিকদের সংখ্যা তার চেয়ে আরো অনেক বেশী। যেমনটি আমি ভূমিকায় উল্লেখ করেছি, আমেরিকায় নাস্তিকদের সংখ্যা ধার্মিক ইহুদীদের চেয়ে অনেক বেশী, তা সত্বেও ওয়াশিংটনে ইহুদীদের লবী শক্তিশালীদের একটি। আমেরিকার নাস্তিকরা যদি নিজেদের ঠিক সেরকম ভাবে

সংগঠিত করতে পারতো তারা কি না অর্জন করতে পারত? এই বিষয়টি নিয়ে ফ্রি এনকোয়ারী পত্রিকার সম্পাদক টম ফ্লিন জোরালো যুক্তি দিয়েছিলেন, তার সেকুলারিজমস ব্রেকথ্রু মোমেন্ট শীর্ষক একটি নিবন্ধে: যদি নীরিশ্বরবাদীরা একাকীত্ব, বিচ্ছিন্নতা এবং বিষন্নতায় ভোগেন, সেটার জন্য দায়ী আমরাই (নীরিশ্বরবাদীরা); সংখ্যা বিচারে আমরা অনেক শক্তিশালী, আসুন আমাদের শক্তির প্রমান দেয়া শুরু করি'।

ডেভিড মিলস তার প্রশংসনীয় বই এথিষ্ট ইউনিভার্স একটি ঘটনার বিবরণ দিয়েছিলেন, যা কোন কাহিনী হলে আপনি অনায়াসে পুলিশের অজ্ঞতার একটি অবাস্তব কৌতুক কাহিনী হিসাবে প্রত্যাখান করতে দেরী করতেন না। একজন খৃষ্টীয় ফেইথ হিলার (বিশ্বাসের মাধ্যমে নিরাময় করেন বলে যারা দাবী করে), যিনি মিরাকল ক্রুসেড নামে একাট সংস্থা পরিচালনা করেন, বছরে একবার মিলস এর শহরে আসেন। অন্য অনেক কর্মকান্ডের মধ্যে এই ফেইথ হিলার যারা ডায়াবেটিস এ ভুগছেন তাদের ইনসুলিন ফেলে দিতে উৎসাহ দেন, কিংবা যারা ক্যান্সারে আক্রান্ত তাদের কেমোথেরাপি নেবার বদলে প্রার্থনার মাধ্যমে অলৌকিকভাবে রোগমুক্ত হবার উপদেশ দেন। যুক্তিসংঙ্গত কারনেই মিলস জনসাধারনকে সচেতন করার লক্ষ্যে এর বিরুদ্ধে একটি শান্তিপুর্ন সমাবেশ করার সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু মিলস ভুল করে বসেন পুলিশের কাছে তার উদ্দেশ্য বর্ননা এবং ফেইথ হিলার এর সমর্থকদের সম্ভাব্য আক্রমন থেকে পুলিশের সূরক্ষার আবেদন করে। প্রথম যে পুলিশ অফিসারের সাথে তার কথা হয়, তার প্রশ্ন ছিল: তুমি তার পক্ষে না বিপক্ষে সমাবেশ করবে? যখন মিলস তার উত্তরে বললো: তার বিপক্ষে, পুলিশ অফিসার এর উত্তরে বলছিল, সে ফেইথ হিলার এর র‍্যালিতে যোগ দেবে এবং তার সমাবেশের সামনে দিয়ে যাবার সময় ব্যক্তিগতভাবে মিলসের মুখে থুতু মারার ইচ্ছা পোষন করে।

মিলস তার ভাগ্য পরীক্ষার জন্য দ্বিতীয় আরেকজন পুলিশ অফিসারের কাছে যান। দ্বিতীয়জন উত্তর দেয়, ফেইথ হিলার এর সমর্থকদের কেউ যদি হিংসাত্মকভাবে মিলসকে আক্রমন করে, সেক্ষেত্রে সে মিলসকেই গ্রেফতার করবে কারন সে ঈশ্বরের কাজে বিঘ্নতা সৃষ্টি করছে। মিলস বাসায় ফিরে টেলিফোনের মাধ্যমে পুলিশ স্টেশনের সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করে, যেন কোন সিনিয়র অফিসারের সহানুভুতি পাওয়া যায়। অবশেষে যখন সার্জেন্ট এর সাথে যোগাযোগ হল, যার বক্তব্য ছিল: 'নরকে যাও বন্ধু, কোন পুলিশই নাস্তিকদের রক্ষা করতে চায়না, আশাকরি তোমাকে কেউ যেন ভালমত রক্তাক্ত করতে পারে'; স্পষ্টতই এই পুলিশ স্টেশনে মানুষের স্বাভাবিক সহমর্মিতা, দয়া, কর্তব্যজ্ঞানের সাথে সাথে ক্রিয়াবিশেষনের সরবরাহেরও ঘাটতি আছে। মিলস সেদিন সাত অথবা আটজন পুলিশ অফিসারের সাথে কথা বলার বিবরণ দেন,যাদের কেউই সাহায্য করার কোন ইচ্ছাই প্রকাশতো করেইনি বরং বেশীর ভাগই সরাসরি মিলসতে হুমকি দিয়েছে হিংসাত্মক আক্রমনের।

নিরীশ্বরবাদীদের বিরুদ্ধে এধরনের সংস্কারের ঘটনার সংখ্যা অগনিত; কিন্তু অ্যান্টি–ডিসক্রিমিনেশন সাপোর্ট নেটওয়ার্কের প্রতিষ্ঠাতা, মার্গারেট ডাওনী, ফ্রি থট সোসাইটি অব ফিলাডেলফিয়ার [১০] মাধ্যমে এধরনের ঘটনাগুলো পদ্ধতিগতভাবে সংরক্ষন করে যাচ্ছেন; তার সংগৃহীত ঘটনাগুলোর ডাটাবেস, কমিউনিটি,স্কুল, কাজের জায়গা, গণমাধ্যম,পরিবার এবং সরকার ইত্যাদি বিভিন্ন শ্রেনীতে বিভক্ত, যার মধ্যে উদহারন আছে হয়রানি, কর্মচ্যুতি, পরিবার কর্তৃক পরিত্যক্ত হওয়া এমনকি হত্যা [১১]; নিরীশ্বরবাদীদের প্রতি ডাওনীর লিপিবদ্ধ এসব ঘৃনা আর অসহিষ্ণুতার প্রমান আমাদের বুঝতে সাহায্য করে, কেন একজন সৎ নিরীশ্বরবাদীরে পক্ষে আমেরিকার কোন নির্বাচনে জয়ী হওয়া প্রায় অসম্ভব। হাউস অব রিপ্রেজেন্টটেটিভস এর সদস্য সংখ্যা ৪৩৫, সিনেটে আরো ১০০ জন, ধরে নেই এই ৫৩৫ জন ব্যাক্তি সমগ্র শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর নমুনা, আমেরিকার শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর পরিসংখ্যানগত হিসাব অনুযায়ী, এদের প্রায় উল্লেখযোগ্য সংখ্যক অবশ্যই নিরীশ্বরবাদী। তাদের অবশ্যই মিথ্যাচার করতে হয়েছে, অথবা তাদের প্রকৃত অনুভুতিটাকে লুকিয়ে রাখতে হয়েছে, নির্বাচনে জেতার জন্য। কে তাদের দোষ দেবে এই মিথ্যাচারের, যদি ভোটারদের বিশ্বাস তাদের অর্জন করতে হয়? এটা সর্বজনস্বীকৃত যে, নিরীশ্বরবাদী হিসাবে নিজেকে স্বীকার করে নেয়া, একজন প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থীর জন্য রাজনৈতিক আত্মহত্যা। (এখানে উল্লেখ করতে হবে, মার্চ

২০০৭ এ ক্যালিফোর্নিয়ার ১৩তম ডিস্ট্রিক্ট এ কংগ্রেস ম্যান পিট স্টার্ক, জনসমক্ষে স্বীকার করে নিয়েছেন তার যে কোন ঈশ্বরবাদী বিশ্বাস নেই [১২]।

বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রে রাজনৈতিক আবহাওয়ার এধরনের বাস্তবতা এবং এই অবস্থা যা ইঙ্গিত করে, তা দেখলে নিসন্দেহে আতঙ্কিত হতেন জেফারসন, ওয়াশিংটন,ম্যাডিসন, অ্যাডামস এবং তাদের সকল বন্ধুরা। তারা ঈশ্বরবাদী, একাত্মবাদী, অ্যাগনস্টিক বা নিরীশ্বরবাদী যাই হোন না কেন প্রাকএকবিংশ শতাব্দীর ওয়াশিংটনের এইসব থিওক্র্যাটদের দেখে ভয়ে পিছু হটতেন। তারা হয়তো একাত্মতা বোধ করতেন উপনিবেশ পরবর্তী ভারতের ধর্মনিরপেক্ষবাদী জাতির পিতাদের সাথে, বিশেষ করে ধার্মিক গান্ধী (আমি একজন হিন্দু,আমি একজন মসুলমান,আমি একজন ইহুদী, আমি একজন খৃষ্টান, আমি একজন বৌদ্ধ) এবং নিরীশ্বরবাদী নেহরুর সাথে:

এই যে প্রদর্শনী যার নাম ধর্ম বা আরো সঠিকভাবে বলতে গেলে সংগঠিত ধর্ম, ভারতে কিংবা পৃথিবী যে কোন জায়গায়, আমাকে আতঙ্কগ্রস্থ করে। আমি প্রায়ই এর নিন্দা করেছি এবং ইচ্ছা পোষন করেছি একে পুরোপুরি ভাবে পরিচ্ছন্ন করার। এবং প্রায় প্রতিবারই মনে হয়েছে এটির ভিত্তি, অন্ধবিশ্বাস এবং প্রতিক্রিয়াশীলতা, গোড়া মতবাদ আর সংকীর্নতা, কুসংস্কার, শোষন আর কায়েমি স্বার্থ রক্ষা করা।

গান্ধীর স্বপ্নের ধর্মনিরপেক্ষ ভারতকে ব্যাখা করে নেহরুর বর্ণনা (যদি না রক্তাক্ত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার মধ্য দিয়ে তাদের দেশটা বিভক্ত না হত হয়ত বাস্তবে তা পরিণত হতে পারতো) পড়ে মনে হতে পারে তা যেন জেফারসনেরই নিজের লেখা [১৩]।

আমরা ধর্মনিরপেক্ষ এক ভারতের কথা বলছি ... কিছু মানুষের ধারনা এর অর্থ হলো ধর্মের বিরুদ্ধে কোনকিছু। অবশ্যই এধরনের ধারনা সঠিক না। এর অর্থ হলো এটা এমন একটি রাষ্ট্র হবে যা সকল ধর্মবিশ্বাসকে সমান মর্যাদা আর সুযোগ দেবে। ভারতের ধর্মীয় সহিষ্ণুতার ইতিহাস অনেক প্রাচীন... ভারতের মত একটি দেশে, যেখানে অনেক ধরনের ধর্ম আর বিশ্বাস বিদ্যমান, সেখানে ধর্মনিরপেক্ষতার ভিত্তি ছাড়া অন্য কোনভাবে সত্যিকারের জাতীয়তাবোধ সৃষ্টি করা সম্ভব না।

দেইষ্টদের বা একাত্মবাদীদের ঈশ্বর, যা প্রায়শঃই জাতির পিতাদের সাথে সংশ্লিষ্ট করা হয়, অবশ্যই সেটি বাইবেলে বর্ণিত দানব অপেক্ষা অনেক উন্নতি। দুঃখজনকভাবে ধারনা করা খুবই কঠিন যে তার অস্তিত্ব আছে বা কখনো ছিল। যে কোন রুপেই ঈশ্বর হাইপোথেসিস আসলেই অপ্রয়োজনীয়। ঈশ্বর হাইপোথেসিস সম্ভাবনার সুত্রানুযায়ী প্রায় বাতিল হবার উপক্রম। ’সম্মানিত মহাশয়, আমার এই হাইপোথেসিসের প্রয়োজন নেই” , এই বিখ্যাত উত্তরটি দিয়েছিলেন লাপ্লাস নেপোলিয়নকে, যখন তিনি বিস্মিত হয়ে এই বিখ্যাত গনিতজ্ঞর কাছে জানতে চেয়েছিলেন কেমন করে তিনি তার বই লিখতে সক্ষম হয়েছিলেন একবারো ঈশ্বরের নাম উল্লেখ না করে। চতুর্থ অধ্যায়ে আমি তার ব্যাখা দেব, তার আগে আমি তৃতীয় অধ্যায়ে ঈশ্বরের অস্তিত্বের তথাকথিত প্রমাণ নিয়ে আলোচনা করবো। আপাতত আমি বরং অ্যাগনষ্টিসিজম বা অজ্ঞেয়বাদ এবং ঈশ্বরের অস্তিত্ব বা অস্তিত্বহীনতা চিরকালই বিজ্ঞানের ধরা ছোয়ার বাইরে একটি অস্পৃশ্য প্রশ্ন, এমন ভ্রান্ত ধারনার দিকে দৃষ্টি ফেরাই।

অ্যাগনষ্টিসিজম বা অজ্ঞেয়বাদ-এর দৈন্যতা:

আমার পুরোনো স্কুলের চ্যাপেলের পালপিট থেকে আমাদের সাথে গলাবাজী করা বলিষ্ঠ, পেশীবহুল খৃষ্টান ব্যাক্তিটি কিন্তু নিরীশ্বরবাদীদের প্রতি একধরনের গোপন শ্রদ্ধা স্বীকার করে নিয়েছিলেন। অন্ততপক্ষে তাদের সৎসাহস আছে নিজেদের বিশ্বাসের উপর, তা ভ্রান্ত বিশ্বাসই হোক না কেন? এই ধর্মযাজক যা পছন্দ করতেন না তা হলো অজ্ঞেয়বাদীদের: দুর্বল, নরম, আগাছা, ভীতু, সিদ্ধান্তহীনতায় আক্রান্ত। তিনি কিছুটা ঠিক, তবে কিন্তু সম্পুর্ন ভুল কারনে। একই সুরে, কোয়েন্টিন দো বেদোয়ের এর লেখা অনুযায়ী ক্যাথলিক ঐতিহাসিক হিউ রস উলিয়ামসন শ্রদ্ধা

করেন প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ধার্মিক এবং প্রতিশ্রুতিবদ্ধ নাস্তিকদেরও। তার ঘৃনা সংরক্ষিত শুধুমাত্র দুর্বল প্রকৃতির ভীরু মেরুদন্ডহীন সাধারন মাপের মানুষগুলো যারা বিশ্বাস অবিশ্বাসের মাঝামাঝি অবস্থান করে [১৪]।

অ্যাগনষ্টিক হওয়া আদৌ দোষের না, বরং যুক্তিসঙ্গত একটি অবস্থান, যদি সে বিষয়ের পক্ষে বা বিপক্ষে প্রমানের অভাব থাকে। কার্ল সাগান অ্যাগনষ্টিক অবস্থান নিতে গর্ব বোধ করেছিলেন, যখন তাকে মহাবিশ্বে কোথাও জীবনের অস্তিত্ব আছে কিনা জিজ্ঞেস করা হয়েছিল। যখন তিনি হ্যা অথবা না জাতীয় কোন উত্তর দিতে অস্বীকার করেন, সাক্ষাৎকার গ্রহনকারী যখন তাকে জোর করছিল এ বিষয়ে তার ‘‘গাট ফিলিংস’ কি, তিনি এর স্মরনীয় জবাব দিয়েছিলেন: ’কিন্তু আমিতো আমার ’গাট’ দিয়ে চিন্তা করার চেষ্টা করিনা’; সত্যিই, প্রমান না পাওয়া পর্যন্ত এ বিষয়ে আমাদের মতামত সংরক্ষন করা যেতেই পারে [১৫]; মহাবিশ্বে প্রাণের অস্তিত্বের প্রশ্নটি উন্মুক্ত; পক্ষে এবং বিপক্ষে জোরালো যুক্তি আছে এবং যে কোন এক দিকে এই সম্ভাবনাটিকে প্রভাবিত করার মত যথেষ্ট প্রমানের অভাব আছে। এক ধরণের অ্যাগনষ্টিসিজম অনেক বৈজ্ঞানিক প্রশ্নের ক্ষেত্রেও যুক্তিযুক্ত অবস্থান হতে পারে, যেমন পারমিয়ান যুগের শেষে ঘটা মহাবিলুপ্তির কারন কি? জীবাশ্ম ইতিহাসে সবচেয়ে যা বড় ধরনের অবলুপ্তি। বর্তমানে সংগৃহীত প্রমানের ভিত্তিতে এর কারণ হতে পারে পৃথিবীর সাথে কোন উল্কাপিন্ডের সংঘর্ষ, যেমনটি পরবর্তী সময়ে ডায়নোসরদেরও বিলুপ্তির কারন হয়েছিল। কিন্ত অন্যান্য সম্ভাব্য একক বা মিশ্র কোন কারনও হতে পারে। এই দুই মহাবিলুপ্তির কারন সংক্রান্ত প্রশ্নে অ্যাগনষ্টিসিজম কিন্তু অযৌক্তিক না। ঈশ্বর সংক্রান্ত প্রশ্নে তাহলে কি? তার অস্তিত্বের ব্যাপারেও কি অ্যাগনষ্টিসিজম যুক্তিযুক্ত? অনেকেই হয়তো বলবে অবশ্যই হ্যা, প্রায়শই দৃঢ় বিশ্বাসের আদলে এই বক্তব্য অনেকটাই অতিরিক্ত প্রতিবাদের পর্যায়ে পড়ে। কিন্তু তারা কি সঠিক?

আমি শুরু করবো দুই ধরনের অ্যাগনষ্টিসিজমকে পৃথক করার মাধ্যমে। TAP বা টেম্পরারী অ্যাগনষ্টিসিজম ইন প্র্যাকটিস, যা যুক্তিসঙ্গত মধ্যবর্তী অবস্থান, যেখানে পক্ষে বা বিপক্ষে সত্যিই সুনির্দিষ্ট উত্তর আছে, কিন্তু আপাততঃ প্রমানের অভাবে সেই উত্তরে আমরা এখনও পৌছাতে পারিনি (অথবা প্রমান থাকলেও ব্যাখ্যা করা যায়নি এখনও বোঝার ঘাটতির কারনে বা যথেষ্ট সময় পাওয়া যায়নি প্রমানগুলো বোঝার জন্য); টেম্পরারী অ্যাগনষ্টিসিজম ইন প্র্যাকটিস বা ট্যাপ অবশ্যই পারমিয়ান মহাবিলুপ্তির কারনের ক্ষেত্রে যুক্তিসঙ্গত অবস্থান হতে পারে। অবশ্যই পারমিয়ান মহাবিলুপ্তির একটি কারণ আছে, যদিও এই মুহূর্তে সত্যটি আমাদের জানা নেই, কিন্তু আশা করি একদিন আমরা অবশ্যই জানতে পারবো।

এছাড়াও কিন্তু আরেক ধরনের মধ্যবর্তী অবস্থান আছে, আমি তার নাম দেব, PAP বা পার্মানেন্ট অ্যাগনষ্টিসিজম ইন প্র্যাকটিস, শব্দসংক্ষেপটি যে শব্দটি বানান করে তার সাথে আমার প্রাক্তন স্কুলের ধর্মযাজকের উচ্চারিত একটি শব্দের মিল (প্রায়) একটি দুর্ঘটনা মাত্র। প্যাপ ধরনের অ্যাগনষ্টিসিজম যুক্তিযুক্ত সেই সব প্রশ্নের ক্ষেত্রে যার উত্তর কোনদিনও পাওয়া যাবেনা, যতই প্রমান আমরা পক্ষে বিপক্ষে যোগাড় করি না কেন, কারণ প্রমান এক্ষেত্রে প্রযোজ্যই হবেনা। এই প্রশ্নের অবস্থান ভিন্ন এক স্তরে অথবা ভিন্ন কোন মাত্রায়, প্রমানের ধরা ছোঁওয়ার বাইরে। একটা উদহারন হতে পারে সেই পুরোনো ফিলোসফিক্যাল “চেষ্টনাট”টি [১৬]; আমার মত লাল কি আপনিও দেখেন। হয়তো আপনার লাল আমার কাছে সবুজ অথবা আমার পক্ষে কল্পনা করা সম্ভব এমন কোন রং থেকে সম্পুর্ন ভিন্ন । দার্শনিকরা এই প্রশ্নের উল্লেখ করেন, এমন একটা প্রশ্ন হিসাবে যার কোন উত্তর দেয়া সম্ভব না, পরবর্তীতে যতই নতুন প্রমান যোগাড় হোক না কেন। কিছু সংখ্যক বিজ্ঞানী আর অন্যান্য চিন্তাবিদ নিঃসন্দেহ হয়েছেন যে – আমার মতে অতি উৎসাহে –ঈশ্বরের অস্তিত্বর প্রশ্নটি চিরকালের জন্য উত্তরহীন থেকে যাবে এই ধরা ছোয়ার বাইরে প্যাপ শ্রেনীতে। এখান থেকেই, যা আমরা পরে দেখব, তারা অযৌক্তিক সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, ঈশ্বরের অস্তিত্বের বা অনস্তিত্বের হাইপোথেসিস, দুটোই সঠিক হবার সমান সম্ভাবনা আছে। যে দৃষ্টিভঙ্গিটা আমি সমর্থন করবো তা খুবই আলাদা: ঈশ্বরের অস্তিত্বের ব্যাপারে অ্যাগনষ্টিসিজম নিশ্চিৎভাবে সাময়িক বা ট্যাপ শ্রেনীভুক্ত। হয় তার অস্তিত্ব আছে বা নেই, এটা অবশ্যই বৈজ্ঞানিক প্রশ্ন। একদিন আমরা এর উত্তর জানতে পারবো। আপততঃ আমরা এর সম্ভাবনা নিয়ে জোরালো যুক্তি দিতে পারি।

বিভিন্ন ধরনের মতবাদ বা ধারণার ইতিহাসে, পরে উত্তর পাওয়া গেছে এমন অনেক প্রশ্নের উদহারন আছে, যা কোন এক সময় ধরে নেয়া হয়েছিল চিরকালই বিজ্ঞানের আওতার বাইরে থেকে যাবে । ১৮৩৫ সালে বিখ্যাত ফরাসী দার্শনিক অগুষ্ট কোম্ত নক্ষত্র নিয়ে মন্তব্য করেছিলেন, যে কোন পদ্ধতিতেই হোক না কেন, আমার কোনদিনও, তাদের রাসায়নিক গঠন বা ধাতব প্রকৃতি নিয়ে গবেষনা করতে পারব না। অথচ কোম্ত এ কথাগুলো বলার আগে ফ্রাউনহফার তার স্পেক্ট্রোস্কোপ ব্যবহার করে সুর্যের রাসায়নিক গঠন নিয়ে গবেষনা শুরু করেছিলেন। এখন স্পেক্ট্রোস্কোপ বিশেষজ্ঞরা প্রতিদিনই কোম্ত এর অ্যাগনষ্টিসিজমকে ভুল প্রমান করে যাচ্ছেন, এমনকি বহু দুরের তারাদের রাসায়নিক গঠন সম্পর্কে সঠিক বিশ্লেষনের মাধ্যমে [১৭]; কোম্ত এর নভোবিজ্ঞানীয় অ্যাগনষ্টিসিজম এর সঠিক যে অবস্থাই থাকুক না কেন, এই সতর্কতামুলক কাহিনীর বক্তব্য হল, অন্ততঃপক্ষে, অ্যাগনষ্টিসিজম এর চিরন্তন সত্যতার পক্ষে জোরালো কোন যুক্তি দেবার আগে সাবধানতা অবলম্বন করা উচিৎ। তাসত্ত্বেও যখনই ঈশ্বরের বিষয় আসে, এই শব্দটির প্রথম আবিষ্কারক, টি এইচ হাক্সলী থেকে শরু করে, অনেক মহান দার্শনিক আর বিজ্ঞানীরা, খুবই খুশী মনে কাজটি করে থাকেন[১৮]।

হাক্সলী শব্দটির উদ্ভাবন সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করেছিলেন, যখন সেটি একটি ব্যাক্তিগত আক্রমনের কারন হয়ে দাড়িয়েছিল। লন্ডনের কিংস কলেজের অধ্যক্ষ রেভারেন্ড ডঃ ওয়েইস হাক্সলীর কাপুরুষোচিত অ্যাগনষ্টিসিজম তীব্র সমালোচনা করেছিলেন:

তিনি হয়ত নিজেকে অ্যাগনষ্টিসিজমবাদী হিসাবে চিহ্নিত করতে স্বাচ্ছন্দ বোধ করেন, কিন্তু তার প্রকৃত নাম আসলে আরো প্রাচীন, তিনি আসলে নাস্তিক, অর্থাৎ অবিশ্বাসী। অবিশ্বাসী শব্দটির সাথে হয়তো একটি অপ্রীতিকর অর্থ জড়িয়ে আছে, এটাই হওয়া হয়ত স্বাভাবিক। কোন মানুষের পক্ষে, এবং সেটা হওয়াই উচিৎ, যীশু খৃষ্টকে সে বিশ্বাস করে না, এই কথাটা স্পষ্ট করে বলাটা অবশ্যই সুখকর কোন বিষয় নয়।

হাক্সলী অবশ্য সে ধরনের মানুষ ছিলেন না যিনি সহজে এধরনের উস্কানিমুলক বক্তব্য অগ্রাহ্য করবেন এবং সবাই যেমনটি আশা করেছিল, ১৮৮৯ সালে,তার প্রত্যুত্তর ছিল খুবই তীব্রভাবে সমালোচনামুলক (যদিও তিনি তার স্বভাব সুলভ সতর্ক নম্রতার কোন ব্যতিক্রম না ঘটিয়ে: ডারউইনের বুলডগ হিসাবে তিনি ইতিমধ্যেই দক্ষ হয়ে উঠেছিলেন শহুরে ভিক্টোরিয়ান তীর্যক কথাবার্তায়); অবশেষে, ডঃ ওয়েইসকে তার উচিৎ প্রাপ্য শাস্তি দিয়ে এবং শেষ পর্যন্ত সবটুকু কবর দিয়ে, হাক্সলী ফিরে আসেন ‘অ্যাগনষ্টিক‘ শব্দটির কাছে এবং বর্ণনা দেন কেমন করে তিনি এটি পেলেন। অন্যরা, তিনি বলেন,

> নিশ্চিৎ যে, তারা ‘নসিস’ বা অন্তর্গত তত্ত্বজ্ঞান অর্জন করতে পেরেছেন– এবং কমবেশী সাফল্যের সাথে আস্তিত্বের প্রশ্নটি সমাধান করতে পেরেছেন; কিন্তু আমি নিশ্চিৎ আমি পারিনি এবং আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই প্রশ্ন সমাধানযোগ্য নয়। হিউম এবং কান্টকে আমার পাশে নিয়ে বলছি, আমি আমার নিজেকে এধরনের মতামত শক্ত করে আকড়ে থাকার মত এত অহঙ্কারী ভাবতে পারিনা...... সুতরাং আমি চিন্তা করলাম এবং আবিষ্কার করলাম ‘অ্যাগনস্টিক’ শীর্ষক শিরোনামটি, যা আমার মতে যথাযথ।

পরবর্তীতে তার বক্তৃতায়, হাক্সলী আরো বিষদ ব্যাখ্যা দেন যে, ‘অ্যাগনস্টিকদের কোন মতবাদ নেই, এমনকি নেতিবাচক কোন কিছু।

> অ্যাগনস্টিসিজম, আসলে কোন মতবাদ না বরং একটি পদ্ধতি। যার সার কথা হলো, একটি আদর্শকে দৃঢ়ভাবে প্রয়োগ করা.......ইতিবাচকভাবে, সেই আদর্শকে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে: বুদ্ধিমত্তার ক্ষেত্রে, আর কোন কিছুর কথা না ভেবে, যতটুকু পর্যন্ত্য সম্ভব নিজের যুক্তিকে সর্বদা অনুসরন করা। এবং নেতিবাচকভাবে: বুদ্ধিমত্তার ক্ষেত্রে, উপসংহার যে নিশ্চিৎ এমন ভান না করা যখন তা প্রমান করা যাবেনা বা প্রমানযোগ্য নয়। আমি এটাকেই

অ্যাগনস্টিক বিশ্বাস বলি, যা কেউ যদি পুরোটা মানে এবং হালকা করে না ফেলে, পৃথবীর মুখোমুখি হতে তাকে নির্লজ্জ হতে হবেনা, ভবিষ্যতে যা কিছুই ঘটুক না কেন।

একজন বিজ্ঞানীর কাছে এগুলো অনেক মহৎ কথা এবং টি এইচ হাক্সলীকে হালকাভাবে সমালোচনা করা যায়না। কিন্তু হাক্সলী ঈশ্বরের অস্তিত্ব বা অনস্তিত্ব প্রমান অসম্ভবতার দিকে তার মনোযোগ দেয়ার ফলে তিনি সম্ভাবনার বিষয়টির দিকে গুরুত্ব দেননি। আমাদের পক্ষে কোন কিছুর অস্তিত্ব প্রমান করতে পারা বা না পারার এই সত্যটা কিন্তু অস্তিত্ব আর অনস্তিত্বকে একই শ্রেনীতে ফেলে না। আমি মনে করিনা টি এইচ হাক্সলী এব্যাপারে দ্বিমত পোষন করতে পারেন এবং সন্দেহ হয়, তিনি যখন আপাতঃ দৃষ্টিতে কাজটি করেছেন, আসলে তিনি খুশি করার জন্য বেশীমাত্রায় সচেষ্ট হয়েছেন বিষয়কে মেনে নিতে. শুধুমাত্র অন্য আরেকটি বিষয়ের খাতিরে। আমরা সবাই কাজটি কোন না কোন একসময় করেছি।

হাক্সলীর সাথে দ্বিমত পোষন করে আমি বলতে চাই, ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রশ্নটি অবশ্যই একটি বৈজ্ঞানিক হাইপোথেসিস, অন্য অনেক বিষয়ের মত। যদিও বিষয়টি কঠিন, ব্যাবহারিক ক্ষেত্রে এটি পরীক্ষা করা, এটির অবস্থান পারমিয়ান এবং ক্রেটাসিয়াস মহাবিলুপ্তি নিয়ে বিতর্কের সাথে একই ট্যাপ বা বা টেম্পরারী অ্যাগনষ্টিসিজম ইন প্র্যাকটিস শ্রেনীতে। ঈশ্বরের অস্তিত্ব বা অনস্তিত্ব মহাবিশ্ব সংক্রান্ত একটি বৈজ্ঞানিক সত্য, তাত্বিকভাবে আবিষ্কারযোগ্য যদিও ব্যাবহারিক ক্ষেত্রে ব্যাপারটা সহজ নয়। যদি ঈশ্বর সত্যিই থাকেন এবং তিনি নিজে যদি চান, ঈশ্বর নিজেই তার স্বপক্ষে এই বিতর্ক চিরকালের মত স্বশব্দে এবং সুষ্পষ্টভাবে থামিয়ে দিতে পারেন। এবং এমনকি যদি ঈশ্বরের অস্তিত্ব যদি নিশ্চিৎভাবে প্রমান বা খন্ডানো নাও যায়, বর্তমানে প্রাপ্য সব প্রমান আর যুক্তি সম্ভাবনার পরিমাপের অংকটি নিয়ে গেছে শতকরা ৫০ ভাগ থেকে আরো অনেক দুরে।

তাহলে, আমরা গুরুত্বের সাথে সম্ভাবনার স্পেকট্রামের ধারনাটিকে গ্রহন করি, এবং দুটি চুড়ান্ত বীপরিত নিশ্চিৎ অবস্থানের মাঝে আরোপ করি ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্পর্কে মানুষের ভাবনাকে। এই স্পেকট্রাম যদিও অবিচ্ছিন্ন, তা সত্বেও দুই চুড়ান্ত অবস্থানের মধ্যে নিম্নলিখিত সাতটি উল্লেখযোগ্য মাইলফলক বিদ্যমান:

১. পুরোপুরি ঈশ্বরবাদী। শতকরা ১০০ ভাগ সম্ভাবনা ঈশ্বরের অস্তিত্বে। সি জি ইয়াং এর ভাষায়: আমি বিশ্বাস করিনা,আমি জানি।

২. অনেক বেশী সম্ভাবনা কিস্তু শতকরা ১০০ ভাগের নীচে। কার্যতঃ ঈশ্বরবাদী। ‘আমি নিশ্চিৎভাবে জানি না কিন্তু আমি দৃঢ়ভাবে ঈশ্বরকে বিশ্বাস করি এবং তার অস্তিত্ব আছে এটাকে সত্য মনে করে আমার জীবন যাপন করি।’

৩. শতকরা ৫০ ভাগের উপরে তবে সম্ভাবনা এর খুব একটা বেশী উপরে নয় । কৌশলগতভাবে অ্যাগনষ্টিক কিন্তু ঈশ্বরবাদ ঘেষা। ‘আমি খুবই অনিশ্চিৎ কিন্তু আমি ঈশ্বরকে বিশ্বাস করতে ইচ্ছুক।’

৪. সম্ভাবনা ঠিক শতকরা ৫০ ভাগ। পুরোপুরি পক্ষপাতহীন অ্যাগনষ্টিক।‘ ‘ঈশ্বরের অস্তিত্ব বা অস্তিত্বহীনতা দুটোই সমানভাবে সম্ভাব্য।’

৫. শতকরা ৫০ ভাগের নীচে তবে সম্ভাবনা এর খুব একটা বেশী নীচে নয়। কৌশলগতভাবে অ্যাগনষ্টিক কিন্তু নিরীশ্বরবাদ ঘেষা। আমি জানিনা ঈশ্বরের অস্তিত্ব আছে কিনা কিন্তু আমি সংশয়বাদী হতে ইচ্ছুক ।

৬.খুবই কম সম্ভাবনা কিন্তু শুন্যের উপরে।কার্যতঃ নিরীশ্বরবাদী। আমি নিশ্চিৎভাবে জানিনা কিন্তু আমি মনে করি ঈশ্বর খুবই অসম্ভব একটি ব্যাপার এবং তার নেই এটা মনে করে আমার জীবন যাপন করি।’

৭. পুরোপুরি নিরীশ্বরবাদী। যেমন ইয়াং “জানেন’ একজন আছেন ঠিক তেমন বিশ্বাসের সাথে আমি জানি কোন ঈশ্বরের অস্তিত্ব নেই।

আমি অবাকই হবো যদি বেশী মানুষকে ক্যাটেগরী ৭ এ পাওয়া যায়, তারপরও যেখানে বেশীর ভাগ মানুষ, সেই ক্যাটেগরী ১ এর সাথে সামঞ্জস্য রাখার খাতিরে আমি এটা যোগ করেছি। বিশ্বাসের প্রকৃতিই হচ্ছে, ইয়াং (C. Jung) এর মতই , একজন বিশ্বাসী কোন যৌক্তিক কারন ছাড়াই তার বিশ্বাসকে আকড়ে ধরে রাখতে সক্ষম (ইয়াং অবশ্য বিশ্বাস করতেন তার বুক সেলফের নির্দিষ্ট কিছু বই স্বতঃস্ফুর্তভাবে স্বশব্দে বিস্ফোরিত হতে পারে); নিরীশ্বরবাদীদের কোন বিশ্বাস নেই,আর শুধুমাত্র যুক্তি দিয়ে কোন কিছুর অস্তিত্ব নেই এধরনের বিশ্বাসে কেউ পৌছাতে পারেনা। সেকারনে ক্যাটেগরী ৭ ব্যবহারিকভাবে শুন্য তার বীপরিত মেরুর ক্যাটেগরী ১ থেকে, যেখানে অনেক অনুগত মানুষের সমাবেশ। আমি নিজেকে ক্যাটেগরী ৬ এ, কিন্ত ৭ দিকে ঘেষা মনে করি। আমি অ্যাগনষ্টিক, তবে তা শুধুমাত্র, বাগানে গাছের নীচে পরীদের ব্যাপারে আমি যেমন অ্যাগনষ্টিক ঠিক ততটুকু।

সম্ভাবনার এই স্পেক্ট্রামটি ট্যাপ বা ‘টেম্পরারী অ্যাগনষ্টিসিজম ইন প্র্যাকটিস’ এর ক্ষেত্রে বেশ প্রযাজ্য। ‘পার্মানেন্ট অ্যাগনষ্টিসিজম ইন প্র্যাকটিস’ বা প্যাপকে এই স্পেক্ট্রামটির মাঝামাঝি, ঈশ্বরের অস্তিত্বর সম্ভাবনা যেখানে শতকরা ৫০ ভাগ, সেখানে রাখার একটা হালকা প্রলোভন হতে পারে, কিন্তু সেটা সঠিক হবে না। প্যাপ অ্যাগনষ্টিসিজমবাদীরা দৃঢ়তার সংগে দাবী করেন, ঈশ্বরের অস্তিত্ব আছে, কি নেই, এই প্রশ্নে আমাদের পক্ষে বা বিপক্ষে কিছু বলা সম্ভব না। এই প্রশ্নটি, প্যাপবাদীদের মতে, নীতিগতভাবে সমাধানযোগ্য নয় এবং তাদের উচিৎ হবে এই স্পেক্ট্রামটির কোন স্তরে নিজেদের শ্রেনীভুক্ত করার যে কোন প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করা। আমার পক্ষে জানা সম্ভব না যে, আপনার লাল কি আমার সবুজের মত–এই সত্যটা কিন্তু শতকরা ৫০ ভাগ সম্ভাবনার সমান না। এধরনের প্রস্তাব এতটাই অর্থহীন যে, একে কোন ধরনের সম্ভাবনার মর্যাদা দেয়া সম্ভব না। তাসত্বেও, এটা খুব সাধারন একটা ভুল, যা আমরা পরবর্তীতে আবার লক্ষ্য করব, নীতিগতভাবে ঈশ্বরের অস্তিত্বর প্রশ্নটি সমাধানযোগ্য নয় এমন ধারনা থেকে, তার অস্তিত্ব এবং তার অস্তিত্বহীনতা দুটোই সমানভাবে সম্ভাব্য, এমন কোন একটা উপসংহারে লাফ দেয়া।

অন্য আরেক ভাবে এই ভুলটি বোঝানো যেতে পারে, প্রমানের দায়ভারের মাধ্যমে, যা বার্ট্রান্ড রাসেল চমৎকারভাবে ব্যাখ্যা করেছেন স্বর্গীয় চা এর পটের রুপকের মাধ্যমে[১৯]।

অনেক গোড়া মানুষ কথা বলেন যেন, প্রাপ্ত ধর্মমতকে প্রমান করার দায়িত্ব ধর্মমতাবলম্বীদের নয় বরং সংশয়বাদীদেরই দায়িত্ব যেন প্রাপ্ত ধর্মমতকে মিথ্যা প্রমান করার। এটা অবশ্য একটি ভুল। আমি যদি প্রস্তাব করি যে, পৃথিবী আর মঙ্গল গ্রহের মাঝে চীনামাটির তৈরী একটি চা এর পট আছে, যা সুর্যের চারপাশে উপবৃত্তাকার কক্ষপথে প্রদক্ষিন করছে, কারো পক্ষে কিন্তু আমার দাবীকে মিথ্যা প্রমান করা সম্ভব না, বিশেষ করে আমি যদি একটু সতর্ক হয়ে আরো উল্লেখ করি যে, চায়ের পটটি এত ক্ষুদ্রকায় যে, আমাদের সবচেয়ে শক্তিশালী টেলিস্কোপ দিয়ে তা দেখা সম্ভব নয়। কিন্তু আমি যদি আরো বলি, আমার দাবীকে যেহেতু মিথ্যা প্রমান করা যাবে না, অতএব একে সন্দেহ করা কোন মানবিক যুক্তির পক্ষে অসহ্য একটি ধৃষ্টতা হবে; তবে আমি যে আবোলতাবোল কথা বলছি এমনটি ভাবা কারো জন্য ভুল হবে না। কিন্তু যদি এধরনের একাট চায়ের পটের অস্তিত্ব যদি সুনিশ্চিৎভাবে ঘোষনা করা হতো প্রাচীন ধর্মীয় গ্রন্থে, প্রতি রোববারে পবিত্র উদ্ধৃতি হিসাবে তা শেখানো হত, স্কুলে শিশুদের মনের মধ্যে ঢুকিয়ে দেয়া হত, তাহলে এর অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোন ধরনের দ্বিধাদন্দ বা ইতস্ততা চিহ্নিত হত বরং অস্বাভাবিকতা হিসাবে, এবং এর সংশয়বাদীরা নজরে পড়তেন আধুনিক যুগে মনোচিকিৎসকদের এবং অতীতের ইনক্যুইজিটরদের নজরে ।

আমাদের এ বিষয়ে কথা বলে সময় নষ্ট করা ঠিক হবে না, আমি যতটুকু জানি কেউই চায়ের পটের উপাসনা করে না [২০]; কিন্তু যদি জোর করা হয়, সেক্ষেত্রে আমরা আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস প্রকাশ করতে দ্বিধা বোধ করবো না যে, অবশ্যই কোন ঘুর্ণায়মান চায়ের পট এর অস্তিত্ব নেই। তারপরও মুলতঃ নিয়মানুযায়ী আমাদের সবাইকে

চায়ের পট অ্যাগনষ্টিক হিসাবে ধরে নিতে হবে: আমরা প্রমান করতে পারব না, সুনিশ্চিৎভাবে, যে কোন স্বর্গীয় চা এর পটের কোর অস্তিত্ব নেই। ব্যবহারিক সব ক্ষেত্রে, চায়ের পট অ্যাগনষ্টিকবাদ থেকে আমরা সরে আসব চা এর পট অবিশ্বাসী মতবাদে।

একজন বন্ধু, যিনি প্রতিপালিত হয়েছেন একজন ইহুদী হিসাবে এবং নিজ ঐতিহ্যর প্রতি অনুগত হয়ে এখনও সাবাথ বা অন্যান্য ইহুদী ধর্মী আচার পালন করেন, নিজেকে বর্ণনা দেন একজন ’টুথ ফেয়ারী অ্যাগনস্টিক’ হিসাবে। তিনি ঈশ্বরের অস্তিত্বর সম্ভাবনাকে ’টুথ ফেয়ারীর’ অস্তিত্বর সম্ভাবনার থেকে আদৌ বেশী মনে করেন না। কোন হাইপোথিসিসই প্রমান করা সম্ভব না, এবং দুটোই সমানভাবে অসম্ভব। প্রায় ঠিক যতটুকু তিনি ফেয়ারী অবিশ্বাসী ততটুকু ঈশ্বর অবিশ্বাসী, এবং উভয় ক্ষেত্রেই একই রকম সামান্য মাত্রায় *অ্যাগনষ্টিক*।

রাসেলের চা এর পট, অবশ্যই অগনিত জিনিসের প্রতীক, যাদের অস্তিত্ব কল্পনা করা সম্ভব, কিন্তু মিথ্যা প্রমান করা অসম্ভব। আমেরিকার বিখ্যাত আইনজীবি, চার্লস ড্যারো বলেছিলেন, ’আমি ঈশ্বরকে বিশ্বাস করি না যেমন মাদার গুজকেও বিশ্বাস করিনা’; সাংবাদিক অ্যান্ড্রু মুয়েলার মত হল, নিজেকে কোন বিশেষ একটি ধর্মবিশ্বাসের সাথে সংশ্লিষ্ট করার মানে হলো, ’কোন অংশে কম বা বেশী অদ্ভুত না, বিশ্বাসের জন্য বেছে নেয়া যে পৃথিবী হচ্ছে রম্বস আকৃতির এবং এসমেরেল্ডা আর কীথ নামের দুই অতিবিশাল সবুজ লবস্টার তাদের সাড়াশীর মত দুই হাতে মহাবিশ্বর মধ্য দিয়ে পৃথিবীটাকে বহণ করে নিয়ে চলছে’ [২১] ; দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গিতে সবচেয়ে প্রিয়, অদৃশ্য,অস্পৃশ্য, অশ্রবনযোগ্য ইউনিকর্ণ, যা প্রতিবছর ক্যাম্প কোয়েষ্টে [২২] শিশুরা মিথ্যা প্রমান করার চেষ্টা করে। বর্তমানে ইন্টারনেটে সবচেয়ে জনপ্রিয় দেবতা যা ইয়াওয়ে বা অন্য যে কোনটার মতই মিথ্যা প্রমান করা সম্ভব নয়, হল উড়ন্ত স্প্যাগেটি মনস্টার, যিনি, অনেকেই দাবী করে, তাদেরকে স্পর্শ করেছে নুডলস এর মত শরীরের অংশ দিয়ে [২৩]; আমি খুবই আনন্দিত হয়েছে যে, ’গসপেল অব ফ্লাইং স্প্যাগেটি মনস্টার’ ইতিমধ্যেই বই আকারে প্রকাশিত হয়েছে এবং প্রশংসিত হয়েছে [২৪]; আমি যদিও এখনওপড়িনি, কিন্ত গসপেল পড়ার কি দরকার, যদি আপনি জানেন, এটা সত্যি ? প্রসঙ্গক্রমে যা হবার কথা ছিল, বড় মাপের মতবিভেদ ইতিমধ্যেই ঘটে গেছে,ফলে তৈরী হয়েছে,রিফর্মড ’ চার্চ অব দ্য ফ্লাইং স্প্যাগেটি মনস্টার’ [২৫]।

এসব ব্যতিক্রমী উদহারন নিয়ে আলোচনার উদ্দেশ্য হলো, এদের মিথ্যা প্রমান করা সম্ভব না, তারপরও কেউ চিন্তা করেনা, তাদের অস্তিত্বের আর অস্তিত্বহীনতার হাইপোথিসিস একই সমমানের। রাসেলের বক্তব্য হল, প্রমান করার দায়ভার বিশ্বাসীদের, অবিশ্বাসীদের নয়। আমার বক্তব্যও কিছুটা সেধরনের, উড়ন্ত চা এর পটের অস্তিত্বের পক্ষে সম্ভাবনা (বা স্প্যাগেটি মনস্টার/এসমেরেল্ডা আর কীথ/ ইউনিকর্ণ ইত্যাদি) কিন্তু এর বিপক্ষে সম্ভাবনার সমান না।

কক্ষপথে প্রদক্ষিনরত কোন চা এর পট বা টুথ ফেয়ারী মিথ্যা প্রমান করার অযোগ্য, এই বিষয়টিকে সত্য হিসাবে কোন যুক্তিবাদী মানুষেই অনুভব করেন না যে, এটি এমন কোন একটি বিষয়, যা আগ্রোহদ্দীপক যুক্তিতর্কর মাধ্যমে মীমাংসা করা সম্ভব। আমরা কেউই, উর্বর আর ছলনাময়ী কল্পনা তৈরী করতে পারে এমন লক্ষ লক্ষ আবস্তব বিষয়গুলোকে মিথ্যা প্রমান করাটা নিজেদের দায়িত্ব মনে করি না। যখন জিজ্ঞেস করা হয় আমি নীরিশ্বরবাদী কিনা, আমার এটাকে মজার একটা কৌশল মনে হয়, যে আমিও প্রশ্নকারীর দৃষ্টি আকর্ষন করে বোঝাতে চাই যে, জিউস, অ্যাপোলো, আমন রা, মিথরাস, বাল, থর, ওটান, সোনালী বাছুর এবং ফ্লাইং স্প্যাগেটি মনস্টার এর ক্ষেত্রে তিনি নিজেও একজন নীরিশ্বরবাদী, আমি কেবল আরেকটি বেশী ঈশ্বরকে অবিশ্বাস করি মাত্র।

আমরা প্রায় সবাই পুরোপুরি অবিশ্বাসের কাছাকাছি এক ধরনের সন্দেহ প্রকাশ করার অধিকার রাখি– শুধুমাত্র ইউনিকর্ণ, টুথফেয়ারী, প্রাচীন গ্রীস, রোম, মিশর এবং ভাইকিংদের দেবদেবীদের ক্ষেত্রে আমাদের তেমন কোন মাথাব্যাথা নেই। কিন্তু আব্রাহামীয় ঈশ্বর এর ক্ষেত্রে চিন্তার প্রয়োজন আছে, কারন উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মানুষ যাদের

সাথে আমরা এই পৃথিবীতে বাস করি তারা তার অস্তিত্বে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে। রাসেল এর চা এর পটে টি যা প্রদর্শন করছে, তা হলো ঈশ্বর বিশ্বাসের সার্বজনীনতা; স্বর্গীয় চা এর পটে বিশ্বাসের সাথে তুলনা করলে কিন্তু যুক্তির মাধ্যমে প্রমান করার দায়ভারটা কাদের অপরিবর্তনীয় রয়ে গেছে; যদিও ব্যবহারিক রাজনীতির স্তরে মনে হতে পারে দায়ভার পরিবর্তিত হয়েছে অবিশ্বাসীদের দিকে। ঈশ্বরের অস্তিত্বহীনতা যে আমরা প্রমান করতে পারব না তা গ্রহনযোগ্যতা পেয়েছে, এবং রুপান্তরিত হয়েছে যেন খুবই তুচ্ছ একটি ব্যপারে, এমনকি শুধুমাত্র এই অর্থে যে, আমরা কখনেই চুড়ান্তভাবে কোনকিছুর অস্তিত্বহীনতাকে প্রমান করতে পারব না। আসল ব্যাপারটা হল য, ঈশ্বরকে কি অপ্রমান করা যায় কিনা (তিনি অবশ্যই তা না) সেটা কিন্তু না বরং তার অস্তিত্ব কি আদৌ ”সম্ভব’ কিনা, সেটাই। এবং সেটা ভিন্ন একটি ব্যাপার। কিছু প্রমানঅযোগ্য বিষয় যুক্তিসঙ্গতভাবেই বিচার করা হয়, অন্য আরো কিছু প্রমানঅযোগ্য বিষয় থেকে, অনেক কম ’সম্ভাব্য’ হিসাবে। কোন কারনই নেই ঈশ্বরকে সম্ভাবনার স্পেকট্রামের নীরিখে পরীক্ষাযোগ্য না ভাবা। এবং অবশ্যই কোন কারন নেই এটা ভাববার যে, শুধুমাত্র ঈশ্বর এর অস্তিত্ব প্রমান করা বা মিথ্যা প্রমান করা যাবে না বলেই তার অস্তিত্বের সম্ভাবনা শতকরা ৫০ ভাগ। বরং এর বীপরিতটাই সম্ভব,যা আমরা পরবর্তীতে দেখব।

নোমা (NOMA):

সম্পুর্ণভাবে পক্ষপাতহীন অ্যাগনষ্টিসিজম বা অজ্ঞেয়বাদের এর প্রতি টমাস হাক্সলী যেভাবে আন্তরিকতাহীন সমর্থন জানাতে বেশীমাত্রায় সচেষ্ট হয়েছিলেন, আমার সাত স্তরের সম্ভাবনা স্পেক্ট্রামের মধ্যবর্তী স্তরের ঈশ্বরবাদীরাও ঠিক একই ধরনের কারনে কাজটি অন্যদিক বরাবর করে থাকেন। ধর্মতত্ববিদ অ্যালিষ্টার ম্যাকগ্রাথ তার ’ডকিন্স’স গড: জীনস,মীমস অ্যান্ড দ্য অরিজিন অব লাইফ’ বইতে এটাকেই মুল বক্তব্য হিসাবে উপস্থাপন করেছেন। সত্যি, আমার বৈজ্ঞানিক গবেষনার একটি সপ্রশংস পক্ষপাতহীন সারাংশ শেষে মনে হযেছে, যুক্তি খন্ডানোর লক্ষ্যে তিনি কেবলমাত্র একটি মাত্র বিষয়েরই শুধু উল্লেখ করেছেন: সেই অনস্বীকার্য এবং অসম্মানজনক দুর্বল যুক্তি, ঈশ্বরের অস্তিত্বকে কেউ মিথ্যা প্রমান করতে পারবে না। পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা ম্যাকগ্রাথ পড়ার সময় আমি মার্জিনে ’চা এর পট’ লিথে গেছি। টি এইচ হাক্সলীর বক্তব্য তার সমর্থনে উল্লেখ করে তিনি বলেন: ’চরম বিরক্ত হই যখন ঈশ্বরবাদী আর নিরীশ্বরবাদী, উভয়পক্ষই অপর্যাপ্ত পরিমান প্রায়োগিক প্রমানের উপর নির্ভরশীল হয়ে নৈরাশ্যজনকভাবে অযৌক্তিক গোঁড়া মতবাদ বা বক্তব্য প্রদান করেন, হাক্সলী ঘোষনা করেছিলেন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির মাধ্যমে ঈশ্বর প্রশ্নের কোন সুরাহা হবেনা’।

ম্যাকগ্রাথ পরে স্টিফেন জে গুলড এর উদ্ধৃতি দেন একই ধারাবাহিকতায়:”আমার সহকর্মীদের জন্য আর অসংখ্য মিলিয়নবার যা বলেছি (কলেজের ঘরোয়া আলোচনা থেকে গবেষনামুলক সেমিনার):বিজ্ঞান কোনভাবেই (এরঅন্তর্গত বৈধ উপায়ে) প্রকৃতির উপর ঈশ্বরের সম্ভাব্য তদারকীর বিষয়টি মিমাংসা করতে পারবেনা। আমরা না পারবো একে সত্যাপন করতে, না পারবো অস্বীকার করতে। বিজ্ঞানী হিসাবে এ বিষয়ে মন্তব্য করতেই আমরা পারবোনা’; গুলড এর দাবীর মধ্যে প্রত্যয়ী,প্রায় জোরজবরদস্তিমুলক আওয়াজ থাকা সত্বেও, আসলেই তার এই কথার যৌক্তিকতাটা কি? কেন বিজ্ঞানী হিসাবে আমরা ঈশ্বরের বিষয়ে মন্তব্য করতে পারব না ? আর কেনইবা রাসেলের চা এর পট অথবা ফ্লাইং স্প্যাগেটি মনস্টার সমানভাবে বৈজ্ঞানিক সন্দেহের উর্ধে থাকবে। কিছুক্ষনের মধ্যে আমি যুক্তি উপস্থাপন করব যে, সৃষ্টিকর্তার তদারকীতে চলমান একটি মহাবিশ্ব অবশ্যই সৃষ্টিকর্তাবিহীন কোন মহাবিশ্ব থেকে পৃথক হবে। আর কেনইবা তা বৈজ্ঞানিক বিষয় হিসাবে গ্রাহ্য করা হবে না ?

খুশী করার জন্য অতিরিক্ত নত হবার চেষ্টার শিল্পটিকে আক্ষরিক অর্থে মাটিতে শুয়ে পড়ার পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছিলেন গুলড তার কম প্রশংসিত বই ’রকস অব এজেস’ এ। এখানেই তিনি উদ্ভাবন করেন নোমা (NOMA), যা ‘নন ওভারল্যাপিং ম্যাজিষ্টেরিয়া’ র শব্দসংক্ষেপ:

বিজ্ঞানের জাল বা ম্যাজিষ্টেরিয়াম বিস্তৃত প্রায়োগিক জগতে: বিশ্বব্রহ্মাণ্ড কি দিয়ে তৈরী (বাস্তব তথ্য) এবং কেন এটি এভাবে কাজ করে (তত্ব); কিন্তু ধর্মের ম্যাজিষ্টেরিয়াম বিস্তৃত এসব কিছুর সর্বশেষ অর্থ এবং নৈতিক মুল্যবোধ সংক্রান্ত প্রশ্নসমুহে। এই দুই ম্যাজিষ্টেরিয়া একে অপরকে অধিক্রমণ করে না, এবং তারা সকল জিজ্ঞাসাকেও ধারন করেনা (উদহারন হিসাবে ধরা যাক, শিল্পের ম্যাজিষ্টেরিয়াম এবং সৌন্দর্য্যর অর্থ); পুরোনো বহুল ব্যবহৃত কথা উল্লেখ করে বললে, বিজ্ঞান জানে কিভাবে পাথরের অতিক্রান্ত সময় নির্ণয় করা যায় (age of rocks), আর ধর্ম জানে যুগযুগান্তের বিশ্বাসের প্রতীক রুপী পাথরকে (rock of ages); বিজ্ঞান গবেষনা করে কিভাবে স্বর্গলোক চলছে (how the heaven goes), আর ধর্ম কেমন করে স্বর্গ যাওয়া যায় (how to go to heaven)।

বিষয়টা নিয়ে আপনি চিন্তা করার আগ পর্যন্ত শুনতে ভালোই লাগবে উপরের কথাগুলো। কোনগুলো সেই সব চুড়ান্ত প্রশ্নাবলী যার সামনে ধর্ম সন্মানিত অতিথি আর বিজ্ঞানকে শ্রদ্ধা সহকারে চুপিসারে সরে পড়তে হবে?

মার্টিন রিস, কেমব্রীজের প্রখ্যাত নভোবিজ্ঞানী, যার কথা আমি আগেই উল্লেখ করেছি, তার বই ’আওয়ার কসমিক হ্যাবিট্যাট’ শুরু করেছেন দুটি সম্ভাব্য চুড়ান্ত প্রশ্ন প্রস্তাব এবং নোমা–বান্ধব উত্তর দেয়ার মাধ্যমে । ‘সবচেয়ে প্রধান রহস্যটা হলো, যে কোন কিছুর আদৌ কেন অস্তিত্ব আছে এবং এই সমীকরনে কে বা কি জীবনের স্পর্শ দিয় এই মহাবিশ্বে তাদের বাস্তবতা দিয়েছে? এধরনের প্রশ্নগুলো বিজ্ঞানের আওতার বাইরে, কিন্তু তারা দর্শন আর ধর্মতত্ত্বর এখতিয়ারে অবস্থিত।’ আমি বরং বলতাম যে, যদি সত্যি তারা বিজ্ঞানের নাগালের বাইরে অবস্থান করে থাকে, অবশ্যই ধর্মতত্ত্বর আওতার বাইরেও তাদের অবস্থান (আমার সন্দেহ আছে দার্শনিকরা তাদেরকে ধর্মতাত্বিকদের সাথে একত্রে করার করার জন্য মার্টিন রিস এর উপর সন্তুষ্ট হবে); আমি আরেকটু আগ বাড়িয়ে ভাবার চেষ্টা করছি যে, কোন অর্থে বলা সম্ভব যে, ধর্মতাত্বিকদের একটি পৃথক এখতিয়ার বা সীমানা আছে। আমার অক্সফোর্ড কলেজের ওয়ার্ডেন (প্রধান) এর মন্তব্যটা মনে পড়লে হাসি পায়। একজন তরুন ধর্মতত্ত্ববিদ জুনিয়র রিসার্চ ফেলোশীপের জন্য আবেদন করেছিল, এবং খৃষ্ঠীয় ধর্মতত্ব নিয়ে তার ডক্টরাল থিসিস ওয়ার্ডেনকে মন্তব্য করতে প্ররোচনা করেছিল : ’আমার গভীর সন্দেহ আছে আদৌ এটা কোন বিষয় কিনা।’

গভীর মহাজাগতিক প্রশ্নের সমাধানে ধর্মতাত্বিকরা কি এমন বিশেষ দক্ষতা দেখাবেন, যা বিজ্ঞানীরা পারবেন না? আরেকটি লেখায় আমি অক্সফোর্ডের একজন নভোবিজ্ঞানীর কথা উল্লেখ করেছিলাম, যখন আমি তাকে এই গভীর প্রশ্নগুলোর একটি করেছিলাম, তার উত্তর ছিল: ‘’আহ, এখন আমরা বিজ্ঞানের সীমানার বাইরে চলে যাচ্ছি; এখন এর উত্তর দেবার দায়িত্ব ছেড়ে দিচ্ছি আমাদের ভালো বন্ধু চ্যাপলেইনের (ধর্মযাজক) উপর।’ আমি খুব দ্রুত এর উত্তর দিতে পারিনি, যা আমি পরে লিখেছিলাম: ’কিন্তু কেন চ্যাপলেইন? কেন বাগানের মালী বা বাবুর্চি না?’’ ‘‘কেন বিজ্ঞানীরা কাপুরুষের মত ধর্মতত্ত্ববিদদের উচ্চাশার প্রতি ভক্তিশীল, যখন এ ধরনের প্রশ্নের উত্তর দেবার জন্য তারা অবশ্যই বিজ্ঞানীদের নিজেদের থেকে বেশী যোগ্য না?

এটা বিরক্তিকর ক্লিশে বা বহুব্যবহৃত উক্তি (আর, অন্য অনেক ক্লিশে থেকে এর পার্থক্য, এটা এমনকি সত্য না), তা হলো, বিজ্ঞান ব্যস্ত থাকে ‘’কিভাবে’ (how) প্রশ্ন নিয়ে কিন্ত একমাত্র ধর্মতত্ব যথেষ্ট প্রস্তুত ‘কেন’ (why) প্রশ্নের উত্তর দিতে। এই ‘কেন’ প্রশ্নটা আসলেই বা কি? প্রত্যেকটা ইংরেজী বাক্য ‘কেন’ দিয়ে শুরু হলেই সেটা যুক্তিসঙ্গত বৈধ প্রশ্ন হয়ে যায়না: ইউনিকর্ন এর ভেতরটা ফাপা বা শুন্য কেন? কিছু প্রশ্ন কোন উত্তর পাবার যোগ্যতা রাখেনা, চিন্তার রং কেমন?আশার গন্ধ কেমন? কোন প্রশ্ন ব্যকরনগত শুদ্ধ হলেই অর্থবহ বাক্য হয় না বা তার জন্য সময় নষ্ট করা যুক্তিযুক্ত হয়না। এমনকি প্রশ্নটা যদি বাস্তব সম্মতও হয়, বিজ্ঞান পারবে না বলে এর অর্থ এমন না যে, ধর্ম পারবে।

হয়ত এমন কিছু সত্যিকারের এবং গভীর প্রশ্ন আছে চিরকালই বিজ্ঞানের আওতার বাইরে থেকে যাবে। হয়ত কোয়ান্টাম তত্ব ইতিমধ্যে আমাদের বোঝার ক্ষমতার সীমাবদ্ধতার দরজায় কড়া নাড়ছে। কিন্তু যদি বিজ্ঞান না

পারে কোন সর্বশেষ প্রশ্নের উত্তর দিতে, তাহলে ধর্ম পারবে এমন কথা কেমন করে ভাবা সম্ভব? আমি বিশ্বাস করি, না কেমব্রীজ বা অক্সফোর্ডের নভোবিজ্ঞানী, কেউই বিশ্বাস করতে পারেন না, বিজ্ঞানের পক্ষে উত্তর দেবার জন্য কঠিন সব গভীরতম প্রশ্নের উত্তর দেবার মত,কোন বিশেষ দক্ষতা ধর্মতত্ত্ববিদদের আছে। আমি সন্দেহ করছি, দুই নভোবিজ্ঞানী, আবারো নম্র হবার জন্য অতিরিক্ত চেষ্টা করেছেন: ধর্মতাত্ত্বিকদের কোন কিছুর সম্বন্ধেই গুরুত্বপুর্ণ কোন কিছু বলার নেই। সুতরাং ঠিক আছে আমরা বরং তাদের একটু ছাড় দেই, তারা চিন্তা করতে থাকুক কতগুলো প্রশ্ন নিয়ে যা কেউ কোনদিনও পারবে না উত্তর দিতে। আমার নভোবিজ্ঞানী বন্ধুদের মত আমি কিন্তু মনে করিনা, আমাদের আদৌ তাদের কোন সুযোগ দেয়ার প্রয়োজন আছে। আমি এখনো কোন জোরালো কারন দেখিনি ধর্মতত্ত্ব (বিবলিক্যাল ইতিহাস, সাহিত্য এর পরিবর্তে) আসলে কোন একটি বিষয় হতে পারে।

বাড়িয়ে না বললেও, একইভাবে, আমরা সবাই একমত হতে পারি যে, নৈতিক মুল্যবোধের উপর আমাদের উপদেশ দেবার ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের অধিকারের বিষয়টি অবশ্যই জটিল। কিন্তু গুলড আসলেই চান কোনটা ভাল আর কোনটা খারাপ সেটা নির্ধারন করার অধিকার ধর্মের উপর ছেড়ে দিতে। মানুষের জ্ঞানে যার নতুন আর কিছু দেবার নেই, এই সত্যটা নিশ্চয়ই কোন কারন হতে পারে না, আমাদের করনীয় সম্বন্ধে নির্দেশ দেবার জন্য ধর্মকে পুর্ন স্বাধীনতা দেয়া। তাছাড়া, কোন ধর্ম? সেই ধর্ম, যে ধর্মে ঘটনাচক্রে আমরা প্রতিপালিত হয়েছি? তাহলে, কোন অধ্যায়, বাইবেলের কোন বইটার পাতা আমরা উল্টাবো – কারন কোন বইই একমত পোষন করেনা, আর কয়েকটা তো রীতিমত কদর্য, যে কোন যুক্তিসঙ্গতার মাপকাঠিতে। কত জন আসলে যথেষ্ঠ পরিমান বাইবেল পড়েছে যে জানে ব্যভিচারের বা সাবাথের দিনে কাঠ কুড়ানো বা পিতামাতার সাথে বেয়াদবীর শাস্তি মৃত্যদন্ড ঘোষনা করা হয়েছে। আমরা যদি ডিউটেরোনমী এবং লেভিকটাসকে বাদ দেই (আধুনিক আলোকিত সব মানুষ যেটা করেন), কোন মানদন্ডের উপর ভিত্তি করেই বা আমরা সিদ্ধান্ত নেব, ধর্মের কোন নৈতিক মুলবোধ আমরা 'গ্রহন' করব? নাকি আমরা সারা পৃথিবীর সব ধর্মগুলো খুজে বেছে দেখব যতক্ষন না পর্যন্ত্য আমরা আমাদের জন্য খাপ খায় এমন কোন নৈতিক শিক্ষা খুজে পাই। সেটাই যদি হয়, তাহলে আবার প্রশ্ন ওঠে, কোন মানদন্ডের উপর ভিত্তি করে তা আমরা বাছাই করবো। ধর্মীয় নৈতিকতা বাছাই এর ক্ষেত্রে আমাদের কাছে যদি স্বতন্ত্র কোন মানদন্ড থেকেই থাকে, তাহলে কেন আমরা মধ্যসত্বভোগীদের বাদ দিয়ে অর্থাৎ ধর্ম ছাড়াই সরাসরি নৈতিক মুল্যবোধ বেছে নিতে পারি না? প্রশ্নগুলোতে আমি আবার ফিরে আসব সপ্তম অধ্যায়ে।

আমি সত্যি বিশ্বাস করিনা, গুলড তার 'রক অব এ্যাজেস' এ যা লিখেছেন তা আসলেই তিনি তা বোঝাতে চাইছেন। আমি যেমনটা বলেছি আগে, আমরা প্রত্যেকেই মাঝে মাঝে, অযোগ্য কিন্তু শক্তিশালী প্রতিপক্ষর প্রতি নম্র হতে অতিরিক্ত সচেষ্ট হবার অপরাধে অপরাধী, এবং গুলড এসব করার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আমি শুধু এটুকুই ভাবতে পারি । কিন্তু কল্পনা করা যেতে পারে যে, তিনি তার সুস্পষ্ট শক্তিশালী বক্তব্য দিয়ে আসলেই বোঝাতে চেয়েছিলেন, ঈশ্বরের অস্তিত্বর প্রশ্নে বিজ্ঞানের কোন কিছু বলার নেই: 'আমরা না পারবো প্রমান করতে, না পারবো অস্বীকার করতে; বিজ্ঞানী হিসাবে আমরা এ বিষয়ে কোন রকম মন্তব্যই করতে পারবো না' ; বক্তব্যটা শুনতে অ্যাগনোষ্টিকবাদের মত শোনাচ্ছে, স্থায়ী আর অপরিবর্তনশীল, পুরোপুরি প্যাপ বা পার্মানেন্ট অ্যাগনষ্টিসিজম ইন প্র্যাকটিস। এর অর্থই হচ্ছে এই প্রশ্ন সম্বন্ধে বিজ্ঞান এমন কি ' ' "সম্ভাবনা' সংক্রান্ত কোন মন্তব্যও করতে পারবে না। এই লক্ষনীয় সর্বত্রব্যাপী মিথ্যা ধারনাটি – অনেকেই যা যপ করেন মন্ত্রের মতন, কিন্তু তাদের মধ্যে কেউ কেউ, আমার সন্দেহ, ভালোমত ভেবেছেন ব্যাপারটা নিয়ে, আমি যাকে বলছি অ্যাগনষ্টিসিক বা অজ্ঞেয়বাদের দৈন্যতা। গুলড কিন্তু পক্ষপাতহীন অ্যাগনষ্টিক না বরং বেশ তীব্রভাবে কার্যত নিরীশ্বরবাদী। যদি ঈশ্বরের অস্তিত্ব আছে কিনা এ বিষয়ে আর কিছুই বলার নাই থাকে তাহলে কিসের উপর ভিত্তি করে তিনি এমন রায় দিলেন?

ঈশ্বর হাইপোথেসিসের বক্তব্য হল, যে বাস্তবতায় আমাদের বসবাস সেখানে একজন অতিপ্রাকৃত সত্বারও বসবাস, যিনি এই মহাবিশ্বর পরিকল্পক এবং সৃষ্টিকারী– নিদেনপক্ষে এই হাইপোথেসিসের বেশ কিছু সংস্করনে, তিনি এর রক্ষনাবেক্ষন করেন এবং এমনকি অলৌকিক ঘটনার মাধ্যমে হস্তক্ষেপ করে থাকেন, যা তার নিজের তৈরী

অতিবিশাল চিরঅপরিবর্তনশীল আইনেরই সাময়িক লঙ্ঘন। রিচার্ড সুইনবার্ণ, ব্রিটেনের নেতৃস্থানীয় ধর্মতত্ত্ববিদ এ বিষয়ে স্পষ্ট তার বই 'ইস দেয়ার এ গড' এ?:

ঈশ্বরবাদীরা ঈশ্বর সম্বন্ধে যা দাবী করে তা হল, তার ক্ষমতা আছে ছোট কিংবা বড় যে কোন কিছু সৃষ্টি, রক্ষনাবেক্ষন এবং ধ্বংস করার। এবং তিনি যে কোন বস্তুকে নাড়ান অথবা এর দ্বারা যে কোন কিছু করাতে পারেন। তিনি গ্রহদের এমনভাবে নাড়ান যে, কেপলার আবিষ্কার করেছিলেন তারা স্থির নয়, অথবা বারুদকে বিস্ফোরিত করেন যদি তা আমরা জলন্ত দিয়াশলাই কাঠির সংস্পর্শে নিয়ে আসি; অথবা তিনি গ্রহদের গতিপথ নাড়াতে পারেন অন্য কোন ভাবে, এবং নিয়ন্ত্রন করেন বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থসমুহ বিস্ফোরিত হবে কি হবে না, তাদের প্রকৃতি নিয়ন্ত্রনকারী পারিপার্শ্বিক পরিবেশ থেকে সম্পুর্ন ভিন্ন পরিস্থিতিতে। প্রকৃতির নিয়মকানুন দিয়ে ঈশ্বর সীমাবদ্ধ নন, তিনি তাদের তৈরী করেন, যদি ইচ্ছা পোষন করেন তিনি তাদের স্থগিত করতে পারেন।

যেন কত সহজ, তাই না, এটা যাই হোক না কেন, নোমা (NOMA) থেকে এটা অনেক আলাদা একটা প্রস্তাব। এবং তারা যা কিছু বলুক না কেন, যে সমস্ত বিজ্ঞানীরা এই 'পৃথক ম্যাজিস্টিরিয়া বা ক্ষমতার বলয়' তত্ত্বটির অনুগত তাদের উচিৎ হবে মেনে নেয়া যে, অতিপ্রাকৃত এবং বুদ্ধিমান সৃষ্টিকর্তা সহ একটি মহাবিশ্ব অবশ্যই অনেক পৃথক হবে সৃষ্টিকর্তাহীন কোন মহাবিশ্ব থেকে। এই দুটি হাইপোথিটিকাল মহাজগতের মধ্যে পার্থক্য নীতিগতভাবে তেমন মৌলিক না, যদিও ব্যবহারিক ক্ষেত্রে তা পরীক্ষা করা কঠিন। এবং এটা দুর্বল করে দেয় এই আত্মতুষ্টি প্রদানকারী চিত্তাকর্ষক বাণীটিকে: বিজ্ঞানকে অবশ্যই সম্পুর্ন নীরব থাকতে হবে ধর্মের মুল অস্তিত্ব সংশ্লিষ্ট দাবী প্রসঙ্গে। সৃজনশীল একজন অতিবুদ্ধিমান সৃষ্টিকর্তার উপস্থিতি বা অনুপস্থিতি প্রশ্নাতীতভাবে একটি বৈজ্ঞানিক প্রশ্ন এবং, যদিও ব্যবহারিক ক্ষেত্রে যার আপাতত – এখনও পর্যন্ত –মিমাংসা হয়নি। তেমনি সকল অলৌকিক কাহিনীগুলো, যার উপর ধর্ম নির্ভর করে অসংখ্য বিশ্বাসীদের চমক দিতে, তাদের সত্যতা বা মিথ্যার বিষয়টিও বৈজ্ঞানিক প্রশ্ন ।

জিসাস এর কি মানব কোন পিতা ছিলেন অথবা তার জন্মের সময় তার মা কি কুমারী ছিলেন? এসব বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবার মত যথেষ্ট পরিমান প্রমান এখনও অবশিষ্ট থাকুক বা না থাকুক, এখনও এই প্রশ্নগুলো সুনির্দিষ্টভাবে বৈজ্ঞানিক প্রশ্ন, যার নীতিগতভাবে নির্দিষ্ট একটি উত্তর আছে: হ্যা অথবা না। জিসাস কি ল্যাজারাসকে মৃত্যুশয্যা থেকে জাগিয়ে তুলেছিলেন, ক্রুশবিদ্ধ হবার তিন দিন পর তিনি নিজে কি মৃত্যু থেকে পুনরায় জীবিত হয়ে উঠেছিলেন? এধরনের প্রত্যেকটি প্রশ্নের একটি সুনির্দিষ্ট উত্তর আছে, আমরা সেই উত্তর ব্যবহারিক ক্ষেত্রে খুজে পাই কিংবা না পাই এবং এটি কঠোরভাবে বিজ্ঞানভিত্তিক উত্তর। যদি প্রাসঙ্গিক প্রমানাদি জোগাড় হবার অসম্ভব ঘটনা ঘটে কোনদিন, তবে এ বিষয়গুলো সমাধানের জন্য আমরা যে পদ্ধতি অবলম্বন করবো তা সম্পুর্নভাবে এবং বিশুদ্ধভাবে বিজ্ঞানভিত্তিক হবে। প্রসঙ্গটিকে একটু নাটকীয়ভাবে উপস্থাপন করা যাক, কল্পনা করুন, কোন অসাধারন ঘটনাচক্রে ফরেনসিক প্রত্নতত্ত্ববিদরা ডিএনএ প্রমান সংগ্রহ করতে সক্ষম হলেন, যা প্রমান করে, আসলে জিসাসের কোন জৈব মানুষ পিতা ছিল না। আপনি কি কল্পনা করতে পারবেন ধর্মীয় আত্মপক্ষসমর্থনকারীরা পুরো ব্যাপারটা তুচ্ছ বলে উড়িয়ে দেবে, সম্ভাব্য এমন কিছু বলে, যেমন,"কার কি এতে আসে যায়, বিজ্ঞানভিত্তিক প্রমান ধর্মতাত্ত্বিক প্রশ্নে সম্পুর্নরুপে অপ্রাসঙ্গিক। ভুল ম্যাজিষ্টারিয়াম! আমাদের ভাববার বিষয় হল চুড়ান্ত প্রশ্ন আর নৈতিক মুল্যবোধ। ডিএনএ কিংবা অন্য যে কোন বৈজ্ঞানিক প্রমানের এ বিষয়ে কোনভাবেই কোন ধরনের প্রভাব নেই।'

এই ধারনাটাই হাস্যকর। আপনি আপনার জীবন বাজী রাখতে পারেন, বৈজ্ঞানিক সাক্ষ্যপ্রমান যদি কোনটা পাওয়া যায়, তাহলে সেগুলো জোর করে দখল করে অনুকীর্তন করে তারা আকাশে উঠিয়ে দেবে। নোমার জনপ্রিয়তার কারন হচ্ছে শুধু মাত্র ঈশ্বর হাইপোথেসিস এর পক্ষে কোন প্রমান নেই বলেই। যে মুহুর্তে কোন ক্ষুদ্রতম প্রস্তাব বা প্রমান ধর্মবিশ্বাসের পক্ষে সাফাই গাইবে, ধর্মীয় আত্মপক্ষসমর্থনকারীরা নোমাকে জানালা দিয়ে ছুড়ে ফেলতে একমুহুর্তও দেরী করবে না। কিছু জ্ঞানী ধর্মতাত্ত্বিকদের বাদ দিলে (এবং এমন কি তারাও সাধারন মানুষদের অলৌকিক কাহিনী বলতে ভালোবাসেন তাদের সমাবেশের আকৃতি স্ফীত করতে), আমার সন্দেহ যে,এই কথিত

অলৌকিক ঘটনাগুলো অনেক বিশ্বাসীদের তাদের বিশ্বাসকে ধরে রাখার পেছনে শক্তিশালী কারন। এবং অলৌকিক ঘটনাগুলো, সংজ্ঞানুযায়ীই বিজ্ঞানের নীতি ভঙ্গ করে।

রোমান ক্যাথলিক চার্চ একদিকে যেমন কখনও মনে হয় নোমা হবার উষ্চাকাঙ্খা, কিন্তু আবার অন্যদিকে অলৌকিক ঘটনা ঘটানোকে সেইন্ট হবার জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয় নিয়ম বেধে দেয়। গর্ভপাতের বিরুদ্ধে তার অবস্থানের জন্য বেলজিয়ানদের প্রয়াত রাজা সেইন্ট হবার একজন প্রার্থী। বর্তমানে আন্তরিক অনুসন্ধান চলছে, মৃত্যুর পর তার উদ্দেশ্যে নিবেদন করা দোয়াকে কোন অলৌকিক নিরাময়ের সাথে সংশ্লিষ্ট করা যায় কিনা। আমি ঠাট্টা করছি না কিন্তু। এটাই হচ্ছে ঘটনা, সেইন্টদের কাহিনীগুলো কিন্তু এধরনেরই। আমার মনে হয় চার্চের মধ্যে বিজ্ঞ কারো কারো কাছে ব্যাপারটা বিব্রতকর। কেনই বা বিজ্ঞ বলে পরিচিত চার্চের কেউ চার্চের সাথে সংশ্লিষ্ট থাকবে কেন এটাই রহস্যজনক, অনেকটা ধর্মতাত্ত্বিকরা যে রহস্য উপভোগ করে সেরকম।

অলৌকিক ঘটনা সংক্রান্ত বিষয়ের মুখোমুখি হলে, অনুমান করা যায় গুলড এর মন্তব্য হবে এধরনের। নোমার মুল ব্যাপারটি হল যে, এটি একটা দুমুখো দরকষাকষি। যে মুহুর্তে ধর্ম বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে পা ফেলবে এবং বাস্তব পৃথিবীতে অলৌকিক ঘটনা দিয়ে অনধিকারচর্চা করা শুরু করবে, তখন গুলড যে ধর্মের পক্ষে ওকালতী করছে, ধর্মের আর সেই অর্থ থাকে না এবং তার অ্যামিকাবিলিস কনকর্ডিয়া বা বন্ধুসুলভ চুক্তি ভঙ্গ হয়ে যায়। লক্ষ্য করুন, যদিও অলৌকিক ঘটনাহীন ধর্ম যা গুলড সমর্থন করছেন, তা কিন্তু বেশীর ভাগই চার্চের পিউ বা পার্থনার মাদুরে বসা ধর্মপালনকারী ঈশ্বরবাদীরা আদৌ মানেন না। আসলেই এটা তাদের জন্য হবে বড় ধরনের হতাশাব্যান্জ্ঞক। ওয়ান্ডারল্যান্ডে পড়ে যাবার আগে তার বোনের বই নিয়ে অ্যালিস এর মন্তব্যটা একটু থাপ খাইয়ে নিয়ে বললে, ’কি দরকার এমন ঈশ্বরের, যে কোন অলৌকিক ঘটনা ঘটায় না আর প্রার্থনার জবাব দেয়না’; মনে আছে অ্যাম্ব্রোজ বিয়ের্স এর ’প্রার্থনা করা’ ক্রিয়াপদের বুদ্ধিদীপ্ত সংঙ্গাটি: ’শুধুমাত্র একজন আবেদনকারীর স্বার্থে, যে আত্মস্বীকৃত অযোগ্য, মহাজগতের সমস্ত আইন বাতিল করার জন্য আবেদন’; অনেক অ্যাথলেট আছেন যারা মনে করেন ঈশ্বর তাদের সাহায্য করেছে জয় লাভ করার জন্য –এমন প্রতিপক্ষর বিরুদ্ধে, যাকে দেখে মনে হতেই পারে ঈশ্বরের সহায়তা পাওয়ার ক্ষেত্রে সে কোন অংশে কম যোগ্য নয়। অনেক গাড়ীচালক বিশ্বাস করেন ঈশ্বর তাদের জন্য পার্কিং এর জায়গা সংরক্ষন করেছেন – স্পষ্টতই আরেকজনকে বঞ্চিত করে। এ ধরনের ঈশ্বরবাদ বিব্রতকরভাবে জনপ্রিয়, নোমার মত যুক্তিসঙ্গত (যদি উপরি উপরি) কিছু তাদের মনে দাগ কাটাবে এমন সম্ভাবনা কম।

তা সত্বেও চলুন আমরা গুলডকে অনুসরণ করে এবং আমাদের ধর্মকে খোসা ছাড়িয়ে ছাড়িয়ে একেবারে কোন ধরনের হস্তক্ষেপ করার ক্ষমতাহীন ন্যুনতম পর্যায়ে নিয়ে যাই: কোন অলৌকিক ঘটনা না, ঈশ্বর এবং আমাদের মধ্যে উভয় দিকে কোন ধরনের ব্যক্তিগত যোগাযোগ না, পদার্থবিজ্ঞানের নিয়ে কোন খেলাধুলা না, বিজ্ঞানের এলাকায় কোন অবৈধ প্রবেশ না। বড়জোর, একটু একাত্মবাদী ঈশ্বরের মত মহাবিশ্বের জন্মলগ্নে কিছু অবদান রাখা, যা পরবর্তীতে সময়ের পুর্নতার সাথে সাথে, নক্ষত্র, মৌলিক উপাদান,রসায়ন, গ্রহ সম্পুর্নতা পায় এবং জীবনের উদ্ভব এবং বিবর্তন হয়; নিঃসন্দেহে এটা যথেষ্ট পৃথকীকরন, নিশ্চই নোমা টিকে থাকতে পারবে এই পরিমিত এবং ভনিতামুক্ত ধর্ম নিয়ে।

বেশ, আপনি হয়ত তাই ভাববেন। কিন্তু আমার প্রস্তাব হল, এমনকি একজন হস্তক্ষেপ ক্ষমতাহীন, নোমা ঈশ্বর, যদিও সে আব্রাহামীয় ঈশ্বর অপেক্ষা অনেক কম হিংস্র এবং অমার্জিত, তা সত্বেও যখন আপনি তাকে সম্ফুর্ন পক্ষপাতহীন হিসাবে দেখবেন, দেখবেন এটি একটি বৈজ্ঞানিক হাইপোথিসিস। আমি সেই প্রসঙ্গেই ফিরে আসি: যে মহাবিশ্বে আমরা নিসঙ্গ শধু অন্যান্য ধীরে বিবর্তনমান বুদ্ধিমত্তা ছাড়া, তা অবশ্যই অনেক আলাদা, সেই মহাজগত থেকে, যেখানে একজন মূল পথপ্রদর্শক ছিলেন, যার বুদ্ধিদীপ্ত সৃষ্টিশীলতা সব অস্তিত্বের জন্য দায়ী। আমি মানছি, ব্যাবহারিক ক্ষেত্রে এমন দুটি মহাবিশ্বের মধ্যে পার্থক্য শনাক্ত করা কঠিন। তাসত্বেও, সম্পুর্নভাবে নির্দিষ্ট কিছু আছে সৃষ্টিকর্তার মৌলিক

ডিজাইন হাইপোথিসিসে এবং সমান ভাবে বিশেষ কিছু আছে এর একমাত্র বিকল্প হাইপোথিসিসে: একটু বিশাল অর্থে যা ক্রম বিবর্তন। দুটি হাইপোথিসিস আবার প্রায় অসমন্বয়যোগ্যভাবে পৃথক। অন্য আর কিছু যা পারে নি, একমাত্র বিবর্তন আসলেই সক্ষম হয়েছে, কোন কিছুর অস্তিত্বকে ব্যাখ্যা দিতে, যার অসম্ভবতা এত বেশী যে, প্রায়োগিক দিক থেকে ভাবলে হয়ত অস্তিত্বই থাকা কথা ছিল না। এবং তর্কের উপসংহার, যা আমি ৪র্থ অধ্যায়ে উল্লেখ করেছি, ঈশ্বর হাইপোথেসিস এর জন্য যা চূড়ান্তরুপে প্রাণনাশক।

দি গ্রেট প্রেয়ার এক্সপেরিমেন্ট:

অলৌকিক ঘটনার কেস স্টাডির একটা কৌতুকপ্রদ, যদিও হতাশাব্যান্জ্ঞক উদহারন হল, বিখ্যাত মহান প্রার্থনার পরীক্ষা: রোগীদের জন্য দোয়া করলে কি তা তাদের রোগ নিরাময়ে সহায়তা করে। রোগে আক্রান্ত ব্যাক্তিদের জন্য আরোগ্য লাভের উদ্দেশ্যে ব্যাক্তিগত ভাবে এবং আনুষ্ঠানিক উপাসনালয়ে সাধারনতঃ প্রার্থনা করা হয়ে থাকে। ডারউইনের আত্মীয় ফ্রান্সিস গালটন প্রথম বৈজ্ঞানিকভাবে গবেষনা করেছিলেন প্রার্থনার কার্য্যকারিতা নিয়ে। তিনি লক্ষ্য করেছিলেন প্রতি রোববারে ইংল্যান্ডের সকল চার্চে, সমবেত সবাই প্রকাশ্যে রাজপরিবারের সুস্বাস্থ্যর জন্য প্রার্থন করে থাকে। সুতরাং স্বভাবতই তারা স্বাভাবিকের চেয়ে বেশী স্বাস্থ্যবান থাকা উচিৎ,আমাদের তুলনায়, যাদের জন্য শুধুমাত্র কাছের মানুষ ছাড়া আর কেউ প্রার্থনা করেনা। গালটন বিষয়টি বিশ্লেষন করেন, এবং পরিসংখ্যানগত ভাবে কোন পার্থক্যই খুজে পেতে ব্যর্থ হন। তার উদ্দেশ্য হয়ত ছিল ব্যঙ্গাত্মক, এরপর যখন তিনি নিজে কিছু ভাগ ভাগ করা জমির জন্য প্রার্থনা করেন, প্রার্থনা করা জমিতে লাগানো গাছ, প্রার্থনা করা হয়নি জমি গাছ থেকে দ্রুত বাড়ে কিনা তা দেখতে (গাছ দ্রুত বাড়েনি); সাম্প্রতিক সময়ে, পদার্থবিদ রাসেল স্ট্যানার্ড (ব্রিটেনের সুপরিচিত তিন জন ধার্মিক বিজ্ঞানীর একজন) এধরনের একটি গবেষনার উদ্যোগে নেন –অবশ্যই টেম্পলটন ফাউন্ডেশনের অর্থ সাহায্যে, অসুস্থ রোগীদের জন্য প্রার্থনা করলে তাদের শারীরিক অবস্থার উন্নতি ঘটে,এই প্রস্তাবটিকে পরীক্ষা নীরিক্ষার মাধ্যমে যাচাই করার লক্ষ্যে[২৫]।

এধরনের গবেষনা নিয়মমাফিক করতে গেলে অবশ্যই ডাবল ব্লাইন্ড হতে হয়, এবং এই মানটা কঠোর ভাবে অনুসরন করতে হয়। বিভিন্ন গ্রুপে রোগীদের সম্পুর্ন র‍্যান্ডমভাবে বন্টন করা হয়, একটি পরীক্ষাধীন গ্রুপ (যারা প্রার্থনা পাবে), এবং একটি কন্ট্রোল গ্রুপ (কোন প্রার্থনা যারা পাবে না), রোগী, চিকিৎসক, সেবাপ্রদানকারী, এমনকি গবেষক, কারোরই জানার অনুমতি থাকবে না, কোন রোগী প্রার্থনা পাচ্ছে আর কে পাচ্ছে না। যারা পরীক্ষা মুলক প্রার্থনা করবেন তাদের অবশ্য আলাদা আলাদা করে নাম জানতে হবে, তাদের নাম ধরে প্রার্থনা করতে। নয়ত তারা কিভাবে জানবেন,তারা কার জন্য প্রার্থনা করছে। কিন্তু বিশেষ নজর রাখা হয়েছে যেন প্রার্থনাকারী যার জন্য প্রার্থনা করছেন,তার নামের প্রথম অংশ আর পদবীর আদ্যাক্ষরটি শুধু জানতে পারে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হচ্ছে যে, ঈশ্বরের পক্ষে এতটুকু তথ্যই যথেষ্ট, সঠিক হাসপাতালের শয্যা শনাক্ত করার জন্য।

এধরনের কোন গবেষনা করার পরিকল্পনার যথেষ্ট পরিমান ব্যাঙ্গাত্মক মন্তব্য আর বিদ্রুপের শিকার হওয়া স্বাভাবিক এবং যথেষ্ট পরিমান তা জুটেছিল এই প্রকল্পের ভাগ্য। আমি যতদুর জানি বব নিউহার্ট এটা নিয়ে কোন কৌতুক নক্সা করেননি, কিন্তু আমি তার কন্ঠ স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি:

কি বললে তুমি, ঈশ্বর, তুমি আমার নিরাময় করতে পারবে না কারন আমি কন্ট্রোল গ্রুপ?... ওহ, আমি বুঝেছি, আমার খালার দোয়া যথেষ্ট না। কিন্তু ঈশ্বর, আমার পাশের বিছানার মিঃ ইভান্স,... এটা কি ঈশ্বর, মিঃ ইভান্স প্রতি দিন এক হাজার প্রার্থনা পায়, কিন্তু ঈশ্বর মিঃ ইভান্স হাজার জনকে চেনেই না।.....ওহ, তারা শুধু জন ই বলে তাকে চেনে, কিন্তু ঈশ্বর কেমন করে তুমি বুঝলে তারা আসলে জন ইলসওয়ার্থীর জন্য দোয়া করছে না। ওহ ঠিক, তুমি তোমার অসীম জ্ঞান ব্যবহার করে বের করে ফেলেছ, কোন জন ই র জন্য দোয়া করা হচ্ছে। কিন্তু ঈশ্বর ....

সাহসের সাথে সব হাসি ঠাট্টা একপাশে সরিয়ে গবেষক দল তাদের কাজ করে গেলেন, বোস্টনের কাছে অবস্থিত মাইন্ড/বডি মেডিকেল ইন্সটিটিউটের হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ হার্বার্ট বেনসন নেতৃত্বে টেম্পলটন ফাউন্ডেশনের ২.৪ মিলিয়ন ডলার খরচ করে। টেম্পলটন ফাউন্ডেশনের এর সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে ইতিপূর্বে ডাঃ বেনসন মন্তব্য করেছিলেন: ’তিনি বিশ্বাস করেন চিকিৎসার ক্ষেত্রে ইন্টারসেশরী বা অপরের মঙ্গলের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা কার্যকারিতার উপযোগিতা ক্রমেই বাড়ছে’; সেকারনে নিশ্চিতভাবে গবেষনার লাগাম ছিল উপযুক্ত মানুষের হাতেই, যা সন্দেহবাদীদের প্রভাবে ক্ষতি হবার সম্ভাবনা ছিল খুব ক্ষীন। ডাঃ বেনসন এবং তার গবেষক দল, ছয়টি হাসপাতালে মোট ১৮০২ জন রোগীকে পর্যবেক্ষন করেন, এদের প্রত্যেকেরই করোনারী বাইপাস সার্জারী হয়েছিল। রোগীদের মোট তিনটি গ্রুপে ভাগ করা হয়, গ্রুপ ১: প্রার্থনা পায়, কিন্তু তারা তা জানতো না, গ্রুপ ২: (কন্ট্রোল গ্রুপ) কোন প্রার্থনা পায় না তারা এবং সেটা তাদের জানা ছিল না, গ্রুপ ৩: প্রার্থনা পায় এবং তারা তা জানতো। ইন্টারসেশরী প্রার্থনার কার্যকারিতা নিয়ে তুলনামুলক সমীক্ষা হয়, গ্রুপ ১ এবং ২ এর মধ্যে। গ্রুপ ৩ কে পরীক্ষা করা হয় যেহেতু তারা জানত মঙ্গল কামনা করে তাদের জন্য প্রার্থনা করা হচ্ছে ,এই তথ্যটি তাদের উপর কোন মনোদৈহিক কোন প্রভাব ফেলেছে কিনা তা দেখবার জন্য।

প্রার্থনা করেন তিনটি চার্চের সদস্যরা, একটি মিসিসিপিতে, একাটি ম্যাসাচুসেটস এ, একটি মিসৌরিতে অবস্হিত, প্রত্যেকটিরই অবস্থান হাসপাতাল থেকে দুরে। ইতিপূর্বে যা ব্যাখ্যা করেছি, প্রার্থনাকারী ব্যাক্তিকে, সে যার জন্য প্রার্থনা করবে তার নামের প্রথমাংশ, এবং পদবীর প্রথম আদ্যাক্ষরটি জানানো হয়েছিল। যত দুর সম্ভব ততদুর পর্যন্ত্য প্রতিটি গবেষনার বিভিন্ন পরিমাপের নির্দিষ্ট কিছু মানদন্ড থাকা উচিৎ, সেকারনে প্রত্যেক প্রার্থনাকারীকে তাদের প্রার্থনায় ’সফল সার্জারীসহ কোন জটিলতা ছাড়াই দ্রুত আরোগ্য লাভ করুক’ বাক্যটি যোগ করে নিতে বলা হয়েছিল।

এপ্রিল ২০০৬ এ আমেরিকান হার্ট জার্ণালে এই গবেষনার ফলাফল প্রকাশ করা হয় এবং ফলাফল খুব সুস্পষ্ট। প্রার্থনা পেয়েছে আর পাইনি এই দুই গ্রুপের মধ্যে কোন পার্থক্যই পাওয়া যায়নি। অবাক হবার ব্যাপার, পার্থক্য পাওয়া গেছে যারা জানতো তাদের জন্য প্রার্থনা করা হচ্ছে আর যারা কোনভাবে জানত না তাদের জন্য প্রার্থনা করা হয়েছে কিনা, কিন্ত প্রমানের মিলেছে উল্টোদিকে। যারা জানত তাদের দ্রুত আরোগ্যলাভের জন্য প্রার্থনা করা হচ্ছে, তারা অনেক বেশী জটিলতায় ভুগেছে অন্য গ্রুপের তুলনায়। ঈশ্বর কি তার অপছন্দ জানিয়ে একটু ধাক্কা দিলেন, এরকম সম্পুর্ন পাগলামীর একটা গবেষনা পরিচালনা করার জন্য। আরো সম্ভাব্য কারন মনে হয় যে ঐ রোগীরা যারা আগেই জানতো তাদের জন্য প্রার্থনা করা হচ্ছে, তারা হয়ত একধরনের বাড়তি চাপ অনুভব করেছিল: গবেষকদের ভাষায় যা পারফরমেন্স দুশ্চিন্তা। গবেষকদের একজন, ডাঃ চার্লস বেথেয়ার ভাষায়, হয়ত তারা ভেবেছে, আমি কি এতই অসুস্থ্য যে তাদেরকে প্রার্থনাকারীদের শরনাপন্ন হতে হয়েছে। বর্তমান মামলাপ্রিয় সমাজে, আশা করা কি খুব অতিরিক্ত মনে হবে যে, ঐ রোগীগুলোর জটিলতা হওয়ার কারন হচেছ তারা জানত তারা পরীক্ষামুলক প্রার্থনা পাচ্ছে। টেম্পলটন ফাউন্ডেশনের বিরুদ্ধে সবাই মিলে একটা ক্লাস অ্যাকশন মামলা করা সম্ভাবনা থেকে যায় ।

অবাক হবার কোন কারন ছিল না, যখন এই গবেষনা ধর্মতাত্বিকরা আগেই বিরোধিতা করেছিলেন কারন হয়ত এমন গবেষনার সম্ভাবনা আছে ধর্মকে উপহাসের বস্তুতে পরিণত করার। অক্সফোর্ডের ধর্মতাত্বিক রিচার্ড সুইনবার্ন, গবেষনার ফলাফল কাঙ্খিত না হবার পর, এর বিরোধিতা করে লিখেছিলেন এই যুক্তি দিয়ে, ঈশ্বর শধুমাত্র সেই সব প্রার্থনার জবাব দেন, যদি তা ভালো কোন উদ্দেশ্যে নিবেদন করা হয় [২৬]; শুধুমাত্র ডাবল ব্লাইন্ড স্টাডির জুয়ার ছক্কার দানের মত কারো জন্য প্রার্থনা না করে বরং অন্য কারো জন্য প্রার্থনা করা , কোন ভাল কারন না। ঈশ্বর খুব ভালোই বুঝতে পারেন ব্যাপারটা। এটাই আমার বক্তব্য ছিল বল নিউহার্টের ব্যঙ্গরচনাটির। সুইনবার্নও ঠিক একই কথা বলেছেন। কিন্তু তার রচনার অন্য অংশে সুইনবার্ন নিজেই স্যাটায়ারের উর্ধে। যদিও প্রথমবারের মত নয়, তিনি ঈশ্বর নিয়ন্ত্রিত এই পৃথিবীর দুঃখ কষ্টের যথার্থতা প্রমান করার চেষ্টা করেছেন:

আমার কষ্ট আমাকে সুযোগ করে দেয় সাহস আর ধৈর্য্য প্রদর্শনের জন্য। আপনাকে সুযোগ করে দেয় সমবেদনা প্রকাশ এবং আমার কষ্ট লাঘবের উদ্দেশ্যে উদ্যোগী হবার জন্য। এবং সমাজকে সুযোগ করে দেয়, বেছে নেবার জন্য,প্রচুর পরিমান অর্থ বিনিয়োগ করা হবে কি হবেনা, এটা কিংবা অন্য কোন একটা সুনির্দিষ্ট কষ্ট দুর করার উপায় আবিষ্কার করার উদ্দেশ্যে;যদিও মহান ঈশ্বর আমাদের দুঃখ সহ্য করতে পারেন না, তার বড় চিন্তার বিষয় হল, নিশ্চই আমরা প্রত্যেকে ধৈর্য্য, সমবেদনা, দয়া দেখাবো, এবং এভাবেই পবিত্র চরিত্র গঠন করবো। কিছু মানুষের অবশ্যই প্রয়োজন আছে তাদের নিজেদের সার্থেই অসুস্থ হবার জন্য আর কিছু মানুষের খুব বেশী আসলে প্রয়োজন আছে অসুস্থ হবার জন্য, যা অন্যদের প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করবে। একমাত্র এভাবেই কিছু মানুষ, তারা কি ধরনের মানুষ হতে চায়, সেই রকম হবার লক্ষ্যে গুরুত্বপুর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে পারে। অন্যদের জন্য, অসুস্থতা হয়ত তেমন কোন মুল্যবান বিষয় না।

এরকম অদ্ভুত যুক্তি,এত নিকৃষ্টভাবে ধর্মতাত্বিক মনের নমুনার প্রমান, আমাকে মনে করিয়ে দিল আরেকটি ঘটনার, যখন আমি সুইনবার্ণের সাথে এবং আরো আমাদের অক্সফোর্ড এর আরেক সহকর্মী প্রফেসর পিটার এটকিনস এর সাথে একটি টেলিভিশন প্যানেলে আলোচনায় আমন্ত্রিত হয়েছিলাম। এক পর্যায়ে সুইনবার্ণ হলোকষ্টের যথার্থতা প্রমান করার চেষ্টা করছিলেন, এই যুক্তিতে যে, হলোকস্ট নাকি ইহুদীদের সাহসী আর মহান হবার চমৎকার সুযোগ করে দিয়েছে। পিটার এটকিনস দারুনভাবে গর্জে উঠেছিলেন, ‘আপনি যেন নরকে পচেন’; এই বাদানুবাদটি অবশ্য চুড়ান্ত সম্প্রচারিত অনুষ্ঠান থেকে সম্পাদিত করা হয়েছিল। সুইনবার্ণের এই বক্তব্য তার স্বভাবসুলভ ধর্মতত্ত্বের চিহ্ন বহন করে; প্রায় একই রকম মন্তব্য তিনি হিরোশিমা নিয়ে করেছিলেন তার ’দি এক্সিসটেন্স অব গড’ (২০০৪) বইটিতে ২৬৪ নং পৃষ্ঠায়,মনে করুন হিরোশিমার পারমানবিক বোমায় যদি একজন মানুষ কম পুড়তেন,তাহলে সেখানে সাহস এবং সমবেদনার সুযোগও খানিকটা কমে যেত...’

ধর্মতাত্বিক যুক্তি প্রয়োগের আরেকটি উদহারন দেখা যায় সুইনবার্ণের লেখার তার আগের মন্তব্যের খানিকটা পরেই। তিনি ঠিকই প্রস্তাব করেছেন যে, ঈশ্বর যদি তার নিজের অস্তিত্ব প্রমান দিতে চাইতেন, পরীক্ষাধীন বনাম কন্ট্রোল গ্রুপের হৃদরোগীদের নিরাময়ের পরিসংখ্যান সামান্য প্রভাবিত করা ছাড়া অবশ্যই আরো ভালো কোন পথ বেছে নিতেন। যদি ঈশ্বররে অস্তিত্ব থাকে এবং আমাদেরকে তা তিনি প্রমান করে দেখাতে চাইতেন, তাহলে তিনি ’সারা পৃথিবী ভরে দিতেন নানা অলৌকিকতায়’; কিন্তু তারপরই সুইনবার্ণ তার তার পছন্দের কথাটা বললেন,’ ঈশ্বরের অস্তিত্বের স্বপক্ষে ইতিমধ্যেই অনেক প্রমান আছে, অতিরিক্ত বেশী প্রমান আমাদের জন্য ভালো নাও হতে পারে’; অতিরিক্ত বেশী প্রমান আমাদের জন্য ভালো নাও হতে পারে,বাক্যটা আবার পড়ুন। ’অতিরিক্ত বেশী প্রমান আমাদের জন্য ভালো নাও হতে পারে’; রিচার্ড সুইনবার্ন ব্রিটেনের সবচেয়ে সন্মানজনক ধর্মতত্ত্বর প্রফেসরশীপ থেকে সম্প্রতি অবসর নিয়েছেন এবং ব্রিটিশ একাডেমীর একজন ফেলো। আপনি যদি ধর্মতাত্বিক চান, তাহলে এর চেয়ে বিশিষ্ট বেশী কেউ হতে পারে না। হয়ত আপনি চান না কোন ধর্মতাত্বিক।

শুধুমাত্র সুইনবার্ন একমাত্র ধর্মতাত্বিক নন যিনি এই গবেষনার আশানুরুপ ফলাফল না হবার কারনে এটি অস্বীকার করেছেন। রেভারেন্ড রেমন্ড জে লরেন্সকে নিউ ইয়র্ক টাইমস এ বেশ অনেকটুকু জায়গা দিয়েছিল মন্তব্য প্রতিবেদনের জন্য, কেন দায়িত্বশীল ধর্মীয় নেতারা ’স্বস্তির নিঃশ্বাস’ ফেলবেন, যে কারো জন্য বিশেষভাবে করা প্রার্থনা তার আরোগ্য লাভের উপর যে কোন প্রভাব নেই সে কারনে [২৭]; তিনি কি অন্য সুরে কথা বলতেন, যদি বেনসনের গবেষনা প্রার্থনার ক্ষমতা প্রমানে সফল হত। হয়ত না। কিন্তু আপনি নিশ্চিৎ থাকতে পারেন অনেক ধর্মতাত্বিক বা পাস্টর তাই করতেন। রেভারেন্ড রেমন্ড জে লরেন্স এর লেখাটি প্রধানতঃ মনে রাখার মত কারন মুলতঃ নিম্নলিখিত ঘটনাটি তার লেখায় প্রকাশের জন্য: ‘সম্প্রতি, আমার এক সহকর্মী আমাকে বলেছিলেন, একজন নিষ্ঠাবান,শিক্ষিত মহিলা, ডাক্তারের বিরুদ্ধে তার স্বামীর চিকিৎসায় অবহেলা করেছেন বলে অভিযুক্ত করেছেন। মহিলার দাবী, তার স্বামী মুমুর্ষ থাকাকালীন ডাক্তার ব্যর্থ হয়েছে তার স্বামীর জন্য প্রার্থনা করতে’।

অন্য ধর্মতত্ত্ববিদরাও নোমা অনুপ্রানিত সন্দেহবাদীদের সাথে যোগ দিয়েছেন এই বলে যে, এধরনের প্রার্থনার কার্যকারিতা সংক্রান্ত গবেষনা অর্থের অপচয় মাত্র, কারন অতিপ্রাকৃত কোন কিছুর প্রভাব এর সংজ্ঞানুযায়ীই বিজ্ঞানের এখতিয়ারের বাইরে। কিন্তু টেম্পলটন ফাউন্ডেশন যখন এই গবেষনা অর্থায়নের সিদ্ধান্ত নেয়, তখন তারা কিন্তু মেনে নেয়,কারো মঙ্গলের জন্য প্রার্থনার কথিত ক্ষমতা প্রমানের বিষয়টা নীতিগতভাবে অন্ততঃপক্ষে বিজ্ঞানের আওতার পড়ছে। এ বিষয়ে ডাবল ব্লাইন্ড স্টাডি পরিকল্পনা করা হয়, গবেষনা করাও হয়। তাদের গবেষনায় এর স্বপক্ষে ফলাফল হতে পারতো। এবং যদি তাই হত, তাহলে কল্পনা করুন, ধর্মের পক্ষ সমর্থনকারী এমন কাউকে কি খুজে পাওয়া যেত, যারা সেই ফলাফল প্রত্যাখান করতেন কারন ধর্মীয় ব্যাপারে বৈজ্ঞানিক গবেষনার কোন সুযোগ নেই। অবশ্যই না।

বলাবাহুল্য, পরীক্ষাটির নেতিবাচক ফলাফল অবশ্যই বিশ্বাসীদের নাড়া দেবে না। বব বার্থ, মিসৌরির প্রেয়ার মিনিষ্ট্রির স্পিরিচুয়াল ডিরেক্টর, যিনি এই গবেষনায় প্রার্থনাকারী যোগান দিয়েছিলেন, বলেন: ‘বিশ্বাসী মানুষের কাছে এই গবেষনা অবশ্যই কৌতুহলোদ্দীপক, কিন্তু আমরা অনেকদিন থেকেই প্রার্থনা করে আসছি এবং আমরা দেখেছি প্রার্থনা কাজ করে এবং প্রার্থনা আর আধ্যাত্মিকতা বিষয়ে গবেষনাতো কেবল শুরু হলো’; হ্যা ঠিকই, সেটাই :আমরা আমাদের ’বিশ্বাস’ থেকেই জানি প্রার্থনা কাজ করে, যদি এর পক্ষে প্রমান না পাওয়া যায়, আমরা সাহসের সাথে এগিয়ে যাবো যতদিন পর্যন্ত না আমরা যে রকম ফলাফল চাই তেমনটি পাই।

বিবর্তনবাদীদের ‘নেভিল চেম্বারলেইন’ তোষনবাদী গোষ্ঠী:

যে সকল বিজ্ঞানীরা যারা দাবী করেন, নোমা (NOMA) -ঈশ্বর হাইপোথেসিস, বিজ্ঞান দ্বারা অনাক্রম্য একটি বিষয়, তাদের একটি সম্ভাব্য অভিসন্ধি – হলো বিশেষভাবে আমেরিকার রাজনৈতিক অ্যাজেন্ডা বা কার্য্যক্রম, যা আসলে উস্কে দিয়েছে লোকরন্জ্ঞনবাদী বা পপুলিষ্ট ক্রিয়েশিনিজম বা সৃষ্টিবাদের হুমকি। যুক্তরাষ্ট্রের অনেক জায়গায় সুসংগঠিত, রাজনৈতিক যোগাযোগসম্পন্ন ও সর্বোপরি অর্থ সাহায্যপুষ্ট শক্তিশালী প্রতিপক্ষ দ্বারা বিজ্ঞান এখন আক্রান্ত এবং বিবর্তন শিক্ষা এ যুদ্ধের একবারে সামনের ট্রেন্চ এ অবস্থান করছে। বিজ্ঞানীরা সহানুভুতি পেতেই পারেন,কারন তারা ভীত, এছাড়া বেশীর ভাগ গবেষনার অর্থ যোগান দেয় মুলতঃ সরকার এবং নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের জবাবদিহি করতে হয়, যেমন তাদের ভোট দেয়া অজ্ঞ, কুসংস্কারাচ্ছন্ন জনগোষ্ঠীর কাছে, ঠিক তেমনই শিক্ষিত সুবিদিত সমাজের কাছেও।

এধরনের হুমকির মুখে, একটি বিবর্তনবাদ রক্ষাকারী লবীও গড়ে উঠেছে, সবচেয়ে উল্লেখযোগ্যটির প্রতিনিধিত্ব করে ন্যাশনাল সেন্টার ফর সাইন্স এডুকেশন (NCSE)। এর নেতৃত্বে আছেন ইউজেনি স্কট, বিজ্ঞানের জন্য অক্লান্ত কর্মী, যিনি সম্প্রতি একটি বইও প্রকাশ করেছেন, এভল্যুশন ভারসাস ক্রিয়েশনিজম। এনসএসই র অন্যতম প্রধান রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হলো সুবুদ্ধিসম্পন্ন ধর্মীয় মতামত গুলোকে জয় করা এবং সংগঠিত করা । এরা হল মুলধারার চার্চে যাতায়াতকারী নারী এবং পুরুষ, যাদের বিবর্তনবাদের সাথে কোন বিরোধ নেই, এবং তাদের ধর্মীয় বিশ্বাসের ক্ষেত্রে তারা বিষয়টিকে অপ্রাসঙ্গিক (অথবা কোন অদ্ভুত উপায়ে তাদের বিশ্বাসের সহায়ক) মনে করে । এই সব মুলধারার প্রাদ্রী, ধর্মতাত্ত্বিক, এবং উদার মনোভাবাপন্ন ধর্মবিশ্বাসীরা, যারা বিব্রত সৃষ্টিবাদ নিয়ে, কারন তা ধর্মের সনাম কলুষিত করেছে, এদের কাছে বিবর্তনবাদ রক্ষাকারী লবী চেষ্টা করছে এর পক্ষে মতামত গড়বার। এবং সেটা করার একটা উপায় হল, তাদের তুষ্ট করার অতিরিক্ত চেষ্ঠায় নোমাকে পৃষ্ঠপোষকতা করা –স্বীকার করা বিজ্ঞান আদৌ ক্ষতিকর কিছু না, কারন ধর্মের দাবী থেকে বিজ্ঞান সম্পুর্ন বিচ্ছিন্ন।

এই গোষ্ঠীর, যাকে আমরা বিবর্তনবাদীদের ‘নেভিল চেম্বারলেইন’ গোষ্ঠী বলতে পারি,আরেকজন বিখ্যাত ব্যাক্তি হলেন দার্শনিক মাইকেল রুজ। সৃষ্টিবাদের বিপক্ষে রুজ একজন কার্য্যকর যোদ্ধা, কাগজে এবং আদালত, উভয় ক্ষেত্রে

[২৮]; তিনি নিজেকে একজন নাস্তিক হিসাবে দাবী করেন, কিন্তু প্লেবয় পত্রিকায় তার প্রকাশিত রচনায় তার মতামত প্রকাশ পায় এভাবে:

> আমরা যারা বিজ্ঞানকে ভালোবাসি তাদের অবশ্যই অনুধাবন করতে হবে আমাদের শত্রুর শত্রু কিন্তু আমাদের বন্ধু। প্রায়ই বিবর্তনবাদীরা সময় নষ্ট করে তাদের সম্ভাব্য মিত্র পক্ষকে অপমান করার লক্ষ্যে। ব্যপারটা বেশী সত্য ধর্মনিরেপক্ষ বিবর্তনবাদীদের ক্ষেত্রে। সৃষ্টিবাদীদের প্রতিরোধ করার চেয়ে নিরীশ্বরবাদীদের বেশী সময় কাটানো উচিৎ সহানুভুতিশীল খৃষ্টানদের বোঝাতে। যখন দ্বিতীয় পোপ জন পল ডারউইনবাদকে অনুমোদন করে চিঠি লিখেছিলেন, রিচার্ড ডকিন্স এর প্রত্যুত্তর ছিল পোপ ভন্ডামী করছেন এবং তিনি আসলেই বিজ্ঞানের ব্যাপারে এতটা সৎ হতেই পারেন না এবং এভাবে স্পষ্ট যে ডকিন্স নিজেই বরং পছন্দ করেন একজন সৎ মৌলবাদীকে।

শুধুমাত্র বিশুদ্ধ কৌশলগত দিক থেকে, হিটলারের বিরুদ্ধে যুদ্ধজোট করার সাথে, রুজের অগভীর আবেদনটার তুলনাটি আমি বুঝতে পারি: উইনস্টোন চার্চিল বা ফ্রাঙ্কলিন রুজভেল্ট কেউই স্ট্যালিনকে বা কমিউনিজম পছন্দ করতেন না, কিন্তু তারা বুঝতে পেরেছিলেন, হিটলারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হলে তাদের সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে কাজ করতে হবে। সেরকমভাবে সব ধরনের বিবর্তনবাদীদের একসাথে কাজ করতে হবে সৃষ্টিবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য। কিন্তু আমি সবশেষে আমার সহকর্মী শিকাগোর জীনতত্ববিদ জেরী কয়েনের সাথে একমত, যিনি লিখেছিলেন রুজ,

> এই দ্বন্দের মুল কারনটাই বুঝতে ব্যর্থ হয়েছেন। এটা শুধুমাত্র বিবর্তনবাদ বনাম সৃষ্টিবাদ না। ডকিন্স বা উইলসনের (ই ও উইলসন, প্রখ্যাত হার্ভার্ড জীববিজ্ঞানী) মত বিজ্ঞানীদের কাছে, আসল যুদ্ধ হলো যুক্তিবাদ বনাম কুসংস্কার। বিজ্ঞান হচ্ছে যুক্তিবাদের একধরনের রুপ, অপরদিকে ধর্ম হচ্ছে কুসংস্কারের সবচেয়ে পরিচিত রুপ। তারা যাকে আরো বড় শত্রু হিসাবে দেখেন: ধর্ম, সৃষ্টিবাদ হচ্ছে ধর্মের একটা উপসর্গ মাত্র । ধর্ম কিন্তু সৃষ্টিবাদ ছাড়াই টিকে থাকতে পারবে, কিন্তু সৃষ্টিবাদ ধর্ম ছাড়া তার অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে পারবে না [২৯]।

সৃষ্টিবাদীবাদীদের সাথে আমার একটা মিল আছে, তারা আমার মতই এবং 'চেম্বারলেইন গ্রুপের' মত নয়, নোমা কিংবা এর পৃথক ম্যাজিস্টেরিয়াকে বর্জন করেছে। বিজ্ঞানের ক্ষেত্র পৃথক এটা মানা তো দুরের কথা, তাদের সবচেয়ে পছন্দের কাজ এর মধ্যে নাক গলাতে। তাদের যুদ্ধ কৌশলও নোংরা। সৃষ্টিবাদীদের উকিলরা আমেরিকার গ্রাম আর মফস্বল শহরগুলোতে বিভিন্ন আদালতে বেছে বেছে সেই সব বিবর্তনবাদীদের খুজে বের করে যারা প্রকাশ্যে নাস্তিক। আমি জানি, যদিও বিরক্তকর, আমার নামও এভাবে ব্যবহার করা হয়। এটা বেশ কার্য্যকর একটা কৌশল কারন নির্বাচিত জুরীর মধ্যে এমন ব্যাক্তিরাদের থাকার সম্ভাবনা বেশী, যারা এমন বিশ্বাস নিয়ে প্রতিপালিত হয়েছেন যে, নাস্তিকরা যেন পুনর্জন্ম পাওয়া শয়তান, শিশুকামী বা 'সন্ত্রাসী'র মত তাদের অপরাধ (সালেম এর ডাইনী এবং ম্যাকআর্থারের কমি (কমিউনিষ্টদের মত) আধুনিক সংস্করণ); যে কোন সৃষ্টিবাদীদের আইনজীবি যে আমাকে সাক্ষী হিসাবে দাড় করাবে, সাথে সাথেই সে জুরীদের মন জয় করে নেবেন, শুধু আমাকে জিজ্ঞেস করে: 'বিবর্তন সম্বন্ধে আপনার জ্ঞ্যানলাভ কি আপনাকে নাস্তিক হতে প্রভাবিত করেছে?' আমাকে এর উত্তরে বলতে হবে হ্যা, ব্যাস ঐ এক কথাতে জুরীরা আমার বিপক্ষে চলে যাবে। কিন্তু এর বীপরিতে, ধর্মনিরপেক্ষ দিক থেকে আইনসিদ্ধ সঠিক উত্তর হবে: 'আমার ধর্ম বিশ্বাস, বা অবিশ্বাস আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার, এটা আদালতের যেমন বিষয় না, তেমন বিজ্ঞানের সাথে কোনভাবে এর যোগসুত্র নেই।' আমি সততার সাথে এভাবে কথাগুলো বলতে পারবো না, কারনগুলো, আমি ৪র্থ অধ্যায়ে ব্যাখা করেছি।

গার্ডিয়ান পত্রিকার সাংবাদিক ম্যাডেলাইন বান্টিং 'হোয়াই দি ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইন লবী থ্যাঙ্কস গড ফর রিচার্ড ডকিন্স' বা 'কেন ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইন লবী রিচার্ড ডকিন্স এর জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেবে' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন [৩০]; মাইকেল রুজ ছাড়া এটি লেখার সময় তিনি আরো কারো সাথে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেছেন এমন নিদর্শন লেখাটিতে পাওয়া যায় না; মনে হতে পারে আর্টিকেলটি ছায়ালেখক মাইকেল রুজ (নিউ

ইয়র্ক টাইমস এ ২২ জানুয়ারী ২০০৬ এ প্রকাশিত ‘হোয়েন কসমোলজী কোলাইড’ প্রবন্ধটি নিয়েও একই কথা বলা যেতে পারে; এটি লিখেছিল সন্মানিত (এবং ভালোভাবে যাকে এ বিষয়ে অবগত করা হয়েছিল) জুডিথ শুলেভিৎজ। জেনারেল মন্টোগোমারীর যুদ্ধের প্রথম রুল ছিল ’মস্কোর দিকে মার্চ না করা’. হয়তো বিজ্ঞান জার্নালিজমের এরকম একটা প্রথম রুল থাকা দরকার: মাইকেল রুজ ছাড়া অন্ততপক্ষে একজন ব্যক্তির সাক্ষাৎকার নেয়া’; ড্যান ডেনেট এর জবাব দেন লাগসই ভাবে আংকেল রেমুস [৩১] এর লোককাহিনীর চতুর খরগোশের কথা উল্লেখ করে:

আমার কাছে মজার ব্যাপার হলো , দুইজন ব্রিট –ম্যাডেলাইন বান্টিং এবং মাইকেল রুজ –আমেরিকান লোকগাথার সবচেয়ে বিখ্যাত ছলচাতুরীর ফাদে পড়েছেন (কেন ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইন লবী রিচার্ড ডকিন্স এর জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেবে, মার্চ ২০০৭); যখন ব্রেয়ার খরগোশ শিয়ালের হাতে ধরা পড়লো, সে শিয়ালের কাছে মিনতি করলো, ’ওহ, দয়া করো ব্রেয়ার শিয়াল, যাই করো না কেন, আমাকে ঐ জঘন্য ব্রায়ার (এক ধরনের কাটাযুক্ত কান্ডের ছোট গাছ) ঝোপে ছুড়ে ফেল না’, শিয়াল ঠিক সেই কাজটা করার পর, খরগোশ নিরাপদে পালিয়ে গেল। যখন আমেরিকান প্রচারনাবিদ উইলিয়াম ডেম্বস্কী রিচার্ড ডকিন্সকে বিদ্রুপ করে লেখে এই বলে যে, তিনি যেন ভালো কাজ করে যেতে থাকেন ইন্টিলিজেন্ট ডিজাইন পক্ষে, বান্টিং আর রুজ সেই ফাদে পা দিয়েছেন, ওহ ! গলি, ব্রেয়ার শিয়াল, আপনার এই সুষ্পষ্ট দাবীটা –বিবর্তন সংক্রান্ত জীববিদ্যা,সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরের ধারনাকে মিথ্যা প্রমান করেছে– কিন্তু ক্লাসরুমে বিজ্ঞান শিক্ষাকে হুমকির মুকে ঠেলে দেবে, কারন এ বিষয়ে শিক্ষা প্রদান করলে আবার চার্চ আর রাষ্ট্রের পৃথকীকরন বিষয়টিকে লঙ্ঘন করা হবে! ঠিক, আপনাদের উচিৎ হবে শারীরবৃত্তীয় বিদ্যাকে একটু রেখে ঢেকে পড়াতে, কারন এটিতো আগেই প্রমান করেছে কুমারী কারো পক্ষে গর্ভধারন অসম্ভব..... [৩২]

এই পুরো ব্যপারটা, এমনকি স্বতন্ত্রভাবে ব্রায়ার প্যাচে ব্রেয়ার খরগোশ বিষয়টির অবতারনা করে বিষদ আলোচনা করেছেন জীববিজ্ঞানী পি যে মায়ারস, যার ফ্যারিঙ্গুলা ব্লগ থেকে আস্থার সাথে পরামর্শ নেয়া যেতে পারে তার সুতীক্ষ্ম প্রজ্ঞার জন্য [৩৩]।

আমি কিন্তু বোঝাতে চাইছি না, তোষনকারী লবীর আমার সহকর্মীরা সবাই আবশ্যই অসৎ। তারা হয়ত আন্তরিকভাবেই নোমাতে বিশ্বাস করেন, যদিও আমি বাধ্য হই চিন্তা করতে, আসলে বিষয়টি নিয়ে তারা কতটা গভীরভাবে ভেবেছেন এবং তারা কিভাবে তাদের অর্ন্তদ্বন্দকে সামাল দিতে পেরেছেন। আপাতত বিষয়টি নিয়ে আর নাই বা ভাবি কিন্ত কেউ যদি ধর্মসংক্রান্ত বিষয়ে বিজ্ঞানীদের প্রকাশিত বক্তব্য বোঝার চেষ্ঠা করেন, তারা এর পেছনে রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটটা যেন না ভুলে যান: একটা পরাবাস্তব সাংস্কৃতি যুদ্ধ এখন যুক্তরাষ্ট্রকে দ্বিধাবিভক্ত করে ফেলেছে। নোমা ধরনের তোষনবাদ আবার পরের অধ্যায়গুলোতে আলোচনায় আসবে। এখানে, আমি বরং আবার অ্যাগনষ্টিসিজমে এবং আমাদের অজ্ঞতাকে ধীরে ধীরে ভেঙ্গে ফেলে এবং পরিমাপসম্ভব এমন একটা স্তরে ঈশ্বরের অস্তিত্ব বা অনস্তিত্ব সংক্রান্ত অনিশ্চয়তাকে নিয়ে আসার সম্ভাবনায় ফিরে আসি।

ছোট সবুজ মানুষের দল:

ধরা যাক, বার্ট্রান্ড রাসেল এর রুপক কাহিনীর বিষয় মহাশুন্যে চায়ের পট না বরং মহাশুন্যে জীবনের অস্তিত্ব নিয়ে –কার্ল সাগানের সেই স্মরনীয় মন্তব্য ‘গাট দিয়ে চিন্তা করার প্রত্যাখানে’র বিষয়। আবারো আমরা বিষয়টিকে মিথ্যা প্রমান করতে পারবো না এবং একমাত্র যৌক্তিক অবস্থান হল অ্যাগনষ্টিসিজম বা অজ্ঞেয়বাদ। কিন্তু এই হাইপোথিসিসটি আর কোন হালকা বিষয় থাকে না আর। আমরা কিন্তু সাথে সাথেই একেবারে চুড়ান্ত অসম্ভাব্যতার ঘ্রান পাই না এখন। আমরা বেশ কৌতুহল উদ্দীপক একটা বিতর্ক অবতারনা করতে পারি অসমাপ্ত এই অবধি পাওয়া নানা সাক্ষ্যপ্রমানের ভিত্তিতে এবং আমরা সেই প্রমানগুলো লিপিবদ্ধ করতে পারি যৌক্তিক উপায়ে যেগুলো আমাদের অনিশ্চয়তাকে কমাতে পারে। আমরা কিন্তু প্রচন্ড ক্ষুদ্ধ হবো, যদি আমাদের সরকার ব্যায়বহুল টেলিস্কোপের

জন্য অর্থ বিনিয়োগ করে যার একমাত্র কাজ হবে মহাশুন্যে চায়ের পটের সন্ধান করা। কিন্তু আমরা সেটি (SETI) বা সার্চ ফর এক্সট্রা টেরেস্টিয়াল ইন্টেলিজেন্স – 'যার মুল কাজ বুদ্ধিমান ভীনগ্রহবাসী বুদ্ধিমান সত্বার কোন সংকেত খুজে পাওয়ার আশায় রেডিও টেলিস্কোপ দিয়ে মহাশুন্যর বিভিন্ন অংশ পর্যবেক্ষন করা' – এর ক্ষেত্রে অর্থ ব্যায় করার ব্যপারটাকে কিন্তু অন্যভাবে মুল্যায়ন করতে পারি।

আমি কার্ল সাগানের প্রশংসা করি ভীনগ্রহে প্রানের অস্তিত্বের ব্যাপারে আনুমানিক অনুভুতি নির্ভর কোন মন্তব্য করতে অস্বীকার করার জন্য। কিন্তু যে কারো পক্ষে (এবং সাগানও তাই করেছিলেন) এরকম একটা সম্ভাবনার পরিমাপ করার জন্য, আমাদের যা জানা দরকার, তার একটা সংযমী মুল্যায়ন করা সম্ভব। এটা শুরু হতে পারে আমাদের অজানা বিষয়গুলোর একটা তালিকা প্রস্তুত করার মাধ্যমে। যেমন, বিখ্যাত ড্রেক সমীকরন, যা পল ডেভিসের ভাষায় সম্ভাবনা সংগ্রহ করে। সমীকরনটির মুল বক্তব্য হল, স্বতন্ত্রভাবে বিবর্তিত সভ্যতার সংখ্যা পরিমাপের জন্য আমাদের অবশ্যই সাতটি সংখ্যাকে একসাথে পূরণ করতে হবে। এদের মধ্যে আছে, মোট নক্ষত্রর সংখ্যা, প্রতিটি নক্ষত্রের পৃথিবীর মত গ্রহর সংখ্যা এবং এর সম্ভাবনা, এগুলো এবং এছাড়া অন্য সংখ্যাগুলো যার তালিকা আমি উল্লেখ করার দরকার নেই কারন আমি যা বোঝাতে চাচ্ছি তা হলো এসবই অজানা অথবা পরিমাপ করা হয়েছে অনেক বেশী অনুমানের উপর ভিত্তি করে। যখন অনেকগুলো সংখ্যা হয় সম্পুর্ন অজানা অথবা পরিমাপ করা হয় অনেক বড় ভ্রান্তির মার্জিন রেখে, তার ফলাফল –ভীনগ্রহের সভ্যতার সম্ভাব্য সংখ্যায় –এতো বিশালাকৃতির ভুল থাকে যে, অ্যাগনষ্টিকতাবাদকে মনে হয় বেশী যুক্তিযুক্ত, যদিও তা একমাত্র বিশ্বাসযোগ্য অবস্থান নয়।

১৯৬১ সালে প্রথম যখন তিনি সমীকরনটি লিখেছিলেন, তখনকার তুলনায় বর্তমানে ড্রেক সমীকরনের কিছু সংখ্যা কিন্তু ইতিমধ্যে আমাদের জন্য কম অজানা এখন। সেই সময় আমাদের সৌরজগতই ছিল একমাত্র জানা গ্রহ মন্ডলী যা কেন্দ্রীয় একটি নক্ষত্রর চারপাশে ঘুরছে, এছাড়া ছিল বুহস্পতি আর শনির উপগ্রহ মন্ডল সাদৃশ্য কিছু উদহারন। মহাবিশ্বে এধরনের মন্ডলের সংখ্যা সম্বন্ধে আমাদের সবচেয়ে ভালো ধারনাটাটি ভিত্তি হল তাত্বিক মডেলগুলো, যার সাথে সংযুক্ত আরেকটু বেশী অনানুষ্ঠানিক সাধারণত্বর মুলনীতি বা প্রিন্সিপাল অব মিডিওক্রিটি : আমরা ঘটনাক্রমে যেখানে বসবাস করি তার বিশেষ কোন অসাধারনত্ব নেই – এই অনুভুতিটা (কোপার্নিকাস, হাবল, এবং অন্যান্যদের অস্বস্তিকর ইতিহাসের শিক্ষা থেকে জন্ম নেয়া); দুর্ভাগ্যজনক যে, প্রিন্সিপাল অব মিডিওক্রিটিকে আবার দুর্বল করে দিয়েছে অ্যানথ্রপিক তত্ব (অধ্যায় ৪ দ্রষ্টব্য); যদি আমাদের সৌরজগত মহাবিশ্বে সত্যি একটি মাত্র হয়ে থাকে, তার সঠিক কারন হলো, সেখানে আমরা, যারা এসব বিষয় নিয়ে ভাবনাচিন্তা করে, সেই আমাদের বসবাস। আমাদের অস্তিত্বের গুঢ় সত্যটাই অতীতমুখী পর্যালোচনা সাপেক্ষে নির্ধারন করে দেয় যে, আমাদের বসবাস খুবই অসাধারন একটি স্থানে।

সৌরজগতের সর্বব্যাপিতা সম্বন্ধে বর্তমানে আমাদের পরিমাপ কিন্তু আর আগের মতন প্রিন্সিপাল অব মিডিওক্রিটির উপরে নির্ভর করে নেই; প্রত্যক্ষ প্রমানের দ্বারা তথ্যসম্মৃদ্ধ। কমতের এর পজিটিভিজমের উচিৎ প্রতিফল, স্পেক্ট্রোস্কোপ আবারও প্রমান করেছে। আমাদের টেলিস্কোপে এখনও এতটা শক্তিশালী হয়নি যে নক্ষত্রের চারপাশে গ্রহদের সরাসরি দেখতে সক্ষম। নক্ষত্রের অবস্থান সুক্ষ পরিবর্তন হয় তার চতুর্দিকে ঘুর্ণায়মান গ্রহদের মধ্যাকর্ষনের টানে আর নক্ষত্রের আলোর বর্ণালী বিশ্লেষনের মাধ্যমে ডপলার ইফেক্ট শনাক্ত করে স্পেক্ট্রোস্কোপ, অন্ততপক্ষে যেখানে মধ্যাকর্ষন টানের কারন গ্রহটির আকার অনেক বৃহৎ। বেশীরভাগ সময় এভাবেই, আমার এই লেখার সময়, আমরা সৌরজগতের বাইরে ১৪৭টি নক্ষত্রের কক্ষপথে ঘুর্ণায়মান ১৭০ টি গ্রহর সন্ধান পেয়েছি [৩৪]; এবং এই সংখ্যা অবশ্যই বেড়ে যাবে যখন আপনারা এই বইটা পড়বেন। আপাতত এই গ্রহগুলো সব বড় আকারের 'বৃহস্পতির মত; কারন বৃহস্পতির আকারের বড় গ্রহই কেবল পারে তাদের নক্ষত্রর আলোর বর্নালীতে পরিবর্তন আনতে যেটা শনাক্ত করার ক্ষমতা আছে বর্তমান সময়ের স্পেক্ট্রোস্কোপের। আমরা অন্ততপক্ষে পরিমানগত দিক থেকে ড্রেক সমীকরনের একটি অজানা সংখ্যার কিছুটা উন্নতি করেছি। এর ফলে এই সমীকরনের শেষ ফলাফল সম্বন্ধে

আমাদের অ্যাগনষ্টিকবাদে সামান্য হলেও, গুরুত্বপুর্ন পরিবর্তন ঘটেছে। অন্য গ্রহে প্রানের অস্তিত্ব থাকা নিয়ে আমরা এখনও হয়তো অ্যাগনষ্টিক থাকতে বাধ্য – কিন্তু কিছুটা অবশ্যই কম অ্যাগনষ্টিক, কারন আমরা আগের চেয়ে আমাদের অজ্ঞতাকে একটু কমাতে পেরেছি। বিজ্ঞান ধীরে ধীরে অ্যাগনষ্টিকবাদের পরিমানকে কমিয়ে দিতে সক্ষম, যেমন করে হাক্সলী ঈশ্বরের বিশেষ অবস্থানটি অস্বীকার করেছিলেন সবাইকে তুষ্ট করার অতিরিক্ত প্রচেষ্ঠায়। আমার যুক্তি হলো, হাক্সলী, গুল্ড এবং অনেকের নম্র সংযম সত্বেও , ঈশ্বর প্রশ্নটি নীতিগতভাবে এবং চিরকালের মত বিজ্ঞানের আওতা বহির্ভুত না। কমতের ধারণার বীপরিতে যেমন নক্ষত্রের প্রকৃতি, আর তার চারপাশে কক্ষপথে জীবনের অস্তিত্ব থাকার সম্ভাবনা, অন্ততপক্ষে বিজ্ঞান পারে অ্যাগনষ্টিকতাবাদের ভুখন্ডে সম্ভাবনার অনুপ্রবেশ ঘটাতে।

ঈশ্বর হাইপোথিসিস সম্বন্ধে আমার সংজ্ঞায় ‘অতিমানবীয়’, ’অতিপ্রাকৃত’ এসব শব্দগুলো সংযুক্ত। এদের মধ্যে পার্থক্যটা স্পষ্ট করতে, কল্পনা করুন যে একটি সেটি (SETI) রেডিও টেলিস্কোপ সত্যি সত্যি মহাশুন্য থেকে একটা সংকেত শনাক্ত করলো, যা সন্দেহাতীতভাবে প্রমান করলো, মহাবিশ্বে আমরা একা নই। প্রসঙ্গক্রমে, কোন ধরনের সংকেত পেলে আমরা বিশ্বাস করবো যে তা আসলেই কোন বুদ্ধিমান প্রানীর সৃষ্টি?এটা কিন্তু তুচ্ছ প্রশ্ন নয়। একটা ভালো উপায় হচ্ছে, যদি প্রশ্নটাকে উল্টে নেই। আমরা বুদ্ধিমত্তার সাথে কি করতে পারি, পৃথিবীর বাইরে কোন বুদ্ধিমান প্রানীদের কাছে আমাদের অস্তিত্ব প্রচার করার লক্ষ্যে? ছন্দময় পাল্স দিয়ে কাজটা করা হবে না। জোসেলীন বেল বার্ণেল, রেডিও জোতির্বিজ্ঞানী, যিনি ১৯৬৭ সালে প্রথম পালসার আবিষ্কার করেছিলেন, এর ঠিক ১.৩৩ সেকেন্ডের নিয়মিত পর্যায়ক্রমটি অবাক হয়ে নাম রেখেছিলেন, মজা করে, এলজিএম (LGM:little green man signal) সংকেত। পরবর্তীতে মহাশুণ্যের অন্য একটি জায়গায় তিনি দ্বিতীয় পালসারটি আবিষ্কার করেন, যার সংকেতের পর্যায়ক্রম ছিল ভিন্ন, যা ভালোভাবেই এলজিএম হাইপোথিসিসকে মিথ্যা প্রমান করে। অনেক বুদ্ধিমত্বাহীন উৎস থেকে মেট্রোনমিক বা নিয়মিত ছন্দ বা পর্যায়ক্রমের সংকেতের উৎপত্তি হতে পারে, যেমন দোল খাওয়া গাছের ডাল, ফোটা ফোটা করে পড়া পানির বিন্দু থেকে,ঘুর্ণায়মান আর কক্ষপথে প্রদক্ষিনরত মহাজাগতিক বস্তু। আমাদের ছায়াপথে হাজারের বেশী পালসার পাওয়া গেছে, এবং এখন স্বীকৃত যে, এরা আসলে হচ্ছে ঘুর্ণায়মান নিউট্রন নক্ষত্র, যারা বাতিঘরের আলোর মত চারপাশে বেতার তরঙ্গ নিঃসরণ করে। কল্পনা করতে অবাক লাগে এমন নক্ষত্রের কথা যা কিনা সেকেন্ডের মধ্যে নিজ কক্ষে ঘুরছে (ভাবুন আমাদের দিনের দৈর্ঘ্য ২৪ ঘন্টার বদলে ১.৩৩ সেকেন্ড), নিউট্রন নক্ষত্র সম্বন্ধে আমরা যা জানি তার সবকিছু অবাক করার মত। আসল কথা হলো পালসার এর ব্যাপারটি সাধারন পদার্থবিদ্যার একটি ঘটনা, কোন বুদ্ধিমত্বার সৃষ্টি নয়।

তাই শুধু নিয়মিত ছন্দময় কিছু অপেক্ষমান মহাবিশ্বের কাছে আমাদের বুদ্ধিদ্বীপ্ত উপস্থিতির জানান দেবে না। প্রাইম সংখ্যা অনেক সময় পছন্দের একটা ব্যাপার হয়ে আসে। কারন শুধুমাত্র কোন ভৌত উপায়ে এ সংখ্যা তৈরী করা সম্ভব নয়। প্রাইম সংখ্যা শনাক্ত করে হোক বা অন্য কোন উপায়ে হোক, কল্পনা করুন সেটি মহাশুন্যে বুদ্ধিমান প্রানীর উপস্থিতির অকাট্য প্রমান পেল , এর পরে হয়তো বিশাল আকারের তথ্য এবং জ্ঞানের আদান প্রদান হলো , বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনী, যেমন ফ্রেড হয়েলের ’এ ফর অ্যান্ড্রোমিডা’ বা কার্ল সাগানের ’কনটাক্ট’ এর মত। আমরা কিভাবে এর প্রত্যুত্তর দেব? ক্ষমার যোগ্য একটা প্রতিক্রিয়া হতে পারে এমন কিছু যা অনেকটাই উপাসনার মত, যে সভ্যতার ক্ষমতা আছে এতো বিশাল দুরত্ব থেকে সংকেত পাঠাতে, সেই সভ্যতা আমাদের তুলনায় অনেক অগ্রবর্তী হওয়ারই সম্ভাবনা বেশী। এমনকি যদি ঐ সভ্যতা সংকেত পাঠানোর সময় আমাদের চেয়ে খুব একটা বেশী উন্নত না হয়েও থাকে, এই অতিবিশাল দুরত্ব আমাদের হিসাব করতে বাধ্য করায়, যে সময় আমরা তাদের সংকেত শনাক্ত করছি তারা হয়তো কয়েক সহস্র বছর আমাদের থেকে এগিয়ে গেছে (যদিনা অবশ্য তারা নিজেদেরকে ধ্বংশ না করে ফেলে, যা কিন্তু অসম্ভব না)।

আমরা তাদের সম্বন্ধে কখনো জানতে পারি বা না পারি, সম্ভাবনা আছে, যে ভীনগ্রহের সভ্যতা আছে যারা অতিমানবিক, অনেক দিক থেকে দেবতুল্য, যে কোন ধর্মতাত্বিকের কল্পনাতীত। তাদের কারিগরী অগ্রগতি আমাদের কাছে অতিপ্রাকৃত মনে হবে, যেমন অন্ধকার যুগের কোন কৃষককে যদি একবিংশ শতাব্দীতে নিয়ে আসা যায়, কল্পনা

করুন তার প্রতিক্রিয়া কি হতে পারে ল্যাপটপ বা মোবাইল টেলিফোন, হাইড্রোজেন বোমা, জাম্বো জেট দেখে। আর্থার সি ক্লার্ক যেমন লিখেছিলেন, তার তৃতীয় আইনে: ’কোন যথেষ্ট পরিমান উন্নত কোন প্রযুক্তিকে আসলে ম্যাজিক থেকে আলাদা করা যায়না’; আমাদের সভ্যতা যে প্রযুক্তি তৈরী করেছে, প্রাচীন মানুষের কাছে তা মোজেস এর সাগর দুই ভাগ করা বা যীশুর পানির উপর হাটা থেকে, কোন অংশে কম অলৌকিক মনে হবে না। আমাদের সেটি সংকেতের ভীনগ্রহবাসীরা আমাদের কাছে দেবতাদের মতই মনে হতে পারে, যেমন করে, মিশনারীদের মনে করেছিল (এবং তারা যেভাবে তাদের অযোগ্য সন্মানকে অপব্যবহার করেছে চরমভাবে) প্রস্তর যুগীয় সভ্যতার মানুষরা যখন তারা তাদের দেশে এসেছিল অস্ত্র, টেলিস্কোপ, দিয়াশলাই আর পরবর্তী গ্রহনের তারিখ সেকেন্ড পর্যন্ত্য নির্ণয়ের জন্য পঞ্জিকা সাথে নিয়ে।

তাহলে কোন অর্থে, অতি উন্নত সেটি ভীনগ্রহীরা দেবতা হবে না? তাহলে কোন অর্থে তারা অতিমানবীয় হবে, তবে অতিপ্রাকৃত হবে না? খুব গুরুত্বপুর্ন একটি অর্থে, যা এই বইটির অন্তর্নিহিত বক্তব্য। দেবতা আর দেবতাতুল্য ভীনগ্রহীদের মধ্যে পার্থক্য তাদের গুনাবলীতে না,তাদের উৎপত্তিতে। যে কোন প্রানী যা এত জটিল যে তার বুদ্ধিমত্তা আছে, সে একটি বিবর্তন পক্রিয়ার ফসল। যখন তাদের সাথে আমাদের দেখা হবে তখন যতই তাদের দেবতাতুল্য মনে হোক না কেন, তাদের শুরুটা কিন্তু এভাবে হয়নি। বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনীর লেখক যেমন, ড্যানিয়েল এফ গালোউয়ে, ‘কাউন্টারফিট ওয়ার্ল্ড’ এ এমনকি প্রস্তাব করেছেন (আমি চিন্তা করতে পারছি না কিভাবে তা ভুল প্রমান করব) যে আমরা কম্পিউটারের সৃষ্ট কাল্পনিক জগতে বাস করছি যা নিয়ন্ত্রন করছে অতি উন্নত একটি সভ্যতা। কিন্তু যারা এই জগতটা তৈরী করেছে তাদেরও কোন এক জায়গা থেকে আসতে হবে। সম্ভাবনার নীতি অনুযায়ী সরল সাধারন পুর্বসুরী ছাড়া তাদের স্বতঃস্ফুর্তভাবে সৃষ্ট হবার সকল ধারনা নাকচ হয়ে যায়। তারাও সম্ভবতঃ তাদের অস্বিত্বের জন্য এক ধরনের(হয়ত অপরিচিত এবং ভিন্ন) ডারউইনবাদের কাছের ঋণী: ড্যানিয়েল ডেনেটের শব্দ ব্যবহার করে বলা যায় ’স্কাইহুকের’ ‘ পরিবর্তে একধরনের ক্রমবর্ধমান (একদিকে ঘুরতে পারে এমন) হুক সমৃদ্ধ দাঁতালো চাকাযুক্ত ‘’’ক্রেইন’ [৩৫] ; স্কাইহুক – সব দেবতাসহ –শুধুমাত্র যাদুর খেলা। তারা প্রকৃতার্থে আন্তরিকভাবে কোন কিছুর ব্যাখ্যা করে না, এবং তাদের প্রদত্ত ব্যাখ্যার চেয়ে আরো বেশী ব্যাখ্যার প্রয়োজনীয়তা অবশিষ্ট থেকে যায়। ক্রেইন হলো সেই ব্যাখ্যাকারী যন্ত্র, যা আসলে পূর্ণ ব্যাখ্যা দিতে সক্ষম। আর প্রাকৃতিক নির্বাচন হলো সর্বকালের সেরা ক্রেইন। যা জীবনকে আদিমতম সরলতা থেকে জটিলতা, সৌন্দর্য্য আর সুস্পষ্টরুপে প্রতীয়মান নকশার সুউচ্চ শিখরে নিয়ে গেছে যা আমাদের বিস্মিত করে আজ। চতুর্থ অধ্যায়ে ‘’কেন প্রায় নিশ্চিৎভাবে কোন ঈশ্বর নেই’ এর এটাই হবে মুল ভাব । কিন্তু প্রথমে, সক্রিয়ভাবে ঈশ্বরের অস্তিত্বকে অবিশ্বাস করার আমার মুল কারনে প্রবেশের আগে, আমার দ্বায়িত্ব হল বিশ্বাসের স্বপক্ষে ঐতিহাসিক সময় থেকে প্রস্তাবিত সকল ইতিবাচক যুক্তিগুলো খন্ডন করা।

((((((দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত))))))

---

[১] Mitford and Waugh (2001) : The Letters of Nancy Mitford and Evelyn Waugh. *New York: Houghton Mifflin.*

[২] http://www.newadvent.org/cathen/06608b.htm.

[৩] http://www.catholic-forum.com/saints/indexsnt.htm?NF=l.

[৫] Phenomenology is the study of structures of consciousness as experienced from the first-person point of view. The central structure of an experience is its intentionality, its being directed toward something, as it is an experience of or about some object. An experience is directed toward an object by virtue of its content or meaning (which represents the object) together with appropriate enabling conditions.

[৬]*Congressional Record,* 16 Sept. 1981.

[৭]http://www.stephenjaygould.org/ctrl/buckner_tripoli.html.

[০৮] Robert I. Sherman, in Free Inquiry 8: 4, Fall 1988, 16.

[০৯] N. Angier, ‘Confessions of a lonely atheist’, New York Times Magazine, 14 Jan. 2001:http://www.geocities.com/mindstuff/Angier.html.

[১০] http://www.fsgp.org/adsn.html.

[১১] An especially bizarre case of a man being murdered simply because he was an atheist is recounted in the newsletter of the Free thought Society of Greater Philadelphia for March/Apri 2006. Go tohttp://www.fsgp.org/newsletters/newsletter__2006_0304.pdf and scroll down to ‘The murder of Larry Hooper’.

[১২] http://www.secular.org/news/pete_stark_070312.html

[১৩] http://www.hinduonnet.com/thehindu/mag/2001/ll/18/stories/2001111800

[১৪] Quentin de la Bedoyere, *Catholic Herald,* 3 Feb. 2006

[১৫] Carl Sagan, ‘The burden of skepticism’, *Skeptical Inquirer* 12, Fall.1987.

[১৬] A question that has been around for a long time. It is also a question that can produce heated discussion since there seems to be good reasons for anwering it either way. for example, does a tree make a sound if it falls in a forest with no one around. – yes, the tree will make a sound; no, the tree will not make a sound.

[১৭] Dawkins, R. (1998). *Unweaving the Rainbow.* London: Penguin.

[১৮] T. H. Huxley, ‘Agnosticism’ (1889), repr. in Huxley (1931). The complete text of ‘Agnosticism’ is also available at http://www. infidels. org/library/historical/thomas_huxley/huxley_wace/part_02.html.

[১৯] Russell, ‘Is there a God?’ (1952), repr. in Russell (1997b). Russell, B. (1957). Why I Am Not a Christian. London: Routledge. Russell, B. (1993). The Quotable Bertrand Russell. Amherst, NY: Prometheus.

[২০] হয়তো আমি একটু তাড়াতাড়ি কথাটা বলে ফেললাম, ২০০৫ সালের ৫ জুন The Independent on Sunday একটি খবর প্রকাশ করে: মালায়শীয় কর্তৃপক্ষ বলছে, যে ধর্মীয় সেক্টটি, পবিত্র চা’ এর পট এর আকারে একটি বাড়ি বানিয়েছে, তারা গৃহনির্মান সংক্রান্ত নীতিমালাগুলো সুস্পষ্ট লংঘন করেছেন। এছাড়া বিবিসি’র খবরটি দেখুন এখানে: http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/4692039.stm

[২১] Andrew Mueller, ‘An argument with Sir Iqbal’, *Independent on Sunday, 2*April 2006, Sunday Review section, 12-16.

[২২] ক্যাম্প কোয়েস্ট যুক্তরাষ্ট্রের সামার ক্যাম্প প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে একটি ব্যতিক্রম এবং এটি সম্পুর্ন প্রশংসনীয় একটি দিকে এই সংস্কৃতিটাকে নিয়ে যাবার চেষ্টা করছে। অন্যান্য সামার ক্যাম্পগুলো যা একটি ধর্মীয় এবং স্কাউট নির্ভর মুল্যবোধের উপর ভিত্তি করে পরিচালিত হয়,কেন্টাকীতে এডউইন এবং হেলেন কাগিন এর প্রতিষ্ঠিত ক্যাম্প কোয়েষ্ট পরিচালিত হয় ধর্মনিরেপক্ষ মানবতাবাদী নৈতিকতার উপর। শিশুদের এখানে সংশয় এবং প্রশ্নের সাথে সবকিছুকে বিচার করার জন্য প্রণোদনা দেয়া হয়, এর সাথে অন্যান্য বাইরের নানা কার্যক্রমতো আছেই (www.camp-quest.org)। ক্যাম্প কোয়েস্টর এর মত আরো বেশ কিছু সামার ক্যাম্প গড়ে উঠেছে

টেনিসি,মিনোসোটা, মিশিগান, ওহাইও এবং কানাডায়)

[২৩] *New York Times,* 29 Aug. 2005. Henderson, B. (2006). The Gospel of the Flying Spaghetti Monster. New York: Villard.

[২৪] Henderson, B. (2006). The Gospel of the Flying Spaghetti Monster. New York: Villard.

[২৫] http://www.lulu.com/content/267888.

[২৫] H. Benson et al., 'Study of the therapeutic effects of intercessory prayer (STEP) in cardiac bypass patients', *American Heart Journal:*151: 4, 2006, 934-42.

[২৬] Richard Swinburne, in *Science and Theology News, 7* April 2006, http://www.stnews.org/Commentary-2772.htm.

[২৭] *New York Times,* 11 April 2006.

[২৮] In court cases, and books such as Ruse, M. (1982). *Darwinism Defended: A Guide to the Evolution Controversies*. Reading, MA: Addison-Wesley. His article in *Playboy* appeared in the April 2006 issue.

[২৯] Jerry Coyne's reply to Ruse appeared in the August 2006 issue of Playboy.

[৩০] Madeleine Bunting, *Guardian,* 27 March 2006

[৩১] Uncle Remus is a fictional character, the title character and fictional narrator of a collection of African American folktales adapted and compiled by Joel Chandler Harris, published in book form in 1881. A journalist in post-Reconstruction Atlanta, Georgia, Harris produced seven Uncle Remus books.

[৩২] Dan Dennett's reply appeared in the *Guardian,* 4 April 2006.

[৩৩]http://scienceblogs.com/pharyngula/2006/03/the_dawkinsdennett_boogeyman.php;http://scienceblogs.com/pharyngula/2006/02/our_double_standard.php;http://scienceblogs.com/pharyngula/2006/02/the_rusedennett_feud.php.

[৩৪] http://vo.obspm.fr/exoplanetes/encyclo/encycl.html.

[৩৫] Dennett, D. (1995). *Darwin's Dangerous Idea*. New York: Simon & Schuster.

রিচার্ড ডকিন্স এর দি গড ডিল্যুশন : তৃতীয় অধ্যায়

By K M Hassan

The first principle is that you must not fool yourself—and you are the easiest person to fool. Richard Feynman (1974)
(ছবি: স্টিভ পিক্সোটো)

রিচার্ড রিচার্ড ডকিন্স এর দি গড ডিল্যুশন : প্রথম এবং দ্বিতীয় অধ্যায়

রিচার্ড ডকিন্স এর দি গড ডিল্যুশন : তৃতীয় অধ্যায় (অনুবাদ প্রচেষ্টা: কাজী মাহবুব হাসান)
The God Delusion by Richard Dawkins

:ঈশ্বরের অস্তিত্বের স্বপক্ষে প্রস্তাবিত কিছু যুক্তি:

ধর্মতত্ত্বের অধ্যাপনার কোন জায়গা আমাদের কোন প্রতিষ্ঠানে থাকা উচিৎ নয়। টমাস জেফারসন

ঈশ্বরের অস্তিত্বের স্বপক্ষে যুক্তিগুলো বহু শতাব্দী ধরেই বিধি হিসাবে নিয়মতান্ত্রিকভাবে সংকলন করেছেন ধর্মতত্ত্ববিদরা, পরবর্তীতে যেখানে আরো সংযোজন করেছেন অন্যরা, এমনকি ভ্রান্ত ’সাধারন কান্ডজ্ঞান’ এর সরবরাহকারীরাও।

টমাস আকোয়াইনাস এর ’প্রমান সমুহ’:

ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ঈশ্বরের অস্তিত্বের স্বপক্ষে টমাস আকোয়াইনাস (Thomas Aquinas) যে পাচটি ’প্রমান’এর দাবী করেছেন, আসলে তারা কিছুই প্রমান করে না এবং খুব সহজেই – (যদিও বলতে ইতস্ততবোধ করছি, বিশেষ করে তাঁর মতো এমন সুবিখ্যাত কোন কারো যুক্তি) –একে অন্তসারশুন্য প্রমান করা সম্ভব। প্রথম তিনটি মুলত একই বিষয়কে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে বলা হয়েছে – তাই এই তিনটি যুক্তি নিয়ে একসাথে আলোচনা করা যেতে পারে। প্রত্যেকটি মুলতঃ ক্রমান্বয়ে পূর্ববর্তী মতে ফিরে যাওয়ার একটি অনন্ত প্রক্রিয়া বা ইনফিনিট রিগ্রেস – যেখানে কোন একটি প্রশ্নের উত্তর আরেকটি পূববর্তী প্রশ্নের জন্ম দেয় –এভাবেই চলতে থাকে অনন্ত কাল।

১. আনমুভড মুভার বা স্থবির চালিকাশক্তি: কিছুই সচল হতে পারেনা আগে যদি কোন চালক না থাকে। যা আমাদের ক্রমান্বয়ে পূর্ববর্তী মতে ফিরে যাওয়ার একটি অনন্ত প্রক্রিয়ার দিকে নিয়ে যাবে, যার থেকে মুক্তি পাওয়ার একটাই উপায় – ঈশ্বর। কোন না কোন কিছুকে প্রথমে চালকের দায়িত্ব নিতে হয়েছিল আর আমরা সেই প্রথম চালককে বলছি ঈশ্বর।

২. আনকসড কস বা পূর্বকারনহীন কারন: কোন কিছুই নিজে নিজে ঘটে না। প্রত্যেকটি পরিনতির একটি প্রাক কার্য্যকারন আছে, এবং এভাবে আবারো সেই ক্রমান্বয়ে পূর্ববর্তী মতে ফিরে যাওয়ার একটি অনন্ত প্রক্রিয়ায় দিকে ঠেলে দেয়া হবে আমাদের। তাই এটাকে শেষ করতে হবে একটি প্রথমতম কারন দিয়ে, যাকে আমরা বলছি ঈশ্বর।

৩. কসমোলজিকাল আর্গুমেন্ট বা মহাজাগতিক যুক্তি: এমন কোন একটা সময় অবশ্যই ছিল যখন কোন ধরনের ভৌতপদার্থেরই অস্তিত্ব ছিল না। যেহেতু বর্তমানে ভৌতপদার্থের অস্তিত্ব আছে সেহেতু নিশ্চয়ই কোন অভৌত কিছু ছিল যা বর্তমানে এসব কিছুর অস্তিত্বের কারন,এবং সেই কোনকিছুকে আমরা বলছি ঈশ্বর।

এই তিনটি যুক্তিই নির্ভর করে আছে ক্রমান্বয়ে পূর্ববর্তী মতে ফিরে যাওয়ার ধারনা বা ইনফিনিট রিগ্রেস এর উপরে এবং যেখানে ঈশ্বরের নাম ব্যবহার করে এই ক্রমান্বয়ে পশ্চাদগমনকে থামানো হয়। এই যুক্তির সমর্থনকারীরা সম্পুর্ণ অনায্যভাবে যে পূর্বধারনাটি পোষন করেন, তা হলো, তাদের প্রস্তাবিত ’ঈশ্বর’ এই পশ্চাদগমনশীল যুক্তি প্রক্রিয়ার আওতামুক্ত। এমন কি যদি আমরা কাল্পনিকভাবেও কোন অসীম পশ্চাদগমনশীল একটি যুক্তি প্রক্রিয়ায় কাল্পনিকভাবে সৃষ্টিকরা একজন সমাপ্তকারীর অস্তিত্ব সংক্রান্ত সন্দেহজনক বিলাসিতাকে শুধুমাত্র প্রয়োজনের খাতিরে পশ্রয়ও দেই, সেক্ষেত্রেও কিন্তু কোন কারনই নেই, সেই কাল্পনিক সমাপ্তকারীর উপর সেই সব গুনাবলীগুলো আরোপ করা, যা আমরা স্বাধারণতঃ ’ঈশ্বর’ এর উপর আরোপ করে থাকি: সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞতা, দয়াপরায়নতা, সৃষ্টির সৃজনশীলতা, এছাড়াও মানবিক ব্যপারগুলোতো আছেই যেমন, প্রার্থনা শোনা,পাপের ক্ষমা করা এবং যে কারো গোপন গভীরতম চিন্তা সম্বন্ধে সম্যক ধারনা রাখা। ঘটনাচক্রে যুক্তিবিদদের কিন্তু দৃষ্টি এড়ায়নি যে, সর্বশক্তিমান আর সর্বজ্ঞতা পরস্পর বিরুদ্ধ। যদি ঈশ্বর সর্বজ্ঞ হয়ে থাকেন, তাহলে নিশ্চয়ই আগে থেকেই তার জানা আছে যে, তিনি কিভাবে ইতিহাসের গতিপথ পরিবর্তন করতে হস্তক্ষেপ করবেন তার অসীম শক্তি দ্বারা। কিন্তু তার মানে, তিনি তার হস্তক্ষেপ সম্বন্ধে কোনভাবেই তার নেয়া সিদ্ধান্তগুলো পরিবর্তন করতে পারবেন না, এর অর্থ দাড়ায় তিনি আসলে সর্বশক্তিমান নন। কারেন ওয়েনস (Karen Owens) এই বুদ্ধিদীপ্ত প্যারাডক্স বা ধাধাকে সমপর্যায়ের একটা আকর্ষনীয় কবিতায় প্রকাশ করেছেন:

সর্বজ্ঞ ঈশ্বর কি পারেন, যিনি
ভবিষ্যত জানেন, তার
অসীম শক্তি দিয়ে
তার ভবিষ্যত মনকে বদলাতে?

ক্রমান্বয়ে পূর্ববর্তী মতে ফিরে যাওয়ার অসীম প্রক্রিয়া আর কাল্পনিক ঈশ্বরকে সেটি শেষ করার কারন হিসাবে ব্যবহার করার করার অসারতা প্রসঙ্গে আবার ফিরে আসি। বিষয়টা আরো অনেক মিতব্যায়ীতার মাধ্যমে করা যায়,যদি আমরা এর বদলে অন্য কিছু কল্পনা করে নেই , যেমন, ধরুন একটি ’বিগ ব্যাঙ্গ সিঙ্গুলারিটি’ অথবা অন্য কোন ভৌত ধারনা যা এখনো আমাদের অজানা। একে ঈশ্বর বলে সম্বোধন করার ক্ষেত্রে এর সবচেয়ে ভালো পরিনতি হচ্ছে এর উপযোগিতাহীনতা এবং সবচেয়ে খারাপ পরিনতি হলো, এটি অত্যন্ত ক্ষতিকারক একটি ছলনা। এডওয়ার্ড লিয়ার (Edward Lear) এর ’ক্রামববলিয়াস কাটলেট’ এর আবোলতাবোল অর্থহীন রেসিপি যেমন আমাদের আমন্ত্রন জানায়: ‘কয়েক টুকরো গরুর মাংশ যোগাড় করুন, এবার তাদের টুকরো টুকরো করে কাটুন, সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম আকারের টুকরো করে, এরপর এদের আরো ছোট করে কাটার চেষ্টা করুন, আট কিংবা সম্ভব হলে আরো নয় বার’, কিছু পশ্চাদগমনশীল যুক্তি প্রক্রিয়া বা রিগ্রেস প্রাকৃতিকভাবেই একটি জায়গায় শেষ হয়। বিজ্ঞানীরা কল্পনা করেছিলেন, কি হতে পারে, যদি আমরা কোন কিছুকে খুবই ক্ষুদ্রতম টুকরো করে কাটতে পারি, ধরুন, এক টুকরো সোনার খন্ডকে, প্রথমে দুইভাগ, তারপর ক্রমাগত ভাবে আরো ক্ষুদ্রতম কোন সোনার খন্ডাংশে। এক্ষেত্রে রিগ্রেস অবশ্যই নি:সন্দেহে শেষ হবে অ্যাটম বা পরমানুতে। সোনার টুকরার সম্ভাব্য সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম অংশ হবে এর নিউক্লিয়াস, যেখানে উনআশিটি প্রোটন আছে এবং এর চেয়ে কিছু বেশী সংখ্যক নিউট্রন আছে, যার চারপাশে ঘুরছে উনআশিটি ইলেক্ট্রন। কেউ যদি সোনাকে এর অ্যাটমের চেয়ে আরো ক্ষুদ্র অংশে কাটতে চান, সেখানে যা থাকবে, তা আর যাই হোক, সোনা নয়। পরমানু বা অ্যাটম হচ্ছে ‘ক্রামববলিয়াস কাটলেট’ ধরনের কোন রিগ্রেস এর প্রাকৃতিক শেষ বিন্দু। সুতরাং এটি আদৌ স্পষ্ট না, ঈশ্বর কিভাবে আকোয়াইনাসের প্রস্তাবিত রিগ্রেসের প্রাকৃতিক শেষ বিন্দু হতে পারেন, হালকা ভাবে যদি বলি; আমরা পরে আরো বিস্তারিত দেখবো। আপতত বরং আকোয়াইনাসের তালিকায় ফিরে যাই।

৪. ডিগ্রী বা মাত্রা থেকে যুক্তি বা আর্গুমেন্ট ফ্রম ডিগ্রী: আমরা লক্ষ্য করি যে পৃথিবী প্রতিটি জিনিসই ভিন্ন। আমরা জানি যে একটা মাত্রা আছে সবকিছুরই, যেমন, ভালোত্ব এবং উৎকর্ষতার। কিন্তু আমরা সেই মাত্রা পরিমাপ বা বিচার করি, এই বৈশিষ্টগুলোর সর্ব্বোচ্চ কোন একটি মাত্রাকে আদর্শ হিসাবে ধরে নিয়ে। মানুষ ভালো খারাপ দুটোই হতে পারে, সুতরাং চুড়ান্ত মাত্রার ভালোত্ব মানুষের মধ্যে খুজে পাওয়া যায় না; সেকারনে নিশ্চয়ই কোন সর্ব্বোচ্চর অস্তিত্ব আছে যা উৎকর্ষতার একটি চুড়ান্ত মানদন্ড তৈরী করে, আমরা সেই চুড়ান্ত মানদন্ডকে বলছি ঈশ্বর।

এটা কি কোন যুক্তি হতে পারে? আপনি হয়তো বলতে পারেন, প্রত্যেকটা মানুষ তাদের গায়ের দুর্গন্ধের বিভিন্ন মাত্রা আছে, কিন্তু আমরা সেই মাত্রা মাপতে পারি, শুধু একটি নিখুত সর্ব্বোচ্চ মাত্রার দুগন্ধর একটি মানদন্ডের সাথে তুলনা করার মাধ্যমে। সুতরাং নিশ্চয়ই কিছুর অস্তিত্ব আছে যা তুলনাহীনভাবে দুর্গন্ধযুক্ত এবং আমরা তাকে বলছি ঈশ্বর। অথবা তুলনা করা জন্য অন্য যে কোন বৈশিষ্টকে ব্যবহার করুন না কেন, আপনি একই ভাবে এই ফাকা নির্বোধ কোন উপসংহারে পৌছাতে পারবেন।

৫. দি টেলিওলজিক্যাল বা পরমকারনবাদের যুক্তি বা ডিজাইন বা পরিকল্পনা থেকে যুক্তি বা আর্গুমেন্ট ফ্রম ডিজাইন: এই পৃথিবীতে সবকিছু, বিশেষ করে জীবন আছে এমন সবকিছু, দেখলে দেখে মনে হয় যেন তাদের ডিজাইন বা পরিকল্পনা করে বানানো হয়েছে। যদি না তাদের আসলেই ডিজাইন করা হয়ে থাকে, কোন কিছুই কিন্তু আমাদের দেখে মনে হয় না তা ডিজাইন করা হয়েছে, সেকারনে অবশ্যই কোন ডিজাইনারের অস্তিত্ব আছে এবং আমরা তাকে বলি ঈশ্বর [১]; আকোয়াইনাস নিজেই একটি তীরের নিশানার দিকে ধাবমান হবার রুপক ব্যবহার করেছিলেন, কিন্তু মনে হয় আধুনিক হিট-সিকিং অ্যান্টি এয়ার ক্র্যাফট মিসাইলের বা তাপ-সন্ধানী বিমান ধ্বংশকারী ক্ষেপনাস্ত্র তার উদ্দেশ্যর সাথে বেশী যথাযুক্ত হতো।

এই ‘আর্গুমেন্ট ফ্রম ডিজাইন’, তার এই একটি মাত্র যুক্তি যা আজো প্রায়ই ব্যবহৃত হচ্ছে। এবং অনেকের কাছে এটি চুড়ান্ত নকডাউন আর্গুমেন্ট বা তর্ক জয়কারী যুক্তির মত। কেমব্রিজে আন্ডারগ্রাজুয়েট ছাত্র থাকাকালীন তরুন চার্লস ডারউইনকেও একসময় এই যুক্তিটি আকর্ষন করেছিল, যখন তিনি উইলিয়াম পেইলী’র (ন্যাচারাল থিওলজী বইটি পড়েছিলেন। পেইলীর জন্য দুর্ভাগ্য,কারন পরবর্তীতে পরিণত ডারউইন তার যুক্তি বাতাসে উড়িয়ে দিয়েছিল।

চার্লস ডারউইনের ’আর্গুমেন্ট ফ্রম ডিজাইন‘ বা ডিজাইন থেকে যুক্তিকে অযৌক্তিক প্রমান করে ধরাশায়ী করা ছাড়া সম্ভবত বুদ্ধিমত্তাপুর্ণ যুক্তি দ্বারা কোন লোকপ্রিয় বিশ্বাসের এভাবে ভয়াবহ পরাজয়ের নজির আর নেই; খুবই অপ্রত্যাশিত ছিল ব্যাপারটা। ডারউইনের কল্যাণে, এই উক্তিটি আর সত্য নয় যে, আমরা এমন কিছু জানিনা, যা ডিজাইন করা হয়েছে, যদি না আসলেই তাদের ডিজাইন করা হয়ে থাকে। প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে বিবর্তন সৃষ্টি করতে পারে অসাধারন ডিজাইন সমতুল্য উদহারন, কল্পনাতীত জটিলতা আর আভিজাত্য। এবং এই সব বিখ্যাত সিউডো ডিজাইন(বা আপাত দৃষ্টিতে ডিজাইন মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে ডিজাইন না) তালিকায় আছে স্নায়ুতন্ত্র, যে তন্ত্রের সামান্য কিছু অর্জনের মধ্যে যেমন আছে – গোল সিকিং (কোন উদ্দেশ্য নির্ভর) আচরণ, যা এমনরকি ক্ষুদ্রতম কীট বা ইনসেক্টদের মধ্যে, মনে হতে পারে, সাধারন লক্ষ্যকে নিশানা করে যাওয়া কোন তীর অপেক্ষা আরো উন্নত জটিল হিট সিকিং ক্ষেপনাস্ত্রের মত। ৪ র্থ অধ্যায়ে আমি আবারো এই আর্গুমেন্ট ফ্রম ডিজাইনে ফিরে আসবো।

অনটোলজিক্যাল [২] যুক্তি এবং অন্যান্য এ প্রাইওরী [৩] বা পুর্ববর্তী জ্ঞান নির্ভর যুক্তিসমূহ:

ঈশ্বরের অস্তিত্ব সংক্রান্ত যুক্তিগুলো দুটো প্রধান ক্যাটেগরীতে ভাগ করা যায়, এ প্রাইওরী (a priori) এবং এ পোস্টেরিওরী (a posteriori)। টমাস আকোয়াইনাস এর পাচটি যুক্তি যেমন আ পোস্টেরিওরী (যে জ্ঞানের উৎস কোন প্রাকধারনা না বরং অভিজ্ঞতা বা পরীক্ষা নির্ভর) , কারন তাদের ভিত্তি পৃথিবী নানা বিষয় সম্বন্ধে সরাসরি পর্যবেক্ষন; এ প্রাইওরী (যা অভিজ্ঞতা থেকে স্বাধীন, পুর্ববত জ্ঞান নির্ভর) যুক্তিগুলোর মধ্যে বিখ্যাত, যেগুলো নির্ভর করে আছে আর্মচেয়ারে বসে যুক্তি প্রদান করার প্রক্রিয়ার উপর, সেটি হলো অনটোলজিক্যাল আর্গুমেন্ট, যা প্রস্তাব করেছিলেন ১০৭৮ খৃষ্টাব্দে ক্যান্টারবেরীর সেইন্ট আনসেল্ম (St Anselm), এবং তারপর এটাকেই নানাভাবে বর্ননা করেছেন পরবর্তীতে অগনিত দার্শনিকরা। আনসেল্ম এর যুক্তির একটি অদ্ভুত ব্যাপার হলো, এটি মুলত মানুষের প্রতি নির্দেশিত না বরং ঈশ্বরের প্রতি (আপনি ভাবতেই পারেন এমন কোন একটি সত্বা বাএনটিটি, যিনি প্রার্থনা শোনার ক্ষমতা রাখেন, নিজের অস্তিত্ব সম্বন্ধে নিশ্চয়ই তাকে বিশ্বাস করানোর কোন প্রয়োজন পড়ে না);

অ্যানস্লেম বলছেন, এমন একটি সত্বার অস্তিত্ব আমাদের পক্ষে ধারনা করা সম্ভব, যার চেয়ে মহান আর কোন কিছুই ভাবা যায় না। এমনকি একজন নীরিশ্বরবাদীও এধরনের সর্ব্বোচ্চ কোন সত্বার কথা ভাবতে পারবেন,যদিও তিনি তার অস্তিত্ব স্বীকার করবেন না বাস্তব পৃথিবীতে। কিন্তু ,.... যুক্তিটা এরপর এভাবে মোড় নেয়..... কোন একটি সত্বা যার আদৌ কোন বাস্তব অস্তিত্ব নেই, এই বিশেষ ফ্যাক্টটারই কারনে, সেটি চুড়ান্ত বা চরমতম নিখুতত্বর গুনাবলী সম্পন্ন হতে পারেনা। সুতরাং আমরা এখানে একটি অসঙ্গতি বা পরস্পরবিরোধীতা দেখতে পাচ্ছি এবং .....এভাবে ব্যাস হয়ে গেলা.. ছু মন্তর ছু...... ঈশ্বরের অস্তিত্ব আছে !

আমি বরং এই শিশুতোষ যুক্তিটাকে উপযুক্ত ভাষায়, তা হলো শিশুদের খেলার মাঠের ভাষাতে বরং,অনুবাদ করে দেই:

‘তোমার সাথে আমি বাজী রাখছি, আমি প্রমান করতে পারবো যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব আছে’।

’আমিও বাজী রাখতে পারি যে, তুমি পারবে না’।

‘ঠিক আছে, তাহলে, এমন কিছু একটা কল্পনা করো, যা সবচেয়ে বেশী নিখুত, নিখুত, নিখুত, যতটা সম্ভব নিখুত কোন কিছুকে ভাবা যেতে পারে’।

‘ঠিক আছে, ভাবলাম, এরপর’?

’এখন বলোতো, এই যে সব চেয়ে নিখুত নিখুত নিখুত যে জিনিসটা তুমি ভেবেছো তা কি সত্যি? বাস্তবে কি তার কোন অস্তিত্ব আছে’?

‘ না, নেই, এর অস্তিত্ব আছে শুধু আমার মনে’।

‘কিন্তু এটা যদি বাস্তবে অস্তিত্ব আছে এমন কিছু হত, তাহলে এটা আরো বেশী নিখুততর হতো, কারন সত্যি সত্যি বাস্তবে অস্তিত্ব আছে এমন কিছুর অবশ্যই কল্পনার কোন তুচ্ছ জিনিসের চেয়ে আরো বেশী উত্তম হতে বাধ্য । সুতরাং আমি প্রমান করলাম যে, ঈশ্বরের অস্তিত্ব আছে। নুর নুরনী নুর নুর (শিশুতোষ শব্দমালা), সব নাস্তিকরা আসলে বোকা’।

আমার কাল্পনিক এই গল্পে শিশু পন্ডিতটি দিয়ে আমি জেনেশুনে ’বোকা’ শব্দটি ব্যবহার করিয়েছি। আনসেল্ম নিজেই সাম ১৪ (Psalm 14) এর প্রথম ভার্সের উদ্ধৃতি দিয়েছিলেন, ’বোকারাই তাদের অন্তরে উচ্চারণ করেছে যে, কোন ঈশ্বর নেই’; এবং তিনি তার হাইপোথেটিকাল নিরীশ্বরবাদীকে নির্বোধ (ল্যাটিন ইনসিপিয়েন্স) বলে সম্বোধন করার সাহস দেখিয়েছিলেন:

এভাবে এমনকি কোন নির্বোধও বিশ্বাস করে যে, নিদেনপক্ষে এমন কোন কিছু আমাদের বোধের জগতে বাস করে, যা তুলনায় আর মহান কোন কিছুকে ভাবা সম্ভব না। কারন যখন সে এটি শুনতে পারে, তখনি সে বুঝতে পারে। আর যেটা বোঝা সম্ভব হয়েছে, তা কেবল বোঝার ক্ষেত্রেই অস্তিত্বশীল। এবং নিশ্চিৎভাবে এমন কোন কিছু, যার চেয়ে আর মহান কিছু ভাবা সম্ভব না, তা শুধু মাত্র আমাদের বোঝার জগতে সীমাবদ্ধ থাকতে পারেনা। কারন ধরা যাক এটি শুধু আমাদের বোধের জগতে বাস করে তাহলে বাস্তবে এর অস্তিত্ব ধারনা করা সম্ভব, যা আরো মহত্তর।

এভাবে কোন শব্দকে ব্যবহার করে বা লোগোম্যাশিস্ট ছলচাতুরী মাধ্যমে এধরনের বিশাল উপসংহারের দাবী কেউ করতে পারে, এই বিষয়টি আমাকে প্রথমত নান্দনিক দিক থেকে আহত করে। সুতরাং আমি অবশ্যই সতর্ক থাকবো ’নির্বোধ’ শব্দটির অযথা ব্যবহার করা থেকে। উল্লেখযোগ্যভাবে বার্ট্রান্ড রাসেল (অবশ্যই নির্বোধ নন) কিন্তু বলেছিলেন , ‘ভুলটা ঠিক কোথায় আছে সেটা খুজে বের করার চেয়ে, এই যুক্তিটি (অনটোলজিক্যাল আর্গুমেন্ট) যে অবশ্যই ভুল এই সিদ্ধান্তে কিন্তু অপেক্ষাকৃত ভাবে সহজেই পৌছানো যায়’; রাসেল নিজেই, তার তরুন বয়সে, অল্পসময়ের জন্য এই যুক্তিটি দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন:

আমার মনে আছে সেই বিশেষ মুহুর্তটার কথা; ১৮৯৪ সালের একদিন, ট্রিনিটি লেন দিয়ে যখন হাটছিলাম আমি তখন হঠাৎ করে একঝলকের জন্য দেখতে যেন দেখতে পেলাম (বা আমি মনে হয়েছিল দেখেছিলাম) যে অনটোলজিক্যাল আর্গুমেন্টটা সঠিক। আমি বের হয়েছিলাম এক টিন তামাক কেনার জন্য; এবং ফেরার পথে আমি হঠাৎ করে সেটা উপরের দিকে শুন্যে ছুড়ে দিয়ে বিস্ময়ে বলে উঠেছিলাম: গ্রেট স্কট..অনটোলজিক্যাল আর্গুমেন্টটি সঠিক;

কিন্তু আমি ভাবছি, রাসেল এমন কিছু কেন বলেননি: গ্রেট স্কট, অনটোলজিক্যাল আর্গুমেন্টটি মনে হচ্ছে সম্ভবত সঠিক হতে পারে। কিন্তু ব্যপারটা একটু বেশী সহজ হয়ে গেল না যে, মহাবিশ্ব সম্বন্ধে এমন বিশাল একটি সত্য শুধুমাত্র এধরনের কোন শব্দের খেলা থেকে আসতে পারে? আমি বরং এর অসারতা প্রমান করার চেষ্টা করি, আপাত দৃষ্টি যেটা প্যারাডক্স, যেমন জেনোর প্যারাডক্স (Zeno’s paradox) [৪];গ্রীকদের বেশ কষ্ট হয়েছে জেনোর প্যারাডক্স এ দাবী করা ’প্রমান’, যে অ্যাকিলীস কখনোই কচ্ছপটিকে দৌড়ে ধরতে পারবেনা, এই বিষয়টির আসল রহস্যটা বুঝতে। কিন্তু তাদের যথেষ্ট বোধশক্তি ছিল এর থেকে সেই উপসংহারটি না মেনে নিতে, যে অ্যাকিলীস আসলেই কচ্ছপটি ধরতে পারবে না। বরং তারা এর নাম দিয়েছিল প্যারাডক্স, এবং পরবর্তী প্রজন্মের গনিতজ্ঞদের

জন্য তারা অপেক্ষা করেছিল এর একটি ব্যাখ্যা দেবার জন্য।রাসেল নিজেও, অবশ্য, যে কোন কারো চেয়ে কোন অংশেই কম যোগ্য ছিলেন না, যে বুঝতে, কেন তামাকের টিনটি খুশীতে উপরে ছুড়ে মারা উচিৎ হবেনা, অ্যাকিলীস কচ্ছপটি ধরতে পারবে না সেই আনন্দে; তিনি কেন সেন্ট অ্যানসেল্ম এর যুক্তির ক্ষেত্রে একই সাবধানতা অবলম্বন করেননি? আমার মনে হয়, রাসেল ছিলেন অতিমাত্রার পক্ষপাতহীন একজন নিরীশ্বরবাদী, অতি উৎসাহী ছিলেন মোহভঙ্গর জন্য, যদি তার জন্য কোন যুক্তির প্রয়োজন হয়ে থাকে [৫]; অথবা হয়তো এর উত্তর আছে রাসেলের ১৯৪৬ সালে নিজের একটি লেখায় অনটোলজিক্যাল আর্গুমেন্টকে অসার প্রমাণ করার বহুদিন পরে:

আসল প্রশ্নটি হলো,: এমন কিছু কি আছে যা আমরা চিন্তা করতে পারি, এবং সেটি, শুধুমাত্র আমরা যে সেটি চিন্তা করতে পারছি, সেই সত্যর উপর ভিত্তি করে, আমাদের চিন্তার বাইরে তার অস্তিত্ব আছে বলে দেখাতে পারি? যে কোন দার্শনিক হয়তো চাইবেন, হ্যা বলতে, কারন দার্শনিক এর কাজ পৃথিবী সম্বন্ধে কোন কিছু বোঝা তার চিন্তার মাধ্যমে, কোন কিছু পর্যবেক্ষন করার মাধ্যমে নয়। যদি হ্যা সঠিক উত্তর হয়ে থাকে, তাহলে বিশুদ্ধ চিন্তার অস্তিত্ব আছে এমন কিছুর মধ্যে একটা সেতুবন্ধন আছে। যদি না, তবে কোন যোগসুত্রও নেই।

আমার নিজের অনুভুতি, কিন্তু ঠিক এর বীপরিত, স্বয়ংক্রিয়ভাবেই গভীর সন্দেহ হত যে কোন যুক্তি বাস্তব পৃথিবী থেকে সামান্যতম কোন উপাত্ত ছাড়াই, কিভাবে এধরনের একটি উপসংহারে পৌছাতে পারে। হয়ত এই বিষয়টি ইঙ্গিত করছে, আমি দার্শনিক না বরং একজন বিজ্ঞানী। বহুশতাব্দী ধরে দার্শনিকরা অনটোলজিক্যাল আর্গুমেন্টটির বেশ গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করেছেন, এর পক্ষে এবং বিপক্ষে। নীরিশ্বরবাদী দার্শনিক জে এল ম্যাকি (J. L. Mackie) এ বিষয়ে সুস্পষ্টভাবে আলোচনা করেছিলেন তার দি মিরাকল অব থেইজম (The miracle of Theism) এ। প্রশংসাসুচক অর্থেই বলছি, যখন আমি বলছি, যে আমরা কোন দার্শনিককে প্রায় সংজ্ঞায়িত করতে পারি এমন একজন মানুষ হিসাবে যিনি সাধারন কান্ডজ্ঞান বা কমন সেন্সকে কোন কিছুর উত্তর হিসাবে গ্রহন করেন না।

সবচেয়ে সুনির্দিষ্টভাবে অনটোলজিক্যাল আর্গুমেন্টটিকে ভিত্তিহীন প্রমান করার কৃতিত্ব দেয়া হয়,দুইজন দার্শনিক: ডেভিড হিউম (David Hume)(১৭১১–৭৬) এবং ইমানুয়েল কান্ট (Immanuel Kant)(১৭২৪–১৮০৪) কে; কান্ট আনসেল্ম এর যুক্তির চালাকীর ফাদটা শনাক্ত করেছিলেন, অনেকটা যাদুকরদের কাপড়ের ভাজে রাখা লুকানো কার্ড এর মতন; আনসেল্ম এর এই যুক্তির ক্ষেত্রে কান্টের মতে সেটি হলো, তার পিচ্ছিল প্রাকধারনাটি: যে ’অস্তিত্ব’ অনস্তিত্ব অপেক্ষা বেশী ’পারফেক্ট’ বা নিখুত। যুক্তরাষ্ট্রের দার্শনিক নরমান ম্যালকম (Normal Malcolm) বিষয়টি ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন এভাবে: যে মতবাদ দাবী করছে অস্তিত্ব হলো ক্রটিহীন, তা আসলেই খুব বেশী মাত্রায় অদ্ভুত, যেমন আপনি যদি বলেন, যে আমার ভবিষ্যৎ বাড়ীটি অপেক্ষাকৃত বেশী ভালো হবে যদি তা ইনসুলেটেড বা অন্তরিত না হবার চেয়ে বরং ইনসুলেটেড হয়, এটির একটি অর্থ হয় এবং বাক্যটি সত্যতাও বহন করে; কিন্তু এর কি অর্থ হতে পারে, যদি বলা হয়, এটি একটি ভালো বাসা হবে, যদি এর অস্তিত্ব না থাকার চেয়ে অস্তিত্ব থাকে? [৬]; অষ্ট্রেলিয়ীয় দার্শনিক ডগলাস গাসকিঙ্গ (Douglas Gasking), আনসেল্ম এর যুক্তিটা নিয়ে আয়রনিক প্যারোডি তৈরী করেছিলেন, যিনি বিষয়টি অবশ্য লিপিবদ্ধ করেননি, তবে কুইন্সল্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের উইলিয়াম গ্রে (William Grey) সেটিকে পুননির্মান করেছিলেন এভাবে:

১. এই মহাবিশ্বর সৃষ্টি, কল্পনাতীতভাবে অসাধারণ বিস্ময়কর একটি অর্জন।
২. আর কোন একটি অর্জনের গুনগত বৈশিষ্ট হচ্ছে (ক) এর অন্তর্নিহিত গুনাবলী এবং (খ) এর স্রষ্টার যোগ্যতা বা ক্ষমতার একটি যৌথ ফসল।
৩. স্রষ্টার অক্ষমতা (বা প্রতিবন্ধীতা) যত বেশী হবে, ততই আকর্ষনীয় হবে সেই অর্জন।
৪. একজন স্রষ্টার জন্য সবচেয়ে বড় অক্ষমতা (বা প্রতিবন্ধীতা) হবে তার অস্তিত্বহীনতা।
৫. সুতরাং আমরা যদি ভাবি যে এই মহাবিশ্ব একজন অস্তিত্বশীল সৃষ্টিকর্তারই সৃষ্টি, আমরা সেক্ষেত্রে আরো মহান

একটি সত্বার কথা কল্পনা করতে পারি, যিনি সব কিছু সৃষ্টি করেছেন তার নিজের কোন অস্তিত্ব না রেখেই।
৬. সুতরাং অস্তিত্ব আছে এমন কোন স্রষ্টা অবশ্যই সবচেয়ে মহান হতে পারেনা, যার চেয়ে আর মহান কিছুই ভাবা সম্ভব না কারন আরো বেশী শক্তিশালী এবং অবিশ্বাস্য স্রষ্টা হবে সেই ঈশ্বর, যার কোন অস্তিত্বই নেই।

অতএব ...

৭. ঈশ্বর এর অস্তিত্ব নেই।

বলাবাহুল্য, যে গাসকিঙ্গ কিন্তু আসলে প্রমান করেননি যে ঈশ্বরের কোন অস্তিত্ব নেই। একই ভাবে আনসেল্মও প্রমান করতে পারেননি তার কোন অস্তিত্ব আছে। পার্থক্য শুধু একটা, গাসকিঙ্গ বিষয়টি নিয়ে মজা করেছেন ইচ্ছাকৃতভাবে। কারণ তিনি বুঝতে পেরেছেন,ঈশ্বরের অস্তিত্ব আছে কিনা নেই এই প্রশ্নটি যথেষ্ট বিশাল এবং শুধুমাত্র ‘দ্বান্দিক ছলচাতুরী’ দিয়ে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া যেতে পারে না। এবং আমি মনে করিনা নিখুতত্ব বা পারফেকশনের এর সুচক হিসাবে অস্তিত্ব র পিচ্ছিল ব্যবহার এই যুক্তির সবচেয়ে খারাপ অংশ। আমার ঠিক বিস্তারিত মনে নেই কিন্তু একবার ধর্মতাত্বিক এবং দার্শনিকদের একটা সমাবেশে তাদের খোচা দিয়েছিলাম, অনটোলজিক্যাল যুক্তি ব্যবহার করে শুকররা উড়তে পারে তা প্রমান করে। তাদের মনে হয়েছিল, তারা মোডাল লজিকের আশ্রয় নিতে পারেন আমাকে ভুল প্রমান করানোর জন্য।

ঈশ্বরের স্বপক্ষে প্রস্তাবিত অন্যান্য সব এ প্রাইওরী যুক্তির মতই, অনটোলজিক্যাল আর্গুমেন্ট আমাকে আলডস হাক্সলী (Aldous Huxley) এর পয়েন্ট কাউন্টার পয়েন্টের (Point Counter Point) বইয়ের এর সেই বৃদ্ধর কথা মনে করিয়ে দেয়, যে ঈশ্বরের অস্তিত্বের স্বপক্ষে একটি গানিতীক প্রমান আবিষ্কার করেছিলেন:

আপনারা তো সেই সূত্র জানেন, শুন্যর মান যদি m হয় তাহলে তা অসীমের সমান, যেখানে m হচ্ছে যে কোন ধনাত্মক একটি সংখ্যা। বেশ, আমরা এই সমীকরণটিকে আরেকটু সরল করি না কেন, সমীকরনের দুই পাশে শুন্য দিয়ে গুন করে। সেক্ষেত্রে আপনি পাচ্ছেন m যা অসীম এবং শুন্যর গুনফলের সমান। বা বলা যায়, একটি ধনাত্মক সংখ্যা অসীম এবং শুন্যর গুনফলের সমান। সেটা কি প্রমান করেনা একেবারে শুন্য থেকে কোন অসীম শক্তিমান এই মহাবিশ্ব সৃষ্টি করতে পারেন? পারেন না তিনি?

দুর্ভাগ্যজনকভাবে, দিদোরো (Diderot) এনলাইটেন্টমেন্ট যুগের বিশ্বকোষ রচয়িতা এবং সুইস গনিতজ্ঞ ইউলার (Euler) এর বিখ্যাত কাহিনী আদৌ ঘটেছিল কিনা সন্দেহ আছে। তবে প্রচলিত কাহিনী অনুযায়ী, ক্যাথেরিন দ্য গ্রেট, তাদের দুজনের মধ্যে একটি বিতর্কের আয়োজন করেছিলেন, যেখানে ধার্মিক ইউলার নিরীশ্বরবাদী দিদেরোকে চুড়ান্ত আত্মবিশ্বাসের সাথে তার চ্যালেন্জ ছুড়ে দিয়েছিলেন এভাবে: ’ $(a+bn)/n = x$ সুতরাং ঈশ্বরের অস্তিত্ব আছে, উত্তর দিন! এই কাহিনীর মুল বিষয়টা হলো দিদেরো গনিতজ্ঞ ছিলেন না সুতরাং সংশয় নিয়ে তিনি এই বিতর্কে আর অগ্রসর হননি। তবে বি এইচ ব্রাউন এর অ্যামেরিক্যান ম্যাথমেটিক্যাল মান্হলী (১৯৪২) তে উল্লেখ করেছিলেন, দিদেরো আসলে একজন বেশ দক্ষ গনিতজ্ঞ, এবং ইউলার এর ধরনের যুক্তিতে ধরাশায়ী হবার মত মানুষ তিনি ছিলেন না, ইউলার যা করেছিলেন তা সম্ভবত বলা যায় ব্লাইন্ডিং উইথ সায়েন্স থেকে যুক্তি (এখানে গনিত); ডেভিড মিলস, তার অ্যাথিষ্ট ইউনিভার্স এ তার সাথে একজন ধর্মীয় মুখপাত্রের রেডিও সাক্ষাৎকারের বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেছিলেন: যেখানে সেই ধর্মীয় মুখপাত্রটি ভর ও শক্তির অবিনশ্বরতার সুত্র বা ল অব কনসারভেশন অব মাস-এনার্জি ব্যবহার করেছিলেন একটা অদ্ভুতভাবে অকার্যকর বিজ্ঞানের অন্ধ ধারনার যুক্তি প্রয়োগের কৌশল হিসাবে: যেহেতু আমরা সবাই বস্তু আর শক্তি দিয়ে তৈরী, এই বৈজ্ঞানিক মৌলিক নীতিটি কি অনন্ত জীবনের প্রতি বিশ্বাসকে বিশ্বাসযোগ্যতা দেয় না? আমি যেভাবে এর উত্তর দিতাম মিলস তার চেয়ে অনেক ভদ্র ভাবে এবং ধৈর্য সহকারে এর উত্তর দিয়েছিলেন, কারন এই সাক্ষাতকারগ্রহনকারী যা বলছিলেন, বোধগম্য

ইংরেজীতে এর অনুবাদ করলে দাড়ায়: আমরা যখন মৃত্যুবরণ করবো, আমাদের শরীরের একটি অ্যাটমও (এবং কোন শক্তিও না) হারিয়ে যায় না। সেকারনে আমরা অমর’।

এমনকি আমিও, আমার দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় এমন ছেলেমানুষী খেয়ালী ভাবনার মুখোমুখি হইনি। আমি যদিও আরো বিস্ময়কর সব প্রমান দেখেছি, যা সংগ্রহাকারে আছেhttp://www.godlessgeeks.com/ LINKS/ GodProof.htm ওয়েবসাইটে যেখানে অত্যান্ত মজার একটি তালিকা আছে যার নাম ’তিনশ’র বেশী প্রমান যে ঈশ্বর এর অস্তিত্ব আছে ’;এখানে খুবই হাস্যকর আধাডজন প্রমানের একটি তালিকা, শুরু হয়েছে প্রমান নং ৩৬ দিয়ে:

৩৬. অসম্পুর্ন ধ্বংশ বা ইনকমপ্লিট ডিভাসস্টেশন থেকে যুক্তি: একটি প্লেন ক্র্যাশ করার পর ১৪৩ জন প্যাসেন্জার এবং বিমানের ক্র নিহন হস, কিন্তু একটি মাত্র শিশু বেচে যায়, যদিও তৃতীয় ডিগ্রীর পোড়া নিয়ে, সুতরাং ঈশ্বর আছেন।

৩৭. সম্ভাব্য পৃথিবীদের বা পসিবল ওয়ার্ল্ডস থেকে আর্গুমেন্ট: যদি সব কিছু ভিন্ন হয়ে থাকতো তবে সব কিছুই ভিন্ন হতো; সেটা ভালো হতো না। সুতরাং ঈশ্বর আছেন।

৩৮. তীব্র ইচ্ছা শক্তি বা শিয়ার উইল থেকে আর্গুমেন্ট: আমি ঈশ্বরে বিশ্বাস করি! আমি ঈশ্বরে বিশ্বাস করি! আমি করি, আমি করি আমি করি। আমি ঈশ্বরে বিশ্বাস করি! সুতরাং ঈশ্বর আছেন।

৩৯. অবিশ্বাস থেকে আর্গুমেন্ট: বিশ্বের বেশীর ভাগ মানুষই খৃষ্ট ধর্মে বিশ্বাস করেনা, সেটাই শয়তানের ইচ্ছা। সুতরাং ঈশ্বর আছেন।

৪০. মৃত্যু পরবর্তী অভিজ্ঞতা থেকে আর্গুমেন্ট: ক নামক ব্যক্তি নিরীশ্বরবাদী অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছেন। তিনি তার ভুল বুঝতে পেরেছেন। সুতরাং ঈশ্বর আছেন।

৪১. ইমোশনাল ব্ল্যাকমেইল থেকে আর্গুমেন্ট: ঈশ্বর আপনাকে ভালবাসে। আপনি কিভাবে তাকে বিশ্বাস করতে না পারার মত এত নির্মম হতে পারলেন ? সুতরাং ঈশ্বর আছেন।

সৌন্দর্য থেকে যুক্তি বা আর্গুমেন্ট ফ্রম বিউটি:

কিছুক্ষন আগে উল্লেখ করা অ্যালডস হাক্সলীর উপন্যাসটিতে আরো একটি চরিত্র আছে, যিনি ঈশ্বরের অস্তিত্বের স্বপক্ষে প্রমান দিয়েছেন গ্রামোফোনে বীটহোভেন এর স্ট্রীং কোয়ার্টেট নং ১৫ ইন এ মাইনর বাজিয়ে (‘*heiliger Dankgesang*’); শুনতে তেমন বিশ্বাসযোগ্য মনে না হলেও, এটি কিন্তু বেশ জনপ্রিয় একটি আর্গুমেন্ট। আমি গোনা বন্ধ করে দিয়েছি যে কতবার আমি এই প্রসঙ্গে কম বেশী শক্ত চ্যালেন্জ এর মুখোমুখি হয়েছি: বেশ, কেমন করে আপনি শেক্সপিয়ারকে ব্যাখ্যা করবেন? (এই বাক্যে আপনার আপনার পছন্দ মত শুবার্ট, মাইকেলেন্জেলো ইত্যাদি যে কাউকে দিয়ে শেকসপিয়ারকে প্রতিস্থাপিত করতে পারেন) ; এই যুক্তি একই রকমই থাকবে, আমার আর সেটা ব্যাখ্যা দেবার প্রয়োজন নেই। কিন্তু এর পেছনের মুল যুক্তিটা কখনো সুস্পষ্টভাবে বলা হয়নি, আপনি যত বেশী ভাববেন ততই যুক্তিটির অসারতাটা স্পষ্ট হবে আপনার কাছে। কোন সন্দেহ নেই বীটহোভেন এর শেষের কোয়ার্টেটগুলোর আছে স্বর্গীয় সৌন্দর্য, শেকসপিয়ারের সনেটগুলোও তা। ঈশ্বর থাকা বা না থাকার উপর তাদের অসাধারন সৌন্দর্যর কোনই হের ফের হয় না। অবশ্যই তারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমান করেনা; তারা বীটহোভেন এবং শেকসপিয়ারের অস্তিত্ব প্রমান করে। একজন বিখ্যাত কন্ডাক্টর সম্ভবত বলেছিলেন, ‘আপনি যদি শোনার জন্য মোজার্টকে পান তাহলে আপনার ঈশ্বরকে কেন প্রয়োজন? ডেজার্ট আইল্যান্ড ডিস্ক নামের একটি বিবিসি রেডিও শোতে আমি একবার অতিথি হয়েছিলাম; সেখানে আমাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, যদি কোন মরুদ্বীপে আটকা পড়ে যাই তাহলে সেখানে

নেবার জন্য আমাকে যে কোন আটটা রেকর্ড পছন্দ করতে হবে। আমার পছন্দের মধ্যে ছিল বাখ এর *St MatthewPassion* থেকে *'Mache dich mein Herze rein'*; আমার সাক্ষাৎকার গ্রহনকারী বুঝতে পারছিলেন না, আমি ধার্মিক না হয়েও কিভাবে ধর্মীয় সঙ্গীত পছন্দ করলাম। আপনি হয়তো অন্যভাবে বলতে পারেন এই একই কথা, কেন আপনি *Wuthering Heights* পড়ে আনন্দ পাবেন যখন ভালো করেই আপনার জানা আছে ক্যাথী এবং হিথক্লিফ এর আসলেই কোন অস্তিত্ব নেই?

আমার মনে হয় আমি আরো একটি বিষয় উল্লেখ করেছিলাম এবং যেটা আসলে উল্লেখ করতেই হবে বিশেষ করে যখন ধর্মকে বিশেষ কোন সৃষ্টির জন্য কৃতিত্ব দেয়া হয়, যেমন, মাইকেলেন্জেলোর সিস্টিন চ্যাপেল বা রাফ্যায়েল এর *Annunciation*। এমন কি বড় মাপের শিল্পীদেরও জীবন বাচাতে আয় করতে হয়। যেখানে কাজ পাওয়া যায় তাদের সেই সুযোগ নিতে হয়; আমার কোন সন্দেহ নেই মাইকেলেন্জলো বা রাফায়েল দুজনেই খৃষ্ঠ ধর্মাবলম্বী, তাদের সময়ে শুধু মাত্র এটাই হবার সুযোগই ছিল, কিন্তু এই সত্যটা প্রায় কাকতালীয় একটা ব্যাপার কারন সে সময় বিপুল পরিমানে অর্থের মালিক ছিল শুধু চার্চই, তারাই তখন শিল্পের প্রধান সমঝদার ছিল। যদি ইতিহাস অন্যরকম হত, তাহলে মাইকেলেন্জেলো বিশাল বিজ্ঞান যাদুঘরের ছাদে কাজ করার কমিশন পেতেন; তিনি কি তখন তার সিস্টিন চ্যাপেলের মত অসাধারণ কাজ করতেন না? দু:খজনক ব্যপার আমরা কোনদিনও বীটহোভেন এর *Mesozoic Symphony* বা মোজার্ট এর অপেরা *The Expanding Universe* শুনতে পারবো না। একই ভাবে আমরা হাডিন এর *Evolution Oratorio* শোনা থেকেও বঞ্চিত হয়েছি, কিন্তু তিনি আমাদের তার *Creation* শোনা থেকে বঞ্চিত করেননি। এই যুক্তিটাকে অন্যদিক থেকে দেখলে কেমন হয়; আমার স্ত্রী যে ভয়ঙ্কর সম্ভাবনাটার কথা প্রস্তাব করেছিল তা হলো, যদি শেকসপিয়ারকে চার্চের জন্য কাজ করতে বাধ্য হতে হত? আমরা নি:সন্দেহে হ্যামলেন, কিং লিয়ার আর ম্যাকবেথ পেতাম না আর এর বদলে কি পেতাম আমরা? স্বপ্ন তৈরী করে এমন সব কিছু? স্বপ্ন দেখে যান তাহলে।

মহান কোন শিল্পকর্মকে ঈশ্বরের অস্তিত্বের সাথে সংযুক্ত করে এমন যদি কোন যৌক্তিক যুক্তি থাকে, সেটা কিন্তু এই যুক্তির প্রস্তাবকরা স্পষ্ট করে বলছেন না। শুধু ধরে নেয়া হয়েছে,এমনই হবার কথা বা স্বপ্রমানিত কোন একটি বিষয় হিসাবে। অবশ্যই সেটা না। হয়তো এটা আর্গুমেন্ট ফ্রম ডিজাইনের আরো একটি সংস্করণ হিসাবে দেখতে হবে: শুবার্ট এর সঙ্গীত প্রতিভার মস্তিষ্ক নিজেই একটি অসম্ভাব্যতার বিস্ময়, এমন কি মেরুদন্ডী প্রানীদের চোখের তুলনায়। অথবা আরো খারাপ অর্থে, এই যুক্তি কি দাবী করছে, হয়তো প্রতিভাবানদের প্রতি ঈর্ষা, কি সাহস, অন্য একজন মানুষ এত সুন্দর সঙ্গীত/কবিতা/শিল্পকর্ম সৃষ্টি করছে, যখন আমি পারছি না? সুতরাং নিশ্চয়ই ঈশ্বরই এসব করছেন।

ব্যাক্তিগত 'অভিজ্ঞতা' থেকে আর্গুমেন্ট :

আন্ডারগ্রাজুয়েট থাকাকালীন আমার সমকালীনদের মধ্যে অন্যতম একজন বুদ্ধিমান এবং বেশ প্রাপ্তবয়স্ক মানসিকতা সম্পন্ন, যে আবার খুবই ধার্মিকও বটে, একবার স্কটল্যান্ডের কোন একটি দ্বীপে ক্যাম্পিং করতে গিয়েছিল, মাঝরাতে সে এবং তার বান্ধবী তাদের তাবুতে হঠাৎ করে ঘুম থেকে জেগে উঠে, শয়তানের কন্ঠস্বর শুনে– শয়তানের নিজের গলা। তাদের ভাষ্যানুযায়ী এ বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই: সেই শব্দটি নি:সন্দেহে ভীতিকারক কিংবা যাকে বলা হয় ডায়াবলিক্যাল; আমার এই বন্ধু কোনদিনও ভুলতে পারেনি তার এই ভয়াবহ অভিজ্ঞতা। এবং এটাই অন্যতম একটি কারন ছিল পরবর্তীতে তার পাদ্রী হিসাবে দীক্ষা নেবার জন্য। আমার তরুন মনকে খুব নাড়া দিয়েছিল এই গল্পটি। পরে কোন একসময় আমি এই গল্পটি প্রানীবিজ্ঞানীদের একটি সমাবেশের এক পর্যায়ে, যখন তারা অক্সফোর্ড এর রোজ এবং ক্রাউন ইনে অবসর সময় কাটাচ্ছিলেন তখন তাদেরকে এই কাহিনীটা বলি। এদের মধ্যে দুজন ছিলেন অভিজ্ঞ পাখী বিশেষজ্ঞ, তারা দুজনেই স্বশব্দে হেসে ওঠেন, আনন্দের সাথে তারা একসাথে চিৎকার করে বলে উঠেন 'Manx Shearwater!' এদের একজন যোগ করেন,

শয়তানের সাথে তুলনা করার মত চিৎকার এবং আওয়াজ এই প্রজাতির পাখিদের বিশেষ বৈশিষ্ট, একারনে পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় ও বিভিন্ন ভাষায় এদের স্থানীয় নাম 'ডেভিল বার্ড' বা 'শয়তান পাখি'।

অনেক মানুষই ঈশ্বরে বিশ্বাস করে কারন তারা বিশ্বাস করে তারা তার একটি ভিশন দেখেছে বা কোন ফেরেশতা বা অ্যান্জেল বা কোন নীল কাপড় পরা কুমারীকে –তারা স্বচক্ষে দেখেছে, অথবা ঈশ্বর তাদের মস্তিষ্কের মধ্যে সরাসরি কথা বলেছে। এই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার যুক্তি, তাদের কাছেই সবচেয়ে বিশ্বাসযোগ্য, যারা দাবী করেন এই ধরনের অভিজ্ঞতা তাদের আছে। কিন্তু বাকী সবার কাছে এবং যারা মনোবিজ্ঞান সমন্ধে কাজ চালানোর মত জ্ঞান আছে, তাদের কাছে এই যুক্তির ভিত আদৌ মজবুত না।

আপনি বলছেন সরাসরি আপনার ঈশ্বরের অভিজ্ঞতা আছে? বেশ, কিছু মানুষ এর অভিজ্ঞতা আছে গোলাপী হাতির;কিন্তু ব্যপারটা আপনার কাছে হয়তো ব্যাপারটা তেমন গুরুত্বপুর্ণ কিছু না। পিটার সাটক্লিফ, ইয়র্কশায়ার রিপার, যে সুস্পষ্টভাবে দাবী করেছিল, সে যীশুর নির্দেশ শুনতে পেয়েছিল যে মহিলাদের হত্যা করতে হবে এবং এর জন্য তার যাবজ্জীবন কারাদন্ডও হয়েছিল। জর্জ ডাবলিউ বুশ দাবী করেছিলেন, ঈশ্বর তাকে ইরাক আক্রমন করতে নির্দেশ দিয়েছেন (ব্যাপারটা দু:খজনক ঈশ্বর তাকে নিশ্চিৎ করে সেই দিব্যজ্ঞান দেয়া থেকে বিরত থেকেছেন: যে সেখানে তিনি উইপন অব মাস ডেস্ট্রাকশন খুজে পাবেন না)। মানসিক আশ্রমে অনেক ব্যক্তিকে পাওয়া যায় যারা নিজেদের নেপোলিয়ন বা চার্লি চ্যাপলিন মনে করেন বা মনে করেন সারা পৃথিবী তাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছেন, কিংবা তারা তাদের চিন্তা আরেক জনের মস্তিষ্কে সম্প্রচার করতে পারে। আমরা তাদের কথা শুনি ঠিকই, কিন্তু গুরুত্ব সহকারে তাদের অন্তস্থল থেকে উদ্ভব এই দাবীগুলোতে বিবেচনা করিনা, কারন এই ধরনের ধারনার সাথে খুব বেশী মানুষ সহমত পোষন করেন না। ধর্মীয় অভিজ্ঞতার ব্যাপারটা ভিন্ন কারন এধরনের অভিজ্ঞতার দাবীদার মানুষের সংখ্যা অগনিত। স্যাম হ্যারিস মোটেও অতিমাত্রায় নিরাশাবাদী অবস্থান নেননি যখন তার *The End of Faith* তিনি লিখেছিলেন:

যাদের অনেক ধরনের বিশ্বাস আছে যাদের কোন যৌক্তিক ভিত্তি নেই, এই সব মানুষদের ডাকার জন্য আমাদের কাছে একটা নাম আছে, যখন তাদের এই বিশ্বাস যখন খুব বেশী মাত্রায় সর্বব্যাপী প্রচলিত হয়, তখন আমরা তার নাম দেই ধর্মীয় বিশ্বাস, কিন্তু তা না হলে,এদের সম্ভাব্য নাম জোটে উন্মাদ, মানসিক রোগাক্রান্ত কিংবা বিভ্রান্ত। স্পষ্টতই সংখ্যার হিসাবে সাথে মানসিক সুস্থতা। এবং তারপরও এটি শুধুমাত্র ইতিহাসের একটি দুর্ঘটনা, যে আমরা সমাজ এই বিশ্বাসটিকেই স্বাভাবিক মনে করে, যে মহাবিশ্বের একজন সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব আছে, যিনি আপনার চিন্তাকে পড়তে পারেন। যদিও এটা মানসিক অসুস্থতার লক্ষন যে বিশ্বাস করা, যে তিনি আপনার সাথে যোগাযোগ করছেন আপনার শোবার ঘরের জানালার কাচে বৃষ্টির ফোটার মোর্স কোড ব্যবহার করে। এবং সুতরাং, যদিও ধর্মবিশ্বাসী মানুষ সাধারনত: উন্মাদ না তবে তাদের মুল বিশ্বাসগুলো অবশ্যই তার লক্ষণ বহন করছে।

হ্যালুসিনেশনের ব্যপারটায় আমি পরে আবার আসাবে অধ্যায় ১০ এ। মানুষের মস্তিষ্ক অতি অসাধারন সিমুলেশন বা কাল্পনিক পরিস্থিতির কোন সফটওয়ারের মত প্রোগ্রাম চালাতে পারদর্শী। আমাদের চোখ কিন্তু আমাদের ব্রেনকে কোন বিশ্বস্থ ফটোগ্রাফ দেখায়না, যা আসলে চোখের সামনে বিদ্যমান বা সঠিক সেই চলমান দৃশ্য, যা ঠিক সেই সময়ই ঘটছে, তার বিশ্বস্ত হুবুহ ফটোগ্রাফটি দেখায়না। আমাদের ব্রেন যেটা করে তা হলো বিরামহীন ভাবে আপডেটেড মডেল তৈরী করে। অপটিক স্নায়ুপথে আসার অসংখ্য সংকেত দিয়ে আপডেটেড হতে থাকে, তবে তা ঠিকই দৃশ্যের একটি মডেল তৈরী করে নেয়। অপটিক্যাল ইল্যুশন বা দৃষ্টি বিভ্রম আমাদের জন্য এ বিষয়টির একটি উজ্বল দৃষ্টান্ত। প্রধান ধরনের দৃষ্টিবিভ্রম বা ইল্যূশনের–, যার একটি বিশেষ উদহারন হচ্ছে নেকার কিউব– উদ্ভব হবার কারন ইন্দ্রিয়দের থেকে যে ডাটা ব্রেন পাচ্ছে তা আসলে বাস্তবতার দুটি আলাদা বা সমন্বয়যোগ্য বিকল্প মডেল [৭];ব্রেন এর পক্ষে এই দুটির মধ্যে কোন একটিকে বেছে নেবার জন্য স্বতন্ত্র কোন ভিত্তি নেই, তাই সে পালাক্রমে এদের বেছে নেয়। আমরাও অভিজ্ঞতা লাভ করি একটি অন্তস্থ মডেল থেকে অন্য মডেলের মধ্যে

ধারাবাহিক পালা পরিবর্তন। যে ছবির দিকে তাকিয়ে আছি বলে মনে করি আক্ষরিক অর্থে উল্টে যায় এবং রুপান্তরিত হয় সম্পুর্ণ অন্যকিছুতে।

ব্রেনের সিমুলেশন সফটওয়্যার সবচেয়ে বেশী দক্ষ চেহারা এবং কন্ঠস্বরকে তৈরী করতে। আমার জানালার উপরই একটা আইনস্টাইনের প্লাষ্টিক মুখোশ আছে;সামনে থেকে দেখলে, এটি একটি ঘন পুর্ণ মুখের মত মনে হয়,এটি বিস্ময়কর কিছু নয়,তবে যেটা বিস্ময়কর সেটা হল পেছন থেকে, ফাকা জায়গার দিক থেকে,তখনও এটিকে ঘন বা সলিড একটি মুখের মত মন হয় এবং জিনিসটি বোঝার ক্ষেত্রে আমাদের পারসেপশনটাও আসলে খুব অদ্ভুত। দর্শক যখনই নাড়াচাড়া করছে মুখটাও যেন তা অনুসরণ করছে এবং এটি কিন্তু সেই দুর্বল,তেমন বেশী বিশ্বাসযোগ্য না অর্থে, মোনা লিসার চোখ আপনাকে অনুসরণ করছে বিষয়টির মতই। এই ফাপা মুখোশটা যেন আসলেই তাকাচ্ছে, নাড়াচাড়া করছে। যারা এই দৃষ্টিবিভ্রমটি আগে দেখেননি তারা বেশ চমকে যাবেন । আরো বিস্ময়কর, যদি মুখোশটিকে একটি ধীরে ঘুর্নায়মান কোন টেবিলের উপর রাখা যায়,দেখা যায় এটি ঠিক সঠিক দিকেই তাকিয়ে আছে,যখন আপনি এটি ঘন বা পুর্ণদিক থেকে দেখছেন, কিন্তু এটা যেন বীপরিত দিকে তাকায় যখন ফাপা দিকটা দৃষ্টির সামনে আসে। এর ফলাফলটা হচ্ছে যখন আপনি দেখবেন একপাশ থেকে অন্যপাশের এই দিক পরিবর্তন হচ্ছে,যেদিকটা আসছে অর্থাৎ কামিং সাইডটি, যে দিকটা চলে যাচ্ছে বা গোয়িং সাইডকে মনে হচ্ছে যে খেয়ে ফেলছে। এটি একটি অসাধারন দৃষ্টি বিভ্রম, একটু ঝামেলা সহ্য করে দেখার যোগ্য একটি বিষয়। কখনো কখনো আপনি বিস্ময়করভাবে কাছাকাছি চলে আসতে পারেন ফাপা মুখের কাছে এবং তারপরও আপনি দেখতে ব্যর্থ হতে পারেন, যে এটা আসলেই ফাপা কিনা? যখন আপনি দেখতে পাবেন, আবার তখন আরেকটি পরিবর্তন বা মডেলটির ফ্লিপ ঘটে যায়, যা আবার পরিবর্তনযোগ্য। কেন এটা হচ্ছে? এই মুখোশ তৈরী করার মধ্যে কিন্তু কোন কৌশল নেই। যে কোন ফাপা মুখোশ এই কাজটা করতে পারে। যে দেখবে তার ব্রেনেই এই চালাকীটা ঘটে। ভিতরের সিমুলেটিং সফটওয়্যার যা ডাটা পায়, যা ইঙ্গিত করে হয়তো একটি মুখের অস্তিত্ব, হয়তো একজোড়া চোখ ছাড়া আর বেশী কিছু না, নাক বা একটি মুখ মোটামুটি যে জায়গায় তাদের থাকার কথা সেখানে। এধরনের বিচ্ছিন্ন কিছু ক্লু পাবার পর ব্রেণ তার বাকী কাজটা নিজেই করে নেয়। মুখের সিমুলেশন সফটওয়্যার কাজ শুরু করে এবং মুখের একটি সম্পুর্ন সলিড বা ঘন মডেল তৈরী করে, এমনকি যখন প্রকৃত বাস্তবতা যে দেখাচ্ছে চোখকে তা হলো মুখের ফাপা একটি মডেল। এই ভুল দিকে আবর্তনের বিভ্রমটা আসে কারন (কঠিন বিষয়টি, কিন্তু আপনি যদি সতর্ক হয়ে ব্যপারটি নিয়ে চিন্তা করেন আপনি এটা নিশ্চিৎ করতে পারবেন) বীপরিতমুখী আবর্তন হচ্ছে অপটিক্যাল ডাটাগুলোর কোন একটা বোধগম্য অর্থ করার একমাত্র উপায়, যখন ফাকা মুখোশ আবর্তনের সময় যে দেখছে তা মনে হবে ঘন। অনেকটা ঘুর্ণায়মান রাডার ডিশের মায়ার মত, যা আপনি এয়ারপোর্টে দেখে থাকবেন, মাঝে মাঝে যতক্ষন না ব্রেন রাডার ডিশটির সঠিক মডেল বদলে নেয়, আপনি একটি ভুল মডেলকে ঘুরতে দেখবেন ভুল দিকে তবে খুব আজব একটা বিভ্রান্তির সাথে।

আমি এটা উল্লেখ করলাম আমাদের ব্রেণের শক্তিশালী সিমুলেটিং সফটওয়্যার সম্বন্ধে একটি ধারনা দেবার জন্য। এটি বিশেষভাব দক্ষ, ভিশন (কোন দৃশ্য) বা ভিজিটেশন বা কারো আবির্ভাব সম্বন্ধে চুড়ান্তভাবে বিশ্বাসযোগ্য সত্যিকার একটি ধারনা দিতে। কোন অশরীরি আত্মা বা ফেরেশতা বা একটি ভার্জিন মেরী র একটি কাল্পনিক উপস্থিতিকে বিশ্বাসযোগ্য উপায়ে সিমুলেট করা ক্ষমতা আমাদের ব্রেনের এই ধরনের কোন উন্নত সফটওয়্যারের ক্ষেত্রে ছেলেখেলা মাত্র। একই জিনিসই আবার ঘটে মাঝে মাঝে কিছু শোনার ক্ষেত্রে। আমরা যখন কিছু শুনি এটি হুবুহু অবিকলভাবে আমাদের অডিটরী স্নায়ু বহন করেনা, এই স্নায়ুটি শব্দ সংকেতগুলো আমাদের ব্রেনে পৌছে দেয় না কোন হাই-ফিডেলিটি ব্যাঙ্গ অ্যান্ড ওলুফসেন এর সাউন্ড সিস্টেম এর মত। দৃষ্টির মতই আমাদের ব্রেনও শব্দের মডেল তৈরী করে, বিরামহীন ভাবে আসা অডিটরী স্নায়ু সংকেত এর মাধ্যমে। সে কারনে যখন কোন ট্রাম্পেট ব্লাস্ট এর শব্দ শুনি আমরা একটি নোট হিসাবে, বিশুদ্ধ কোন যৌগিক টোনের হারমনিকস হিসাবে না যা এর সাথে ব্র্যাসি একটা চাপা গর্জন যোগ করে দেয়। কোন ক্ল্যারিনেট যদি সেই একই নোট বাজায় তাহলে শুনতে কাঠের খানিকটা ভরাট আওয়াজ এবং একটি ওবোর আওয়াজ আরো রিডি বা সুতীক্ষ্, কারন বিভিন্ন নোটদের একটি

হারমোনিকস এর ভারসাম্য এটা নির্ধারন করে। আপনি যদি সতর্কতার সাথে সাইন্ড সিনথেসাইজারের প্রত্যেকটা হারমনিকস আলাদা আলাদা ভাবে বাজান, আপনার মস্তিষ্ক কিছুক্ষনের জন্য এই শব্দগুলোকে বিশুদ্ধ টোনের একটি কম্বিনেশনে শুনতে পায়, যতক্ষন না পর্যন্ত আমাদের ব্রেনের সিমুলেশন সফটওয়ার ব্যাপারটা ’ধরতে’ পারে এবং এর পর থেকে আমরা শুধুমাত্র একটি বিশুদ্ধ নোট,হয় ট্রাম্পেট বা ওবো,যাই হোক না কেন শুনতে পাই। আমাদের কথায় উষ্চারিত স্বরবর্ণ বা ব্যান্জ্ঞনবর্ণ আমদের মস্তিস্কের মধ্যে এভাবে তৈরী হয় এবং সুতরাং অন্য একটি পর্যায়ে, আরো উচু অর্ডারের ফোনেম এবং শব্দগুলোও তৈরী হয়।

শৈশবে, একবার আমি ভুতের গলার আওয়াজ শুনেছিলাম: একটা পুরুষ কন্ঠ, বিড়বিড় করে কি যেন বলছে,মনে হচ্ছে কিছু পড়ছে বা প্রার্থনা করছে; আমি প্রায় পুরোটাই, যদিও সবটা না, কি বলছিল, সেই শব্দগুলো বুঝতে পারছিলাম, আমার কাছে মনে হয়েছিল যা খুব স্বতন্ত্র একটি গম্ভীর কন্ঠস্বর। পুরোনো বাড়ীর যাজকদের ঘর বা প্রিষ্ট হোল সম্বন্ধে আমাকে নানা গল্প বলা হয়েছিল। এবং এ জন্য আমি কিছুটা ভয়ও পেয়েছিলাম;কিন্তু তারপরও কৌতুহলবশত শব্দটার উৎস খোজার জন্য আমি বিছানা থেকে উঠেছিলাম; যতই কাছে যাচ্ছিলাম, শব্দটার তীব্রতা বাড়ছিল এবং তারপর হঠাৎ করেই আমার মাথার মধ্যে এটি উল্টে গেল, আমি শব্দের আসল উৎসটা স্পষ্ট বোঝার মত অবশেষে যথেষ্ট কাছাকাছি পৌছালাম; দরজার চাবির ছিদ্র দিয়ে বাতাস দ্রুত আসা যাওয়া করার প্রক্রিয়ায় শব্দটি তৈরী হচ্ছিল, এবং এটি যে শব্দ তৈরী করছিল তা আমার মস্তিষ্কের সিম্যুলেশন সফটওয়ারটি একটি মডেল তৈরী করে কোন পুরুষের গভীর কন্ঠস্বরের কথামালার। আমি যদি সহজে প্রভাবিত করা যায় এমন শিশু হতাম, তাহলে সম্ভবত আঅস্পষ্ট অবোধ্য কথা শোনার বদলে হয়ত আমি শুনতে পেতাম সুনির্দিষ্ট শব্দ এবং এমন কি বাক্যগুলো। আর একইসাথে আমি যদি সহজে প্রভাবিত হবার মত এবং ধর্মীয় ভাবে প্রতিপালিত হতাম, আমি ভাবতাম, বাতাস কি বলছে ।

অন্য আরেকটি ঘটনায়, প্রায় একই বয়স তখন আমার, আমি একটা দানবীয় আকারের মুখকে দেখেছিলাম, অবর্ণনীয় অশুভদৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে আছে, সমুদ্রের পাশে একটা সাধারন গ্রামের খুবই সাধারণ বাসার জানালা দিয়ে। একটু ভয় নিয়ে আমি সেই মুখের দিকে অগ্রসর হতে থাকি, যতক্ষন না পর্যন্ত খুব কাছাকাছি পৌছে বুঝতে পারি, আসলে এটি কি: কাকতলীয়ভাবে একটা অস্পষ্ট মুখের মত সজ্ঞা তৈরী করেছে জানালার পর্দাগুলো এলোমেলোভাবে ভাজ হয়ে। এই মুখ এবং তার অশুভ বলয়, একটি ভীত শিশুর মস্তিষ্ক কল্পনা করে তৈরী করে নিয়েছে। সেপ্টেম্বর ১১, ২০০১ সালে সন্ত্রাসী হামলায় বিধ্বস্ত টুইন সেন্টার থেকে বেরিয়ে আসা ধোয়ার কুন্ডলীর মধ্যে অনেক ধার্মিকই খোদ শয়তানের চেহারা আদল দেখতে পেয়েছিলেন: একটি কুসংস্কার যাকে উস্কে দিয়েছে একটি ফটোগ্রাফ যা ইন্টারনেটে ব্যপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল।

কোন মডেল তৈরী করার ব্যাপারে মানুষের মস্তিষ্ক অত্যন্ত দক্ষ। আমরা যখন ঘুমিয়ে থাকি, তখন একে বলি স্বপ্ন আর যখন জেগে থাকি, আমরা বলি কল্পনা বা যখন তারা খুবই বেশী স্পষ্ট, তখন বলি হ্যালুসিনেশন (ভ্রম); দশম অধ্যায়ে আমরা দেখবো, শিশুরা যাদের কাল্পনিক বন্ধু আছে, তারা তাদের স্পষ্টই দেখতে পায়, যেন আসলেই বাস্তবে তাদের অস্তিত্ব আছে। আমরা যদি সরল বিশ্বাসপ্রবন হয়ে থাকি, আমরা হ্যালুসিনেশন বা জেগে দেখা স্বপ্ন বা লুসিড স্বপ্নকে শনাক্ত করতে পারিনা, বিষয়টা আসলে কি, বরং আমরা দাবী করি আমরা কোন ভুত দেখলাম বা শুনলাম বা কোন ফেরেশতা, বা ঈশ্বর; অথবা, আমাদের বয়স যদি অল্প হয় এবং আমরা মহিলা ও ক্যাথলিক হই, সেক্ষেত্রে কুমারী মাতা মেরীকে। এধরনের কোন ভিশন বা আপাত প্রকাশ অবশ্যই ভুত, ফেরেশতা, ঈশ্বর কিংবা কুমারীদের অস্তিত্বে বিশ্বাস করার জন্য শক্ত কোন কারণ নয়। এর উপর আবার আছে গন হারে এই সব দৃষ্টি বিভ্রম দেখার কাহিনী। পর্তুগালের ফাতিমায় ১৯১৭ সালে প্রায় সত্তর হাজার তীর্থ যাত্রী যেমন দাবী করে তারা দেখেছিল, সুর্য আকাশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে, উপস্থিত মানুষের জমায়েত এর উপর ভেঙ্গে পড়ছে [৮], এই গন বিভ্রমটাকে বাতিল করা স্পষ্টতই কঠিন। খুব সহজ না কিন্তু ব্যাখ্যা করা কেমন করে সত্তর হাজার মানুষ একই হ্যালুসিনেশন দেখেছিল। কিন্তু এটা যে ঘটেছে সেটা মেনে নেয়া আরো কঠিন যে ফাতিমার বাইরে সারা পৃথিবীর

দৃষ্টির অগোচরে এমন কিছু আসলেই ঘটেছিল। শুধু দেখাই না, সৌরজগতের সেই ভয়াবহ ধ্বংশ অনুভব করা, যার প্রবল ত্বরণগতি যথেষ্ট সবকিছুরই মহাশুন্যে ছিটকে পড়ার জন্য। ডেভিড হিউমের মিরাকল বা অতিপ্রাকৃত ঘটনার পিথি (Pithy) টেষ্টটি কথা মনে পড়ে যেতে বাধ্য: `কোন ধরনের স্বাক্ষ্যপ্রমানই একটি মিরাকল বা দৈব বা অতিপ্রাকৃত ঘটনাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য যথেষ্ট না, যদিনা সেই স্বাক্ষ্যপ্রমানটিই এমন কোন প্রকৃতির হয়ে থাকে যে তার অসত্যতাও সেটা যে সত্যকে প্রমান করার চেষ্টা করছে তারচেয়েও আরো বেশী অতিপ্রাকৃত'।

অসম্ভব মনে হতে পারে যে সত্তর হাজার মানুষ একই সাথে বিভ্রান্ত হয়ে বা তারা একই সাথে নিজেদের মধ্যে যোগসাজশ করে একটি গণ মিথ্যার সৃষ্টি করতে পারে। সত্তর হাজার মানুষ সুর্যকে নাচতে দেখেছে এই বিষয়টি হয়তো ইতিহাস লিপিবদ্ধ করতে ভুল করেছে। অথবা তারা সবাই একসাথে মরীচিকা দেখেছে (তাদের সবাইকে একসাথে সুর্যের দিকে তাকিয়ে থাকতে অনুরোধ করা হয়েছিল, দৃষ্টি ক্ষমতার জন্য বিষয়টা নিশ্চয়ই খুব একটা ভালো অভিজ্ঞতা ছিল না); কিন্তু এই সব প্রায় অসম্ভব ব্যাপারগুলো অনেক বেশী সম্ভাব্য এর বিকল্প ঘটনাটি থেকে: পৃথিবী হঠাৎ করে তার কক্ষপথে একদিকে বেকে যাওয়া এবং সৌরজগত ধ্বংস হবার ঘটনাটি, যা ফাতিমার বাইরে কেউ লক্ষ্য করেনি। আমি বোঝাতে চাইছি, পর্তুগালতো পৃথিবী থেকে সেরকম বিচ্ছিন্ন কোন দেশ না। আসলেই ঈশ্বর এবং ধর্মীয় অলৌকিক ঘটনাগুলোর ব্যাক্তিগত অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে এর চেয়ে বেশী কিছু বলার প্রয়োজন আর নেই।আপনার যদি এধরনের কোন অভিজ্ঞতা থেকে থাকে, আপনি সম্ভবত সেটা সত্যি একটি ঘটনা এমন বিশ্বাস দৃঢ়ভাবে ধারণ করতে পারেন। কিন্তু আপনার আশা করা উচিৎ না বাকী আমরা সবাই আমরা কথাই সত্য বলে ধরে নেব, বিশেষ করে যদি আমাদের ব্রেন এবং এর শক্তিশালী কার্য্যপদ্ধতি সম্বন্ধে সামান্যতম ধারনাও থেকে থাকে।

স্ক্রিপচার বা ধর্ম গ্রন্থ থেকে আর্গুমেন্ট:

এখনও বেশ কিছু মানুষ আছেন যারা ধর্মগ্রন্হে বর্নিত প্রমানের দ্বারা ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করতে প্ররোচিত হন। খুব প্রচলিত যে যুক্তি, যার উৎস অনেকেই, যাদের মধ্যে অন্যতম সি এস লুইস (তার বিষয়টি আরো স্পষ্ট বোঝা উচিৎ ছিল), যা দাবী করে, যেহেতু জীসাস বা যীশু নিজেকে ঈশ্বরের পুত্র বলে দাবী করেছেন, তিনি অবশ্য হয় সঠিক অথবা একজন মিথ্যাবাদী পাগল: পাগল, খারাপ লোক বা ঈশ্বর; বা খানিকটা স্থুল অনুপ্রাস, উন্মাদ, মিথ্যাবাদী বা প্রভু (লুন্যাটিক, লায়ার অর লর্ড); যীশু যে এধরনের কোন স্বর্গীয় পদমর্যাদা দাবী করেছিলেন তার স্বপক্ষে ঐতিহাসিক প্রমান খুব নগন্য। কিন্তু যদি যীশু যে এমন দাবী করেছিলেন তার প্রমান থাকে, আর সেই প্রমান জোরালো হয়, তাসত্বে প্রস্তাবটি সংক্রান্ত এই ট্রাইলেমাটি (তিনটি অপছন্দনীয় বক্তব্যর মধ্যে একটিকে বেছে নেবার দ্বন্দ) হাস্যকরভাবে অপ্রতুল হতো। চতুর্থ সম্ভাবনা, যা এত স্পষ্ট যে উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই, তা হলো আসলেই যীশু ভুল করেছেন। সেই সাথে বহু মানুষও। যাই হোক না কেন আমি আগেও বলেছি, ঐতিহাসিকভাবে এমন কোন ভালো প্রমান নেই যে যীশু আসলেই নিজেকে কখনো স্বর্গীয় ভেবেছিলেন।

কোন একটি বিষয় সম্বন্ধে কিছু লেখা আছে, এই বিষয়টাই যথেষ্ট সেই সব মানুষদেরকে সহজেই প্ররোচিত করার জন্য, যারা সাধারণত এধরনের প্রশ্নের সাথে খুব একটা অভ্যস্থ না: কে লিখেছে এটি এবং কখন? কেমন করে তারা জেনেছিল কি লিখতে হবে? তারা কি, তাদের সময়ে যা সত্যি বোঝাতে চেয়েছে, আমাদের সময়ে আমরা সেটাকে যা মনে করছি, তারা কি আসলেই তা বলতে চেয়েছিল? তারা কি পক্ষপাতহীন পর্যবেক্ষক ছিলেন?, বা তাদের নিজস্ব কিছু অ্যাজেন্ডা ছিল, যা তাদের লেখার প্রকৃতি নির্ধারণ করেছিল? উনবিংশ শতাব্দী থেকে বিজ্ঞ ধর্মতাত্বিকরা নি:সন্দেহে প্রমান জড়ো করেছেন যে গসপেল আদৌ বিশ্বাসযোগ্য না সেই সময়ের প্রকৃত বাস্তবতায় ইতিহাসে আসলেই কি ঘটেছিল তার বর্ণনা হিসাবে। সবকিছু লেখা হয়েছে যীশু মারা যাবার বহুদিন পরে এবং এমনকি পলের এপিষ্টল (epistle) রচনার পরে, যেখানে আদৌ যীশুর জীবনে ঘটা পরবর্তীতে প্রস্তাবিত তথাকথিত ঘটনাগুলোর প্রায় কোনটারই উল্লেখ করা হয়নি। এই সবগুলোরেই অনুলিপি, পুনঃ অনুলিপি হয়েছে বহু 'চাইনীজ

হুইজপারস জেনেরাশনের’ (৫ অধ্যায় দ্রষ্টব্য) ভ্রমপ্রবন অনুলিপিকারদের মাধ্যমে, যাদের ভুল না হওয়াটাই অস্বাভাবিক, তাদেরও নিজেদের ধর্মীয় অ্যাজেন্ডা আছে;

ধর্মীয় উদ্দেশ্য প্রনোদিত ভাবে রং চড়ানোর একটি ভালো উদহারন হলো বেথলেহেমে যীশুর হৃদয়স্পর্শ করা জন্মকাহিনী, এরপরই নীরিহ মানুষদের উপর পরিচালিত হেরডের ভয়াবহ নৃশংস গণহত্যার কাহিনী। যখন যীশুর মৃত্যুর বহু বছর পরে গসপেলগুলো সংকলিত হয়েছিল, কেউই জানতো না তার জন্ম আসলে কোথায় হয়েছে। কিন্তু ওল্ড টেষ্টামেন্টে বর্ণিত একটি প্রফেসি বা ভবিষ্যদ্বানীর (Micah 5:2) উপর নির্ভর করে ইহুদী মতাবলম্বীরা ধারনা করতেন তাদের বহু প্রতীক্ষিত মেসিয়া বা ত্রাণকর্তার জন্ম হবে বেথলেহেম এ। এই প্রফেসির আলোকে, জন (John) এর গসপেল সুস্পষ্টভাবে মন্তব্য করেছিলেন যে, যীশুর অনুসারীরা অবাক হয়েছিলেন, তিনি বেথলেহেম এ জন্ম নেননি: ‘অন্যরা বলেন, এই হচ্ছে যীশু খৃষ্ঠ। কিন্তু কেউ কেউ বলেছিল, খৃষ্ঠর কি গ্যালীলি থেকে আসার কথা? ধর্মগ্রন্হ কি বলেনি, ডেভিডে বীজে জন্ম হবে খৃষ্টের, বেথলেহেম শহরে, যেখানে ডেভিড বসবাস করতেন’।

ম্যাথিউ (Matthew) এবং লিউক (Luke) যীশুর জন্ম সমস্যাটার সমাধান করেছিলেন ভিন্ন ভাবে, সর্বোপরি যীশুর যে অবশ্যই বেথলেহেম এ জন্ম হয়েছে এই সিদ্ধান্ত নেবার মাধ্যমে; কিন্তু তারা দুজনই তাদের কাহিনীতে তাকে সেখানে নিয়ে গিয়েছিলেন ভিন্ন ভিন্ন পথে। ম্যাথিউ যেমন মেরী এবং জোসেফকে বেথলেহেমের বাসিন্দা বলেই উল্লেখ করেছেন, যীশুর জন্মের পর শুধু মাত্র তারা নাজারেথে বসবাস শুরু করেছিলেন এই বলে, সেটা মিসর থেকে ফেরার পর, যেখানে তারা রাজা হেরডের নীরিহ মানুষদের গনহত্যা থেকে বাচার জন্য পালিয়েছিলেন। কিন্তু লুক, এর ঠিক বিপরীত, অর্থাৎ যীশুর জন্মের আগেই মেরী এবং জোসেফ এর বসবাস ছিল নাজারেথ এ, সুতরাং তিনি কিভাবে সেই প্রফেসি মেলানোর জন্য তাদের সেই বিশেষ মুহূর্তে বেথলেহেম এ নিয়ে আসবেন?এজন্য ল্যুক বললেন যে, যে সময় সাইরেনিয়াস (কিরিনিয়াস) সিরিয়ার গভর্ণর ছিলেন, সীজার অগাষ্টাস কর আদায়ের উদ্দেশ্যে একটি সাম্রাজ্যব্যাপী আদম শুমারীর নির্দেশ দেন। তার নির্দেশ ছিল প্রত্যেককে তাদের জন্ম যে শহরে শুমারীর জন্য সেখানে ফিরে যেতে হবে। জোসেফ ছিল আবার ডেভিডের বংশধারার, এবং সে কারনে তাকে ডেভিডের সেই শহরে যেতে হবে, যার নাম বেথলেহেম। এই সমাধানাটাকে অবশ্যই মনে হয়েছিল সবচেয়ে উত্তম। কিন্তু ঐতিহাসিক ভাবে বিষয়টি সম্পুর্ন ভিত্তিহীন, এ এন উইলসন (A. N. Wilson) তার জীসাস (Jesus) এবং রবিন লেইন ফক্স (Robin Lane Fox) তার দি আনঅথোরাইজড ভার্সন (The unauthorized version) (এছাড়া আরো অনেক সুত্র) এ বিষয়টি সুস্পষ্ট করেছেন, ডেভিড, যদি তার অস্তিত্ব থেকে থাকে, তিনি বেচে ছিলেন মেরী এবং জোসেফের চেয়ে প্রায় ১০০০ বছর আগে। এছাড়া রোমানদের কিই বা এমন কারন ছিল, যার জন্য জোসেফকে তার হাজার বছর আগে দুসম্পর্কের কোন পুর্বপুরুষের শহরে আসতে হবে, এছাড়া তারা এমনটা চাইবেই বা কেন। অনেকটা যেমন শুমারীরে ফর্মে আমার ক্ষেত্রে প্রয়োজন আছে নির্দিষ্ট করে বলা, অ্যাশবী– দ্য– লা– জোউথ হচ্ছে আমার জন্ম শহর, যদি আমি আমার পুর্বপুরুষের প্রাচীন ইতিহাস ঘেটে আমি সেইনোর দ্য ডাকেইন অবধি যেতে পারি, যিনি সেই শহরে উইলিয়াম দ্য কনকেররের সাথে এসেছিলেন এবং সেখানে বসতি গড়েছিলেন।

এছাড়াও লিউক যাচাই না করে সেই সব ঘটনার বিবরন দিয়ে সময়ের হিসাবেও গোলমাল করেছেন, যার সত্যতা ঐতিহাসিকরা স্বতন্ত্রভাবে যাচাই করে দেখার সুযোগ পেয়েছেন। গর্ভনর কিরিনিয়াসের সময় সত্যি একটি শুমারী হয়েছিল – একটি স্থানীয় শুমারী, সিজার অগাষ্টাসের ডিক্রি করা সাম্রাজ্যব্যাপী কোন শুমারী ছিল না সেটা, লিউকের বর্ণিত সময়ে না, সেটা হয়েছিল আরো অনেক পরে, ৬ খৃষ্টাব্দে, হেরোড এর মৃত্যুর বহুদিন পর। লেন ফক্স উপসংহার টানেন এই বলে যে, লিউক এর গল্প ঐতিহাসিকভাবেই অসম্ভব এবং অন্তর্গতভাবেই অসংলগ্ন, কিন্তু তিনি লিউক এর সমস্যা এবং তার ওল্ড টেস্টামেন্ট এ বর্ণিত মিকাহ এর প্রফেসির পুর্ন করার ঐকান্তিক ইচ্ছার সাথে সমবেদনাও প্রকাশ করেছেন।

২০০৪ এর ডিসেম্বরে ফ্রি ইনকোয়ারী তে (Free Inquiry), টম ফ্লিন (Tom Flyn), এই অসাধারন প্রত্রিকাটির সম্পাদক, এসব পাল্টা যুক্তি, এবং লোকপ্রিয় ক্রিসমাস এর গল্পের কিছু অসংলগ্ন অংশ নিয়ে লেখা বেশ কিছু নিবন্ধ এক জায়গায় করেছিলেন; ফ্লিন নিজেও অনেক অসঙ্গতির তালিকা করেছিলেন ম্যাথিউ এবং লিউকের মধ্যে, শুধুমাত্র যে দুই জন ইভানজেলিস্ট, যারা যীশুর জন্ম নিয়ে মন্তব্য করেছিলেন[৯]; রবার্ট গিলুলী (Robert Gillooly) দেখিয়েছেন, কেমন করে যীশু কিংবদন্তীর গুরুত্বপুর্ণ বৈশিষ্টগুলো: পুর্ব দিকের নক্ষত্র, কুমারী মার সন্তান প্রসব, সদ্যজাত শিশুর প্রতি রাজাবাদশাদের উপঢৌকন এবং শ্রদ্ধান্জলি, পুনরুত্থান বা রেজারেকশন, স্বর্গে আরোহন, একেবারে প্রত্যেকটি বিষয় ধার করা হয়েছে ভুমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে এবং নিকট প্রাচ্যে প্রচলিত অন্যান্য নানা ধর্ম থেকে। ফ্লিনের প্রস্তাব ছিল, ইহুদী পাঠকদের সুবিধার লক্ষ্যে মেসিয়ানিক প্রফেসি পুর্ণ করার জন্য ম্যাথিউর (ডেভিডের বংশধর, বেথলেহেম এ জন্ম) ইচ্ছা মুখোমুখি হয় ইহুদী নয় এমন সমাজের জন্য খৃষ্টধর্মকে থাপ থাওয়ানোর জন্য লিউকের প্রচেষ্টার সাথে, সেজন্য প্যাগান হেলেনিষ্টিক ধর্মগুলোর নানা পছন্দের বিষয়গুলোর যোগ (কুমারী মার সন্তান প্রসব, রাজাদের ভক্তি প্রদর্শন ইত্যাদি) করা হয়; এর ফলাফলে অসঙ্গতিগুলো খুবই সুস্পষ্ট, কিন্তু বিশ্বাসীরা এসব চিরন্তনভাবে উপেক্ষা করতে কখনো ভুল করেনি।

শিক্ষিত আর বোধসম্পন্ন খৃষ্টধর্মীদের অবশ্য বিষয়টি বোঝার জন্য আইরা গ্রেসউইনের (Ira Greshwin) এর মত কারো প্রয়োজন নেই: ‘বাইবেলে আমরা যা পড়তে বাধ্য হই /সেটা আসলে সেকরম নয়’, কিন্তু বহু স্বল্প জানা খৃষ্টানরা আছেন, যারা বাইবেলের কথা অক্ষরে অক্ষরেই চুড়ান্ত সত্য মনে করেন– যারা বাইবেলকে এত গুরুত্বের সাথে গ্রহন করেন যে তাদের কাছে এটি ইতিহাসের আক্ষরিক এবং নির্ভুল রেকর্ড হিসাবে প্রতিষ্ঠিত এবং সেকারনে এটি তাদের ধর্মীয় বিশ্বাসের সমর্থনে মুল ভিত্তি রচনা করেছে। এই মানুষগুলো কি কখনো এই বইটা খুলে পড়েনি যা তারা আক্ষরিক অর্থেই পুর্ন সত্য বলে বিশ্বাস করেন? কেনই বা তারা লক্ষ্য করেননি এই সব চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখানোর মত স্পষ্ট অসঙ্গতিগুলো? যারা একে আক্ষরিক অর্থে সত্য বলে বিশ্বাস করেন তাদের কি চিন্তা হয়না যে, ম্যাথিউ জোসেফের বংশসুত্র রাজা ডেভিডের বংশের সাথে জোড়া লাগিয়েছেন মধ্যবর্তী ২৮ টি প্রজন্ম দিয়ে, যা লিউক করেছেন ৪১ টি প্রজন্ম দিয়ে? আরো খারাপ ব্যপার হলো, এই দুই তালিকায় নামের প্রায় কোন পুনরাবৃত্তি নেই! কিন্তু যাই হোক না কেন, যদি যীশুর জন্ম আসলেই কুমারী মার গর্ভে হয়, সেখানে জোসেফের বংশপরিচয়ই তো অপ্রাসঙ্গিক, এবং সেটা, যীশু স্বপক্ষে, ওল্ড টেষ্টামেন্ট এর সেই ভবিষ্যদ্বানী, ডেভিডের বংশে মেসিয়ার জন্ম হবে, সে বিষয়টি তো আর পুর্ণ করে না।

বার্ট এহরম্যান (Bart Ehrman) যুক্তরাষ্ট্রের বিখ্যাত বাইবেল স্কলার একটি বইয়ে, যার শিরোনাম, দি স্টোরী বিহাইন্ড হু চেন্জড দি নিউ টেষ্টামেন্ট অ্যান্ড হোয়াই (The story behind who changed the new testament) উন্মোচন করেছেন, কি বিশাল অনিশ্চয়তা নিউ টেষ্টামেন্ট এর টেক্সকে অস্পষ্ট করে রেখেছে [১০]; এই বইয়ের ভুমিকায় অধ্যাপক এহরম্যান আবেগঘনভাবে বাইবেল বিশ্বাসী মৌলবাদী থেকে তার চিন্তাশীল সন্দেহবাদী হবার ব্যাক্তিগত শিক্ষামুলক যাত্রার কথা উল্লেখ করেন। যে যাত্রা পরিচালিত হয়েছিল ধর্ম গ্রন্থের বিশালাকার ভুলগুলো অনুধাবন করার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। উল্লেখযোগ্যভাবে, তিনি যখন আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়ে পদমর্যাদায় ক্রমশ উপরে উঠছিলেন একেবারে তলানির মুডি বাইবেল ইন্সস্টিটিউট থেকে হুইটন কলেজের মাধ্যমে (এই তালিকার একটু উপরে, কিন্তু তারপরও বিলি গ্রাহামের আলমা ম্যাটার) সেখান থেকে প্রিন্সটন এ দুনিয়ার সেরাদের শীর্ষে, প্রতিটা ধাপে তাকে সতর্কবানী শুনতে হয়েছে, ক্রমবর্ধমান প্রগতিশীলতার ধারায় তার গোড়া মৌলবাদী খৃষ্টধর্মীয় মানসিকতা বজায় রাখা সহজ হবে না। এবং সেটাই সত্য প্রমানিত হলো, এবং আমরা তার পাঠকরা এর উপকার পেলাম। বাইবেল সমালোচনা অন্যান্য যুগান্তকারী বইয়ের মধ্যে আছে রবিন লেন ফক্স (Robin Lane Fox) এর দি আনঅথোরাইজড ভার্সন (The unauthorized version), যার কথা এর আগেই বলেছি। এবং জাক বার্লিনারব্লাউ (Jaques Berlinerblau) এর দি সেকুলার বাইবেল : হোয়াই ননবিলিভারস মাস্ট টেক রেলিজিয়ন সিরিয়াসলী (The secular bible:why nonbelievers should take religion seriously)।

চারটি গসপেল যাদের প্রাতিষ্ঠানিক ক্যানন বা ধর্মগ্রন্হের জন্য কম বেশী আনুমানিকভাবেই বাছাই করা হয়েছে, তাদের বেশ অনেকগুলো, কমপক্ষে ডজনখানেক নমুনা থেকে, যেমন, গসপেল অব টমাস, পিটার,নিকোডেমাস, ফিলিপ, বার্থোলোমিউ এবং মেরী ম্যাগডালেন ইত্যাদি [১১]; এই সব গসপেলদের কয়েকটি যারা সেই সময় পরিচিত ছিল অ্যাপোক্রিফা (Apocrypha) হিসাবে, এই বাড়তি গসপেলগুলোর কথাই টমাস জেফারসন উল্লেখ করেছিলেন, তার ভাইপোর কাছে লেখা একটি চিঠিতে:

নিউ টেষ্টামেন্ট বলার সময়, আমি ভুলে গেছি উল্লেখ করতে যে, তোমরা উচিৎ হবে খৃষ্টের প্রত্যেকটি ইতিহাসই পড়ে দেখা। এমনকি সেগুলোও যেগুলো একটি কাউন্সিল অব একলেসিয়াসটিক (ecclesiastic) এর সদস্যরা আমাদের পক্ষে সিদ্ধান্ত নিয়ে এদের চিহ্নিত করেছেন মিথ্যা বা সিউডো ইভানজেলিষ্ট হিসাবে, বাকীদের যেমন তারা চিহ্নিত করেছেন ইভানজেলিষ্ট হিসাবে; যেহেতু এই সব সিউডো ইভানজেলিষ্টদের গসপেল অন্যদের মতই একই মাত্রায় আমাদের অনুপ্রানিত করার দাবী করছে, তাদের এই দাবীটাকে তোমার নিজস্ব যুক্তি দিয়েই বিচার করতে হবে, ঐসব একলেসিয়াসটিকদের প্রদত্ত যুক্তি দিয়ে না।

ঐসব একলেসিয়াসটিকদের দ্বারা যে গসপেল গুলো বাতিল হয়েছে, তার কারন সম্ভবত অন্য চারটি ক্যানোনিক্যাল গসপেলের কাহিনীর তুলনায় সেখানে এমন কিছু গল্প আছে যা বিব্রতকরভাবে ব্যাখ্যার অযোগ্য। টমাসের গসপেলে যেমন, যীশুর শৈশবের অসংখ্য ঘটনার বিবরণ আছে, যেখানে শিশু যীশু তার ম্যাজিক ক্ষমতাকে অপব্যবহার করেছে নানা দুষ্টামীতে, যেমন খেলার সাথীদের ছাগলে রুপান্তরিত করেছে বা খেলাচ্ছলে বা কাদা মাটিকে রুপান্তর করেছে চড়ুই পাখিতে, কিংবা তার বাবাকে কাঠের কাজে সাহায্য করেছে রহস্যজনকভাবে কাঠের দৈর্ঘ বাড়িয়ে দিয়ে[১২];বলা হবে কেউ এই ধরনের মোটাদাগের অলৌকিক কাহিনী বিশ্বাস করে না যা টমাসের গসপেলে আছে, কিন্তু কোন কম বেশী বিশেষ কারনও কিন্তু নেই, চারটি ক্যানোনিক্যাল গসপেলকে বিশ্বাস করার জন্য। তাদের সবার স্ট্যাটাসই কিংবদন্তীর রুপকথার মত, রাজা আর্থার এবং তার রাউন্ড টেবিলের নাইটদের গল্পের মত সন্দেহজনক তথ্যপুর্ন। এই চারটি ক্যানোনিক্যাল গসপেলের প্রত্যেকটির সিংহভাগ সংগৃহীত হয়েছে একটি সাধারন উৎস থেকে, হয় মার্কের গসপেল বা প্রাচীন হারিয়ে যাওয়া কোন কাজ যার সবচেয়ে আদি উত্তরসুরী ছিলেন মার্ক; কেউ জানেনা কারা ছিলেন সেই চার ইভানজেলিষ্ট, তবে তারা ব্যাক্তিগতভাবে কেউই যীশুর সাথে সাক্ষাৎ করেননি। বেশীর ভাগ বিষয় যা তারা লিখেছেন তা কোন অর্থেই ইতিহাসের সত্যভাষনের সামান্যতম প্রচেষ্ঠা না বরং যা শুধুমাত্র ওল্ড টেস্টামেন্ট থেকে ধার করে নতুন করে লেখা। কারন গসপেল তৈরী কারকরা খুব ভক্তির সাথে বিশ্বাস করতেন যে যীশুর জীবন যেন ওল্ড টেষ্টামেন্টের ভবিষ্যদ্বানীর সাথে মিলে যায়। এমন কি একটা ঐতিহাসিক কেসও তৈরী করা সম্ভব, যদিও বেশীর ভাগ মানুষ তা সমর্থন করবেনা, যে যীশু বলে আসলে কারো কোন অস্তিত্বই কোনদিনও ছিলনা, বেশ কয়েকজন সেটা করেছেনও ইতিমধ্যে , এর মধ্যে অন্যতম যেমন, লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জি এ ওয়েলস (G A Wells) তার বেশ কিছু বইয়ে, যেমন ডিড জীসাস এক্সিস্ট (Did Jesus exist)?

যদি যীশুর সম্ভবত অস্তিত্ব ছিল, কোন সন্মান জনক বাইবেল বিশেষজ্ঞরা কেউই সাধারনত নিউ টেষ্টামেন্ট (এবং অবশ্যই ওল্ড টেষ্টামেন্ট) ইতিহাসে আসলে কি ঘটেছিল তার বিশ্বাসযোগ্য কোন রেকর্ড হিসাবে হিসাবে গ্রহন করেননা, এবং আমিও আর বাইবেলকে কোন ধরনের ঈশ্বরের অস্তিত্বের স্বপক্ষে প্রমান হিসাবে আর আলোচনায় আনবোনা। তার পুর্বসুরী জন অ্যাডামকে লেখা চিঠিতে টমাস জেফারসনের দুরদৃষ্টিপুর্ণ মন্তব্য, ‘একদিন আসবে যখন সর্ব শক্তিমান ঈশ্বরের দ্বারা কুমারী মাতার গর্ভে যীশুর রহস্যময় জন্ম কাহিনী, জুপিটারের মস্তিষ্কে মিনার্ভার সৃষ্টির মত রুপকথার সাথে একই শ্রেনীতে আলোচিত হবে’।

ড্যান ব্রাউনের (Dan Brown) উপন্যাস দি দা ভিন্চি কোড (The Vinci Code) এবং এর উপর আশ্রিত চলচ্চিত্রটি, চার্চ সংশ্লিষ্টদের মধ্যে তুমুল বিতর্ক সৃষ্টি করেছিল। খৃষ্ট ধর্মাবলম্বীদের এই চলচ্চিত্রটি বয়কট করার জন্যও

উৎসাহিত করা হয়েছিল, এমনটি যেখানে এটি প্রদর্শিত হয়েছিল সেখানে এর বিরুদ্ধে বিক্ষোভও করা হয়েছে। পুরো ঘটনাটি, শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এটি মনগড়া, বানানো, লেখকের কল্পনাপ্রসুত একটি কাহিনী। এই অর্থে, এটা ঠিক গসপেলের মতই। দি দা ভিন্চি কোড এবং গসপেল এর মধ্যে পার্থক্য শুধু, গসপেলগুলো হচ্ছে প্রাচীন কাহিনী আর দা ভিন্চি কোড হচ্ছে আধুনিক একটি কাহিনী।

শ্রদ্ধেয় ধার্মিক বিজ্ঞানীদের থেকে আসা যুক্তি:

’বুদ্ধিমত্তার ক্ষেত্রে প্রখ্যাত মানুষদের বিশাল একটি অংশ খৃষ্ট ধর্মে বিশ্বাস করেন না, কিন্তু তারা বিষয়টি জনসমক্ষে লুকিয়ে রাখেন, কারন তারা তাদের রোজগার হারাতে চান না’। বার্ট্রান্ড রাসেল

’নিউটন ধার্মিক ছিলেন, আপনি কে বলুন তো, নিজেকে নিউটন, গ্যালিলিও, কেপলার ইত্যাদি ইত্যাদি ইত্যাদিদের থেকে উৎকৃষ্ট মনে করেন থেকে? যদি তাদের জন্য ঈশ্বর যথেষ্ট হতে পারে, আপনি নিজেকে ঠিক কি মনে করছেন? এমনিতেই এটা নিজে যথেষ্ঠ পরিমান বাজে একটা যুক্তি, তেমন কোন কিছুই আসে যায় যদিও, তারপরও কোন কোন ধর্মবাদীরা এমন কি এর সাথে ডারউইনের নাম যুক্ত করেছে, যার বিরুদ্ধে স্থায়ী এবং সহজে প্রমান করা সম্ভব এমন মিথ্যা গুজব যে, মৃত্যুশয্যায় তিনি ধর্মান্তরিত হয়েছিলেন, বিষয়টি নিরন্তরভাবে বার বার ফিরে আসে দুর্গন্ধের মত [১৩], যখন থেকে এর শুরু করেছিল জনৈক লেডি হোপ, যিনি একটা আবেগময় গল্প বুনেছিলেন এভাবে: অসুস্থ ডারউইন সন্ধ্যার আলোয় বালিশে হেলান দিয়ে শুয়ে আছেন, নিউ টেষ্টামেন্টের পাতা উল্টাচ্ছেন এবং স্বীকারোক্তি করছেন যে বিবর্তন তত্ব সম্পুর্ণ ভুল। এই অংশে আমি মুলত মনোযোগ দেব বিজ্ঞানীদের উপর, কারনটা– যা হয়ত খুব বেশী কষ্টসাধ্য না কল্পনা করা– যারা শ্রদ্ধেয় ব্যাক্তিদের ধর্মপ্রান হিসাবে জাহির করতে চান,তারা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই পছন্দ করেন বিজ্ঞানীদের উদহারন দিতে।

নিউটন সত্যিই নিজেকে ধার্মিক বলে দাবী করেছিলেন, আমার মনে হয়, প্রায় সবাই তেমনটি করেছেন, উল্লেখযোগ্যভাবে উনবিংশ শতাব্দীর পর্যন্ত, কারন এ সময়ের পর বাধ্যতামুলকভাবে ধর্মবিশ্বাস প্রকাশের উপর সামজিক এবং আইনগত চাপ এর আগের শতকগুলো থেকে বহুলাংশে শিথিল হয়ে পড়েছিল এবং ধর্ম পরিত্যাগের স্বপক্ষে বৈজ্ঞানিক সমর্থনও ছিল অপেক্ষাকৃতভাবে বেশী। অবশ্যই এই সময়ের দুই দিকেই এর ব্যতিক্রম ছিল। এমনকি ডারউইনের আগেও, সবাই কিন্তু ঈশ্বরবিশ্বাসী ছিলেন না, যেমন জেমস হট (James Haught) তার টু থাইজ্যান্ড ইয়ারস অব ডিসবিলিফ: ফেমাস পিপল উইথ দা কারেজ টু ডাউট (2000 years of disbelief: Famous people with the courage to doubt) বইয়ে দেখিয়েছেন এবং তেমনি অনেক প্রখ্যাত বিজ্ঞানী ডারউইনের পরেও তাদের ঈশ্বর বিশ্বাস থেকে সরে আসেননি। কারো পক্ষেই খৃষ্টান হিসাবে মাইকেল ফ্যারাডের ধর্মবিশ্বাসকে আন্তরিক না ভাবার কোন অবকাশ নেই, এমনকি সেই সময়ে পরেও যখন তিনি নিশ্চয়ই ডারউইনের কাজ সম্বন্ধে অবশ্যই কিছু জানতেন। তিনি সান্ডেম্যানিয়ান সেক্ট এর সদস্য ছিলেন, যারা (অতীত অর্থে কারন বর্তমানে তারা একরকম বিলুপ্ত বর্তমানে) বাইবেলের আক্ষরিক ব্যাখ্যায় বিশ্বাসী ছিলেন, এবং আচার অনুষ্ঠান করে তারা নতুন সদস্যদের পা ধুইয়ে দিতেন এবং ঈশ্বরের ইচ্ছা বোঝার জন্য লটারী করতেন। ১৮৬০ সালে ফ্যারাডে এই সেক্ট এর একজন গুরুজন বা এল্ডার হয়েছিলেন, যার একবছর আগেই অরিজিন অব স্পিসিস প্রকাশিত হয়েছিল এবং তিনি স্যান্ডেম্যানিয়ান হিসাবে ১৮৬৭ সালে মারা যান। পরীক্ষক ফ্যারাডে এর তাত্বিক অপরপক্ষ, জেমস ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল, একই মাত্রায় নিবেদিত প্রান খৃষ্ঠান ছিলেন। তেমনি ছিলেন, উনবিংশ শতাব্দীর বৃটিশ পদার্থবিদ্যার আরেক স্তম্ভ উইলিয়াম থমসন। লর্ড কেলভিন, যিনি চেষ্টা করেছিলেন প্রমান করতে, যে সময়ের অভাবেই বিবর্তন সম্ভব না। এই মহান থার্মোডিনামিষ্ট ভুল সময়ের হিসাব অনুযায়ী, সুর্য হচ্ছে এক ধরনের আগুন, যা জ্বালানী পোড়াচ্ছে, যে জ্বালানী কয়েশ মিলিয়ন বছরে শেষ হয়ে যাবে, কয়েক হাজার মিলিয়ন বছর নয়। কেলভিনের অবশ্যই পারমানবিক শক্তি সম্বন্ধে অবশ্যই কোন ধারনা ছিল না। সন্তোষজনক ব্যাপার হচ্ছে, ১৯০৩ সালে ব্রিটিশ অ্যাসোসিয়েশন এর সভায়, দ্বায়িত্ব পড়ে ডারউইনের দ্বিতীয় ছেলে, স্যার জর্জ ডারউইনের উপর , তার স্যার উপাধি

না পাওয়া বাবার ধারনা স্বপক্ষে প্রমান হিসাবে মাদাম কুরীর রেডিয়াম আবিষ্কারের বিষয়টি ব্যবহার করে তখনও জীবিত লর্ড কেলভিনের সময়ের পরিমাপকে প্রশ্নবিদ্ধ করার জন্য। বিংশ শতাব্দী জুড়ে, ক্রমশ বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকরা, যারা নাকি ধর্ম বিশ্বাস প্রচার করেছেন, তাদের খুজে পাওয়া কঠিন হয়ে পড়েছিল। কিন্তু তারা একেবারে দুষ্প্রাপ্য তা কিন্তু না। আমার সন্দেহ সাম্প্রতিককালের বেশীর ভাগ সেধরনের বিজ্ঞানীরা আসলে আইনস্টাইনীয় অর্থেই কেবল ধার্মিক, যা আমি প্রথম অধ্যায়ে (দি গড ডিলুশন) যা যুক্তি দিয়েছিলাম ধর্ম শব্দটির একটি অপব্যবহার হিসাবে। যাই হোক, অবশ্যই অনেক ভালো বিজ্ঞানীদের উদহারন আছে যারা আন্তরিকভাবেই প্রচলিত অর্থে ধার্মিক। সমসাময়িক বৃটিশ বিজ্ঞানীদের মধ্যে তিনটি নাম প্রথমেই নজর কাড়ে, ডিকেন্সীয় উপন্যাসে বর্ণিত আইনজীবিদের কোন ফার্মের উর্ধতন সহযোগীদের নামের সাথে পছন্দনীয় একটি সদৃশ্যতা সহ: পিকক, স্ট্যানার্ড এবং পোলকিংহোম। এরা তিনজনই হয় টেম্পলটন পুরষ্কার জিতেছেন অথবা টেম্পলটন ফাউন্ডেশনের ট্রাষ্টি বোর্ডে আছেন। তাদের প্রত্যেকের সাথে ব্যাক্তিগত এবং জনসমক্ষে হৃদ্যতাপুর্ণ আলোচনা পরও আমি বিস্মিত হয়েছি, বিস্ময়ের কারন কিন্তু কোন এক ধরনের মহাজাগতিক আইনপ্রণেতার উপর তাদের স্থাপিত বিশ্বাস না, বরং তাদের খৃষ্ট ধর্মের নানা বিস্তারিত বিষয়গুলোর প্রতি তাদের বিশ্বাস: রেজারেকশন বা পুনরুত্থান, পাপের জন্য ক্ষমা ইত্যাদি নানা কিছু।

যুক্তরাষ্ট্রের এধরনের সমতুল্য কিছু উদহারন আছে, যেমন ফ্রান্সিস কলিন্স, মুল বা অফিসিয়াল হিউমান জীনোম প্রোজেক্ট এর যুক্তরাষ্ট্র অংশের প্রশাসনিক প্রধান [১৪]; কিন্তু ব্রিটেনের মতই, তারা চিহ্নিত দুর্লভ একটি ব্যাতিক্রম হিসাবে, এবং তারা তাদের সহকর্মী এবং অ্যাকাডেমিক সমাজে কৌতুকময় বিস্ময়ের কারন। ১৯৯৬ সালে, কেমব্রিজে ক্লেয়ারে তার পুরোনো কলেজের বাগানে আমি আমার বন্ধু হিউম্যান জীনোম প্রোজেক্টের একজন প্রতিষ্ঠাতা প্রতিভা জিম ওয়াটসনের সাক্ষাৎকার নিয়েছিলাম বিবিসি একটি প্রমান্য চিত্রর জন্য, যা আমি তৈরী করেছিলাম খোদ জেনেটিকস বিষয়টির প্রতিষ্ঠাতা প্রতিভা হিসাবে চিহ্নিত গ্রেগর মেন্ডেলকে নিয়ে। অবশ্যই মেন্ডেল ধার্মিক ছিলেন, অগাষ্টানিয়ান অর্ডারের একজন মনক ; কিন্তু মনে রাখতে হবে, সেটা উনবিংশ শতাব্দী, যখন তরুন মেন্ডেলের জন্য এই মনক হওয়াটাই সহজতম উপায় ছিল তার বিজ্ঞান চর্চা করার জন্য। তার জন্য এটি গবেষনা অনুদান বা রিসার্চ গ্র্যান্টের সমতুল্য। আমি ওয়াটসনকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তিনি কি অনেক ধর্ম বিশ্বাসী বিজ্ঞানীদের চেনেন কিনা? তার উত্তর ছিল: ‘প্রকৃত পক্ষে একজনও না, কদাচিৎ কারো কারো সাথে দেখা হয়েছে, আমি বিব্রত বোধ করেছি (হাসি), তুমি তো জানো, ব্যাক্তিগত বা গুপ্তভাবে পাওয়া কোন সত্যকে যারা মেনে নেয় তাদের আমি বিশ্বাস করতে পারিনা’;মলিক্যুলার জেনেটিকস বিপ্লবের ওয়াটসনের সহপ্রতিষ্ঠাতা, ফ্রান্সিস ক্রিক কেমব্রিজের চার্চিল কলেজে তার ফেলোশীপের পদ থেকে পদত্যাগ করেছিলেন কারন একজন দাতার অনুরোধের প্রেক্ষিতে কলেজটির কর্তৃপক্ষ একটি চ্যাপেল বানানো সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। ক্লেয়ারে ওয়াটসনের সাক্ষাৎকারের সময় আমি সচেতনভাবে তাকে প্রশ্ন করেছিলাম, তিনি এবং ক্রিক এর থেকে ব্যাতিক্রম কিছু মানুষ কিন্তু বিজ্ঞান এবং ধর্মের মধ্যে কোন সংঘাত দেখেন , কারন তাদের দাবী বিজ্ঞান হচ্ছে কেমন করে কোন কিছু কাজ করে এবং ধর্ম হচ্ছে এসব কিসের জন্য। ওয়াটসনের মন্তব্য: ‘বেশ, আমি মনে করিনা আমরা কোন কিছু জন্য সৃষ্ট, আমরা বিবর্তনের একটি ফলাফল মাত্র’। ‘আপনি বলতে পারেন, তাহলে তো আপনার জীবন নিশ্চয়ই ভীষন হতাশার, যদি আপনার জীবনের কোন উদ্দেশ্য না থাকে’;কিন্তু তখন আমি একটা ভালো লান্চএর আশা করছিলাম। আমরা সেদিন চমৎকার একটি লান্চও করেছিলাম।

ধর্মীয় অ্যাপোলজিষ্ট বা সমর্থনকারীদের সত্যিকার অর্থে একজন খাটি প্রখ্যাত ধার্মিক বিজ্ঞানীকে খুজে করে বের করার চেষ্ঠার মধ্যে হতাশার সুস্পষ্ট, যা আসলেই খালি কলসীর তলে হাতড়ানোর মত ফাকার আওয়াজ তৈরী করে। যে একমাত্র ওয়েবসাইট আমি খুজে পেয়েছি, যারা দাবী করে নোবেল জয়ী খৃষ্টান বিজ্ঞানীদের তালিকা আছে বলে, তারা সেই তালিকায় কয়েক শত নোবেল জয়ী বিজ্ঞানিদের মধ্যে ছয় জনের নাম উল্লেখ করেছেন । এই ছয়জনের মধ্যে আবার চারজন নোবেল পুরষ্কারই পাননি আদৌ; এবং অন্তত একজন, আমি নিশ্চিৎভাবে জানি, অবিশ্বাসী, যিনি চার্চে যান শুধুমাত্র সামাজিক কারনে। বেনজামিন বেইট–হালাহমির (Benjamin Beit-Hallahmi) আরো বেশী পদ্ধতিগত গবেষনা প্রমান করে যে, বিজ্ঞানে নোবেল জয়ীরা, এমন কি যারা সাহিত্যে নোবেল জিতেছেন, তাদের মধ্যে

উল্লেখযোগ্য পরিমানে ধর্মবিশ্বাসহীনতার হার সুস্পষ্টভাবে বেশী, যখন তারা যে জনগোষ্ঠী থেকে এসেছে, তার সাথে তুলনা করা হয় [১৫]। ১৯৯৮ সালে প্রথম সারির জার্ণাল নেচার এ লারসন (Larson) এবং হুইথাম (Witham) তাদের একটি গবেষনায় দেখিয়েছেন, যে সব আমেরিকার বিজ্ঞানীদেরকে তাদের সহকর্মীরা বিশেষভাবে প্রতিভাবান হিসাবে গন্য করেছেন এবং তাদের ন্যাশনাল অ্যাকাডেমী অব সায়েন্স এর সদস্য নির্বাচিত করেছেন (ব্রিটেনের ফেলো অব রয়্যাল সোসাইটির সমতুল্য), তাদের মধ্যে মাত্র ৭ শতাংশ বিজ্ঞানী ব্যক্তিগত ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন [১৬]; এই বিশাল পরিমান নীরিশ্বরবাদীদের তুলনামুলক আধিক্যর প্রায় ঠিক বীপরিত চিত্রটা প্রকাশ পায় বৃহত্তর আমেরিকার জনগনের মধ্যে, যেখানে ৯০ শতাংশের অধিক মানুষ কোন না কোন একটি অতিপ্রাকৃত সত্বায় বিশ্বাস করেন। এই সংখ্যাটি অবশ্য মাঝামাঝি,খানিকটা কম প্রখ্যাত বিজ্ঞানীদের মধ্যে, যারা ন্যাশনাল অ্যাকাডেমীর সদস্য নন। প্রখ্যাত বিজ্ঞানীদের নমুনার মতই ধর্ম বিশ্বাসীরা এখানেও সংখ্যা লঘু, কিন্তু অপেক্ষাকৃত কম নাটকীয় পরিমান, প্রায় ৪০ শতাংশ। পুরোপুরিভাবে আমি যা আশা করেছিলাম, যুক্তরাষ্ট্রের বিজ্ঞানীরা সাধারনত যুক্তরাষ্ট্রের জনগন অপেক্ষা কম ধর্মপরায়ন। এবং সবচেয়ে প্রখ্যাত বিজ্ঞানীরা বাকী সবার চেয়ে কম ধার্মিক। লক্ষ্য করার মত বিষয় হচ্ছে, বৃহত্তর আমেরিকার জনগোষ্ঠীর ধার্মিকতার একেবারে বীপরিত অবস্থানে আছে যুক্তরাষ্ট্রের বুদ্ধিজীবি সমাজের উপরের সারির নীরিশ্বরবাদিতা [১৭]।

একটা হালকা মজার ব্যাপার হচ্ছে, প্রথম সারির ক্রিয়েশনিষ্টদের ওয়েবসাইট আনসারস ইন জেনেসিস (Answers in Genesis) লারসন এবং হুইথামের এই গবেষনাটি উল্লেখ করেছে, কিন্তু ধর্মবিশ্বাসের যে কিছু গলদ থাকতে পারে সেটা প্রমান করার জন্য না বরং তাদের আভ্যন্তরীন সংগ্রামের একটি অস্ত্র হিসাবে প্রতিদ্বন্দী ধর্মীয় আত্মপক্ষ সমর্থনকারীদের বিরুদ্ধে, যারা দাবী করছে বিবর্তন ধর্মের সাথে কোন সংঘর্ষ সৃষ্টি করছে না। ’ন্যাশনাল অ্যাকাডেমী অব সায়েন্স পুরোপুরি ভাবে ঈশ্বর অবিশ্বাসীদের দখলে’ এ ধরনের একটি শিরোনামে আনসারস ইন জেনেসিস, বেশ তৃপ্তি সহকারে নেচার পত্রিকার সম্পাদককে লেখা লারসন এবং হুইথামে চিঠিটির শেষ অনুচ্ছেদটির উদ্ধৃতি দেয়:

‘আমরা যখন আমাদের গবেষনার ফলাফল প্রকাশের জন্য তৈরী করছি, ন্যাস (NAS বা ন্যাশনাল অ্যাকাডেমী অব সায়েন্স) একটি বুকলেট প্রকাশ করে পাবলিক স্কুল গুলোতে বিবর্তন পড়ানোর উৎসাহ দিয়ে, যা দীর্ঘদিন ধরে বৈজ্ঞানিক সমাজ এবং যুক্তরাষ্ট্রের কিছু রক্ষনশীল খৃষ্টান গ্রুপের মধ্যে চলমান বিতর্কর কারন। এই বুকলেটটি পাঠকদের আশ্বস্ত করে এই বলে :‘ ঈশ্বরের অস্তিত্ব আছে কি নেই এই প্রশ্নের ব্যাপারে বিজ্ঞানের অবস্থান নিরপেক্ষ‘; ন্যাস প্রেসিডেন্ট ব্রুস অ্যালবার্ট বলেন, এই অ্যাকাডেমীর অনেক বিখ্যাত সদস্য খুবই ধার্মিক ব্যাক্তি, যারা বিবর্তনে বিশ্বাস করেন, এবং তাদের অনেকেই জীববিজ্ঞানী, তবে আমাদের এই সার্ভে অন্য কথা বলছে’।

অ্যালবার্ট, যে কেউ বুঝতে পারবেন, নোমা’কে (NOMA) মেনে নিয়েছেন, যে কারনে বিষয়টি আমি ২য় অধ্যায়ে আলোচনা করেছি, ’দি নেভিল চেম্বারলেইন স্কুল অব ইভোল্যুশনিষ্ট’ অংশে। ’অ্যানসারস ইন জেনেসিস’ এর আসলে ভিন্ন অ্যাজেন্ডা আছে। যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল অ্যাকাডেমী অব সায়েন্স এর সমতুল্য ব্রিটেনে (এবং কমনওয়েলথ দেশগুলোর জন্য যেমন, কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, ভারত, পাকিস্থান এবং ইংরেজীভাষী আফ্রিকা ইত্যাদি, আছে রয়্যাল সোসাইটি। এই বইটা যখন প্রেসে আমার সহকর্মী আর. এলিসাবেথ কর্ণওয়েল (R. Elisabeth Cornwell) এবং মাইকেল স্টিরাট (Michael Stirrat) তখন রয়্যাল সোসাইটির ফেলোদের ধর্মীয় মতামত নিয়ে তাদের গবেষনা পত্রটি লিখছিলেন, লেখকদের পুরো উপসংহার প্রকাশিত হবে পরে, কিন্তু তারা আন্তরিকভাবে আমাকে অনুমতি দিয়েছেন প্রাথমিক ফলাফলটি এখানে প্রকাশ করার জন্য। তারা যে টুলটি ব্যবহার করেছিলেন মতামত কে স্কেল বা পরিমাপ করতে, তাহলো লাইকার্ট টাইপ এর সাত পয়েন্টের একটি স্কেল। সব, ১০৭৪ জন রয়্যাল সোসাইটির ফেলোদের মধ্যে যাদের একটি ইমেইল আছে (বেশীর ভাগেরই তা ছিল) তাদের উপর জরিপটি চালানো হয়, এবং প্রায় ২৩ শতাংশ এর উত্তর দেন (এ ধরনের গবেষনা এটি বেশ বড় একটি সংখ্যা); তাদের কাছে বেশ কয়েকটি প্রোপোজিশন প্রস্তাব করা হয়। যেমন, আমি ব্যক্তিগত ঈশ্বরে বিশ্বাস করি, অর্থাৎ যিনি প্রতিটি একক

ব্যাক্তির ব্যাপারে খোজ খবর করেন, প্রার্থনা শোনেন এবং জবাব দেন, নানা ধরনের পাপ এবং খারাপ কাজের ব্যাপারে নজর রাখেন এবং বিচার করেন, এ ধরনের প্রতিটি প্রস্তাবের জন্য অংশগ্রহনকারীদের ১ (সম্পুর্ন ভিন্নমত) থেকে ৭ (সম্পুর্ন একমত) পর্যন্ত একটি সংখ্যাকে বেছে নিতে বলা হয় তাদের মতামত অনুযায়ী। এই গবেষনার ফলাফলটি লারসন এবং হুইথামে স্টাডিটির ফলাফলের সাথে তুলনা করা কঠিন, কারন তারা (লারসন এবং হুইথাম) তাদের অংশগ্রহনকারীদের ৩ পয়েন্টের একটি স্কেল দিয়েছিলেন, এটির মত ৭ পয়েন্ট স্কেল নয়, কিন্তু তা সত্বেও সার্বিক প্রবণতাটা কিন্তু ছিল একই রকম। রয়্যাল সোসাইটির ফেলোদের বিশাল একটি অংশ যুক্তরাষ্ট্রে শিক্ষাবিদ বিজ্ঞানীদের মতই মাত্র ৩.৩ শতাংশ সদস্য মতামত দিয়েছেন ব্যাক্তিগত ঈশ্বরের অস্তিত্বের পক্ষে তাদের জোরালো সমর্থনের (অর্থাৎ তারা এই স্কেলের ৭ পছন্দ করেছেন), অন্যদিকে ৭৮.৮ শতাংশ জোরালো ভাবে কোন ব্যাক্তিগত ঈশ্বরের অস্তিত্বের ব্যাপারে তাদের ভিন্নমত পোষন করেছেন (বা তারা এই স্কেলের ১ পছন্দ করেছেন); আপনি যদি এই স্কেলে যারা ৬ এবং ৭ পছন্দ করেছে তাদের বিশ্বাসী হিসাবে সংজ্ঞায়িত করেন এবং যারা ১ ও ২ পছন্দ করেছে তাদের অবিশ্বাসী হিসাবে সংজ্ঞায়িত করেন, তাহলে ২১৩ জনের একটা বড় অংশ দেখা যাচ্ছে অবিশ্বাসী আর মাত্র ১২ জনকে দেখা যাচ্ছে বিশ্বাসী হিসাবে। লারসন এবং হুইথামের মত বা বেইট হালাহমী এবং আরজাইলের গবেষনায় বা কর্ণওয়েল এবং স্টিরাট এর গবেষনায় যা প্রতীয়মান হয়েছে, তাহলো যদিও সামান্য কিন্ত গুরুত্বপুর্ণ একটি প্রবণতা আছে অন্যান্য শাখার বিজ্ঞানীদের তুলনায় অপেক্ষাকৃতভাবে জীববিজ্ঞানীদের মধ্যে নিরীশ্বরবাদীদের সংখ্যায় বেশী হবার ক্ষেত্রে। বিস্তারিত আরো কিছু এবং কৌতুলহদ্দীপক উপসংহার জানার জন্য তাদের গবেষনা প্রকাশ হলে পড়ে দেখতে পারেন আগ্রহীরা [১৯]।

ন্যাশনাল অ্যাকাডেমী বা রয়্যাল সোসাইটির প্রথম সারির বিজ্ঞানীদের থেকে এবার অন্যদিকে নজর দেই, এমন কোন কি প্রমান আছে, বৃহত্তর জনগোষ্ঠীতে নীরিশ্বরবাদীরা সাধারনত বেশী শিক্ষিত এবং বেশী মেধা সম্পন্ন জনগোষ্ঠী থেকেই আসছে ? বেশ কিছু গবেষনাপত্র প্রকাশিত হয়েছে, ধার্মিকতা এবং শিক্ষাগত যোগ্যতার ও আই কিউ বা বুদ্ধাঙ্কর মধ্যে পরিসংখানগত সম্পর্ক নিয়ে। মাইকেল শেরমার (Michael Shermer) তার হাউ উই বিলিভ: দি সার্চ ফর গড ইন অ্যান এজ অব সায়েন্স (How we believe: The search for God in an age of Science) এ বর্ণনা দিয়েছেন একটি বড় আকারের সার্ভের, যেখানে রানডোমভাবে বাছাই করা যুক্তরাষ্ট্রের জনগোষ্ঠী মাঝে গবেষনা করেছিলেন শেরমার এবং তার সহযোগী ফ্র্যাঙ্ক সুলোওয়ে; তাদের পাওয়া চমকপ্রদ সব ফলাফলের মধ্যে ছিল ধর্মপ্রিয়তার আসলেই ঋণাত্মক বা নেগেটিভ একটি সম্পর্ক আছে উচ্চ শিক্ষার সাথে, অর্থাৎ ধার্মিকতা ক্রমশ কমতে থাকে শিক্ষাগত যোগ্যতা বাড়ার সাথে সাথে; উচ্চ শিক্ষিত মানুষদের ধর্মপ্রীতি থাকার সম্ভাবনা সাধারনত কম। বিজ্ঞানের প্রতি আগ্রহের এবং রাজনৈতিক উদারপন্থিতার (খুব জোরালো) সাথে ধার্মিকতারও ঋণাত্মক সম্পর্ক আছে। এর কোনটাই বিস্ময়কর ফলাফল যেমন নয় তেমনি, এই সত্যটা অবাক করে না যেমন পিতামাতা ধার্মিকতার সাথে সন্তানদের ধার্মিকতার ধনাত্মক একটি সম্পর্ক বিদ্যমান। সমাজবিজ্ঞানী বৃটিশ শিশুদের উপর গবেষনায় দেখেছেন, শুধুমাত্র প্রতি ১২ জনে একজন তাদের পিতামাতার ধর্মবিশ্বাস থেকে নিজেকে বের করে আনতে পারে।

স্পষ্টতই বিভিন্ন গবেষকদের পরিমাপের পদ্ধতিটি ভিন্ন, সুতরাং বিভিন্ন গবেষনার ফলাফল পারস্পরিক তুলনা করা সহজসাধ্য কাজ না। মেটা অ্যানালাইসিস হচ্ছে একটা পদ্ধতি, যেখানে গবেষকরা কোন একটি বিষয়ে প্রকাশিত সবগুলো গবেষনাপত্র নিয়ে দেখেন কতগুলো গবেষনা একই রকম উপসংহারে পৌছেছে আর কতগুলোই বা ভিন্ন কোন একটা উপসংহারে উপনীত হয়েছে। ধর্ম এবং আই কিউ উপর আমার জানা একমাত্র মেটা অ্যানালাইসিসটি প্রকাশ করেছিলেন পল বেল (Paul Bell), ২০০২ সালে মেনসা (Mensa) ম্যাগাজিনে (মেনসা হচ্ছে উচ্চ বুদ্ধাঙ্ক বা আই কিউ সম্পন্ন মানুষদের একটি সোসাইটি, এবং আশ্চর্য হবার কোন কারন নেই যে তাদের ম্যাগাজিন এমন কিছু বিষয়ে প্রবন্ধ ছাপায় যা তাদের মধ্যে সংহতি বৃদ্ধি করে) [২০]। বেল এর মতে, ১৯২৭ থেকে শুরু করে ৪৩ টা স্টাডি করা হয়েছে ধর্মীয় বিশ্বাস, বুদ্ধিমত্তা এবং শিক্ষাগত যোগ্যতার সম্পর্ক নিয়ে। মাত্র চারটি ছাড়া

বাকী সবকয়টি একটি বীপরিত সম্পর্ক খুজে পেয়েছে। অর্থাৎ বুদ্ধিমত্তা এবং শিক্ষাগত যোগ্যতার স্তর যত বেশী হবে, সেই মানুষগুলোর ধার্মিক হবার সম্ভাবনা বা কোন ধরণের ’বিশ্বাস’ ধারন করার সম্ভাবনাও হ্রাস পাবে।

যে কোন মেটা অ্যানালাইসিস অবশ্যই অনেক কম সুনির্দিষ্ট হয়, এই বিষয়ে যে কোন একটি নির্দিষ্ট স্টাডির তুলনায় যেগুলো সাধারনত এই মেটা অ্যানালাইসিসের অংশ হয়। এই ধরনের আরো বেশী স্টাডি হলে ভালো, এমনকি সেরা প্রতিষ্ঠানগুলো, যেমন ন্যাশনাল অ্যাকাডেমীগুলো বা প্রধান প্রধান পুরষ্কারগুলোর বিজয়ীদের, যেমন নোবেল, ক্র্যাফুর্ড, ফিল্ড, কিয়োটো, কসমস এবং অন্যান্যগুলো, মধ্যে আরো গবেষনা পরিচালনা করা প্রয়োজন। আমি আশা করছি এই বইটির ভবিষ্যৎ সংস্করনে সেই সব উপাত্তগুলো সংযুক্ত হবে। বর্তমান স্টাডিগুলোর থেকে যুক্তিসঙ্গত উপসংহার , জননন্দিত রোল মডেল, বিশেষ করে বিজ্ঞানীদের ব্যাপারে ধর্মীয় পক্ষ সমর্থনকারীদের জন্য হয়ত মঙ্গল হবে তাদের স্বভাব বিরুদ্ধভাবেই চুপ থাকাটা ।

পাসকালের বাজী:

বিখ্যাত ফরাসী গনিতজ্ঞ ব্লেইজ পাসকাল (Blaise Pascal) মনে করতেন, ঈশ্বরের অস্তিত্বের বিপক্ষে যত বড়ই সম্ভাবনা থাকুক না কেন, তার চেয়ে অনেক বেশী খেসারত দিতে হবে, যদি এ বিষয়ে কোন ধরনের ভুল অনুমান করলে; তাই ঈশ্বরে বিশ্বাস করাই আপনার জন্য মঙ্গলজনক, কারন আপনি যদি সঠিক হন, আপনি অনন্ত সুখের অধিকারী হবেন এবং আর আপনি যদি ভুলও করেন, সে ক্ষেত্রে আপনার কোন ক্ষতিও হচ্ছেনা। কিন্তু অন্যদিকে যদি আপনি ঈশ্বরে বিশ্বাস না করেন, এবং যদি দেখা যায় আপনার ধারনাটা ভুল, সেক্ষেত্রে আপনার জন্য আছে অনন্ত নরক যন্ত্রণা, আবার আপনি যদি সঠিকও হন, সে ক্ষেত্রে আপনার কিছু আসবে যাবে না। এরকম একটি উভয়সংকটে সিদ্ধান্ত নিতে কি খুব বেশী মাথা খাটাতে হবে ? সুতরাং ঈশ্বরে বিশ্বাস করুন।

কিন্তু ভালো করে লক্ষ্য করলে বোঝা যাবে, এই যুক্তিটাকে সুনির্দিষ্টভাবে কিছু অদ্ভুত ব্যাপার আছে। কোন কিছুকে ’বিশ্বাস’ করাকে কিন্তু আপনি কোন পলিসি বা নীতি হিসাবে সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন না, নিদেনপক্ষে বিশ্বাস এমন কোন কিছু না যে, আমি তা করার সিদ্ধান্ত নিতে পারি নিজের একটি ইচ্ছা প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। আমি চার্চে যাবার সিদ্ধান্ত নিতে পারি এবং আমি নিসেন ক্রিড পাঠ করার সিদ্ধান্ত নিতে পারি, আমি এক থাক বাইবেলের উপর হাত রেখে প্রতিজ্ঞা করে সিদ্ধান্ত নিতে পারি এই বলে যে, এর ভিতরের সব শব্দকে আমি মনে প্রানে বিশ্বাস করি। কিন্তু এসব কোন কিছুই আমাকে আসলে সেটাকে ‘বিশ্বাস’ করাবে না যদি আমি নিজে ’বিশ্বাস’ না করি। পাসকালের বাজী তাই শুধু ‘যুক্তি’ হতে পারে ঈশ্বরকে বিশ্বাস করার ’ভান’ করার ক্ষেত্রে। এবং যে ঈশ্বরে আপনি বিশ্বাস করছেন বলে দাবী করছেন, ভালো হয় সে যেন সর্বজ্ঞ ধরনের কোন ঈশ্বর না হয়, এর ব্যতিক্রম হলে তিনি এই ছলনার ব্যাপারটা সহজে ধরে ফেলার কথা। আমি সিদ্ধান্ত নেবার মাধ্যমে কিছু বিশ্বাস করতে পারবেন এমন হাস্যকর ধারনাটিকে বেশ সুন্দর ভাবে ঠাট্টা করেছিলেন ডগলাস অ্যাডামস (Douglas Adams) তার ডার্ক জেন্টলীস হলিস্টিক ডিটেকটিভ এজেন্সি (Dirk Gently’s Holistic Detective Agency) বইটিতে, যেখানে আমাদের সাথে দেখা হয়, একটি রবোটিক ইলেক্ট্রিক পুরোহিতের সাথে, শ্রম কমানোর যে যন্ত্রটি আপনি কিনতে পারবেন, যে ’আপনার পক্ষ হয়ে আপনার বিশ্বাস’ করার কাজটি করে দেবে। এর ডি ল্যাক্স মডেলটির বিজ্ঞাপন করা হয়েছে, ’এরা সল্ট লেক সিটিতে আপনি যা কখনো বিশ্বাস করতে পারবেননা, এরা সেটা বিশ্বাস করতে সক্ষম’।

যাই হোক, কিন্তু কেন, আমাদের এই ধারনাটাকে সহজে গ্রহন করতে হবে যে, আপনি যদি ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করতে চান, আপনাকে অবশ্যই একটা জিনিস করতে , তাহলো তাকে বিশ্বাস করতে হবে? বিশ্বাস করার মধ্যে কি বিশেষত্ব আছে? ঈশ্বরের কি দয়াশীলতা বা উদারতা বা নম্রতাকে পুরষ্কৃত করার কথা না? অথবা আন্তরিকতাকে? কি হবে, যদি ঈশ্বর একজন বিজ্ঞানী, যিনি সততার সাথে সত্যের অনুসন্ধানকে সবচেয়ে শ্রেষ্ট মানবীয় গুন বলে মনে করেন? আসলেই তো, এই মহাবিশ্বের ডিজাইনার হিসাবে যাকে দাবী করা হয়, তাকে নিশ্চয়ই বৈজ্ঞানিক হতে হবে? বার্ট্রান্ড

রাসেলকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যদি তার মৃত্যুর পর তিনি যদি ঈশ্বরের মুখোমুখি হন, এবং ঈশ্বর যদি জানতে চান, কেন রাসেল তার অস্তিত্বে বিশ্বাস করতেন না? রাসেলের উত্তর ছিলো (আমি বলবো প্রায় অমর), 'যথেষ্ট প্রমান ছিল না ঈশ্বর, যথেষ্ট প্রমান ছিল না'; ঈশ্বরের কি পাসকালের কাপুরুষোচিত সুবিধাবাদী বাজীর চেয়ে রাসেলকে তার সাহসী সন্দেহবাদিতার জন্য বেশী শ্রদ্ধা করার কথা না (বাদ দিলাম তার রাসেলের সেই সাহসী শান্তিবাদিতা, যার কারনে তাকে প্রথম বিশ্ব যুদ্ধের সময় কারাভোগ করতে হয়েছিল)? এবং যদিও আমাদের জানার উপায় নেই, ঈশ্বর কোন দিকে সমর্থন দেবেন এবং জানার প্রয়োজনও আসলে নেই পাসকালের বাজীর যুক্তিকে প্রত্যাখান করার জন্য। মনে রাখতে হবে আমরা একটা বাজির কথা বলছি এবং পাসকাল কিন্তু বাজীর স্বপক্ষে সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ ছাড়া আর বেশী কিছু দাবী করেননি; আপনি কি বাজী রাখবেন যে ঈশ্বর অসৎভাবে ভান করা বিশ্বাসকে (বা এমনকি সৎভাবে করা বিশ্বাসকে) আন্তরিক সৎ সন্দেহবাদীতার চেয়ে বেশী মুল্য দেন? এবং তারপরও ধরুন, আপনি মারা যাবার পর যে, ঈশ্বরের মুখোমুখি হলেন দেখা গেল তিনি বা'ল (Baal) এবং তার পুরোনো প্রতিদ্বন্দী ইয়াওয়ে (জিহোভা) থেকে কোন অংশে কম হিংসুটে না। পাসকালের জন্য ভুল কোন ঈশ্বরের উপর বাজি রাখার চেয়ে কোন ধরনের উপর ঈশ্বরের উপর না বাজি রাখাটাই কি উত্তম না ? সম্ভাব্য অসংখ্য ঈশ্বর, দেব বা দেবীদের যে কোন কারোর উপর বাজি রাখতে পারার সম্ভাবনাটি পাসকালের পুরো যুক্তিটাকে কি প্রশ্নবিদ্ধ করে না? পাসকাল সম্ভবত ঠাট্টা করছিলেন, যখন তিনি তার বাজীর স্বপক্ষে প্রচারনা করেছিলেন, ঠিক যেমন আমি এখন ঠাট্টাচ্ছলে একে বর্জন করছি। কিন্তু আমার সাথে মানুষের দেখা হয়েছে, যেমন কোন লেকচারের পরে প্রশ্নোত্তর পর্বে, যারা খুবই গুরুত্বের সাথে পাসকালের এই বাজীকে দাবী করেছে ঈশ্বর বিশ্বাসের স্বপক্ষে যুক্তি হিসাবে, সুতরাং একারনেই এটিকে খানিকটা আলোচনা করার প্রয়োজনীয়তা ছিল।

সবশেষে, পাসকালের বাজীর ঠিক বীপরিত কোন বাজীর স্বপক্ষে কি যুক্তি প্রস্তাব করা সম্ভব? ধরা যাক, আমরা মেনে নেই, আসলে খুব সামান্য পরিমান সম্ভাবনা আছে ঈশ্বরের অস্তিত্ব এর। তাসত্ত্বেও বলা যেতে পারে আপনি একটি উত্তম এবং পরিপুর্ণ জীবন কাটাতে পারবেন তার অস্তিত্বের উপর বাজি রাখার চেয়ে তার অস্তিত্বহীন উপর বাজী রাখার মাধ্যমে এবং এভাবে আপনার মুল্যবান সময়, তাকে উপাসনা করার পেছনে অপচয় না করে, তার জন্য আত্মত্যাগ না করে, বা তার জন্য যুদ্ধ করে বা না মৃত্যু বরন করে ইত্যাদি। আমি এখানে এই প্রশ্নটা নিয়ে আর আগে বাড়বো না, কিন্তু পাঠকরা মনে রাখতে পারেন বিশেষ করে যখন আমরা ধর্মীয় বিশ্বাস এবং আচার পালনের প্রক্রিয়ার কি ধরনের অশুভ পরিনতি হতে পারে সেই সংক্রান্ত পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে আলোচনা করবো।

বায়েসিয়ান যুক্তিগুলো:

আমার মনে হয় ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমান করার সবচে আজব কেসটি আমি দেখেছি বায়েসিয়ান যুক্তির ব্যবহারে, সম্প্রতি স্টিফেন আনউইন (Stephen Unwin) এই যুক্তিগুলো প্রস্তাব করেছেন তার দি প্রোবাবিলিটি অব গড (The probability of God) বইটিতে। আমি প্রথমে খানিকটা ইতস্তত বোধ করছিলাম এই যুক্তিগুলো এখানে যোগ করার কথা ভেবে। যা শুধুমাত্র দুর্বলই না, এবং বহুকাল আগে থেকেই অপেক্ষাকৃত কম শ্রদ্ধা কুড়িয়েছে। যদিও আনউইনের বইটি উল্লেখযোগ্যভাবে সাংবাদিকদের নজর কেড়েছিল যখন ২০০৩ সালে এটি প্রথম প্রকাশিত হয় এবং এছাড়াও এই যুক্তিটি আমার বেশ কিছু আলোচনার সুত্র একত্র করার একটা সুযোগ দিয়েছে। তার লক্ষ্য নিয়ে আমার খানিকটা সহমর্মিতা আছে , কারন ২ নং অধ্যায়ে আমি যুক্তি দিয়েছিলাম, ঈশ্বরের অস্তিত্বের বিশ্বাস একটি বৈজ্ঞানিক হাইপোথিসিস এবং অন্ততপক্ষে নীতিগতভাবে পরীক্ষাযোগ্য। আনউইন কুইকজোটিক বা অতিমাত্রায় আদর্শবাদী বাস্তবজ্ঞান বর্জিত একটি প্রচেষ্টা চালিয়েছেন, ঈশ্বরের অস্তিত্বের সম্ভাবনাটির একটি সংখ্যাগত রুপ দিতে, যা আসলেই হাস্যকর।

বইটির সাবটাইটেলটি, 'এ সিম্পল ক্যালকুলেশন দ্যাট প্রুভস দ্য আল্টিমেট ট্রুথ (A simple calculatio that proves the ultimate truth), যে শেষ সংস্করণে প্রকাশকের সংযোজন তা স্পষ্ট বোঝা যায়, কারন এই অতিমাত্রায়

আত্মবিশ্বাস আনউইনের মুল বই এর টেক্সট এ পাওয়া যায়না। বইটাকে বলা যায়, একটি হাউ টু ম্যানুয়াল, এক ধরনের বায়েস এর থিওরেম ফর ডামিস গোছের কিছু, যা কিনা হালকা বিদ্রুপাত্মক ভাবে ঈশ্বরের অস্তিত্বকে কেস স্টাডি হিসাবে ব্যবহার করেছে। আনউইন অনায়াসে একই ভাবে কোন কাল্পনিক খুনকে টেষ্ট কেস স্টাডি ব্যবহার করতে পারতেন বায়েস এর থিওরেম বোঝাতে: গোয়েন্দা তদন্ত কর্মকর্তা প্রথমে নানা আলামত সংগ্রহ করে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখলেন; রিভলভারে আঙ্গুলের ছাপ ইঙ্গিত করছে, মিসেস পিকক এই হত্যা করেছেন। এখন এই সন্দেহটাকে গানিতীকভাবে পরিমাপ করুন তার উপর একটি সম্ভাবনার সম্ভাব্য সংখ্যা দিয়ে। কিন্তু প্রফেসর প্লুম এর উদ্দেশ্য ছিল মিসেস পিককেকে দোষী হিসাবে ফাসানোর জন্য। সুতারাং এর আগের সম্ভাবনার পরিমাপের থেকে একটি সংখ্যা পরিমান হ্রাস করুন; ফরেনসিক প্রমান বলেছে শতকরা ৭০ শতাংশ সম্ভাবনা আছে, বেশ দুর থেকে রিভলভারটি থেকে নির্ভুল নিশানায় গুলি বের হবার, যা দাবী করছে হত্যাকারী সম্ভবত সামরিক প্রশিক্ষন প্রাপ্ত, সুতরাং কর্নেল মাষ্টার্ডকে নিয়ে আমাদের বাড়তি সন্দেহটাকে একটা সংখ্যা দিয়ে পরিমাপ করুন। দেখা যাচ্ছে রেভারেন্ড গ্রীন এর খুন করার সবচে সম্ভাব্য মোটিভ আছে ; সুতরাং তার ক্ষেত্রে আমাদের গানিতীক সম্ভাবনার পরিমাপটা বাড়ানো হোক। কিন্তু লম্বা সোনালী যে চুল এর নমুনা নিহতের পরনের জ্যাকেটে পাওয়া গেছে সেটা মিস স্কারলেট এর এবং ... এভাবে আরো। এরকম সাবজেক্টিভ বা আত্মগত ভাবে সিদ্ধান্ত নেয়া সম্ভাবনার নানা গানিতীক পরিমাপ গোয়েন্দা কর্মকর্তার মনে ঘুরপাক খেতে থাকে, বার বার নানা সম্ভাবনা তাকে নানা দিকে টেনে নেবার চেষ্টা করতে থাকে। বায়েস এর থিওরেম এর তাকে উপসংহারে উপনীত হতে সহায়তা করার কথা। এটি হচ্ছে গানিতীক একটি ইন্জিন যা নানা সম্ভাব্য সংখ্যাকে যুক্ত করে একটি চুড়ান্ত রায় দেয়, যার আবার সম্পুর্ণ নিজস্ব একটি সম্ভাবনার পরিমাপ আছে। কিন্তু মনে রাখতে হবে চুড়ান্ত সংখ্যাটি কতটুকু উত্তম হবে তা নির্ভর করবে ইন্জিনে ইনপুট করা মুল সংখ্যাগুলোর উপর। এগুলো সাধারনত আত্মগতভাবে বিচার করা বা সাবজেকটিভ এবং সে কারনে এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকল সন্দেহগুলোও এই হিসাবে প্রবেশ করে। সেই GIGO নীতিও (Garbage In Garbage Out) এখানে প্রযোজ্য, এবং আনউইনের ঈশ্বর উদহারনের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র প্রযোজ্য বললে খুব বেশী লঘুকরন করা হয়ে যায়।

আনউইন একজন ঝুকি ব্যাবস্থাপনা পরামর্শক যার অন্যান্য প্রতিদ্বন্দী পরিসংখ্যানের পদ্ধতির তুলনায় বিশেষ দুর্বলতা আছে বায়েসিয়ান পদ্ধতিতে উপসংহারে উপনীত হবার। তিনি বায়েসীয় থিওরেমটি ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন, কোন হত্যাকান্ডের কেস স্টাডি না বরং সবচেয়ে বড় যে টেষ্ট কেস, ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিষয়টিকে। তার পরিকল্পনা হলো সম্পুর্ন অনিশ্চয়তা দিয়ে বিষয়টি শুরু করা, যা তিনি পরিমাপ করার চেষ্টা করেছেন ঈশ্বরের অস্তিত্ব এবং অনস্তিত্ব উভয়ের শতকরা ৫০ শতাংশ সম্ভাবনা দিয়ে। তারপর তিনি তালিকা করেছেন মোট ৬ টি ফ্যাক্ট এর যাদের এই বিষয়ের উপর প্রভাব থাকার সম্ভাবনা আছে, এবং প্রত্যেকটির একটি করে পরিমাপগত সংখ্যা ভাগ করে দেয়া হয়েছে, এবং এরপর সব সংখ্যাগুলোকে বায়েসীয় থিওরেম এর ইন্জিনে ইনপুট করার পর তিনি লক্ষ্য করেছেন কোন সংখ্যাটি বের হয়ে আসে। সমস্যা হচ্ছে (আবার পুনরাবৃত্তি করছি) এই ৬ টি সংখ্যা যা প্রত্যেকটি নিয়ামক ফ্যাক্টের সাথে প্রদান করা হয়েছে, তা আসলে পরিমাপ করা নয়, এটি সম্পুর্ন ভাবে স্টিফেন আনউইনের ব্যাক্তিগত বিচার বিবেচনার দ্বারা প্রদত্ত, যা এই অনুশীলনের খাতিরে সংখ্যায় রুপান্তরিত করা হয়েছে। এই ৬ টি ফ্যাক্ট হচ্ছে:

১. আমাদের ভালোমন্দ বোঝার একটি ক্ষমতা আছে

২. মানুষ অনেক অশুভ কাজ করে (হিটলার, স্টালিন, সাদ্দাম হুসেইন)

৩. প্রকৃতিও অশুভ কাজ করে (ভুমিকম্প, সুনামি, হারিকেন)

৪. ছোটখাট অলৌকিক ঘটনা ঘটতে পারে (আমি আমার চাবি হারিয়ে ফেলেছিলাম এবং আবার তা আমি খুজে পেলাম)

৫. বড় মাপের অলৌকিক ঘটনা ঘটতে পারে (যীশু মৃত্যুর পরে পুনরুজ্জীবিত হয়েছিলেন)

৬. মানুষের নানা ধর্মীয় অভিজ্ঞতা আছে ;

এইসব কিছুর অবশেষে যা প্রমান করে (আমার মতে, কোন কিছুই না) তা হলো, দোদুল্যমান বায়েসীয় দৌড়ে যেখানে ঈশ্বর আগে থেকে বাজীতে এগিয়ে ছিলেন, খানিকটা পিছিয়ে পড়েন, তারপর আবার ধীরে ধীরে তার ৫০ শতাংশ জায়গায় ফিরে যান, যেখান থেকে তিনি শুরু করেছিলেন, অবশেষে শেষ পর্যন্ত তিনি আনউইনের হিসাব মতন ৬৭ শতাংশ সম্ভাবনা অর্জন করেন তার অস্তিত্বের স্বপক্ষে। এখানে আনউইন সন্তুষ্ট হতে পারেননি বায়েসীয় ফলাফলের উপর, তার কাছে এই ৬৭ শতাংশ যথেষ্ট বেশী মনে হয়নি, সুতরাং তিনি একটা অদ্ভুত একটি ধাপের শরণাপন্ন হন, জরুরী ভাবে তিনি 'বিশ্বাস'কে এর মধ্যে ইনজেক্ট করে এই সম্ভাবনাকে নিয়ে যান ৯৫ শতাংশর কাছে। স্পষ্টত এটা মনে হতে পারে একটা ঠাট্টা, কিন্তু আসলে ঠিক এভাবেই তিনি কাজটি করেছেন; ঠিক কেন এভাবে কাজটি করেছেন সেটার ব্যাখ্যা আমি যদি দিতে পারতাম ভালো হতো, কিন্তু আসলে আমারও আর কিছুই বলার নেই এ বিষয়ে। এই ধরনের উদ্ভট দাবী আমি আগেও দেখেছি অন্য ক্ষেত্রে, যখন আমি ধার্মিক কিন্তু বুদ্ধিমান বিজ্ঞানীদের চ্যালেন্জ করেছি তাদের বিশ্বাসের স্বপক্ষে তাদের যুক্তি ব্যাখা করার জন্য, বিশেষ করে তারা যখন নিজেরাই স্বীকার করেন তাদের বিশ্বাসের স্বপক্ষে কোন প্রমান নেই: 'আমি স্বীকার করছি কোন প্রমান নেই। এজন্য কারন আছে কেন একটাকে 'বিশ্বাস' বা ফেইথ বলা হয়' (এই শেষ বাক্যটি উচ্চারন করা হয় প্রায় সুস্পষ্ট আত্মবিশ্বাসের সাথে, কোন ধরনের আত্মপক্ষ সমর্থন মুলক এমন বক্তব্যর জন্য নুন্যতম অনুতপ্ত হয়ে ক্ষমা চাইবার নমনীয়তার চিহ্ন ছাড়াই)।

আশ্চর্যজনকভাবেই আনউইনের ৬ টি প্রস্তাবনার তালিকায় ডিজাইন থেকে যুক্তি নেই, এছাড়া অ্যাকোয়াইনাস এর পাচটি প্রমানের একটিও এখানে নেই, এ ছাড়াও বাকী অনটোলজিক্যাল যুক্তিগুলোও নেই। এসব যুক্তিগুলোর সাথে আনউইনের যুক্তির কোন লেনদেন নেই এবং ঈশ্বরের অস্তিত্বের সম্ভাবনা প্রশ্নে তার গানিতীক পরিমাপে ক্ষেত্রে এদের সামান্য অবদান ও প্রভাব নেই। ভালো পরিসংখ্যানবিদের মতই তিনি এগুলো ব্যাখ্যা করেছেন এবং ফাপা যুক্তি বলে এগুলো বাতিল করেছেন। আমি এজন্য তাকে ক্রেডিট দেবো, যদিও তার 'ডিজাইন যুক্তি' বাতিল করার কারন আমার থেকে ভিন্ন। কিন্তু তার বায়েসীয় দরজা দিয়ে যে যুক্তিকে তিনি প্রবেশাধিকার দিয়েছেন, সেটাও একই রকম দুর্বল বলে আমার মনে হয়েছে। এটা বলার একমাত্র কারন যে আত্মগত বা সাবজেকটিভ গানিতীক সংখ্যা তিনি তার ফ্যাক্টদের উপর আরোপ করেছেন, কাজটা আমি করলে সেটি তার থেকে ভিন্ন হত। কিন্তু সাবজেকটিভ জাজমেন্ট দিয়ে কার এত মাথাব্যাথা আছে ? তার ধারনা আমাদের ভাল মন্দ পার্থক্য করার ক্ষমতা আছে এই বিষয়টি ঈশ্বরের অস্তিত্বের স্বপক্ষে জোরালো প্রমান এবং যেখানে আমি মনে করি বিষয়টা তাকে কোন দিকেই সমর্থন করছে না, তার প্রাথমিক প্রাকধারনা থেকে (ঈশ্বরের অস্তিত্ব ৫০/৫০)। ৬ এবং ৭ অধ্যায় স্পষ্ট হবে যে একটি জোরালো কেস তৈরী করা যাবে যে আমাদের ভালো মন্দ বোঝার ক্ষমতার ব্যাপারটায় আসলেই কোন অতিপ্রাকৃত ঈশ্বরের কোন স্পষ্ট যোগাযোগ নেই। যেমন বীটহোভেন এর কোয়ারর্টেট বোঝার জন্য, আমাদের এই ভালোমন্দ বোঝার অনুভুতিটা (অবশ্যই এর অর্থ এই অনুভুতিকে অনুগমন করার আমাদের প্রবনতাটি না) ঈশ্বর থাকলেও যেমন থাকতো না থাকলেও তেমনই থাকতো।

অন্যদিকে আনউইন অশুভর উপস্থিতি বিশ্বাস করেন, বিশেষ করে প্রাকৃতিক বিপর্যয় যেমন ভুমিকম্প, সুনামি ইত্যাদি ঈশ্বরের অস্তিত্বের বীপরিত দিকেই জোরালো ইঙ্গিত দিচ্ছে। এখানে আনউইনের বিচার আমার বিচারের বীপরিতে অবস্থান নিয়েছে যা অনেক ধর্মতাত্ত্বিকেরও অস্বস্তির কারন। থিওডিসি (অশুভর উপস্থিতির মুখে স্বগীয় সত্বার উপস্থিতি এবং জয়ের প্রমান) বহু ধর্মতাত্ত্বিককের অনিদ্রার কারন। প্রভাবশালী অক্সফোর্ড কমপ্যানিয়ন টু ফিলোসফি

এই অশুভর সমস্যাকে চিহ্নিত করেছেন প্রচলিত ঈশ্বরবাদিতার সবচেয়ে শক্তিশালী চ্যালন্জ হিসাবে। কিন্তু এই যুক্তিটা শুধুমাত্র একজন ’ভালো ঈশ্বরের’ অস্তিত্বের বিরুদ্ধে মত্র। এই ভালোমন্দ যাচাই করার ক্ষমতা ঈশ্বর হাইপোথেসিসের কোন অংশ না, শুধু মাত্র পছন্দনীয় একটি উপরি মাত্র।

স্পষ্টতই ধর্মীয় মনোভাবাপন্ন মানুষগুলো সাধারনত সবসময়ই কোনটা আসলে সত্যি এবং কোন তারা সত্যি বলে ভাবতে ভালোবাসেন, এই দুয়ের মধ্যে পার্থক্য করতে অক্ষম । কিন্তু, অতিপ্রাকৃত বুদ্ধিমত্তায় বিশ্বাস করে এমন খানিকটা বেশী শিক্ষিত বিশ্বাসীদের জন্য, এই অশুভ শক্তি সমস্যাটা অতিক্রম করা শিশুসুলভ সহজ একটি কাজ। সেক্ষেত্রে তাদের শুধুমাত্র একটি খারাপ ঈশ্বরকে কল্পনা করতে হবে, যেমন একজন ওল্ড টেষ্টামেন্টের পাতায় পাতায় বিরাজমান অথবা, আপনি যদি সেটা করতে পছন্দ না করেন, একটা আলাদা অশুভ দেবতাকে আবিষ্কার করুন, আর তার নাম দেন শয়তান বা স্যাটান, বিশ্বের যত অশুভ কাজের জন্য ভালো ঈশ্বরের সাথে তার মহাজাগতি যুদ্ধের উপর এবার সব দোষ চাপিয়ে দিন। অথবা আরো বেশী অভিজাত সমাধান –এমন ঈশ্বরের কল্পনা করুন, যার মানুষের দৈনন্দিন হাহাকার নিয়ে ব্যস্ত হবার চেয়ে আরো অনেক মহান কাজ করার আছে বা এমন একজন ঈশ্বর যিনি মানুষের কষ্ট সম্পর্কে নির্বিকার না, তবে তার কাছে, এই যন্ত্রনা সহ্য করার মানে হচ্ছে একটি তার গোছানো আইন মেনে চলা এই মহাবিশ্বে স্বাধীন ইচ্ছা শক্তি বা ফ্রি উইল এর জন্য মুল্য পরিশোধ করা। ধর্মতাত্বিকদের দেখা যায় এইসব যুক্তিগুলো বিনা বাক্য ব্যায়ে মেনে নিয়েছেন।

এ কারনেই যদি আমি নিজে আবার নতুন করে আনউইনের বায়েসীয় অনুশীলনটি করি, তাহলে অশুভ শক্তির উপস্থিতির সমস্যাটি কিংবা সামগ্রিকভাবে নৈতিকতার বিষয়টি আমাকে খুব বেশী পরিবর্তন করাবে না নাল হাইপোথিসিস (Nullhypothesis)থেকে,যে কোন একটি দিকে (আনউইনের ৫০ শতাংশ সম্ভাবনা থেকে)। কিন্তু আমি এই পয়েন্টটা আর তর্ক করতে চাচ্ছি না কারন কোনভাবেই আমি ব্যাক্তিগত মতামত নিয়ে উৎসাহ বোধ করতে পারিনা, সেটা আমার বা আনউইনের যার হোক না কেন।

এরচেয়ে অনেক শক্তিশালী যুক্তিটি হলো, যা কোন ব্যাক্তিগত অনুধাবন বা মতামতের উপর প্রতিষ্ঠিত না, এবং সেটা হলো অসম্ভাব্যতা থেকে নেয়া যুক্তিটি। যা আমাদের আসলেই ৫০ শতাংশ অজ্ঞেয়বাদ থেকে নাটকীয় ভাবে দুরে নিয়ে যায়, অনেক ঈশ্বরবাদীদের চোখে যা চরম ঈশ্বরবাদী অবস্থানের প্রান্তে, আমার দৃষ্টিতে চরম নীরিশ্বরবাদীতার প্রান্তে। আমি বিষয়টি বেশ কয়েকবার উল্লেখ করেছি ইতিমধ্যে, আসলে পুরো বিতর্কটা একটা পরিচিত প্রশ্নের আশে পাশে ঘুরপাক খাচ্ছে, ‘ঈশ্বরকে কে তৈরী করেছে’? যারা চিন্তা করতে পারেন, তারা ইতিমধ্যেই এর উত্তর নিজেরাই খুজে নিতে পেরেছেন। একজন পরিকল্পক বা ডিজাইনার ঈশ্বর, কোন সংগঠিত জটিলতা বা অর্গানাইজড কমপ্লেক্সিটি আসলেই ব্যাখ্যা করতে পারেনা, কারন কোন ঈশ্বর, যিনি যথেষ্ট পরিমানে জটিল এমন কিছু ডিজাইন করতে পারেন, তার নিজের ক্ষেত্রেও বিষয়টি একই রকম ব্যাখ্যার দাবী করে। ঈশ্বর এমন একটি অসীম রিগ্রেস এর পরিস্থিতি আমাদের উপস্থাপন করেন, যেখান থেকে মুক্তি পাবার ব্যাপারে তিনি আমাদের কোন সাহায্য করতে অক্ষম। এই যুক্তিটা, পরবর্তী অধ্যায়ে আমি যা ব্যাখ্যা আরো করবো, দেখাচ্ছে যে ঈশ্বর, যদিও টেকনিক্যালি অপ্রমানযোগ্য না, তবে অবশ্যই খুবই খুবই অসম্ভাব্য।

পাদটীকা:

[১] আমি এখানে না মনে করে থাকতে পারছি না, একসাথে জ্যামিতি পড়ার সময় আমার এক স্কুল বন্ধুর ইউক্লিডিয়ান জ্যামিতির প্রমান হিসাবে অমন সিলোগজিমের ব্যবহার: ত্রিভুজ এবিসি দেখতে সমবাহু ত্রিভুজের মত, সুতরাং।

[২] Ontology: the branch of metaphysics that studies the nature of existence or being as such.

[৩] The terms ***a priori*** (“from the earlier”) and ***a posteriori*** (“from the later”) are used in philosophy (epistemology) to distinguish two types ofknowledge, justifications or arguments. *A priori* knowledge or justification is independent of experience (for example “All bachelors are unmarried”); *a posteriori* knowledge or justification is dependent on experience or empiricalevidence (for example “Some bachelors are very happy”).

[৪] জেনোর প্যারাডক্স (Zeno’s paradox) এর বিস্তারিত সবার ভালোই জানা আছে বিধায় আমি ফুটনোট ছাড়া এর আর পুনরাবৃত্তি করলাম না। অ্যাকিলীস একটি কচ্ছপ থেকে দশগুন জোরে দৌড়াতে পারে, সুতরাং সে কচ্ছপকে ১০০ গজ দুরত্ব সামনে থেকে শুরু করার সুযোগ দিল। অ্যাকিলীস ১০০ গজ দৌড়ায় এবং কচ্ছপ এখন ১০ গজ আগে, অ্যাকিলীস ১০ গজ দৌড়ায় এবং কচ্ছপ ১ গজ আগে, ।অ্যাকিলীস আরো একগজ দৌড়ায়, কচ্ছপ তখনও এক গজের ১০ ভাগের একভাগ আগে... এবং এভাবে অনন্তকাল চলতে থাকবে, সুতরাং অ্যাকিলীস কচ্ছপ কখনোই ধরতে পারবে না।

[৫]আমরা এমন কিছু বিষয় দেখতে পাই, ইদানীং দার্শনিক অ্যান্থনী ফ্লিউ এর বহুলপ্রচারিত পুরানো মতবাদের প্রতি পৃষ্ঠ প্রদর্শনের ঘটনায়, যিনি তার বৃদ্ধ বয়সে ঘোষনা দেন কোন এক ধরনের দৈবত্বের প্রতি তিনি বিশ্বাসীতে রুপান্তরিত হয়েছেন (যা সমস্ত ইন্টারনেট জুড়ে অতি উৎসাহের সাথে পুনরাবৃত্তি হচ্ছে); অন্যদিকে রাসেল একজন মহান দার্শনিক, নোবেল পুরষ্কার পেয়েছিলেন, হয়তো ফ্লিউর এই তথাকথিত রুপান্তরও টেম্পলটন পুরষ্কার অর্জন করতে পারে। সেদিকে তার যাত্রার প্রথম পদক্ষেপ তার সেই কুখ্যাত সিদ্ধান্ত, ২০০৬ সালে ফিলিপ ই জনসন পুরষ্কার (‘Phillip E. Johnson Award for Liberty and Truth’) গ্রহন। প্রথম এই ফিলিপ ই জনসন পুরষ্কার গ্রহন করেন ফিলিপ ই জনসন নিজেই, যে আইনজীবি ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইনের বিখ্যাত ওয়েজ স্ট্রাটেজীর আবিষ্কার করেছিলেন। ফ্লিউ হবেন এর দ্বিতীয় গ্রহীতা। এই পুরষ্কারটি প্রদান করে বায়োলা বা BIOLOA বা the Bible Institute of Los Angeles ; না ভেবে আসলে পারা যায় না, ফ্লিউ কি বুঝতে পারছেন, তাকে ব্যবহার করা হচ্ছে। ভিক্টর স্টেনগার এর ‘Flew’s flawed science’, *Free Inquiry* 25: 2, 2005, 17-18;http://www.secularhumanism.org/ index.php? section= library & page= stenger_25_2 দেখুন।

[৬] http://www.iep.utm.edU/o/ont-arg.htm. Gasking’s ‘proof is at http://www.uq.edu.au/~pdwgrey/pubs/gasking.html.

[৭] The whole subject of illusions is discussed by Richard Gregory in a series of books including in Gregory, R. L. (1997). Eye and Brain. Princeton:PrincetonUniversity Press.

[৮]http://www.sofc.org/Spirituality/s-of-fatima.htm.

[৯]Tom Flynn, ‘Matthew vs. Luke’, Free Inquiry 25: 1, 2004, 34-45;Robert Gillooly, ‘Shedding light on the light of the world’, Free Inquiry 25: 1, 2004, 27-30.

[১০] আমি সাবটাইটেলটা উল্লেখ করলাম, কার এই নামটার ব্যাপারে আমি আত্মবিশ্বাসী। লন্ডনের কন্টিনিউয়াম থেকে প্রকাশিত বইটার যে কপি আমার কাছে আছে সেটা নাম Whose word is it? আমি এই সংস্করনের কোথাও দেখলাম না এটি হার্পার সান ফ্রান্সিসকো থেকে প্রকাশিত সংস্করনটি একই, যেটা আমি দেখিনি, যারা প্রধান শিরোনাম Misquoting Jesus; আমার ধারনা তারা একই বই; কিন্তু প্রকাশকরা এই ধরনের সংশয় কেন সৃষ্টি করে।

[১১] Ehrman, B. D. (2003). Lost Christianities: The Battles for Scripture

and the Faiths We Never Knew.Oxford:OxfordUniversityPress. Ehrman, B. D. (2003). Lost Scriptures: Books that Did Not Make It into the New Testament.Oxford:OxfordUniversityPress. Ehrman, B. D. (2006). Whose Word Is It?London: Continuum.

[১২] এ এন উইলসন, তার যীশুর জীবনকাহিনীতে, জোসেফ একজন কাঠমিস্ত্রি ছিলেন এই তথ্যটিকে সংশয়ের মধ্যে ফেলে দিয়েছিলেন। গ্রীক শব্দ Tekton এর আসল অর্থ কার্পেন্টার বা কাঠমিস্ত্রি, কিন্তু এটি অনুদিত হয়েঠে আরমায়িক শব্দ Naggar থেকে, যার অর্থ হতে পারে মিস্ত্রি এবং জ্ঞানী ব্যাক্তি। বাইবেলকে কলুষিত করেছে এমন বেশ কিছু ভুল শব্দানুবাদের একটি এটি। সবচেয়ে বিখ্যাত অবশ্যেই ইসাইয়াহ (Isaiah) এর তরুন রমনীর হিব্রু (almah) থেকে গ্রীক শব্দ কুমারী (Parthenos) ভ্রান্ত অনুবাদ। খুব সহজেই ভুল হতে পারে (চিন্তা করুন ইংরেজী maid আর maiden, এ ধরনের ভুল কেমন করে হতে পারে সেটা বোঝার জন্য); অনুবাদকের এই সামান্য একটু ভুল কিভাবে স্ফীত হয়ে যীশুর মা কুমারী ছিলেন বলে একটা বিশাল কাহিনী তৈরী করা হয়েছে। এ ধরনের আরেকটি কাহিনী কেবল এর সাথে তুলনা হতে পারে, সেটাও অনুবাদ বিভ্রাট এবং এর কেন্দ্রেও আছে কুমারী। ইবন ওয়ারাক এবিষয়ে দারুন মজার আলোচনা করেছিলেন, প্রত্যেকটি ইসলামী শহীদদের বিখ্যাত প্রতিশ্রুতি দেয়া আছে তারা মৃত্যুর পর বেহেশতে ৭২ জন কুমারী বা Virgin হুরপরী পাবে উপহার হিসাবে, এখানে এই কুমারী শব্দটা একটি ভ্রান্ত অনুবাদ ’ স্ফটিক স্বচ্ছ সাদা আঙ্গুর বা White raisin of crystal clarity ’ শব্দটির। শুধু এই বিষয়টা যদি আরো বেশী মানুষ জানতো, কত নিরীহ আত্মঘাতী বোমাহামলাকারীর জীবন বাচতো? (ইবন ওয়ারাক, Virgins? What virgins? Free Inquiry 26:1,2006,45-6);

[১৩] এমন কি আমাকে সন্মানিত করা হয়েছে মৃত্যুসজ্জায় ধর্মে ফিরে আসার ভবিষ্যদ্বানী দিয়ে। আসলে এটা ঘটেছে একঘেয়ে নিয়মিতভাবে। প্রতিটি পুনরাবৃত্তি সেই একই ভ্রমের ধোয়া তুলে যাচ্ছে, আমার সম্ভবত সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে মরার সময় টেপরেকর্ডার এর ব্যবস্থা করতে হবে যেন আমার মরনোত্তর সন্মানটা বজায় থাকে; লালা ওয়ার্ড (রিচার্ড ডকিন্সের এর স্ত্রী) এর সাথে যোগ করেছেন: মৃত্যুশয্যা নিয়ে এত লাফালাফি কেন? নিজেকে যদি বিক্রি করতেই চাও তুমি, সময় থাকতে করা কি ভালো না, যাতে টেম্পলটন পুরষ্কারটি পাওয়া যায় আর দোষটা বার্ধক্যের জরাগ্রস্থতার উপর চাপানো যায়’

[১৪] আনঅফিসিয়াল হিউম্যান জীনোম প্রোজেক্ট এর সাথে মিলিয়ে ফেলা যাবেনা, যার নেতুত্বে ছিলেন অসাধারন প্রতিভাবান (এবং ধার্মিক নন), সাহসী, যাকে বিজ্ঞানের বাক্কানিয়ার বা দু:সাহসী অভিযাত্রী বলা হয়: ক্রেইগ ভেন্টার (Craig Venter);

[১৫] Beit-Hallahmi and Argyle (1997).

[১৬] E. J. Larson and L. Witham, ‘Leading scientists still reject God’, Nature 394, 1998, 313.

[১৭] http://www.leaderu.com/ftissues/ft9610/reeves.html gives a particularly interesting analysis of historical trends in American religious opinion by Thomas C. Reeves, Professor of History at the University of Wisconsin, based on Reeves (1996).

[১৮] http://www.answersingenesis.org/docs/3506.asp.

[১৯] R. Elisabeth Cornwell and Michael Stirrat, manuscript in preparation, 2006.

[২০] P. Bell, ‘Would you believe it?’, Mensa Magazine, Feb. 2002, 12-13.

রিচার্ড ডকিন্স এর দি গড ডিল্যুশন: চতুর্থ অধ্যায় (প্রথম পর্ব)

By K M Hassan

শীর্ষ ছবি: মিকেল্যান্জেলোর ক্রিয়েশন অব অ্যাডাম এর একটি ভিন্ন রুপ (ইন্টারনেট থেকে)

রিচার্ড ডকিন্স এর দি গড ডিল্যুশন অনুবাদ: প্রথম , দ্বিতীয় এবং তৃতীয় অধ্যায়

রিচার্ড ডকিন্স এর দি গড ডিল্যুশন : চতুর্থ অধ্যায় (প্রথম পর্ব) (অনুবাদ প্রচেষ্টা: কাজী মাহবুব হাসান)
The God Delusion by Richard Dawkins

কেন প্রায় নিশ্চিৎভাবে বলা সম্ভব ঈশ্বরের কোন অস্তিত্ব নেই

বিভিন্ন ধর্মীয় গোত্রের প্রচারকরা ... বিজ্ঞানের অগ্রগতি নিয়ে সদা শঙ্কিত, যেমন কাহিনীর ডাইনীরা শঙ্কিত থাকে ভোরের আলোর আগমনের এবং তাদের ক্রুদ্ধ দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে এই সব নিয়তি নির্ধারক অগ্রদুতদের প্রতি, যারা তাদের ছলছাতুরীর জীবিকার বিভক্তির বার্তা নিয়ে এসেছে। টমাস জেফারসন

দি আল্টিমেট বোয়িং ৭৪৭

যুক্তি হিসাবে ’অসম্ভাব্যতা থেকে নেয়া যুক্তি’ বা ’আর্গুমেন্ট ফ্রম ইমপ্রোবাবিলিটি’ বেশ শক্তিশালী। প্রচলিত আর্গুমেন্ট ফ্রম ডিজাইন বা পরিকল্পনা থেকে যুক্তির ছদ্মবেশে অনায়াসে এটি বর্তমানে ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমানের স্বপক্ষে প্রস্তাবিত সবচেয়ে জনপ্রিয় যুক্তি এবং যুক্তিটি বিস্ময়কর সংখ্যক ঈশ্বরবাদীদের দৃষ্টিতে স্বয়ংসম্পুর্ন ও পুরোপুরিভাবে বিশ্বাসযোগ্য । অবশ্যই যুক্তিটি খুব শক্তিশালী এবং আমার ধারনা, উত্তর করা সম্ভব না বা উত্তরের অযোগ্য এমন একটি যুক্তি – কিন্তু সেটা ঈশ্বরবাদীরা যা বোঝাতে চাইছেন, ঠিক এর বীপরিত অর্থে। অসম্ভাব্যতা থেকে নেয়া যুক্তি যদি সঠিকভাবে ব্যবহার করা যায়, তবে এটাই ঈশ্বরের যে অস্তিত্ব নেই তা প্রমান করার ক্ষেত্রে সবচে কাছাকাছি পৌছানো যায়। প্রায় নিশ্চিৎভাবেই ঈশ্বরের যে কোন অস্তিত্ব , সে বিষয়ে পরিসংখ্যানগত প্রমান প্রদর্শনকে আমি নাম দিয়েছিল: দি আলটিমেট বোয়িং ৭৪৭ গামবিট (১)।

নামটার উৎপত্তি ফ্রেড হয়েল (Fred Hoyle) এর মজার সেই বোয়িং ৭৪৭ এবং স্ক্র্যাপইয়ার্ড (পরিত্যক্ত কিংবা অবাঞ্ছিত লোহা লক্কড়ের টুকরো যেখানে ফেলে রাখা হয়) এর সেই রুপক চিত্রটি; আমি অবশ্য নিশ্চিৎ না, বিষয়টি হয়েল নিজে কোথাও লিখেছিলেন কিনা, কিন্তু এটি যে তার মন্তব্য, সেটি সত্যায়িত করেছিলেন তার ঘনিষ্ঠ সহকর্মী চান্দ্রা বিক্রমাসিংহে এবং ধারনা করা হয় হয়েলই এই মন্তব্যটা করেছিলেন (২); হয়েল বলেছিলেন, পৃথিবীতে জীবন এর উৎপত্তি হবার সম্ভাবনা, কোন একটা স্ক্র্যাপইয়ার্ড এর মধ্য দিয়ে ঘুর্ণিঝড় বয়ে গেলে, সেখানে ভাগ্যক্রমে নিজে নিজে বিভিন্ন যন্ত্রাংশ যুক্ত হয়ে একটা আস্ত বোয়িং ৭৪৭ উড়োজাহাজ তৈরীর হবার যে সম্ভাবনা, তার চেয়ে খুব একটা বেশী না। অন্যরা এই রুপকটি ধার করেছেন বিবর্তনের পরের পর্যায়ে জটিল জীবদেহের উদ্ভবকে ব্যাখ্যা করতে, যেখানে এর একটি মিথ্যা আপাত-গ্রাহ্যতা আছে। এলোমেলো ভাবে বিভিন্ন অংশ নাড়া চাড়া করে যোগ বিয়োগ করে পুরোপুরি কর্মক্ষম একটি ঘোড়া, গুবরে পোকা বা অস্ট্রিচ পাখী গঠন করার সম্ভাবনাটা সেই স্ক্র্যাপইয়ার্ড এ ঘুর্ণিঝড়ের বোয়িং ৭৪৭ তৈরী করার মত বেশ উচু মাত্রায় অসম্ভাব্যতার পর্যায়ে পড়ে। এটাই, মোটামুটি সংক্ষেপে সৃষ্টিবাদীদের সবচেয়ে প্রিয় যুক্তি - আর এ ধরনের একটি যুক্তি শুধুমাত্র এমন কারো পক্ষেই প্রস্তাব করা সম্ভব, যার প্রাকৃতিক নির্বাচন সম্বন্ধে সামান্যতম কোন ধারনা নেই : এমন কেউ যে মনে করে প্রাকৃতিক নির্বাচন হচ্ছে একটা চান্স বা আপতন বা দৈবক্রমে ঘটা বিবর্তনীয় পরিবর্তনকে ব্যাখ্যা করে এমন একটি তত্ব অথচ আপতন বা দৈবক্রমে ঘটা বিবর্তনীয় পরিবর্তনের প্রাসঙ্গিক প্রেক্ষাপটে এটি সম্পুর্ন এই ধারনা বীপরিত।

সৃষ্টিবাদীদের আত্মসাৎ কৃত অসম্ভাব্যতা থেকে নেয়া যুক্ত টির রুপ সবসময়ই একই সাধারন রুপ ধারণ করে থাকে এবং সৃষ্টিবাদীরা একে যতই রাজনৈতিকভাবে সুবিধাজনক ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইন (ID) (ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইনকে অনেক সময় নির্দয়ভাবে বলা হয় সস্তা সুট বা টাক্সেডো পরা সৃষ্টিবাদ) এর চমক দেখানো পোষাকে সজ্জিত করুক না কেন, কোন গুনগত পার্থক্য ঘটেনা। কিছু পর্যবেক্ষনকৃত বিষয় – কখনো একটি জীবিত প্রানী বা এর কোন একটি জটিল অঙ্গ, কিন্তু যে কোন কিছুই হতে পারে, কোন একটি অনু থেকে শুরু করে পুরো মহাবিশ্বটাই – আসলেই সঠিকভাবে অতি প্রশংসায় মহিমান্বিত করা হয় পরিসংখ্যানগতভাবে অসম্ভাব্য একটি বিষয় হিসাবে। কখনো তথ্য তত্বের ভাষা ব্যবহৃত হয়: জীবিত পদার্থের মধ্যে বিদ্যমান সকল তথ্যের উৎস ব্যাখ্যা দেবার জন্য চ্যালেন্জ্ঞ ছুড়ে দেয়া হয় ডারউইনবাদীদের প্রতি। টেকনিক্যাল অর্থে, তথ্য ভান্ডার আসলে অসম্ভাব্যতার একটি পরিমাপ বা ’সারপ্রাইজ ভ্যালু’; বা যুক্তিটি হয়তো প্রস্তাবনা করে অর্থনীতিবিদদের বহুব্যবহৃত মন্ত্র: কোন কিছুই বিনামুল্যে পাওয়া যায় না – এবং কোন কিছু না করার বিনিময়ে, অনেক কিছুর জন্য কৃতিত্ব দাবী করার জন্য ডারউইনবাদকে অভিযুক্ত করা হয় । আসলে, এই অধ্যায়ে আমি প্রমান করবো, ডারউইনীয় প্রাকৃতিক নির্বাচনই হচ্ছে আমাদের জানা আছে এমন একটি মাত্র সমাধান যা কিনা, কোথা থেকে তথ্যগুলো এসেছে – এই অন্যথায় সমাধান অযোগ্য ধাধাটির। দেখা যাচ্ছে ঈশ্বর হাইপোথিসিসটি চেষ্টা করছেকোন কিছু না করেই সব কিছু পাবার জন্য । ঈশ্বর নিজেই বিনামুলেই কিছু পেতে চাইছেন এবং বেশ তাই হোক। তবে যত বড় পরিসংখ্যানের হিসাবে অসম্ভাব্য হোক না কেন. এই সত্বা যা আপনি খুজছেন , একটি মহান পরিকল্পনাকারী বা ডিজাইনারের অস্তিত্ব কল্পনা করার মাধ্যমে, কমপক্ষে সেই ডিজাইনারের নিজেকেও অবশ্যই সেই পরিমানে অসম্ভাব্য হতে হবে। ঈশ্বরই হচ্ছেন সেই আল্টিমেট বোয়িং ৭৪৭।

অসম্ভাব্যতা থেকে নেয়া যুক্তি দাবী করছে, শুধু চান্স বা আপতনের মাধ্যমে কোন জটিল কিছুর সৃষ্টি হতে পারে না (বিজ্ঞানের প্রেক্ষিতে চান্স (chance) শব্দটার অর্থ ভিন্ন। বিজ্ঞানের সাথে সংশ্লিষ্ট নন অনেকেই মনে করেন বিবর্তন হচ্ছে চান্সের মাধ্যমে। এই শব্দটা ব্যবহার করে তারা যেটা বোঝাতে চাইছেন, বিবর্তন হচ্ছে কোন কারন বা কোন লক্ষ্য ছাড়াই। সেই সুত্রানুযায়ী প্রকৃতিতে সবকিছুই – রাসায়নিক বিক্রিয়া, আবহাওয়া, গ্রহের গতি, ভুমিকম্প সবকিছু হচ্ছে চান্সের মাধ্যমে, এইসব কিছু কোনটারই কোন উদ্দেশ্য বা পারপাস নেই। আসলে বিজ্ঞানীদের দৃষ্টিতে এই উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য ,এই বিষয়গুলোর মানুষের চিন্তাতেই শুধু অস্তিত্ব আছে, তারা কোন প্রাকৃতিক ঘটনাকে উদ্দেশ্যপুর্ণ মনে করেন না। কিন্তু বিজ্ঞানীরাও রাসায়নিক বিক্রিয়া বা গ্রহদের গতি এসব কিছুকেও কোন চান্স জনিত ঘটনা মনে করেন না। কারন বিজ্ঞানে, চান্স শব্দটার ভিন্ন অর্থ আছে। যদিও চান্স এর অর্থ হতে পারে জটিল কোন দর্শনের বিষয়, কিন্তু বিজ্ঞানীরা চান্স বা র‍্যানডমনেস শব্দকে ব্যবহার করেন এই অর্থে: যখন কোন ভৌত কারন বেশ কয়েকটি ফলাফল সৃষ্টি করতে পারে, আমরা আগে থেকে যা অনুমান করতে পারিনা যে, কোন একটি নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে ফলাফল কি হবে। যাই হোক, আমরা হয়তো নির্দিষ্ট করতে পারি, এদের কোন একটি ফলাফলের সম্ভাবনা বা প্রোবাবিলিটি এবং এভাবে তাদের হার বা ফ্রিকোয়েন্সি; যেমন আমরা কোন দম্পতির পরবর্তী শিশুর লিঙ্গ কি হবে বলতে পারিনা, তবে যথেষ্ট নিশ্চয়তার সাথে আমরা এটা বলতে পারি, পরবর্তীতে তাদের মেয়ে শিশু হবার সম্ভবনা প্রায় ০.৫ বা ৫০ শতাংশ; প্রায় সবকিছুতে একই সাথে দুটি জিনিসের প্রভাব দেখা যায়, চান্স (অনুমান করা যায় না) এবং ননর‍্যানডোম বা ডিটারমিনিষ্টিক বা অনুমানযোগ্য কারনগুলো। আমাদের মধ্যে যে কারোই গাড়ী অ্যাক্সিডেন্ট হতে পারে অন্য কোন ড্রাইভাবে অনুমান করা সম্ভব না বা আনপ্রেডিকটেবল আচরনের জন্য, এবং আমাদের এই সম্ভাবনাকে আমরা অনুমান করা যায় এমন একটা পর্যায়ে নিয়ে যেতে পারি যদি আমরা মাতাল হয়ে গাড়ী চালাই। বিবর্তনের ক্ষেত্রেও সেটা ঘটছে, প্রাকৃতিক নির্বাচন হচ্ছে ডিটারমিনিষ্টিক (deterministic বা predictable), ননর‍্যানডোম একটি প্রক্রিয়া। এবং সেই একই সাথে বিবর্তনে গুরুত্বপর্ণ র‍্যানডোম প্রক্রিয়াও আছে, যেমন মিউটেশণ এবং জেনেটিক অ্যালীল বা হ্যাপ্লোটাইপদের র‍্যানডোম কমবেশী নানা হার হওয়া (random genetic drift))) কিন্তু বেশীর ভাগ মানুষই এই ‘চান্স বা আপতনের মাধ্যমে সৃষ্ট’ বক্তব্যটি ‘কোন সুনির্দিষ্ট পরিকল্পক বা ডিজাইনারের পরিকল্পনা বা ডিজাইন ব্যতীত সৃষ্ট’ বক্তব্যটার সমার্থক হিসাবে সংজ্ঞায়িত করেন। সে কারনেই অবাক হবার কিছু নেই, যে তারা অসম্ভাব্যতাকে ডিজাইনের স্বপক্ষে প্রমান হিসাবে মনে করেন। ডারউইনীয় প্রাকৃতিক নির্বাচন দেখায় যে, জীববিজ্ঞানীয় অসম্ভাব্যতার প্রেক্ষাপটে এই ব্যাখ্যা কতটুকু ভ্রান্ত। এবং যদিও ডারউইনবাদ সরাসরি অজৈব জগত – যেমন কসমোলজী – এর সাথে সরাসরি সম্পর্কযুক্ত নয় – তবে এটি আমাদের সচেতনতার স্তরকে উচ্চ একটি স্তরে নিয়ে যায়, এর মুল ক্ষেত্র জীববিজ্ঞানের বাইরেও।

ডারউইনবাদ সম্বন্ধে গভীর ধারনা আমাদেরকে চান্স বা আপতনের একমাত্র বিকল্প হিসাবে প্রস্তাবিত ডিজাইন বা পরিকল্পনার সহজ ধারনা থেকে সতর্ক থাকতে শেখায়। এবং আমাদের ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাওয়া জটিলতার ক্রমানুসারে সাজানো পথ গুলোর শেখায় অনুসন্ধান করতে শেখায়। ডারউইনের আগে দার্শনিক যেমন হিউম বুঝতে পেরেছিলেন জীবনের অসম্ভাব্যতা মানে কিন্তু এই না একে অবশ্যই ডিজাইনকৃত বা পরিকল্পিত হতে হবে, কিন্তু তারা এর বিকল্প কোন কিছুর কল্পনা করতে পারেননি। ডারউইনের পর, ডিজাইনের ধারনাটি সম্বন্ধে আমাদের সবারই, একেবারে অন্তস্থল থেকে,সন্দেহ অনুভব করা উচিৎ। ডিজাইনের এই বিভ্রম বা মায়া আসলেই একটা ফাদ, যা এর আগেও আমাদের বোকা বানিয়েছিল, এবং আমাদের সচেতনাকে জাগিয়ে তুলে এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার কথা ডারউইনের; যদি তাই হতো, তাহলে আমাদের সবার ক্ষেত্রেই তিনি সফল হতেন।

সচেতনতা বৃদ্ধি কারক হিসাবে প্রাকৃতিক নির্বাচন:

কোন একটি বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনীর স্টারশীপে, নভোচারীরা পৃথিবীর জন্য আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েছেন, ’পৃথিবীতে এখন বসন্তকাল, শুধু এটা ভাবলেই !’, আপনি হয়তো সাথে সাথে এই বাক্যের ভুলটা ধরতে পারবেন না, কারন উত্তর গোলার্ধের শভিনিজম বা নিজেদের সবকিছুর কেন্দ্রে মনে করার প্রবণতা, এখানে আমরা যারা বাস করি তাদের

অবচেতন মনে গভীরভাবে খোদাই করা আছে; এমনকি যারা এখানে বাস করেনা তাদের অনেকেরও। ‘অবচেতন’ কথাটাই পুরোপুরি ঠিক আছে। এখানেই সচেতনতা বাড়াবার বিষয়টি আসে। শুধুমাত্র লোক দেখানো মজা করা ছাড়াও, আরো গুরুত্বপুর্ণ কিছু কারনে, অষ্ট্রেলিয়া এবং নিউজিল্যান্ডে আপনি পৃথিবীর মানচিত্র কিনতে পারবেন যেখানে দক্ষিন মেরু উপরের দিকে অবস্থিত। সচেতনতা বাড়াতে এই ম্যাপগুলো কতইনা চমৎকার হতে পারতো, যদি উত্তর গোলার্ধের ক্লাসরুমগুলোর দেয়ালে এদের আটকিয়ে রাখা যেত। দিনের পর দিন, সেটি শিশুদের মনে করিয়ে দিত ‘উত্তর‘ একটি কাল্পনিক পোলারিটি বা মেরুকরণ, শুধুমাত্র যার একার সবসময় ‘উপরে‘ থাকার একচেটিয়া অধিকার নেই। মানচিত্রটি যেমন তাদের জানতে উৎসাহী করে তুলতো, তেমনি তাদের সচেতনতাও বৃদ্ধি করতো। তারা বাসায় ফিরে তাদের বাবা মা দের তা বলতো – প্রসঙ্গক্রমে বলে রাখি, শিশুদের এমন কিছু শেখানো যা দিয়ে তারা তাদের বাবা মা দের বিস্মিত করতে পারে, সম্ভবত একজন শিক্ষকের পক্ষ থেকে এটি অন্যতম শ্রেষ্ঠতম উপহার।

নারীবাদীরাই সচেতনতা বৃদ্ধির শক্তি সম্বন্ধে আমার সচেতনতাকে বৃদ্ধি করেছিল। History না Herstory অবশ্যই হাস্যকর, এমনকি শুধুমাত্র এই কারনে, যে history শব্দটির মধ্যে His শব্দাংশটির উৎপত্তিগত কোন সম্পর্কই নেই পুরুষ বাচক সর্বনামের সাথে। শব্দের উৎপত্তিগত দিক থেকে এটিও হাস্যকর ১৯৯৯ সালে ওয়াশিংটনের একজন সরকারী কর্মকর্তার বরখাস্ত হবার ঘটনার মত। যার Niggardly শব্দটি ব্যবহার বর্ণবাদী হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছিল (Niggardly শব্দের আভিধানিক অর্থ কৃপন, এবং শব্দটার উৎপত্তি কিন্তু কোন ধরনের বর্ণবাদ ইঙ্গিত করেনা); এমনকি নির্বোধের মত উদহারনও, যেমন Niggardly বা Herstory কিন্তু আমাদের সচেতনতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করেছে। যখন আমাদের দার্শনিক ক্রোধটা প্রশমিত করে এবং হাসি থামাতে পারবো, Herstory আসলেই আমাদের History কে একটি নতুন দৃষ্টিভঙ্গীতে দেখতে শেখাবে। এ ধরনের সচেতনা বৃদ্ধিতে কুখ্যাতভাবে লিঙ্গভিত্তিক সর্বনামগুলোর অবস্থান সবসময় সামনের কাতারে। He বা She অবশ্যেই Himself বা Herself কে জিজ্ঞাসা করবে, His বা Her তার স্টাইল সেন্স কখনো Himself বা Herself কে এভাবে কোন কিছু লেখার ব্যাপারে সম্মতি দেয় কিনা। কিন্তু আমরা যদি ভাষার এই অস্বস্তিকর ধ্বণির সমস্যাটা কাটিয়ে উঠতে পারি, এটা আমাদের মানব জাতির অর্ধেক অংশের সংবেদনশীলতার প্রতি সচেতনতা বৃদ্ধি করবে। Man বা মানুষ, Mankind বা মানবজাতি, Rights of Man বা মানুষের অধিকার, সব Man বা মানুষ সৃষ্টি হয়েছে সমানভাবে, একজন Man বা মানুষ একটি ভোট – ইংরেজী ভাষা প্রায়শই মনে হয় Woman বা নারীদের বর্জন করেছে [ধ্রুপদী ল্যাটিন কিংবা গ্রীকে সেটা তেম ঘটেনি, ল্যাটিন Homo (গ্রীক Anthropo-) অর্থ মানুষ, যেমন Vir (Andro-) অর্থ পুরুষ, এবং Femina (Gyne-)v অর্থ হচ্ছে নারী। সেকারনে Athropology র বিষয় হচ্ছে সমস্ত মানব জাতি। যেখানে Andrology ও Gynecology চিকিৎসাবিজ্ঞানের লিঙ্গ ভিত্তিক স্বতন্ত্র দুটি শাখা]; আমার যখন অল্পবয়স ছিল, আমার কখনো মনে হয়নি কোন নারী ‘ The Future of Man বা মানুষের ভবিষ্যৎ’ বাক্যটি দ্বারা অপমানিত বোধ করতে পারেন। এরপরের মধ্যবর্তী দশকগুলোতে, আমাদের সবারই এ বিষয়ে সচেতনতার স্তর বৃদ্ধি পেয়েছে, এমনকি যারা Human এর পরিবর্তে Man ব্যাবহার করেন, তারাও সেটা করেন একটি আত্মসচেতন ক্ষমাপ্রার্থনার ভাব ধারন করে – অথবা কেউ সেটা সচেতন আগ্রাসী মনোভাব নিয়ে, প্রচলিত ভাষার স্বপক্ষে অবস্থান গ্রহন করে, এমনকি পরিকল্পিতভাবে নারীবাদীদের উত্যক্ত করতে। সময়ের স্পিরিট বা Zeitgeist এর সকল অংশগ্রহন কারীদের সচেতনতা বৃদ্ধি হয়েছে। এমনকি যারা এর বিরুদ্ধে নেতিবাচক অবস্থান নিতে সিদ্ধান্ত নিয়ে তাদের অবস্থানে অনড় আছেন এবং তাদের আক্রমনও দ্বিগুন করেছেন।

নারীবাদ বা ফেমিনিজিম আমাদের দেখিয়েছে এর সচেতনতা বৃদ্ধি করার শক্তিময় ক্ষমতা, এবং আমি সেই কৌশলগুলো ধার করতে চাই প্রাকৃতিক নির্বাচনের জন্যে। প্রাকৃতিক নির্বাচন পুরো জীবনটাকেই শুধু ব্যাখ্যা করেনা, এটি আমাদের সচেতনতাকেও বাড়িয়ে দেয় বিজ্ঞানের ব্যাখ্যা করার ক্ষমতার উপর : কিভাবে প্রত্যক্ষ দিক নির্দেশনা ছাড়াই সংগঠিত জটিলতার উদ্ভব হতে পারে খুব সরল কোন সুচনা থেকে । প্রাকৃতিক নির্বাচন সম্বন্ধে পুর্ণ ধারনা আমাদের সাহস যোগায় অন্যান্য ক্ষেত্রগুলোতেও সেই ব্যাখ্যা প্রয়োগ করতে। এই সব অন্য ক্ষেত্রেও

আমাদের বিশ্লেষনী সংশয়কে এটি বাড়িয়ে দেয়, সেই সব মিথ্যা অপ্রমানযোগ্য বিকল্প মতামতগুলো সম্বন্ধে, যা প্রাক–ডারউইন পর্বে একসময় জীববিজ্ঞানকে প্রতারিত ও দিকভ্রষ্ট করেছিল। ডারউইনের আগে, কেইবা, অনুমান করতে পেরেছিল, ডাগ্রন ফ্লাই এর পাখনা বা ঈগল পাখির চোখ যা আপাতদৃষ্টিতে পরিকল্পিত বা ডিজাইন করা মনে হলেও এটি আসলে এলোমেলো বা র‍্যানডম নয় (নন র‍্যানডোম) এমন কোন প্রক্রিয়ায় কিন্তু সম্পুর্ন প্রাকৃতিক একটি সুদীর্ঘ ক্রমবিন্যাসের শেষ পরিনতি মাত্র?

ডগলাস অ্যাডামস এর নিজের রাডিক্যাল নাস্তিকতাবাদে রুপান্তরিত হবার মজার এবং হৃদয়স্পর্শী কাহিনীর বিবরন –রাডিক্যাল শব্দটার উপর তিনি জোর দিয়েছেন, যেন আবার কেউ তাকে ভুল করে অজ্ঞেয়বাদী বা অ্যাগনষ্টিক মনে না করে বসে –ডারউইনিজমের সচেতনতা বৃদ্ধি করার ক্ষমতার একটি সাক্ষ্যপ্রমান, আমি আশা করি আমাকে আমার এই আত্মপ্রশ্রয়ের জন্য, যা পরবর্তী উদ্ধৃতিতে স্পষ্ট হবে –ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখা হবে। আমার অজুহাত হলো যে, আমার আগের বইগুলোর মাধ্যমে ডগলাসের রুপান্তর , যেগুলো অবশ্যই কাউকে রুপান্তরের প্রচেষ্টা ছিল না – আমাকে অনুপ্রানিত করেছে তার স্মৃতির উদ্দেশ্যে এই বইটি নিবেদন করার জন্য– কিন্তু সেটি তাই করেছিল! একটি সাক্ষাৎকারে, যা দি স্যামন অব ডাউট (The Salmon of Doubt) এ পুণমূদ্রিত হয়েছে, ডগলাসকে একজন সাংবাদিক জিজ্ঞাসা করেছিলেন, কেমন করে তিনি নাস্তিক হয়েছিলেন, তিনি তার উত্তর শুরু করেছিলেন প্রথমে কিভাবে অ্যাগনষ্টিক হয়েছিলেন সেটা ব্যাখ্যা করে, তারপর তিনি বলেছিলেন:

> এবং এরপর আমি ভাবতে শুরু করলাম বিরামহীনভাবে, কিন্তু আমার কাছে এভাবে ক্রমাগত চিন্তা করার যাবার মত যথেষ্ট পরিমান কিছু ছিল না, সুতরাং আমি কোন মতামতেও পৌছাতে পারিনি। ঈশ্বর এর ধারনাটি সম্পর্কে আমার তীব্র একটা সন্দেহ ছিল, কিন্তু কোন কিছু সম্বন্ধেই আমার যথেষ্ট পরিমান জানা ছিল না, যা একটা কাজ চালানোর মত মডেল হতে পারে ব্যাখ্যা করার জন্য, যেমন, জীবন, মহাবিশ্ব এবং সবকিছু যা বর্তমানে যেভাবে যে অবস্থানে আছে। কিন্তু আমি হাল ছাড়িনি, আমি আমার পড়া এবং চিন্তা দুটোই অব্যাহত রেখেছিলাম। আমার বয়স যখন ত্রিশের শুরুর দিকে হঠাৎ করেই বিবর্তন জীববিজ্ঞান পড়ার সুযোগ হয়, বিশেষ করে, রিচার্ড ডকিন্সের বই রুপে, দি সেলফিশ জীন এবং পরে দি ব্লাইন্ড ওয়াচমেকার এবং হঠাৎ করে (আমার মনে হয়ম দি সেলফিশ জীন দ্বিতীয় বার পড়ার সময়) সব কিছু আমার মনে স্পষ্ট হয়ে যায়। সেই ধারনা যে কি বিস্ময়করভাবে সহজ সরল, কিন্তু সেটাই প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্টি করে অসীম সংখ্যক এবং হতবাক করে দেবার মত জীবনের নানা জটিল রুপগুলো। যে শ্রদ্ধা আমার মধ্যে এটি জাগিয়ে তুলেছিল, সেটির তুলনায়, মানুষ ধর্মীয় অভিজ্ঞতার প্রসঙ্গে যে শ্রদ্ধার কথা বলে,স্পষ্টতই তা হাস্যকর মনে হয়েছিল। কোন অজ্ঞতাপুর্ণ বিস্ময়কে গ্রহন করার চেয়ে, কোন কিছু অনুধাবন করার বিস্ময় গ্রহন করতে আমি সদা প্রস্তুত [৪]।

যে বিস্ময়কর সহজ সরল ধারনাটির কথা ডগলাস বলছিলেন, তা অবশ্যই, আমার কোন বিষয় না। সেটি ডারউইনের প্রাকৃতিক নির্বাচানের মাধ্যমে বিবর্তন তত্ত্ব – সেই চুড়ান্ত বৈজ্ঞানিক সচেতনতা বৃদ্ধিকারক । ডগলাস, তোমার অনুপস্থিতি ভীষনভাবে অনুভব করছি, তুমি ছিলে আমার সবচেয়ে বুদ্ধিমান, কৌতুকময়, সবচেয়ে খোলা মনের, তীক্ষ্ণ মেধার, সবচেয়ে বড় এবং সম্ভবত সাত্র একজন রুপান্তরিত অবিশ্বাসী। আমি আশা করছি এই বইটা তোমাবে হাসাবে, অবশ্য তুমি যতটা আমাকে হাসিয়েছ ততটা নয় ।

বিজ্ঞানমনষ্ক দার্শনিক ড্যানিয়েল ডেনেট উল্লেখ করেছিলেন, বিবর্তন আমাদের অন্যতম একটি প্রাচীন ধারনাকে বিরোধিতা করে: ‘সে ধারনাটি হলো, অপেক্ষাকৃত ছোট কোন কিছু সৃষ্টি করতে কোন বড় বিশাল বুদ্ধিমান কিছুর প্রয়োজন হয়, আমি একে বলবো ‘ট্রিকল ডাউন থিওরী অব ক্রিয়েশন’ বা চুইয়ে পড়া সৃষ্টিবাদের তত্ব। আপনারা কখনোই দেখবেন না যে একটা বর্শা আরেক বর্শাকে তৈরী করছে, কিংবা কোন হর্স শু কে দেখবেন আস্ত কামারকে সে বানাচ্ছে বা কোন পাত্র বানাচ্ছে কুমারকে’[৫] ; ডারউইনের একটি কার্যকরী প্রক্রিয়ার আবিষ্কার ঠিক সেই

প্রচলিত ইনটুইশন বা আমাদের অর্ন্তদৃষ্টি নির্ভর ধারনার বীপরিত কাজটাই করেছিল, সেকারনেই মানুষের চিন্তার ক্ষেত্রে তার অবদান এত বেশী বৈপ্লবিক এবং সচেতনতার স্তর বাড়ানোয় অনেক বেশী ক্ষমতাপুষ্ট।

খুব বিস্ময়কর ব্যাপার হচ্ছে, কত বেশী প্রয়োজন এই সচেতনতা বাড়ানোর প্রক্রিয়াটি, এমনকি জীববিজ্ঞান ছাড়া অন্য ক্ষেত্রে অসাধারন বিজ্ঞানীদের চিন্তার ক্ষেত্রেও। ফ্রেড হয়েল একজন দুর্দান্ত মেধাবী পদার্থবিজ্ঞানী এবং কসমোলজিষ্ট কিন্তু তার বোয়িং ৭৪৭ এর ভুল অনুধাবন, এছাড়া জীববিজ্ঞানে তার করা আরো কিছু ভুল যেমন, আর্কিওপটেরিক্স এর জীবাশ্মকে ভেলকিবাজী হিসাবে প্রতিষ্ঠা করার প্রচেষ্টা স্পষ্টতই ইঙ্গিত দিচ্ছে, সচেতনার স্তর বাড়ানোর জন্য বেশ ভালোভাবে প্রাকৃতিক নির্বাচনের জগত সম্বন্ধে একটি ধারনার তার একান্ত প্রয়োজন ছিল । আমি মনে করি, একটা বুদ্ধিবৃত্তিক স্তরে তিনি প্রাকৃতিক নির্বাচনকে বুঝতে পেরেছিলেন। কিন্তু আসলে প্রাকৃতিক নির্বাচনের নির্যাসের মধ্যে ঢুকে বিষয়টিকে বুঝতে হবে, পুরোপুরি অবগাহন করতে হবে, এর মধ্যে সাতার কাটতে হবে, তারপর এর আসল শক্তি সম্বন্ধে একটি স্পষ্ট ধারনা হবে।

অন্য বিজ্ঞানও আমাদের সচেতনার স্তরকে উন্নীত করে ভিন্ন ভিন্ন উপায়ে। ফ্রেড হয়েল এর নিজের জ্যোর্তিবিজ্ঞানের বিজ্ঞান আমাদের অবস্থান নিশ্চিৎ করেছে এই মহাবিশ্বে, রুপকার্থে এবং আক্ষরিকার্থে, আমাদের দম্ভর আকৃতিকে হ্রাস করে একে বসিয়ে দিয়েছে খুবই ছোট একটা মঞ্চে যেখানে আমরা আমাদের জীবনের নাটক করে যাচ্ছি – মহাজাগতিক বিস্ফোরনের আমাদের একটি ক্ষুদ্র ধ্বংশাবশেষে। ভুতত্ত্ববিদ্যা আমাদের মনে করিয়ে দেয়, কোন একক প্রানী এবং প্রজাতি হিসাবে আমাদের অস্তিত্বকালের ব্যাপ্তি অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। বিষয়টি জন রাসকিন এর সচেতনাকে বৃদ্ধি করেছিল এবং উদ্বুদ্ধ করেছিল তার স্মরনীয় হৃদয়গ্রাহী ১৮৫১ সালের উদ্ধৃতিটিকে :‘ যদি এই ভুতত্ত্ববিদরা আমাকে একটু শান্তিতে থাকতে দিত। আমি ভালোই করতে পারতাম, কিন্তু ঐসব ভয়াবহ হাতুড়ী, বাইবেলের প্রতিটি অনুচ্ছেদের ছন্দের শেষে আমি তাদের শব্দ শুনি’ ; বিবর্তনও ঠিক সেই একই কাজ করে সময় সংক্রান্ত আমাদের ধারনার সাথে। ব্যাপারটা বিস্ময়কর না, যেহেতু এটি ভুতাত্বিক সময়ের মাপকাঠিতেই তার কাজ করে। কিন্তু ডারউইনীয় বিবর্তন, বিশেষ করে প্রাকৃতিক নির্বাচন আরো বেশী কিছু করে। এটি ডিজাইন বা পরিকল্পনার মায়াকে চুর্ণবিচুর্ণ করে দিয়েছে জীববিজ্ঞানের পুরো সীমানায় এবং আমাদের শিখিয়েছে যে পদার্থবিদ্যা বা কসমোলজী বিষয়েও যে কোন ধরনের ডিজাইন বা পরিকল্পনার হাইপোথিসিসকে সন্দেহের চোখে দেখতে। আমি মনে করি পদার্থবিদ লিওনার্ড সাসকিন্ড এই কথাগুলো ভেবেই লিখেছিলেন: ’ইতিহাসবিদ নই, তবে আমি আমার একটি মতামত দেবো, আধুনিক কসমোলজীর যাত্রার আসল সুচনা হয়েছিল ডারউইন এবং ওয়ালেসের মাধ্যমে। তাদের মত করে আগে কেউই, আমাদের অস্তিত্বের ব্যাখ্যা দিতে পারেনি, যেখানে পুরোপুরিভাবে অতিপ্রাকৃত কোন শক্তি বা এজেন্টদের উপস্থিতিকে অস্বীকার করা হয়েছে। ডারউইন এবং ওয়ালেস শুধুমাত্র জীববিজ্ঞানের জন্যই একটি মানদন্ড দিয়ে যান নি, কসমোলজির জন্য তা দিয়ে গেছেন’[৬]; অন্যান্য ভৌত বিজ্ঞানীদের মধ্যে যাদের এ ধরনের কোন সচেতনতার স্তর বৃদ্ধির কোন প্রয়োজন নেই তাদের অন্যতম ভিক্টর স্টেঙ্গার, যার বই Has Sciece Found God? (বা বিজ্ঞান কি ঈশ্বরকে খুজে পেয়েছে?) (এর উত্তর হচ্ছে না) , আমি সবাইকে পড়ার জন্য উৎসাহিত করছি এবং পিটার অ্যাটকিন্স, যার Creation revisited (বা ফিরে দেখা সৃষ্টিতত্ব) যা আমার সবচেয়ে প্রিয় বৈজ্ঞানিক কাব্যিক গদ্য।

আমি সারাক্ষনই সেই সব ঈশ্বরবাদীদের দেখে অবাক হই, আমি যেভাবে প্রস্তাব করেছি, সেভাবে তাদের সচেতনতার স্তর বৃদ্ধি করার বদলে, তারা বরং আনন্দিত এই ভেবে যে প্রাকৃতিক নির্বাচন হচ্ছে ’তার সৃষ্টিকে এই পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য ঈশ্বরের একটি পন্থা’; তাদের দৃষ্টিতে প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে বিবর্তন হচ্ছে, খুবই সহজ এবং চমৎকার একটি উপায় পৃথিবী ভরা বিভিন্ন জীবের সমারোহ সৃষ্টিতে। ঈশ্বরের কিছুই করা লাগবে না ! পিটার অ্যাটকিন্স, তার কিছুক্ষন আগে উল্লেখ করা বইটি ঠিক এই চিন্তা সুত্রটি নিয়ে শুরু করে একটি যুক্তিগ্রাহ্য ঈশ্বরহীন উপসংহারে উপনীত হয়েছিলেন, যখন তিনি প্রস্তাব করেন, একজন কল্পিত অলস ঈশ্বর যিনি চেষ্টা করেছেন যত সহজে কম কষ্টে জীবনের উপস্থিতি সহ একটি মহাবিশ্ব সৃষ্টি করা যায়। অ্যাটকিনস এর অলস ঈশ্বর অষ্টাদশ

শতাব্দীর এনলাইটেন্টমেন্ট বা নবজাগরনের যুগের দেইস্ট বা একাত্মবাদীদের ঈশ্বরের তুলনায় আরো বেশী অলস: deus otosius - আক্ষরিক অর্থে বিশ্রামরত ঈশ্বর, ব্যস্ততাহীন, কর্মহীন, অপ্রয়োজনীয়, বাড়তি। ধীরে ধীরে অ্যাটকিন্স অলস ঈশ্বরের করনীয় কাজকে এমন একটা পর্যায়ে কমিয়ে আনতে সফল হন, যে পরিশেষে দেখা যায়, তার আসলেই কোন কাজ নেই ; সেক্ষেত্রে বরং তার কোন অস্তিত্ব থাকারই কি বা দরকার । আমি আমার স্মৃতিতে স্পষ্ট শুনতে পাই উডি অ্যালেনএর গভীর অনুধ্যানের সেই বিলাপ: ‘ অবশেষে যদি দেখা যায়, আসলেই কোন ঈশ্বর আছেন, আমি মনে করি না তিনি খুব অশুভ একটি চরিত্র, কিন্ত সবচেয়ে খারাপ যেটা আপনি তার সম্বন্ধে বলতে পারেন তা হলো, আসলে তার যতটুকু অর্জন করার কথা ছিল, সেটা করতে তিনি ব্যর্থ হয়েছেন’।

ইররিডিউসিবল কমপ্লেক্সিটি (Irreducible complexity) বা অবিভাজ্য জটিলতা

বড় মাপের একটি সমস্যা , যা আসলেই অতিরন্জন করা প্রায় অসম্ভব, তার সমাধানই করেছিলেন ডারউইন এবং ওয়ালেস । আমি অ্যানাটমি, কোষের গঠন, প্রাণরসায়ন এবং আক্ষরিক অর্থে যে কোন জীবিত প্রানীর আচরন থেকে আমি উদহারন দিতে পারি, তবে সৃষ্টিবাদী লেখকরা আপাতদৃষ্টিতে ডিজাইন বা পরিকল্পনার সবচেয়ে চমৎকার কীর্তি হিসাবে যেসব সাফল্যগুলো বেছে নেয়া নিয়েছে (এবং অবশ্যই সুস্পষ্ট কারনে) এবং খানিকটা হালকা আইরনির মাধ্যমে আমিও আমারগুলো খুজে পেয়েছি সৃষ্টিবাদীদের একটি বই থেকে, যার নাম: Life – How Did It Get Here (বা জীবন- কেমন করে এটি এখানে এল) ; কোন নাম নেই লেখকের তবে বইটি প্রকাশ করেছে দি ওয়াচটাওয়ার বাইবেল এবং ট্র্যাক্ট সোসাইটি, মোট ১৬ টি ভাষায়, প্রায় ১১ মিলিয়ন কপি, এবং স্পষ্টতই বেশ জনপ্রিয়, কারনএই এগারো মিলিয়ন কপির কমপক্ষে ছয়টি আমাকে অযাচিত উপহার হিসাবে প্রেরণ করছেন পৃথিবীর নানা প্রান্ত থেকে শুভাকাঙ্খীরা।

ছবি: পরিফেরা পর্বের একটি স্পনজ *Euplectella aspergillum* (Venus’ Flower Basket) ;

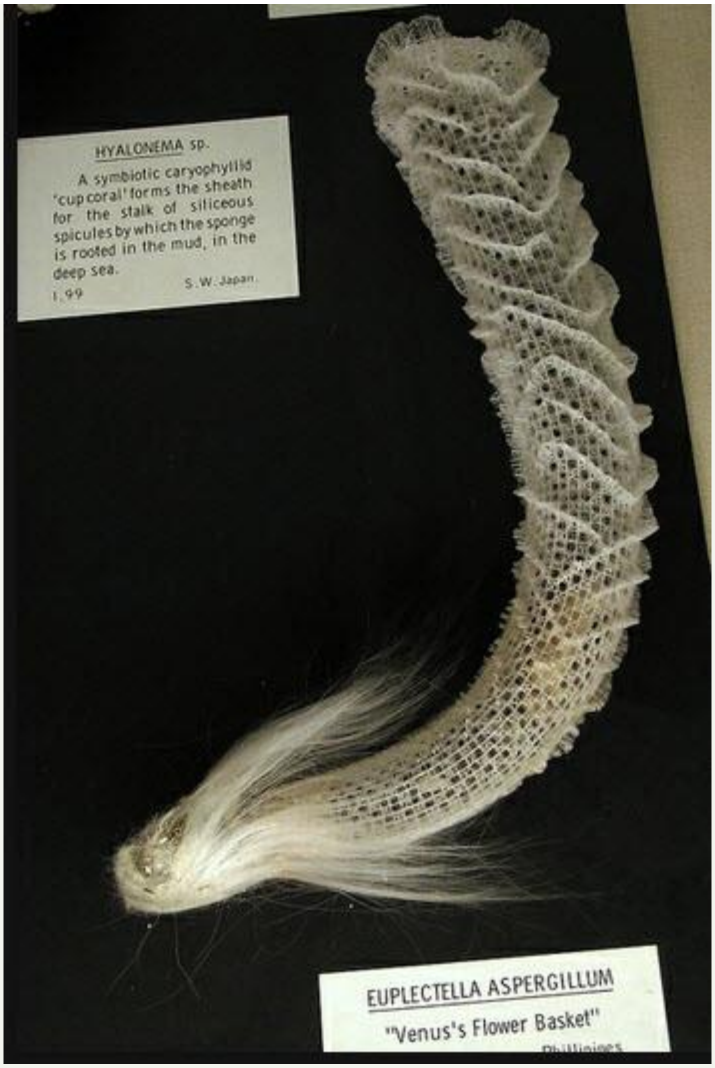
HYALONEMA sp.
A symbiotic caryophyllid 'cup coral' forms the sheath for the stalk of siliceous spicules by which the sponge is rooted in the mud, in the deep sea.
1.99
S.W. Japan.
EUPLECTELLA ASPERGILLUM
"Venus's Flower Basket"

ছবি: Euplectella aspergillum (Venus’ Flower Basket) এর স্কেলিটন।

এই বেনামী লেখকের বিপুল সংখ্যক সংখ্যায় প্রকাশিত এবং ব্যাপক প্রচারিত এই বইটির যে কোন পৃষ্ঠা এলোমেলোভাবে উল্টালেই, আমরা খুজে পাই একটি স্পনজ (Sponge), যার আরেক নাম ‘ভেনাস ফ্লাওয়ার বাস্কেট (Euplectella), এর সাথে আবার, যার তার , খোদ স্যার ডেভিড অ্যাটেনবুরোর উদ্ধৃতি যোগ করা হয়েছে: ‘আপনি যখন স্পনজদের জটিল কংকালের দিকে নজর দেন, যেমন যেগুলো তৈরী সিলিকার স্পিকিউল বা সুচের মত সরু কনা দিয়ে, যা ভেনাস ফ্লাওয়ার বাস্কেট নামে পরিচিত, কল্পনাও হতবাক হয়ে যায়। কেমন করে প্রায় স্বাধীন আনুবীক্ষনীক এক গুচ্ছ কোষ একে অপরের সাথে সহযোগিতার মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ কাচের (সিলিকা) কাঠামো বা স্প্লিন্টার নি:সরণ করে এবং এরকম একটি জটিল ও সুন্দর জাফরি বা ল্যাটিস তৈরী করেছে? আমরা জানিনা’ ; ওয়াচটাওয়ারের লেখকরা এখানে তাদের তীর্যক মন্তব্য জুড়ে দিতে কালক্ষেপন করেননি: কিন্তু আমরা একটা জিনিস জানি, ’চান্স বা আপতন খুব সম্ভবত এর ডিজাইনার না’; এই একটা বিষয়ে আমরা সবাই একমত হতে পারি। এই প্রাকৃতিক ঘটনাটি ঘটার পরিসংখ্যানগত অসম্ভাব্যতা যেমন ইউপ্লেকটেলার (Euplectella) কংকাল হচ্ছে সেই কেন্দ্রীয় সমস্যাটির উদাহারন, জীবনের যে কোন তত্বকে সেটার সমাধান করতে হবে; আর যত বেশী পরিসংখ্যানগত অসম্ভাব্যতা থাকবে, এর সমাধান হিসাবে চান্স বা আপতন ততই তা ব্যাখ্যা করতে ব্যার্থ হবে: অসম্ভাব্যতার অর্থ বলতে সেটাই বোঝায়। কিন্তু অসম্ভাব্যতার এই ধাধার সম্ভাব্য সমাধান দুটি কিন্তু ডিজাইন এবং চান্স না, যা ভুলভাবেই দাবী করা হয়ে থাকে, বরং তারা হলো ডিজাইন এবং প্রাকৃতিক নির্বাচন। চান্স অবশ্যই

কোন সমাধান নয় যখন উচু মাপের অসম্ভাব্যতা আমরা দেখি জীবিত প্রানীদের মধ্যে। কোন সুস্থ জীববিজ্ঞানী কখনো এটা প্রস্তাব করেননি সমাধান হিসাবে, ডিজাইনও আসল সমাধান নয়, কেন নয় আমরা পরেই দেখবো। কিন্তু আপাতত আমি, জীবন সংক্রান্ত যে কোন থিওরীর বা তত্ত্বে সে সমস্যার সমাধান করতে হবে, চান্স থেকে কিভাবে পালানো যেতে পারে –সেই সমস্যাটা নিয়ে আলোচনাঅব্যাহত রাখতে চাচ্ছি।

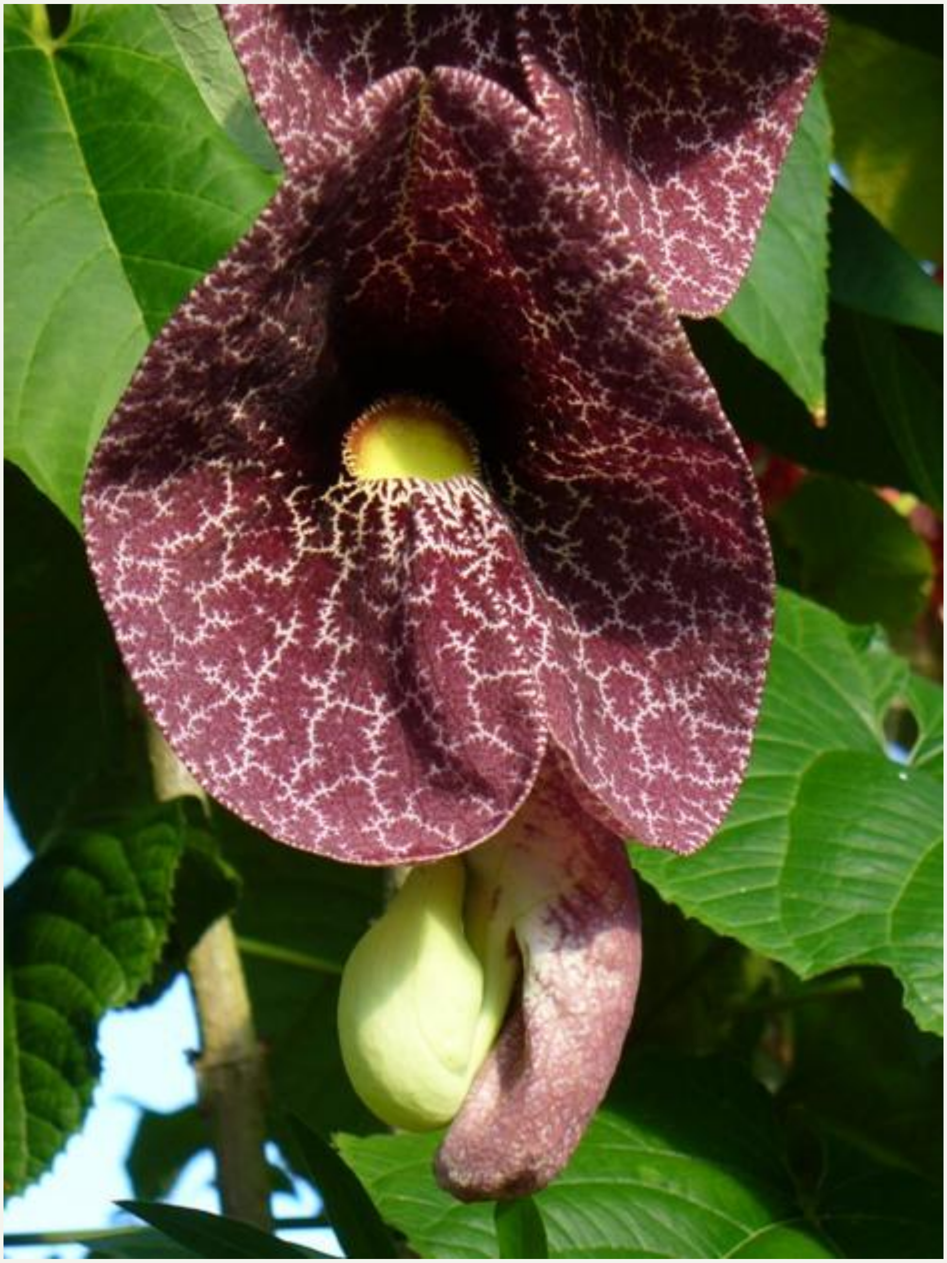

ছবি: ডাচম্যানস পাইপ (Dutchman’s pipe: *Aristolochia trilobata)*

ওয়াচটাওয়ারের পাতা উল্টাতে গিয়ে আমরা আরো একটা দারুণ গাছ সম্বন্ধে জানতে পারি, যা পরিচিত ডাচম্যানস পাইপ (*Aristolochia trilobata*) নামে। এর প্রতিটি অংশ দেখে মনে হয়, সুক্ষভাবে ডিজাইন করা হয়েছে পোকামাকড় আকর্ষন করার জন্য, যাদের আকৃষ্ট করে ধরার পর তাদের গায়ে রেণূ মাখিয়ে ছেড়ে দেয়া হয় অন্য ডাচম্যানস পাইপ ফুলের পরাগায়নের জন্য। ফুলটির অসাধারন সুক্ষ্ম জটিলতা ওয়াচটাওয়ারের লেখকদের বেশ

আন্দোলিত করেছে একটি প্রশ্ন করতে : এসব কি ঘটেছে চান্স বা আপতনের মাধ্যমে? নাকি, এটা ঘটেছে কোন বুদ্ধিমান সত্ত্বার ডিজাইন (Intelligent design) বা পরিকল্পনা মাধ্যমে? আরো একবার আমি পুনরাবৃত্তি করছি, অবশ্যই চান্সের মাধ্যমে এটা ঘটেনি। এবং আবারো, ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইন চান্সের কোন সঠিক বিকল্প না। প্রাকৃতিক নির্বাচন শুধুমাত্র যে একটা বাহুল্যবর্জিত তাই নয়, একটি ব্যাখ্যা উপযোগী এবং অসাধারন সুন্দর একটি সমাধান; এটি একমাত্র কর্মক্ষম প্রক্রিয়া, যা চান্সের বিকল্প হিসাবে প্রস্তাব করা হয়েছে। শুধু একমাত্র কর্মক্ষম বিকল্প চান্সের যা প্রস্তাব করা হয়েছে। ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইনও চান্সের মতই একই সমস্যার মুখোমুখি; কোনভাবেই এটি পরিসংখ্যানগত অসম্ভাব্যতার ধাধার ব্যাখ্যা দেবার মত সমাধান নয়। যত বেশী অসম্ভাব্যতা তত বেশী ব্যাখ্যার অযোগ্য হতে থাকে ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইন। স্পষ্টভাবে দেখলে, ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইন সমস্যাটিকে দ্বিগুনে রুপান্তরিত করে। আরো একবার, এর কারন ডিজাইনার নিজে (Himself/Herself/itself) তাৎক্ষনিকভাবে তার নিজের উৎপত্তি কিভাবে হলো, সেই বৃহত্তর সমস্যাটা তৈরী করে। যে কোন একটি বুদ্ধিমান সত্ত্বা, যার কিনা ডাচম্যানস পাইপের (বা মহাবিশ্ব) মত কোন অসম্ভাব্য কিছু পরিকল্পনা করার ক্ষমতা আছে, তাহলে সেই সত্ত্বাটি নিজেই ডাচম্যানস পাইপের তুলনায় আরো বেশী অসম্ভাব্য হবে। এই ভয়ঙ্কর পশ্চাৎমুখী ক্রমান্বয়ে পুর্ববর্তী কারনে ফিরে যাবার রিগ্রেস প্রক্রিয়াকে থামানোর বদলে, ঈশ্বর এটি উস্কে দেন আরো তীব্র প্রতিহিংসায়।

ছবি: জায়ান্ট সেকোয়াইয়া ট্রি (*Sequoiadendron giganteum :* giant sequoia, giant redwood) (উইকিপেডিয়া)

ওয়াচটাওয়ারের আরেকটা পৃষ্ঠা উল্টিয়ে দেখুন, জায়ান্ট রেড উড (*Sequoiadendron giganteum)* সম্বন্ধে প্রানবন্ত একটা বিবরন পাওয়া যাবে। এই গাছটার প্রতি আমার একটা বাড়তি দুর্বলতা আছে কারন আমার বাগানে এই গাছটি আছে – অবশ্য সেটি শুধু শিশুমাত্র, বড়জোর এক শতাব্দী বয়স হবে, কিন্তু তারপরও এটি এই এলাকায় সবচেয়ে দীর্ঘতম গাছ। ‘একজন সামান্য মানুষ, সেকোইয়ার নীচে দাড়িয়ে উপরের দিকে তাকালে নীরব বিস্ময়ে অভিভুত হয় এর সুবিশাল বিশালত্ব দেখে; একমাত্র সুপরিকল্পিত ডিজাইন ছাড়া অন্য আর কোন বিশ্বাস কি অর্থবহ হতে পারে, এই রাজকীয় দানবাকৃতির বৃক্ষ এবং এর ছোট বীজের ক্ষেত্রে, যা এর আকৃতি ধারন করে’; আবারো, আপনি যদি মনে করেন ডিজাইন এর একমাত্র বিকল্প হচ্ছে চান্স, তাহলে না, এটি কোন অর্থ বহন করেনা। কিন্তু এখানে লেখকরা সত্যিকারের বিকল্প ব্যাখ্যাটিকে উহ্য রেখেছেন, প্রাকৃতিক নির্বাচন, হয় এর কারন, তারা সত্যি সত্যি এটি বোঝেন না বা তারা সেটা চান না।

যে প্রক্রিয়ায় কোন উদ্ভিদ, তা সে ছোট পিম্পারনেল বা সুবিশাল ওয়েলিংটোনিয়া হোক না কেন, তাদের তৈরী করা জন্য শক্তি তৈরী করে, তা হলো সালোক সংশ্লেষন। ওয়াচটাওয়ার আবারো: `প্রায় ৭০ টি পৃথক রাসায়নিক বিক্রিয়া আছে সালোক সংশ্লেষন প্রক্রিয়ায়, একজন জীববিজ্ঞানীর ভাষায়, ’সত্যিকারের অলৌকিক একটি ঘটনা’;সবুজ গাছদের বলা হয় প্রকৃতির ফ্যাক্টরী – সুন্দর শান্ত দুষনহীণ, অক্সিজেন উৎপাদনকারী, পানি চক্রকে গতিশীল রাখা, সারা পৃথিবীর খাদ্যের যোগান দেয়া। তাদের কি আসলেই উদ্ভব হয়েছে চান্সের মাধ্যমে? সত্যিই কি কথাটা বিশ্বাসযোগ্য’? না, অবশ্যই তা বিশ্বাসযোগ্য না। কিন্তু বার বার নানা উদহারনের পুনরাবৃত্তি করে কোন আলোচনাই আসলে সামনে আগায় না। সৃষ্টিবাদী ‘যুক্তি’ সবসময়ই একই। কিছু প্রাকৃতিক ঘটনা পরিসংখ্যানগত দিক থেকে আসলে অসম্ভাব্য, অনেক জটিল, অনেক সুন্দর, অনেক বেশী বিস্ময়কর, শুধু মাত্র চান্সের মাধ্যমে তাদের সৃষ্টি হবার জন্য। চান্সের একমাত্র বিকল্প ডিজাইনকে শুধু এই লেখকরা কল্পনা করতে পারেন। সুতরাং একজন ডিজাইনার বা পরিকল্পনাকারী নিশ্চয়ই এসব করেছেন। এই ভ্রান্ত যুক্তির প্রতি বিজ্ঞানের উত্তরও সবসময় এক। চান্সের এর একমাত্র বিকল্প ডিজাইন নয়। এর চেয়ে উত্তম বিকল্পটি হলো প্রাকৃতিক নির্বাচন। ডিজাইন আসলেই সত্যিকারের কোন বিকল্প না, কারন এটি যে সমস্যার সমাধান করছে, তার চেয়ে আরো বড় একটি সমস্যারও সৃষ্টি করছে: ডিজাইনারকে কে ডিজাইন করেছে? চান্স এবং ডিজাইন দুটোই ব্যার্থ পরিসংখ্যানগত অসম্ভাব্যতাকে ব্যাখ্যা করতে। কারন, একটি হচ্ছে সমস্যা এবং আরেকটি প্রথম সমস্যার দিকে ক্রমান্বয়ে পশ্চাৎমুখী পুর্ব ধারনায় ফিরে যাবার নিরন্তর প্রক্রিয়া। প্রাকৃতিক নির্বাচনই হচ্ছে সত্যিকারের সমাধান। এখন পর্যন্ত প্রস্তাবিত সমাধানগুলোর মধ্যে এটি একমাত্র পরীক্ষা করা সম্ভব এমন কার্যকরী একটি সমাধান। শুধুমাত্র কর্মক্ষম সমাধানই নয়, বিস্ময়কর সুন্দর এবং শক্তিশালী একটি সমাধান।

তাহলে কোন বিষয়টি প্রাকৃতিক নির্বাচনকে সফল করেছে এই অসম্ভাব্যতার সমস্যার সফল সমাধান হিসাবে, যেখানে চান্স এবং ডিজাইন দুটোই ব্যার্থ একেবারে শুরুতে। উত্তর হচ্ছে, প্রাকৃতিক নির্বাচন হচ্ছে একটি একটি কুমুলেটিভ বা ক্রমবর্ধমান একটি প্রক্রিয়া, যা অসম্ভাব্যতার সমস্যাটিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে ভাগ করে ফেলে। প্রতিটি ছোট টুকরো কিছুটা অসম্ভাব্য হতে পারে, তবে চুড়ান্তভাবে অসম্ভব নয়। যখন অনেক সংখ্যক এই খানিকটা অসম্ভব ঘটনাগুলো ধারাবাহিকভাবে একের পর এক যখন সজ্জিত হয়, এই সমষ্টিগত ক্রম উত্তরনের শেষ প্রোডাক্টটি আসলেই খুবই বেশী অসম্ভাব্য মনে হতে পারে; চান্সের সীমানার বাইরে সেই অসম্ভাব্যতা। এই সব চুড়ান্ত রুপগুলো সৃষ্টিবাদীর ক্লান্তিকর বহুব্যবহৃত যুক্তির বিষয়ে পরিণত হয়েছে। একজন সৃষ্টিবাদী মুল বিষয়টি বুঝতে ব্যর্থ হয়েছেন, কারন এই ব্যাক্তিটি বা He (আমি পুরুষবাচক সর্বনাম ব্যবহার করছি, অন্তত এখানে মহিলারা সর্বনাম দ্বারা নিজেদের বঞ্চিত হবার জন্য কিছু মনে করবেন না) বার বার জোর করছেন পরিসংখ্যানগত অসম্ভব ব্যাপারটার সৃষ্টিকে একটি একক বিচ্ছিন্ন ঘটনা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে,তিনি ক্রমান্বয়ে পুন্জীভুত হবার বা অ্যাকুমুলেশন এর শক্তি বোঝেন না।

আমি Climbing mount improbable বইটিতে একটি রুপক আকারে বিষয়টি ব্যাখ্যা করেছিলাম: পর্বতের একপাশটা একেবারে খাড়া, সেদিক থেকে বেয়ে ওঠা অসম্ভব কিন্তু অন্য দিকে একটা ঢালু পাশ ধীরে ধীরে চুড়ায় গিয়ে মিশেছে। ধরা যাক এই চুড়ায় আছে জটিল কোন অঙ্গ, যেমন একটি চোখ বা ব্যাক্টেরিয়ার ফ্ল্যাজেলাকে চলনশক্তি দেয়া মটর। এখানে উদ্ভট ধারনাটা হচ্ছে এটা মনে করা যে, এই ধরনের জটিলতা পুর্ণ কোন অঙ্গ, যেন স্বত:স্ফুর্তভাবে স্বেচ্ছায় নিজেদের তৈরী করে ফেলে, যাকে তুলনা করা যায় নীচ থেকে এক লাফে পাহাড়ের চুড়োয় উঠার মত। বিবর্তন ঠিক এর বীপরিত, পাহাড়ের খাড়া দিক ফেলে এর অন্যপাশের ঢালু দিয়ে ধীরে ধীরে পাহাড় চুড়ায় ওঠে: সহজ! হালকা ঢাল বেয়ে পাহাড় চুড়ায় ওঠার মুলনীতি, একলাফে নীচ থেকে পাহাড় চুড়ায় ওঠার মুলনীতি থেকে অনেক বেশী সরল। যে কারো বিস্মিত হবার সম্ভাবনা থাকে, কেন একজন ডারউইনের এই দৃশ্যে আসতে এবং বিষয়টি আবিষ্কার করতে এত সময় লাগলো ।যখন তিনি কাজটা শেষ করেন, ততদিনে প্রায় তিন শতাব্দী পেরিয়ে গেছে নিউটনের অ্যানাস মিরাবিলিস বা চমৎকার বছরের, যদিও তার কীর্তি সুস্পষ্টভাবে ডারউইনের কীর্তির চেয়ে বেশ কঠিন ছিল।

চুড়ান্ত অসম্ভাব্যতার আরেকটি প্রিয় রুপক হচ্ছে ব্যাঙ্কের ভল্টের কম্বিনেশন লক। তাত্ত্বিকভাবে, একজন ব্যাঙ্ক ডাকাত ভাগ্যক্রমে সেই সংখ্যাগুলো চান্সের এর মাধ্যমে পেতে পারেন. কিন্তু ব্যবহারিক ক্ষেত্রে ব্যাঙ্কের কম্বিনেশন লক যথেষ্ট সতর্কতার সাথে ডিজাইন করা হয় এর অসম্ভাব্যতাকে যথেষ্ট পরিমান বৃদ্ধি করার মাধ্যমে, প্রায় অসম্ভব ফ্রেড হয়েল এর বোয়িং ৭৪৭ এর মত। কিন্তু এর বদলে কল্পনা করুন একটি খানিকটা বাজে ভাবে ডিজাইন করা একটি কম্বিনেশন লক, যা ধীরে ধীরে তার গোপন সংখ্যাগুলো প্রকাশ করে, শিশুদের হান্ট দি স্লিপার (Hunt The Slipper) খেলার শুরুর অনুশীলনের মত [৭]; মনে করুন যখনই লকটি প্রত্যেকটি ডায়াল তাদের সঠিক সেটিং এ আসে দরজা খুব সামান্য একটু খোলে, এবং ভল্ট থেকে কিছু টাকা গড়িয়ে পড়ে সেই ফাক দিয়ে, চোর এভাবেই খুব তাড়াতাড়ি তার মুল লক্ষ্যে পৌছে যায়।

সৃষ্টিবাদীরা যারা তাদের অবস্থানের স্বপক্ষে অসম্ভাব্যতা থেকে যুক্তি ব্যবহার করে তারা সবসময় ধরে নেন জীববিজ্ঞানের অভিযোজন অনেকটা লটারীতে ’জ্যাকপট’ জেতা নয়তো কোনটাই না। এই হয় ‘জ্যাকপট নয়তো কোন কিছু না’, এই ভ্রান্ত ধারনাটির অন্য নাম ইররিডিউসিবল কমপ্লেক্সিটি (IC); হয় একটি চোখ তার দেখার কাজ করবে নয়তো না, হয় পাখনা বা ডানা উড়তে সাহায্য করবে নয়তো না, কৌশলে ধারনা করে নেয়া হয়েছে এদের মধ্যবর্তী কোন উপযোগী অবস্থার অস্তিত্বই নেই। কিন্তু তাদের এই ধারনা পুরোপুরি ভুল। এ ধরনের ইন্টারমিডিয়েট বা অন্তবর্তীকালীন প্রকৃতির অবস্থার উদহারন অসংখ্য – এবং ঠিক সেটাই কোন তত্ত্বে আমাদের আশাকরা উচিৎ। জীবনের কম্বিনেশন লক হচ্ছে, ‘খানিকটা গরম হওয়া, তারপর ঠান্ডা আবার গরম হওয়ার’ হান্ট দি স্লীপার খেলার সেই কৌশল বা ডিভাইস এর মত[৮]; আসল জীবন সেই অসম্ভাব্যতার পর্বত চুড়ায় পৌছাতে বেছে নেয় পর্বতের অপরদিকের সেই ঢালু পথ, অন্য দিকে সৃষ্টিবাদীরা অন্ধ তাদের সামনের পর্বতের উচু খাড়া পিঠ ছাড়া।

ডারউইন তার অরিজিন অব স্পিসিস বইটি এর একটি পুরো অধ্যায় উৎসর্গ করেছিলেন ’পরিবর্তনের সাথে বংশক্রমাগমের তত্ত্বের সমস্যাগুলো’ সম্বন্ধে। পক্ষপাতহীন ভাবে বলা যায় এই সংক্ষিপ্ত অধ্যায়টি, আজ অবধি প্রস্তাব করা হয়েছে এমন সব প্রতিটি তথাকথিত সমস্যাই আগে থেকেই আশা করেছিল এবং এটি তা খন্ডন করছে। সবচে বড় যে সমস্যাগুলো ছিল, ডারউইনের ’অতি নিখুত সুক্ষ্ম এবং জটিলতম অঙ্গগুলো’, যা কখনো কখনো ভুল ভাবে ব্যাখ্যা করা হয় ইররিডিউসিবলী কমপ্লেক্স বা অভবিভাজ্যভাবে জটিল অঙ্গ হিসাবে। ডারউইন সুনির্দিষ্টভাবে চোখের কথা উল্লেখ করেছিলেন, বিশেষ চ্যালেন্জ্ঞ হিসাবে: ‘এটা মনে করা যে, বিভিন্ন দুরত্বে দেখার জন্য ফোকাস ঠিক করার চোখের ভিতর প্রবেশ করা আলোর পরিমান নিয়ন্ত্রন, আলোর এবং লেন্সের নানা অসঙ্গতিগুলোকে খাপ খাইয়ে নিয়ে সংশোধন করার জন্য চোখের সব অননুকরনীয় নানা কৌশলগুলো, তারা সব তৈরী হতে পারে প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে, আমি দ্বিধাহীন ভাবে স্বীকার করে নিচ্ছি, মনে হতেই পারে, খুবই বড় মাত্রার কোন উদ্ভট ভাবনা’; সৃষ্টিবাদী তীব্র আনন্দের সাথে এই বাক্যটি উদ্ধৃতি দেয় বার বার। বলাবাহুল্য, তারা এর পরের কথাগুলো কখনোই উদ্ধৃতি দেয়না। অতি বিগলিত হয়ে ডারউইনের এধরনের অকপট স্বীকারোক্তি আসলে উপস্থাপনার একটি কৌশল ছিল মাত্র। তিনি এই কথা দিয়ে তার বিরোধীদের তার দিকে টেনে নিচ্ছিলেন, কারন তিনি চাচ্ছিলেন যখন আসল কথাটা বলবেন, তখন যেন কথাগুলো ঠিক জায়গামত আঘাত করে। এই আঘাতটা অবশই, ডারউইনের অনায়াসে দেয়া সেই ব্যাখ্যা কিভাবে ধীরে ধীরে ছোট ছোট পরিবর্তনের মাধ্যমে ক্রমান্বয়ে চোখের বিবর্তন ঘটে। ডারউইন হয়তো ’ইররিডিউসিবল কমপ্লেক্সিটি’ বা অবিভাজ্য জটিলতা কিংবা ’ধীরে ধাপে ধাপে ধাপে অসম্ভাব্যতার চুড়ায় ওঠা’ এসব বাক্যগুলো ব্যবহার করেননি, কিন্তু তিনি স্পষ্টতই দুটোর মুলনীতি বুঝেছিলেন।

’অর্ধেকটা চোখের কি উপকার আছে?’ এবং ’অর্ধেকটা পাখনারই বা কি উপকার আছে?’ এই দুই ক্ষেত্রেই যুক্তিটা এসেছে ’ইররিডিউসিবল কমপ্লেক্সিটি’ থেকে। স্বয়ংসম্পুর্ণভাবে কাজ করতে পারে এমন কোন একটি একক কিছুকে কোন কিছুকে ’ইররিডিউসিবল কমপ্লেক্স’ বলা হয় তখনই, যখন এর কোন একটি অংশ যদি অপসারন করা হয়, তখন আর এটি কাজ করতে পারেনা [৯]; চোখ এবং পাখার ক্ষেত্রে,ধারনা করে আসা হয়েছে এই ব্যাপারটা

স্বপ্রমানিত। কিন্তু যখনই আপনি এই ধারনাটি নিয়ে কয়েক মুহুর্ত ভাববেন, আপনি সাথে সাথে এর ভুলটা বুঝতে পারবেন। চোখে ছানি বা ক্যাটারাক্ট হবার পর সেই লেন্সটি অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে সরানোর পরে চশমা ছাড়া কেউই স্পষ্ট করে কিছু দেখতে পারেন না। কিন্তু তা স্বত্ত্বেও তাদের যে দৃষ্টি ক্ষমতা থাকে সেটি তাদের কোন গাছের সাথে ধাক্কা খাওয়া বা পাহাড়ের খাদ থেকে নিচে পড়ে যাওয়া থেকে কিন্তু রক্ষা করতে পারে। অর্ধেকটা ডানা অবশ্যই কোন ডানা না থেকে উপকারী। অর্ধেকটা ডানা কিন্তু কারো জীবন বাচাতে পারে , একটি নির্দিষ্ট পরিমান উচু কোন গাছ থেকে তার নিচে পড়াটা খানিকটা মসৃন করে। প্রায় ৫১ শতকারা পাখা আরো খানিকটা উচু থেকে পড়াটা সহজ করবে, যে পরিমান পাখাই আপনার থাকুক না কেন, সেই অনুযায়ী কোন একটি উচ্চতা থেকে পড়ার সময় সেটা কাজে দেবে, যেখানে তার চেয়ে ছোট কোন আংশিক পাখা কোন কাজে আসবে না। এই বিভিন্ন উচ্চতার চিন্তার পরীক্ষাটি, যেখান থেকে কেউ পড়ে যেতে পারেন, হচ্ছে একটি উপায়ে বিষয়টি দেখা, যে তাত্ত্বিকভাবেই অবশ্যই ক্রমবর্ধমান সুবিধার একটি স্কেল আছে ,শতকরা ১ ভাগ ডানা থেকে পুরোপুরি শতকরা ১০০ ভাগ ডানার। বনে জঙ্গলে ভরা এ ধরনের গ্লাইডিং বা প্যারাশুট করে আংশিক উড়তে পারা প্রানীদের দিয়ে, যারা বাস্তবে অসম্ভবের সেই পর্বত চুড়ায় দিকে প্রতিটি ধাপের প্রতিনিধিত্ব করছে।

বিভিন্ন উচ্চতার গাছের সাথে তুলনা করলে কল্পনা করতে সহজ হবে, সেই পরিস্থিতিগুলো ভাবা যখন অর্ধেক (৫০%) চোখ কোন প্রানীর জীবন বাচাবে এমন কোন পরিস্থিতিতে যেখানে ৪৯% চোখ ব্যর্থ হবে। মসৃন একটি ক্রমবিন্যাস সৃষ্টি করা যদি হয় আলোর তীব্রতার মাত্রাকে পরিবর্তন করে, কোন শিকারকে বা আপনাকে শিকার করবে এমন কোন শিকারীকে, যে দুরত্ব থেকে চোখে পড়তে পারে তার তারতম্য সৃষ্টি করার মাধ্যমে, পাখার মতই বা উড়ার উচ্চতার মত সম্ভাব্য নানা অন্তবর্তীকালীন অবস্থা কঠিন হবে না কল্পনা করা: এবং প্রানী জগতে তাদের সংখ্যার কোন কমতি নেই। কোন একটি ফ্ল্যাট ওয়ার্মের যে চোখ আছে , যে কোন যুক্তিগ্রাহ্য হিসাবে, তা মানুষের চোখের অর্ধেক এরও কম। নটিলাস (এবং হয়ত এর বিলুপ্ত আমোনাইট পরিবারের অন্যান্য জ্ঞাতি প্রানীরা, যারা প্যালেওজোয়িক এবং মেসোজোয়িক সাগরে প্রাধান্য বিস্তার করতো) তাদের একটা চোখ মানুষ এবং ফ্ল্যাটওয়ার্মের মাঝামাছি একটা অবস্থান হতে পারে। ফ্ল্যাট ওয়ার্মের চোখ, যা আলো এবং ছায়া শনাক্ত করতে পারে কিন্তু কোন ছবি নয়, তার থেকে আলাদা নটিলাসের চোখ, পিনহোল ক্যামেরার মত যা আসল দৃশ্যর প্রতিচ্ছবি তৈরী করতে পারে। কিন্তু আমাদের চোখের তুলনায় যা ঝাপসা এবং অস্পষ্ট। এই ক্রমশ উন্নতিকে কোন সংখ্যা দিয়ে পরিমাপ করাটা মিথ্যা পরিমাপ হবে, তবে সুস্থ মনের কেউই অস্বীকার করতে পারবেন না যে এই অমেরুদন্ডীদের চোখ এবং আরো অনেক ধরনের চোখ, অবশ্যই কোন চোখ না থাকার চেয়ে অনেক বেশী উত্তম। এবং এদের সবার অবস্থান অসম্ভাব্যতার চুড়ার দিকে একটি অবিচ্ছিন্ন, ক্রমশ উপরে উঠতে থাকা ঢালে। প্রায় চুড়ার কাছাকাছি আমাদের চোখ – অবশ্যই একেবারে চুড়ায় না তবে যথেষ্ট সুউচ্চে যার অবস্থান। আমি Climbing Mount Improbable বইটিতে একটি পুরো অধ্যায় আলাদা আলাদা করে ব্যাখ্যা করেছি চোখ এবং ডানা নিয়ে, দেখিয়েছি আসলে কত সহজ তাদের জন্য ধীরে ধীরে ক্রমান্বয়ে ধাপে ধাপে বিবর্তিত হওয়া (বা এমনকি হয়তো অত বেশী ধীরেও না); এবং এখানে এ বিষয়ে বক্তব্য আর বেশী দীর্ঘায়িত করবো না।

সুতরাং আমরা দেখেছি যে, চোখ কিংবা পাখা, কোনটাই অবশ্যই ইররিডিউসিবল কমপ্লেক্স বা অবিভাজ্যভাবে জটিল অঙ্গ না, কিন্তু যেটা গুরুত্বপুর্ণ সেটা হলো : এই উদহারন থেকে আমরা সাধারন কোন শিক্ষাটা পাচ্ছি। এবং বাস্তবতা হচ্ছে যে, কত বেশী মানুষ যে স্পষ্ট এই বিষয়টা সম্বন্ধে সম্পুর্ণ ভুল পোষন করেন, তা যেন আমাদের জন্য একটা সাবধান বানী হয় এর চেয়ে খানিকটা অস্পষ্ট অন্যান্য উদহারনগুলো বোঝার ক্ষেত্রে, যেমন কোষের বা প্রাণরাসায়নিক উদহারনগুলোর ক্ষেত্রে, যার দালালী করছেন ঐসব সৃষ্টিবাদীরা, যারা রাজনৈতিকভাবে সুবিধাজনক সুভাষন শব্দ ’ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইন’ তাত্ত্বিকের আড়ালে এখন আশ্রয় নিয়েছেন।

একটি সতর্কমুলক কাহিনী আছে এখানে, যা আমাদের বলছে: কোন কিছুকেই ইররিডিউসিবল কমপ্লেক্স বা অবিভাজ্যভাবে জটিল বলে ঘোষনা দেবেন না; সম্ভাবনা আছে যে, আপনি আসলেই যথেষ্ট পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে এর

খুটিনাটি বিষয়গুলো বিস্তারিত পর্যবেক্ষন করে দেখেননি, অন্যদিকে, আমরা যারা বিজ্ঞানের পক্ষে, আমাদেরও পুরোপুরি অন্ধ আত্মবিশ্বাসী হবারও অবশ্যই দরকার নেই, হয়তো প্রকৃতিতে এমন কিছু আছে যা তার সত্যিকারের ইররিডিউসিবল কমপ্লেক্স বা অবিভাজ্য জটিলতার মাধ্যমে আসলেই অসম্ভাব্যতার পর্বত চুড়ার দিকে মসৃন ক্রমউন্নতির ধারাবাহিকতাকে অসম্ভব করে তুলতে পারে। সৃষ্টিবাদী ঠিকই বলেন, যদি সত্যিকারের ইররিডিসিউবল কমপ্লেক্সিটি স্পষ্টভাবে প্রমান করে তারা দেখাতে পারেন, এটি ডারউইনের তত্বকে ভিত্তিহীন প্রমান করবে। ডারউইন নিজেও বলেছেন: ’যদি প্রমান করে দেখানো সম্ভব হয় এমন কোন জটিল অঙ্গের অস্তিত্ব আছে, যা কোনভাবেই অসংখ্য, ধারাবাহিক, সামান্য পরিবর্তনের মাধ্যমে উদ্ভব হওয়া সম্ভব হয়নি, আমার তত্বর ভিত্তি পুরোপুরিভাবে ভেঙ্গে পড়বে, কিন্তু আমি এমন কোন উদহারন পাইনি’; ডারউইন এমন কোন উদহারন পাননি, অনেক কষ্টকর, প্রায় মরিয়া হয়ে চেষ্টা করার পরও আর কেউই তা পাননি সেই ডারউইনের সময় থেকে; ’সৃষ্টিবাদীদের এই ’হলি গ্রেইল’ হিসাবে অনেক উদহারনকে অবিভাজ্য জটিলতার যোগ্য প্রার্থী হিসাবে প্রস্তাব করা হয়েছে। কিন্তু কোনটাই বিজ্ঞানীদের নীরিক্ষার সামনে টিকতে পারেনি।

যাই হোক না কেন, যদি সত্যিকারের ইররিডিউসিবলী কমপ্লেক্স বা অবিভাজ্যভাবে জটিল কোন কিছুর উদহারন কখনোও খুজে পাওয়া যায়, সেটি ডারউইনের তত্বকে ধ্বংশ করবে; তাহলে কার বলার উপায় আছে যে, এটি ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইন তত্বকে ধ্বংশ করতে পারবে না? আসলেই, এটি ইতিমধ্যেই ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইন তত্বকে ভিত্তিহীন প্রমান করেছে, কারন যা আমি বলে আসছি এবং বলতে থাকবো আবার, ঈশ্বর সম্বন্ধে আমরা যত সামান্যই জানিনা কেন, একটা ব্যাপারে আমরা নিশ্চিৎ, তাকে খুব, খুব বেশী মাত্রায় জটিল হতে হবে এবং অনুমেয়ভাবে ইররিডিউসিবল বা অবিভাজ্যভাবেই জটিল।

(চলবে)

পাদটীকা

---

[১] গামবিট (Gambit): A gambit (from ancient Italian gambetto, meaning tripping) is a chess opening in which a player, most often White, sacrifices material, usually a pawn, with the hope of achieving a resulting advantageous position

[২] An exhaustive review of the provenance, usages and quotations of this analogy is given, from a creationist point of view, by Gert Korthof, athttp://home.wxs.nl/~gkorthof/kortho46a.htm.

[৩] ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইনকে অনেক সময় নির্দয়ভাবে বলা হয় সস্তা সুট বা টাক্সেডো পরা সৃষ্টিবাদ (রিচার্ড ডকিন্স)।

[৪]Adams, D. (2003). The Salmon of Doubt. London: p. 99. My ‘Lament for Douglas’, written the day after his death, is reprinted as the Epilogue to The Salmon of Doubt, and also in A Devil’s Chaplain, which also has my eulogy at his memorial meeting in the Church of St Martin-in-the-Fields.

[৫]Interview in Der Spiegel, 26 Dec. 2005.

[৬]Susskind, L. (2006). The Cosmic Landscape: String Theory and the Illusion of Intelligent Design. New York: Little, Brown. Susskind (2006: 17).

[৭]Hunt The Slipper: Bluffing game, All of the players but one sit in a circle with the feet drawn up and knees raised so that a slipper may be passed from hand to hand of each player under his knees. Where both boys and girls are playing it is desirable to have the girls alternate as much as possible with the boys as the slipper is more readily hidden under their skirts. The players pass the slipper or bean bag around the circle under the knees the object being on their part to evade the vigilance of the odd player who runs around on the outside of the circle trying to touch the person who holds the slipper. Many devices may be resorted to for deceiving the hunter such as appearing to pass the slipper when it is not in ones hands or holding it for quite a while as though the hands are idle although it is not considered good sport to do this for very long or often. The players will use every means of tantalizing the hunter for instance when he is at a safe distance they will hold the slipper up with a shout or even throw it to some other person in the circle or tap the floor with it. When the hunter succeeds in catching the player with the slipper he changes places with that player. When the circle of players is very large the odd player may take his place in the center instead of outside the circle.

[৮] Often, especially when there is only one seeker, the game is played using “hot or cold,” where the hider informs the seeker how near he is to the object, telling him he is cold when he is far from the object (or freezing or if he is extremely far off), and hot when he is extremely close to the object. If the seeker is moving farther from the object, he is told he is getting colder, and if the seeker is moving closer to the object, he is told he is getting warmer.

[৯] ইররিডিউসিবল কমপ্লেক্সিটি (Irreducible Complexity) হচ্ছে ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইন তত্ত্বের প্রস্তাবকদের একটি যুক্তি যা বলছে, কোন কোন জীববিজ্ঞানীয় তন্ত্র এতবেশী সুক্ষ এবং জটিল যা কিনা কোন সরলতর বা অধিক অসম্পুর্ন কোন পুর্বসুরী থেকে বিবর্তিত হতে পারে না, প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে, যে প্রক্রিয়াটি কিছু সুবিধাজনক প্রাকৃতিকভাবে ঘটিত ধারাবাহিক চান্স বা আপতনের মাধ্যমে সৃষ্ট মিউটেশনেরর উপর কাজ করে। এই যুক্তিটি ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইনের কেন্দ্রীয় প্রস্তাবের একটি, এবং বৃহত্তর বৈজ্ঞানিক সমাজে এটি প্রত্যাখ্যাত, সংখ্যাগরিষ্ট বিজ্ঞানীরা ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইনকে ছদ্মবিজ্ঞান হিসাবে মনে করেন। প্রানরসায়নবিজ্ঞানী মাইকেল বেহে এই ধারনাটির উদ্ভাবক, তিনি একে সংজ্ঞায়িত করেন, কোন একটি ইররিডিউসিবল কমপ্লেক্সিটি (Irreducible Complexity) সিস্টেম হচ্ছে এমন কোন একটি সিস্টেম যা তৈরী করে বেশ কিছু পারস্পরিক সুসামন্জষ্যপুর্ণ অংশদের সমন্বয়ে, পারস্পরিক ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়াশীল এই অংশগুলো প্রত্যেকেই মুল কিছু কাজের সাথে জড়িত, এবং এদের যে কোন একটিকে যদি সরিয়ে ফেলা হয় পুরো সিস্টেমটাই কার্যকরীভাবে কাজ করা স্থগিত করে দেয়। তবে বিবর্তন জীববিজ্ঞানী প্রমান করে দেখিয়েছেন, এ ধরনের কোন সিস্টেমও বিবর্তিত হতে পারে।

রিচার্ড ডকিন্স এর দি গড ডিল্যুশন: চতুর্থ অধ্যায় (দ্বিতীয় পর্ব)

By K M Hassan

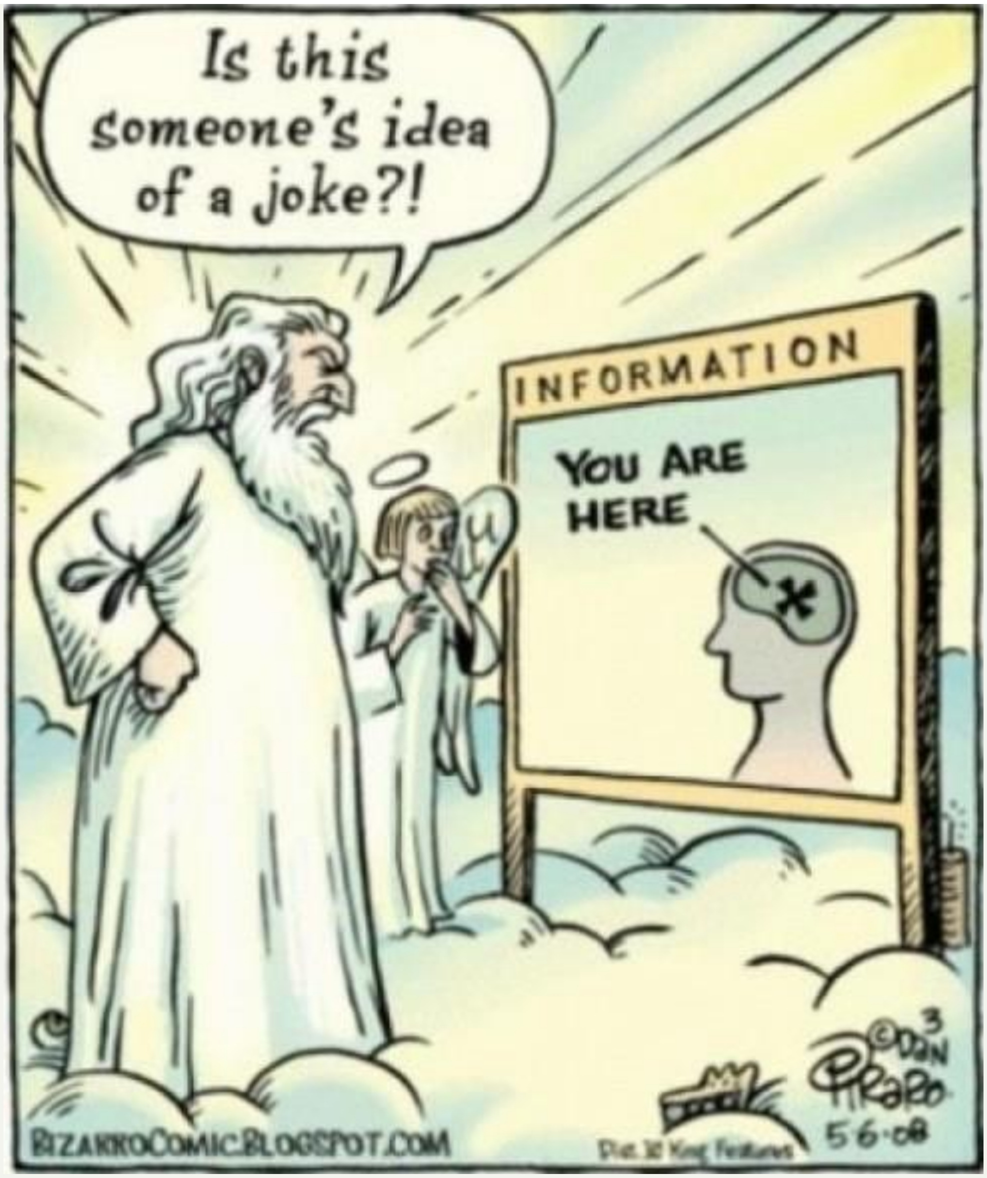
Is this someone's idea of a joke?!
INFORMATION
YOU ARE HERE
©DAN PIRARO
5-6-08
BIZARROCOMIC.BLOGSPOT.COM
Dist. by King Features

কার্টুন সূত্র: ইন্টারনেট

রিচার্ড ডকিন্স এর দি গড ডিল্যুশন এর বাংলা অনুবাদ :
প্রথম , দ্বিতীয় ,তৃতীয় এবং চতুর্থ অধ্যায় (প্রথম পর্ব)

রিচার্ড ডকিন্স এর দি গড ডিল্যুশন : চতুর্থ অধ্যায় (দ্বিতীয় পর্ব)

(অনুবাদ প্রচেষ্টা: কাজী মাহবুব হাসান)

The God Delusion by Richard Dawkins

কেন প্রায় নিশ্চিৎভাবে বলা সম্ভব ঈশ্বরের কোন অস্তিত্ব নেই

চতুর্থ অধ্যায় দ্বিতীয় পর্বের পর:

শুন্যস্থানের উপাসনা:

সামনে অগ্রসর হবার জন্য ইররিডিউসিবল কমপ্লেক্সিটি বা অবিভাজ্য জটিলতার সুনির্দিষ্ট উদহারন অনুসন্ধান করা অবশ্যই মৌলিকভাবে বিজ্ঞানসম্মত কোন উপায় না: সেটা হবে বর্তমান অজ্ঞতা থেকে নেয়া যুক্তির বিশেষ দৃষ্টান্ত। এর আবেদন সেই ভ্রান্ত যুক্তি ঘিরে, যা পরিচিত ’The God of the gaps’ (বা শুন্যস্থানের ঈশ্বর) স্ট্র্যাটেজী, যার বিশেষ নিন্দা করেছিলেন প্রখ্যাত ধর্মত্ত্ববিদ ডিয়েট্রিশ বনহোয়েফার। সৃষ্টিবাদীরা দারুন উৎসাহে বর্তমান সময়ে আমাদের জ্ঞানের শুন্যস্থানগুলোর সন্ধান করে, যদি আপাতদৃষ্টিতে কোন শুন্যস্থান পাওয়া যায়, ধরে নেয়া হয় এটাই ঈশ্বর আমোঘ নিয়মানুযায়ী অবশ্যই পুর্ণ করবেন। চিন্তাশীল ধর্মতত্ত্ববিদদের, যেমন বনহোয়েফার, যেটা ভাবায়, তা হলো বিজ্ঞানের অগ্রগতির সাথে এই শুন্যস্থানগুলোও ক্রমশ: সংকুচিত হয়ে আসছে, এবং ঈশ্বর ধীরে ধীরে কর্মহীন হয়ে যাবার কিংবা লুকিয়ে থাকার মত জায়গার অভাবের হুমকির মুখোমুখি হচ্ছেন। কিন্তু বিজ্ঞানীদের ভাবায় অন্যকিছু। বিজ্ঞানের সাথে জড়িত সকল কর্মকান্ডের প্রয়োজনীয় একটি অংশ হচ্ছে অজ্ঞতাকে স্বীকার করা, এমনকি ভবিষ্যতের জয়ের জন্য একটি চ্যালেন্জ্ঞ হিসাবে এই অজ্ঞতায় উল্লসিত হওয়া । আমার বন্ধু ম্যাট রিডলী যেমন লিখেছিলেন, ‘বেশীর ভাগ বিজ্ঞানীরাই, তারা যা আবিষ্কার করে ফেলেছেন, সে বিষয়ে উৎসাহ হারিয়ে ফেলেন। নতুন অজানা বা অজ্ঞতাই তাদের সামনে এগিয়ে চলার প্রেরণা।’ আধ্যাত্মবাদীরা রহস্যে উল্লসিত হয় এবং রহস্যময়তাকে টিকিয়ে রাখতেই তারা চান, বিজ্ঞানীরা রহস্যর মুখোমুখি আনন্দিত হয় অন্য কারনে: কারন এটা তাদের কিছু করার সুযোগ করে দেয়; খুব সাধারনভাবে, আমি অধ্যায় ৮ এ বিষয়টির পুনরাবৃত্তি করবো, ধর্মের সবচেয়ে ক্ষতিকর একটি দিক হলো, এটি আমাদের শিক্ষা দেয়, কোন কিছু না বুঝে সন্তুষ্ট থাকাটাই হচ্ছে একটি ভালো গুন।

অজ্ঞতাকে স্বীকার করে নেয়া এবং এর সাময়িক রহস্যময়তা ভালো বিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপর্ণ অংশ। নিদেনপক্ষে কিছু বলতে গেলে বলতে হয়, বিষয়টা একারনে দুর্ভাগ্যজনক , সৃষ্টিবাদী প্রচারনাকারীদের প্রধান কৌশলটিই নেতিবাচক, যা বৈজ্ঞানিক জ্ঞানে আপাতত শুন্যস্থানগুলো খুজে বের করা এবং তা সাধারনভাবেই ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইন দিয়ে পুর্ণ করা। পরের উদহারনটা যদিও হাইপোথেটিক্যাল তবে এটাই সচরাচর দেখা যায়: একজন সৃষ্টিবাদী বলছেন, ‘লেসার স্পটের উইজেল ব্যাঙের (Lesser spot Weasel frog) কনুই এর অস্থিসন্ধি হচ্ছে ইররিডিউসিবল বা অবিভাজ্যভাবে জটিল। এর কোন অংশই একক ভাবে কার্যকর নয়, যতক্ষন না সবগুলো অংশ একসাথে যুক্ত না হয়। বাজী রাখছি আপনি কোনভাবেই এমন কোন উপায় দেখাতে পারবেননা, যেখানে উইজেল ব্যাঙ এর কনুই ধীরে ধীরে ক্রমান্বয়ে বিবর্তনের মাধ্যমে সৃষ্টি হতে পারে।’ যদি বিজ্ঞানীরা এর একটি তাৎক্ষনিক এবং বোধগম্য উত্তর দিতে ব্যর্থ হন, সাথে সাথেই সৃষ্টিবাদীরা তাদের সেই একটাই বহুব্যবহৃত উপসংহার টানেন: ‘বেশ তাহলে সেক্ষেত্রে বিকল্প তত্ব, ‘ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইন’ স্বভাবতই বিজয় লাভ করেছে।’ এখানে পক্ষপাতদুষ্ট যুক্তিটা খেয়াল করুন: যদি তত্ব ‘এ’ কোন ক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়, তাহলে তত্ব ’বি’ অবশ্যই সঠিক হবে । বলার প্রয়োজন নেই, যে ব্যপারটা কিন্তু বীপরিত ক্ষেত্রে সেভাবে প্রয়োগ করা হচ্ছে না। আমাদেরকে বিকল্প তত্বে ঝাপিয়ে পড়ে সমর্থন দেবার জন্য উৎসাহ দেয়া হচ্ছে, যখন এটি যে তত্বকে প্রতিস্থাপন করার প্রস্তাব দিচ্ছে, সেই তত্বের মত সেই বিশেষ ক্ষেত্রে এই তত্বটিও ব্যর্থ হচ্ছে কিনা, সে বিষয়ে কোন অনুসন্ধান ছাড়া। ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইন – আইডি (ID) কে সবকিছু থেকেই নি:শর্ত ছাড়পত্র দেয়া হয়েছে, বিবর্তন তত্বকে যে সুকঠিন প্রমানের দাবীর মুখোমুখি হতে হয়, তা থেকে একে দেয়া হয়েছে লোভনীয় একটি সুরক্ষা, যেন কোন যাদুর রক্ষা বলয়।

কিন্তু এখানে আমার বর্তমান বক্তব্যটি হচ্ছে, সৃষ্টিবাদীদের চাতুরীর কারনে, অনিশ্চয়তা নিয়ে বিজ্ঞানীদের স্বাভাবিক – যা আসলেই প্রয়োজনীয় – আনন্দকে তুচ্ছ করে যে দেখা হয়, সে বিষয়টির দিকে দৃষ্টি আকর্ষন করা। শুধুমাত্র খাটি রাজনৈতিক কারনে আজকের বিজ্ঞানীরা বলতে হয়তো ইতস্তত করেন: ‘ হুম, বেশ কৌতুহলের একটি বিষয়তো, আমিও ভাবছি কেমন করে উইজেল ব্যাঙের পুর্বসুরীদের মধ্যে এই কনুই এর অস্থিসন্ধিটা বিবর্তিত হয়েছিল। আমি উইজেল ব্যাঙ বিশেষজ্ঞ না, আমাকে বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরীতে যেতে হবে এবং ব্যাপারটা অনুসন্ধান করে দেখতে হবে, হয়তো কোন গ্রাজুয়েট ছাত্রর জন্য এটি চমৎকার একটি প্রোজেক্ট হতে পারে‘, যে মুহূর্তে একজন বিজ্ঞানী

এভাবে উত্তর দেবেন, এবং কোন ছাত্রর এই প্রোজেক্ট শুরু করা বহু আগেই – সেই একই সুপরিচিত শিরোনাম দেখা যাবে সৃষ্টিবাদীদের প্রচারনাপত্রে: ‘উইজেল ব্যাঙ এর ডিজাইন একমাত্র ঈশ্বরই করতে পারেন’।

এখানে সেই দুর্ভাগ্যজনকভাবে, গবেষনার দিক নির্দেশনায় অজ্ঞাত বিষয়গুলোকে অনুসন্ধান করতে বিজ্ঞানের পদ্ধতিগত প্রয়োজনীয়তা এবং আইডি মতামতধারীদের সেই অজ্ঞাত স্থানগুলোকে খুজে বের করে বিজয় দাবী করার প্রবণতা যুক্ত হয়ে আছে। আইডি র যে নিজস্ব কোন প্রমান নেই, এবং বিজ্ঞানের আপতত না জানা শুন্যস্থানগুলোয় এটি যে আগাছার মত বৃদ্ধি পায়, ঠিক এই সত্যটাই, খানিকটা অস্বস্তির সাথেই সহাবস্থন করে বিজ্ঞানের এই সব শুন্যস্থানগুলোকে শনাক্ত এবং সেই একই শুন্যস্থানগুলোকে গবেষনার সুচনা বলে দাবী করার প্রয়োজনীয়তার সাথে। এই অর্থে, বিজ্ঞান তার মিত্র খুজে পায় মুক্তবুদ্ধির প্রজ্ঞাসম্পন্ন ধর্মতত্ত্ববিদদের সাথে, যেমন বনহয়েফার, তাদের এই কৌশলগত ঐক্য হতে পারে নির্বোধ, জনতুষ্ঠকারী ধর্মতত্ব এবং ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইনের এর শুন্যস্থান পুজারী নামের যৌথ শত্রুর মুখোমুখি।

জীবাশ্ম রেকর্ডে ‘শুন্যস্থানগুলো’র সাথে সৃষ্টিবাদীদের প্রেম তাদের পুরো শুন্যস্থান পুজারী ধর্মতত্ত্বের প্রতীক। আমি একবার ক্যামব্রিয়ান এক্সপোশন নিয়ে একটি অধ্যায় শুরু করেছিলাম এই বাক্যটি দিয়ে: ‘যেন বিবর্তনের কোন ইতিহাস ছাড়াই জীবাশ্মগুলো সেখানে কেউ সাজিয়ে রেখেছে।’ কিন্তু, সেটা ছিল একটি অধ্যায় সুচনা করার লক্ষ্যে ভাষার আড়ম্বরপুর্ণ ব্যবহার, যার উদ্দেশ্য ছিল পাঠকের ক্ষুধাকে তীব্র করে তোলা পুরো বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেবার আগে। বিষন্নভাবে এখন ভাবছি, কত বেশী সহজ ছিল ব্যপারটা বোঝা যে, সেখান থেকে ধৈর্যর সাথে বর্নিত আমার বিস্তারিত ব্যাখ্যা সযত্নে ছেটে ফেলে দেয়া হবে আর অপ্রাসঙ্গিকভাবে আনন্দের সাথে উদ্ধৃতি দেয়া হবে ভুমিকার সেই ছোট বাক্যটিকে । সৃষ্টিবাদীরা জীবাশ্ম রেকর্ডে ‘শুন্যস্থান’ দারুন ভালোবাসে, যেমন সাধারনত: যে কোন জ্ঞানের শুন্যস্থানগুলো তাদের খুব পছন্দের।

অনেক বিবর্তনীয় পরিবর্তন অসাধারন সুন্দর ভাবে কম বেশী অবিচ্ছিন্ন এবং ক্রমান্বয়ে ধীরগতিতে পরিবর্তন হওয়া ক্রান্তিকালীন জীবাশ্মর মাধ্যমে লিপিবদ্ধ হয়ে আছে। কিছু আবার নেই, এবং সেটাই সেই বিখ্যাত শুন্যস্থান। মাইকেল শেরমার তার তীক্ষ্ম বুদ্ধির সাথে মন্তব্য করেছিলেন, যদি নতুন কোন জীবাশ্ম খুজে পাওয়া যায়, যা ঠিক মাঝখান থেকে কোন জীবাশ্মর শুন্যস্থানকে দ্বিধাবিভক্ত করে, তারপরও সৃষ্টিবাদীরা ঘোষনা দিতে দ্বিধা করবে না যে, এখন তাহলে দ্বিগুন শুন্যস্থান ! যাই হোক না কেন, লক্ষ্য করুন সেই আবারো প্রচলিত ধারনার অযাচিত ব্যবহার। যদি প্রস্তাবিত বিবর্তনীয় পরিবর্তনের কোন ফসিল না পাওয়া যায়, সৃষ্টিবাদীদের গতানুগতিক ধারনাটি হলো, কোন বিবর্তনীয় পরিবর্তন হয়নি, সুতরাং ঈশ্বর নিশ্চয়ই কোন হস্তক্ষেপ করেছেন।

বিবর্তন বা বিজ্ঞান,যেটাই হোক না কেন, এর কোন কিছুর ব্যাখ্যার প্রতিটি ধাপের পুঙ্খানুপুঙ্খ প্রমান দাবী করাটা হবে পুরোপুরি অযৌক্তিক ; এরকম দাবী করার মানে যেন, কাউকে খুনী হিসাবে অভিযুক্ত করার জন্য চলচিত্রের মতো সম্পুর্ণ ঘটনাটির, অর্থাৎ হত্যা করার আগে খুনির প্রতিটা পদক্ষেপের রেকর্ড দাবী করা, যেখানে একটা ফ্রেমও বাদ পড়া চলবে না।জীব মৃতদেহদের অতি ক্ষুদ্র এটা অংশ আসলে জীবাশ্মীভুত হয়েছে, আমরা আসলেই ভাগ্যবান, যতটুকু পাওয়ার কথা ছিল, তারচেয়ে অনেক বেশী অন্তবর্তীকালীন প্রানীদের ফসিল আমরা খুজে পেয়েছি। কোন জীবাশ্মই তো না পাওয়ার সম্ভাবনাই ছিল বেশী, কিন্তু তারপরও বিবর্তনের প্রমান আমরা পেতাম অন্য উৎস থেকে, যেমন মলিক্যুলার জেনেটিক্স এবং ভৌগলিক বিস্তার থেকে, এবং সেগুলোই যথেষ্ট শক্তিশালী ছিল। অপরদিকে বিবর্তন দৃঢ়ভাবে ভবিষ্যদ্বানী করছে যদি একটা জীবাশ্মও ভুস্বকের কোন প্রস্তাবিত স্তর ছাড়া অন্য কোন ভুল স্তরে পাওয়া যায়, পুরো তত্বই আসলে ভিত্তিহীন হয়ে যাবে। জে বি এস হ্যালডেনকে যখন একজন অতি উৎসাহী পপারিয়ান [১০] চ্যালেন্জ্ঞ করেছিল বলতে, কিভাবে বিবর্তনকে ভুল প্রমান করা যেতে পারে, তিনি তার বিখ্যাত গর্জন করে বলেছিলেন, প্রি ক্যামব্রিয়ান স্তরে যদি খরগোশের জীবাশ্ম খুজে পাওয়া যায়; এ ধরনের কোন সময়বীপরিত জীবাশ্ম

আজও প্রকৃতঅর্থে খুজে পাওয়া যায়নি, যদিও সম্পুর্ণ মিথ্যা প্রমানিত হওয়া সৃষ্টিবাদীদের কয়লার স্তরে মানুষের খুলি বা ডায়নোসরদের সাথে মানুষের পায়ে চিহ্ন পাওয়ার কাহিনী সত্ত্বে।

শুন্যস্থানগুলো সৃষ্টিবাদীদের মনে প্রথাসিদ্ধভাবেই ঈশ্বর পুরন করেন। একই নীতি প্রয়োগ করা হয় সেই অসম্ভাব্যতার পর্বত চুড়ায় ওঠার আপাতদৃষ্টিতে সেই খাড়া উচু পাশটির ক্ষেত্রে, যেখানে ধীরে ধীরে চুড়ায় ওঠার ঢাল সাথে সাথে চোখে পড়ে না কিংবা উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে উপেক্ষা করা হয়। যে সমস্ত ক্ষেত্রে উপাত্তর ঘাটতি আছে বা বোঝার এখনও ঘাটতি আছে, সেই জায়গাগুলো স্বয়ংক্রিয়ভাবে ঈশ্বরের কৃপায় ছেড়ে দেয়া হয়। খুব দ্রুত নাটকীয়ভাবে কোন কিছুকে ইররিডিউসিবল কমপ্লেক্সিটি বা অবিভাজ্য জটিলতা দাবী করে ঘোষনা দেয়ার এই আশ্রয় নেয়ার কৌশল তাদের কল্পনাশক্তির অভাবকেই ইঙ্গিত করে। কিছু জৈব অঙ্গ, যদি চোখ না হয়, তাহলে বাকটেরিয়া ফ্ল্যাজেলার মটর বা কোন জৈব রাসায়নিক বিক্রিয়া, কোন অতিরিক্ত ব্যাখ্যা কিংবা যুক্তি ছাড়াই অবিভাজ্যভাবে জটিল বলে ঘোষনা দেয়া হয়। কোন ’প্রচেষ্ঠা’ই করা হয়নি এই জটিলতাকে ব্যাখ্যা দেবার জন্য। চোখ, পাখা এবং আরো অনেক কিছুর সতর্কতামুলক কাহিনী সত্ত্বেও এই সন্দেহজনক প্রশংসার প্রতিটি নতুন প্রার্থীকে ধরে নেয়া হয় সুস্পষ্টভাবে স্বপ্রমানিত অবিভাজ্য জটিলতা হিসাবে, এবং এর সেই পদমর্যাদা আরোপিত করা হয়, যেন কোন ঐশী ডিক্রি বা ফিয়াট এর মাধ্যমে [১১]; কিন্তু ব্যাপারটা একটু ভেবে দেখুন। যেহেতু অসরলযোগ্য জটিলতা ব্যবহার করা হচ্ছে ডিজাইনের পক্ষে একটি জোরালো যুক্তি হিসাবে, সুতরাং ডিজাইন এর চেয়ে কিন্ত বেশী এটি ফিয়াট বা ডিক্রির এর দাবী করতে পারেনা। এর চেয়ে আপনি বরং সরাসরি আরোপ করে দাবী করুন, যে উইজেল ব্যাঙ ডিজাইনের চিহ্ন বহন করে (বোমবার্ডিয়ের বীটল ইত্যাদি) কোন যুক্তি বা সাক্ষ্যপ্রমান ছাড়াই, কিন্তু সেটা বিজ্ঞানের পথ নয়।

এবং যুক্তিও দেখা যায় বেশী বিশ্বাসযোগ্য হয়না এর চেয়ে যেমন: আমি [এখানে নিজের নাম যোগ করুন] ব্যাক্তিগতভাবে চিন্তা করে আর কোন উপায় দেখছি না, যে কিভাবে ধাপে ধাপে [এখানে বায়োলজিকাল ফেনোমেনার নামটি যোগ করুন] তৈরী হতে পারে। সুতরাং এটি অবিভাজ্যভাবে জটিল। এর মানে হচ্ছে এটি ঈশ্বর পরিকল্পিত বা ডিজাইন করা।’ এভাবে আপনি বিষয়টি প্রকাশ করে দেখুন এবং তাৎক্ষনিকভাবে আপনি দেখতে পাবেন এটি কোন বিজ্ঞানীর একটি অন্তবর্তীকালীন রুপ খুজে বের করার বা অন্ততপক্ষে কল্পনা করার ঝুকির মুখে পড়ে গেছে। এমনকি যদি কোন বিজ্ঞানী কোন ব্যাখ্যা নিয়ে এগিয়ে না আসেনও, এর শুধুমাত্র কোন কিছু ‘ডিজাইন’ মনে করার বাজে যুক্তির কারনে এটি কোন সুবিধা করতে পারবে না। ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইন ভিত্তির যুক্তি অলস এবং পরাজয়বাদী – সেই প্রথাগত ‘শুন্যস্থান পুর্ণ করা ঈশ্বরের’ যুক্তি। আমি অতীতে এটিকে নাম দিয়েছিলাম ব্যক্তিগত অবিশ্বাস থেকে আসা যুক্তি।

কল্পনা করুন আপনি আসলেই একটি অসাধারন ম্যাজিক কৌশল দেখছেন। যাদুকর জুটি পেন এবং টেলার এর একটা প্রচলিত যাদু ছিল, তারা একই সাথে মঞ্চে এসে একে অপরকে পিস্তল দিয়ে গুলি করবে এবং দুজনেই সেই বুলেট দাত দিয়ে আটকে দিচ্ছে। প্রথমেই বেশ সতর্কতার সাথে দুটি বুলেটে শনাক্তকারী চিহ্ন দেয়া হয় পিস্তলে ঢোকানোর আগে, পুরো প্রক্রিয়াটা কাছ থেকে দেখানো হয় দর্শকদের মধ্য থেকে নেয়া ভলান্টিয়ারদের, যাদের আগ্নেয়াস্ত্র সম্বন্ধে জ্ঞান আছে এবং আপাতদৃষ্টিতে মনে হচ্ছে সব ধরনের ছলচাতুরীর সম্ভাবনাকে নাকচ করে দেয়ার ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। দেখা গেল টেলারের দাগ দেয়া বুলেট পেনের মুখে, পেনের দাগ দেয় বুলেট টেলারের মুখে; আমি [রিচার্ড ডকিন্স] সম্পুর্নভাবে অন্য কোন উপায় কিন্তু ভাবতে পারছি না, এটা যে একটা চালাকি হতে পারে। ব্যাক্তিগত অবিশ্বাস থেকে আসা যুক্তি আমার প্রাকবৈজ্ঞানিক মস্তিষ্কের কেন্দ্র থেকে চিৎকার করে বলছে এবং আমাকেও প্রায় বাধ্য করছে বলতে যে, ‘এটাতো একটি অলৌকিক ঘটনা, এর কোন বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা নেই, এটি অতিপ্রাকৃত হতে বাধ্য।’ কিন্তু আমার মধ্যে এখন বিজ্ঞান শিক্ষার ক্ষুদ্র একটি আওয়াজ বলছে অন্য কথা। পেন এবং টেলার বিশ্বসেরা যাদুকর জুটি। নিশ্চয়ই এর একটা সঠিক ভালো ব্যাখ্যা আছে। আমি শুধু এ বিষয়ে কম জানি বা বেশী ভালো করে লক্ষ্য করিনি বা কল্পনাশক্তির দুর্বলতার কারনে বিষয়টি ভেবে উঠতে পারছি না এই

যা। এটাই যাদুকরী কোন কৌশলের উচিৎ জবাব হতে পারে। এবং এটিও জীববিজ্ঞানের নানা ফেনোফেনা বা ঘটনার, যা আপাতদৃষ্টিতে মনে হচ্ছে ইররিডিউসিবল কমপ্লেক্স, তার ক্ষেত্রেও সঠিক প্রতিক্রিয়া হতে পারে। যে মানুষগুলো প্রাকৃতিক কোন ঘটনার প্রতি ব্যাক্তিগত হতভম্বতা থেকে দ্রুত অতিপ্রাকৃত ব্যাখ্যার শরণাপন্ন হন, তারা ঐসব নির্বোধদের তুলনায় কোন অংশেই কম না, যারা এই ধরনের যাদুকরদের চামচ বাকাতে দেখেএবং এদের ‘প্যারানর্মাল’ বা অতিপ্রাকৃত বলে আখ্যা দেন।

স্কটিশ রসায়নবিদ এ জি কেয়ার্ণ স্মিথ তার Seven Clues to Origin of Life বইটিতে একটি আর্চ এর উদহারন ব্যবহার করে আরো একটি অতিরিক্ত বিষয় উল্লেখ করেছিলেন, অমসৃনভাবে কাটা পাথর দিয়ে তৈরী, কোন সিমেন্ট ছাড়া, স্বাধীনভাবে দাড়ানো কোন আর্চ (বা ধনুকাকৃতির খিলান) কিন্তু একটি ভারসাম্যপুর্ণ স্থায়ী স্হাপনা হতে পারে; তবে এটি ইররিডিউসিবল কমপ্লেক্স বা অবিভাজ্যভাবে জটিল, কারন একটা পাথর যদি মুল কাঠামো থেকে সরানো হয় তবে পুরো আর্চটাই ধ্বসে পড়বে। তাহলে প্রথমেই বা এটা কিভাবে তৈরী হলো। একটা উপায় হলো একসাথে অনেকগুলো পাথর একসাথে জড়ো করে একটা একটা করে পাথর সরানো। সাধারনত: অনেক এমন অনেক কাঠামোর উদহারন আছে তারা অসরলযোগ্য সেই অর্থে যে, এদের কোন অংশ বাদ দিলে এটি আর তার কাঠামোগত ঐক্য টিকিয়ে রাখতে পারেনা। কিন্তু তারা তৈরী হয়েছিল একটি কাঠামোর উপর ভিত্তি করেই, যা পরবর্তীতে সরিয়ে ফেলা হয় এবং এখন যা আর দৃশ্যমান নয়। বিবর্তনেও একই ঘটনা ঘটে, কোন অঙ্গ বা কোন স্ট্রাকচার যা আপনি দেখছেন তারও এমন একটি কাঠামো হয়তো ছিল তার পুর্বসুরী প্রানীদের শরীরে, যা এর পরবর্তী প্রজন্মে অপসারিত হয়েছে।

ইররিডিউসিবল কমপ্লেক্সিটি (Irreducible complexity) নতুন কোন ধারনা না, কিন্তু এই বাক্যটি আবিষ্কার করেছেন সৃষ্টিবাদী বিজ্ঞানী মাইকেল বেহে, ১৯৯৬ সালে [১২]। তাকে কৃতিত্ব দেয়া হয় (অবশ্য যদি কৃতিত্ব এখানে সঠিক শব্দ হয়ে থাকে) সৃষ্টিবাদকে জীববিজ্ঞানের নতুন শাখার দিকে নিয়ে যাবার জন্য, তা হলো: প্রাণরসায়ন এবং কোষ বিজ্ঞান, সম্ভবত তার দৃষ্টিতে চোখ কিংবা পাখার চেয়ে এই ক্ষেত্রগুলোয় শুন্যস্থান বা গ্যাপ শিকার করা বেশ সহজ মনে হয়েছিল। ভালো উদহারন হিসাবে তার সেরা প্রচেষ্টা (যদিও খারাপ একটা উদহারন) হলো ব্যাক্টেরিয়ার ফ্ল্যাজেলার মটর।

প্রকৃতির একটি অসাধারন উদ্ভাবনী শক্তির নমুনা হলো ফ্ল্যাজেলার মটর। মানুষের আবিষ্কৃত প্রযুক্তি বাদ দিলে, এটি প্রকৃতিতে আমাদের জানা একটি মাত্র উদহারন, যা একটি স্বাধীনভাবে ঘুরতে পারে এমন একটি অ্যাক্সল (Axle) এ গতি দেয়। আমার মনে হয়, এর চেয়ে বিশালাকার প্রানীদের জন্য চাকা হতে পারতো সত্যিকারে ইররিডিউসিবল কমপ্লেক্সিটি উদহারন হত, আর সম্ভবত এজন্যই প্রকৃতিতে এদের কোন অস্তিত্ব নেই। কেমন করে স্নায়ু বা রক্ত নালী বিয়ারিং এর স্তর পার হতো [১২]।

ফ্ল্যাজেলাম হলো সুতার মত একটি প্রপেলার, যার মাধ্যমে কিছু ব্যাক্টেরিয়া পানির মধ্যে চলাফেরা করে অনেকটা গর্ত খুড়ে খুড়ে, আমি গর্তে খুড়ে বলছি, সাতার বলছিনা, কারন ব্যাক্টেরিয়ার পর্যায়ে তার অস্তিত্বে পানিকে আমাদের মত তরল মনে হবে না, তাদের কাছে মনে হবে, জেলী বা তরল গুড় বা এমনকি বালির মত কোন মাধ্যম। এবং ব্যাক্টেরিয়ার মনে হবে সে তার মধ্য দিয়ে সুড়ঙ্গর মত গর্ত করে চলাফেরা করছে, সাতার নয়। আরেকটু বড় কোন অর্গানিজম এর ফ্লাজেলাম এর মত যেমন প্রোটোজোয়া, ব্যাকটেরিয়ার ফ্ল্যাজেলাম চাবুকের মত ঢেউ তোলেনা বা বৈঠার মত দাড় টানার মত আচরন করে না। সত্যি সত্যি এর একটি স্বাধীনভাবে ঘুর্ণায়ক্ষম অ্যাক্সল যা ক্রমাগত ভাবে ঘুরতে থাকে একটি বিয়ারিং এর মধ্যে, এটিকে গতিশীল রাখে খুব ছোট একটি অসাধারন মটর। আনবিক পর্যায়ে এই মটর মাংশপেশীর মত একই মুল নীতি ব্যবহার করে, তবে সবিরাম বা থেমে থেমে সংকোচনের বদলে এটি ঘুরতে পারে (ঘুর্ণনক্ষম) [১৩]; বেশ আনন্দের সাথে এটি বর্ণনা করা হয়েছে ক্ষুদ্র

আউটবোর্ড মটর হিসাবে, যেমন মটরবোট এর বাইরে থাকা ইন্জিনের মত (যদিও প্রকৌশলগত দিক থেকে এবং ব্যতিক্রমী একটি জৈব সিস্টেম হিসেবেও এটি খুব বেশী মাত্রায় একটি অদক্ষ মটর)।

কোন যুক্তিযুক্ত স্বাক্ষ্যপ্রমানের একটি শব্দ ছাড়াই, ব্যাখ্যা বা বিস্তারিত কোন আলোচনা ছাড়াই বেহে এটিকে এক কথায় দাবী করেন, যে ব্যাকটেরিয়ার ফ্ল্যাজেলার মটর হচ্ছে অবিভাজ্যভাবে জটিল। যেহেতু তার দাবীর স্বপক্ষে তিনি কোন যুক্তি দিতে পারেননি, আমরা শুরু করতে পারি, তার কল্পনাশক্তির ব্যর্থতা দিয়ে। তিনি আরো দাবী করেন, বিশেষায়িত জীববিজ্ঞানের গবেষনাপত্র গুলো নাকি ব্যাপারটা উপেক্ষা করেছে; তার এই অভিযোগের অসত্যতার প্রমান করতে বেহের জন্য ভয়াবহ রকম বিব্রতকর বিশালকায় প্রমান ভান্ডার পেনসিলভ্যানিয়ায় ২০০৫ সালে বিচারপতি জন ই জোনস এর আদালতে দাখিল করা হয়েছিল, যেখানে বেহে একজন বিশেষজ্ঞ সাক্ষী ছিলেন একটি ক্রিয়েশনিষ্ট গ্রুপের পক্ষে, যারা স্থানীয় পাবলিক স্কুলের বিজ্ঞান কারিকুলামে ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইন মোড়কে সৃষ্টিবাদকে চাপিয়ে দেবার চেষ্টা করেছিল। বিচারপতি জোনস এর ভাষায় তাদের সেই পদক্ষেপ হচ্ছে, অবিশ্বাস্যরকম নির্বুদ্ধিতার একটি পদক্ষেপ (বিচারপতি জোনস এর এই বাক্য এবং তিনি নিজে নি:সন্দেহে স্মরনীয় হয়ে থাকবেন); এই বিচারের সময়ই বেহে শুধু এই বিব্রতকর পরিস্থিতির মুখোমুখি পড়েননি, আমরা অচিরেই তা দেখবো।

কোন কিছুকে অবিভাজ্য জটিল হিসাবে প্রমান করার সবচেয়ে গুরুত্বপুর্ণ বিষয়টি হলো, প্রমান করে দেখানো যে, এর কোন অংশই একক ভাবে কর্ম উপযোগী নয়। এদের একক ভাবে কাজ করার পুর্বশর্ত হলো, তাদের প্রত্যেকটি অংশকে এক জায়গায় জড়ো হতে হবে (বেহের প্রিয় উদহারণ ছিল মাউস ট্র্যাপ); বাস্তবে আনবিক জীববিজ্ঞানীদের বেশী পরিশ্রম করতে হয়নি প্রমান করে দেখাতে যে, পুরো একটি একক ছাড়াও স্বতন্ত্রভাবে কাজ করতে পারা এর নানা অংশগুলোকে, যেমন ফ্ল্যাজেলার মটর এবং বেহের অন্যান্য অসরলযোগ্য জটিল হিসাবে দাবী করা উদহারনের ক্ষেত্রে। ব্রাউন বিশ্ববিদ্যালেয়ের কেনেথ মিলার ভালো বলেছিলেন, আমি যদি বাজি রাখতে চাই, তবে এটাই ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইনের সবচেয়ে সফল প্ররোচনাদায়ী শত্রু, সবচেয়ে কম না কারন তিনি একজন নিবেদিত প্রাণ খৃষ্টান। আমি প্রায়ই ধর্মবিশ্বাসীদের মিলার এর বই পড়ার জন্য উৎসাহ দেই, যারা নিজেদের বেহের ধোকাবাজির শিকার বলে মনে করেন, যেমন Finding Darwin’s God।

ব্যাকটেরিয়ার ঘুর্ণনক্ষম বা রোটারী ইন্জিন এর ক্ষেত্রে, মিলার আমাদের দৃষ্টি আকর্ষন করেন আরেকটি মেকানিজমের প্রতি, টাইপ থ্রি সিক্রেটরি সিস্টেম বা TTSS (Type Three Secretory System) এর প্রতি [১৪]। TTSS ঘুর্ণায়মান গতির জন্য ব্যবহৃত হয়না। এটি পরজীবি ব্যাকটেরিয়াদের ব্যবহার করা অনেকগুলো পদ্ধতির একটি, যা ব্যাকটেরিয়া ব্যবহার করে বিষাক্ত পদার্থ তাদের শরীর থেকে ক্ষতির উদ্দেশ্যে পোষকের শরীরে মধ্যে তাদের কোষপর্দার মধ্য দিয়ে পাম্প করার জন্য। মানুষের মাত্রায় ভাবলে , আমরা ভাবতে পারি, কোন ছিদ্রর মধ্য দিয়ে তরল কিছু ঢেলে দেয়ার মত বা চেপে ঠেলে বের করে দেবার মত পাম্প। কিন্তু ব্যাকটেরিয়ার পর্যায়ে বিষয়টি অন্যরকম, নি:সরিত প্রতিটি অনু আকারে এবং ত্রিমাত্রিক গঠনে TTSS এর অনুদের মতই: বলা হয় ঘণ একটি কাঠামোর অনু, তরল নয়; প্রতিটি অনু এককভাবে নির্দিষ্ট প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে সক্রিয়ভাবে পরিচালনা করে বাইরে বের করে দেয়া হয়, যেন স্বয়ংক্রিয় কোন স্লট মেশিন, যা খেলনা বা বোতল সরবরাহ করে। সুতরাং সাধারন কোন ছিদ্র তারা যার মধ্য দিয়ে কোন অনু ‘প্রবাহিত’ হয় শুধু। কোষীয় দ্রব্য–সরবরাহকারী নিজেই অনেক ছোট ছোট প্রোটিন অনু দিয়ে তৈরী, প্রত্যেকটির আকারে এবং গঠনগত জটিলতায় তারা যে অনুগুলো কোষের ভিতর থেকে বাইরে সরবরাহ করে, তাদের সমতুল্য। মজার ব্যপার হলো, ব্যাকটেরিয়াদের এই স্লট মেশিনগুলো কখনো কখনো সম্পর্কযুক্ত নয় এমন ব্যাকটেরিয়াদের মধ্যে প্রায় একই রকম দেখা যায়। তাদের তৈরী করার জীন যেন, কপি এবং পেষ্ট করা হয়েছে অন্য ব্যাকটেরিয়া থেকে: যে কাজটা করতে ব্যাকটেরিয়া অত্যন্ত দক্ষ, সেটা নিজ অধিকারেই একটা অসাধারন বিষয়, তবে আমাকে অন্য বিষয়ে বলার তাড়া আছে।

TTSS তৈরী করে যে প্রোটিন অনুগুলো ব্যাকটেরিয়ার ফ্ল্যাজেলার মটরের নানা গঠন উপাদানের সদৃশ। বিবর্তনবাদীদের কাছে সুস্পষ্ট যে TTSS এর নানা অংশগুলো, একটা নতুন, তবে পুরোপুরি না, খানিকটা পরিবর্তিত হয়ে পুরোপুরি অন্য কাজের জন্য নির্বাচিত হয়েছে, যখন ফ্ল্যাজেলার মটরটি বিবর্তিত হয়েছিল। যখন TTSS টাগিং বা কোন অনুকে জোরে টেনে নেয় নিজের ভিতর থেকে, তখন (বিস্মিত হবার তেমন কোন কারন নেই যে) এটি ফ্ল্যাজেলার মটরের ব্যবহার করা মুলনীতির একটি আদি সংস্করন ব্যবহার করে, যা অ্যাক্সল হিসাবে কাজ করা অনুটিকে টেনে ধরে ঘোরাতে থাকে। স্পষ্টতই, ফ্ল্যাজেলার মটরের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ আগে থেকেই সেখানে কর্মক্ষম ছিল ফ্ল্যাজেলার মটর বিবর্তিত হবার আগে। বিদ্যমান কোন প্রক্রিয়াকে ভিন্ন কাজের জন্য পুণ:নির্দেশনা দেয়া আপাতদৃষ্টিতে অবিভাজ্য জটিল কোন যন্ত্রর অসম্ভাব্যতার পাহাড় চুড়ায় উঠার একটি সুস্পষ্ট উপায়।

অনেক বেশী কাজ করার প্রয়োজন আছে, অবশ্যই, আমি নিশ্চিৎ, সেই গবেষনা হবে। এধরনের কাজ কখনোই শেষ হবে না, যদি বিজ্ঞানীরা ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইন তত্ব যে অলস ডিফল্ট অবস্থান নেবার জন্য প্ররোচিত করে তাতে সন্তুষ্ট না হন। একজন কাল্পনিক ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইন তাত্বিক এর বিজ্ঞানীদের উদ্দেশ্যে প্রেরিত বার্তা হতে পারে এমন: ‘আপনি যদি না বুঝতে পারেন কিভাবে কোন একটা কিছু কাজ করছে, কোন অসুবিধা নেই :সাথে সাথে এটার বোঝার সব চেষ্টা ছেড়ে দিতে হবে এবং বলতে হবে ঈশ্বরের কাজ এটি। আপনি জানের না স্নায়ু সংকেত কিভাবে কাজ করছে? ভালো, আপনি জানেন না আমাদের মস্তিষ্কে স্মৃতি কিভাবে সংরক্ষিত হয়। চমৎকার! সালোক সংশ্লেষন প্রক্রিয়া খুবই জটিল? দারুন, দয়া করে সমস্যা সমাধান করার দরকার নেই, হাল ছেড়ে দেন, ঈশ্বরের কৃপা ভিক্ষা করুন। প্রিয় বিজ্ঞানীগন দয়া করে আপনাদের অজানা ‘রহস্য’ নিয়ে কোন কাজ করার দরকার নেই, বরং আমাদের কাছে আপনার রহস্যগুলো নিয়ে আসুন, কারন আমরা তা ব্যবহার করতে পারবো। খামোকা গবেষনা করে মুল্যবান অজ্ঞতার অপচয় করা থেকে বিরত থাকুন। ঈশ্বরের শেষ ভরসা হিসাবে এই সব মহান শুন্যস্থানগুলো আমাদের প্রয়োজন।’ সেন্ট অগাষ্টিন কোন রাখ ঢাক ছাড়াই বলেছেন, ‘আরো এক ধরনের প্রলোভন আছে, আরো বেশী বিপদসঙ্কুল. সেটা হচ্ছে কৌতুহলের অসুখ, এটাই আমাদের পরিচালনা করে প্রকৃতির গোপন রহস্য উন্মোচনের চেষ্টা করতে। যে গোপন রহস্য আমাদের বোধের বাইরে, যা আমাদের কোন কাজে আসেনা, যা মানুষের শেখার আকাঙ্খা করাও উচিৎ না (Freeman 2002 এ উদ্ধৃত)’;

ইররিডিউসিবল কমপ্লেক্সিটির ক্ষেত্রে বেহের অন্য আরেকটি প্রিয় উদহারন হলো আমাদের ইমিউন সিস্টেম বা রোগ প্রতিরোধ তন্ত্র। বিচারপতি জোনস এর ভাষায় সেই কাহিনী শোনা যাক:

> ’প্রকৃতপক্ষে, পাল্টা প্রশ্নোত্তরের সময় অধ্যাপক বেহে তার ১৯৯৬ সালে তার দাবী, বিজ্ঞান কখনোই রোগপ্রতিরোধ তন্ত্রের বিবর্তনীয় ব্যাখ্যা দিতে পারবে না, এর বিষয়ে প্রশ্ন করা হয়েছিল। তাকে ৫৮টি পিয়ার রিভিউ প্রকাশনা, নয়টি বই এবং বেশ কয়েকটি ইমিউনোলজী পাঠ্যপুস্তক অধ্যায় দেখানো হয়েছিল ইমিউন সিস্টেম এর বিবর্তনের ব্যাখ্যা হিসাবে। কিন্তু তিনি শুধু দাবী করেন, এগুলো বিবর্তনের পক্ষে প্রমান হিসাবে যথেষ্ট যেমন না যেমন তেমনি শক্তিশালীও না।’

বেহে , পাল্টা প্রশ্নোত্তর পর্বে, বাদী পক্ষের প্রধান কৌশুলী এরিক রথসচাইল্ড প্রশ্নের উত্তরে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন, তিনি সেই ৫৮টি গবেষনা পত্রের বেশীর ভাগই পড়েননি। অবশ্য এটি বিস্ময়কর না, কারন ইমিউনোলজী অনেক কঠিন পরিশ্রমের ব্যাপার ।একারনে বেহের অবজ্ঞাসুচক ‘অর্থহীন’ বলে এসব প্রত্যাখান করা আরো বেশী ক্ষমার অযোগ্য। এটা অবশ্যই অর্থহীন, সত্যিকারের পৃথিবী সম্বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কারের বদলে যদি আপনার লক্ষ্য থাকে সহজে বিশ্বাসপ্রবন সাধারন মানুষ এবং রাজনীতিবিদদের জন্য প্রচারণা চালানো; বেহের কথা শোনার পর, রথসচাইল্ড সুন্দরভাবে পুরোব্যাপারটার সারাংশ করেন যা সেদিন সেই আলাদতে উপস্থিত সকল সৎ মানুষ অনুভব করেছিলেন:

আমাদের সৌভাগ্য এবং আমরা কৃতজ্ঞ যে কিছু বিজ্ঞানী আছেন যারা ইমিউন সিস্টেমের উৎপত্তির প্রশ্নের উত্তরটি খোজার চেষ্টা করেছেন.... এটি আমাদের ভয়ঙ্কর এবং ক্ষতিকর অসুখের বিরুদ্ধে আমাদের প্রতিরোধ, যে বিজ্ঞানীরা এই সব বই লিখেছেন, বা নিবন্ধ লিখেছেন তারা সবার চোখের অন্তরালেই পরিশ্রম করে গেছেন, বই এর জন্য বা বক্তৃতার জন্য কোন পারিশ্রমিক ছাড়াই। তাদের পরিশ্রম আমাদের সহায়তা করেছে অনেক গুরুত্বপূর্ণ অসুখের বিরুদ্ধে যুদ্ধ এবং চিকিৎসা করতে। তার ঠিক বীপরিতে, অধ্যাপক বেহে এবং পুরো ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইন আন্দোলন বিজ্ঞান বা চিকিৎসা বিজ্ঞানের জ্ঞানকে সামনে অগ্রসর হবার ক্ষেত্রে কোন অবদানই রাখছেন না, এবং ভবিষ্যত প্রজন্মের বিজ্ঞানীদের বলছেন, এসব নিয়ে মাথা না ঘামাতে [১৫]।

আমেরিকার জীনতত্ববিদ জেরী কয়েন বেহের বইটি সম্বন্ধে তার রিভিউতে লিখেছিলেন,' যদি বিজ্ঞানের ইতিহাস আমাদের কিছু শিখিয়ে থাকে, তা হলো আমাদের অজ্ঞতাকে 'ঈশ্বর' হিসাবে চিহ্নিত আমরা কিছুই করতে পারবো না, বা একজন বাঙময় ব্লগারের ভাষায়, গার্ডিয়ান পত্রিকায় কয়েন এবং আমার ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইন সম্বন্ধে একটি নিবন্ধে যিনি মন্তব্য করেছিলেন:

কেন ঈশ্বর কে সবকিছুর ব্যাখ্যা হিসাবে গন্য করা হয়? এটি অবশ্যই তা নয়, এটি ব্যাখ্যা করার ব্যার্থতা, কাধ ঝাকানো একটি 'আমি জানিনা' যা কিনা নিজেকে সাজিয়েছে আধ্যাত্মিকতার পোষাক ও আচারের মাধ্যমে। কেউ যদি কোন কিছুর জন্য ঈশ্বরকে কৃতিত্ব দিতে চায়, সাধারনত এর অর্থ হলো তারা এ সম্বন্ধে কিছু জানেন না, সুতরাং তারা এর কারন হিসাবে আরোপ করে ধরাছোয়ার বাইরে, জানা অসম্ভব আকাশ পরীর উপর। এখন আপনি যদি ব্যাখ্যা দাবী করুন ঐ ভদ্রলোক কোথা থেকে আসলেন, খুব সম্ভবত এর উত্তর হিসাবে আমি একটা অস্পষ্ট মিথ্যা দার্শনিক উত্তর পাবেন তার চির অস্তিত্বময়তা বা প্রকৃতির বাইরে তার অবস্থান সম্বন্ধে। যা অবশ্যই কোন কিছুরই ব্যাখ্যা করেনা [১৬]।

ডারউইনিজম আমাদের সচেতনাতাকে বাড়িয়ে দিয়েছে অন্যভাবে, বিবর্তিত অঙ্গ, যারা অসাধারন এবং দক্ষ সাধারনত যেমনটি হয়,তবে তাদের অনেক ক্রুটিও আছে, ঠিক যেমনটা আপনি আশা করতে পারেন, যখন তাদের কোন বিবর্তনের ইতিহাস থাকে এবং যদি তাদের কেউ ডিজাইন করে থাকতো তাহলে ঠিক আপনি এসব ক্রুটি আশা করতেন না। আমি বেশ কিছু উদহারনটা আগেও আলোচনা করেছি অন্য বইতে: যেমন একটি স্নায়ু, রিকারেন্ট ল্যারিন্জিয়াল নার্ভ, এটি যে নির্দিষ্ট অঙ্গকে স্নায়ুসংযোগ দেয়, সেই অঙ্গের প্রতি উৎস থেকে তার যাত্রাপথের অতিমাত্রায়, অপব্যায়ী ঘুরপথ চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় বিবর্তনের ইতিহাস। আমাদের অনেকগুলো অসুস্থতা, পিঠের নীচের দিকে ব্যাথা বা ব্যাক পেইন থেকে হার্নিয়া, জরায়ুর প্রোলাপ্স এবং আমাদের সাইনাস সংক্রমনের প্রবণতা এর সবকিছুর কারন সরাসরিভাবে আমাদের দুই পায়ে হাটার বিষয়টি, আমরা যে এখন যে শরীরটা নিয়ে দুই পায়ে হাটছি তা শত মিলিয়ন বছর ধরে আকারে পেয়েছিল চার পায়ে হাটার উপর নির্ভর করে। আমাদের সচেতনতা আরো বাড়ে প্রাকৃতিক নির্বাচনের নিষ্ঠুরতা এবং অপচয় প্রবনতা দেখে। শিকারী প্রানী মনে হয় সমান সুন্দরভাবে ডিজাইন করা তার শিকার প্রানীটিকে ধরবার জন্য, অন্যদিকে আবার শিকার প্রানীর ঠিক সেই একই সুন্দরভাবে ডিজাইন করা, আক্রমনকারী শিকারী প্রানীর কবল থেকে রক্ষা পাবার সকল উপায় সহ; তাহলে ঈশ্বর আসলে কোন পক্ষে [১৭]।

(চলবে)

পাদটীকা/নোটস

---

[১০] POPPERIAN relating to, or characteristic of the theories of Karl Popper; esp : of or relating to the theory that a hypothesis can be falsified by observed exceptions but never absolutely proven to be true.

[১১] Fiat: a command or act of will that creates something without or as if without further effort

[১২] রিচার্ড ডকিন্সের নোট: কল্পকাহিনীতে একটি উদহারন দিতে পারি এর, লেখক ফিলিপ পুলম্যান তার Dark materials এ কল্পনা করেছিলেন এক প্রজাতির প্রানীর, মুলেফা, যা সহাবস্থান ছিল বৃক্ষর সাথে যারা মাঝখানে ছিদ্রযুক্ত গোলাকৃতি বীজবাহী পড তৈরী করতো; এই পডগুলো মুলেফা ব্যবহার করতো চাকা হিসাবে।চাকাগুলো যেহেতু শরীরের অংশ ছিলনা, সে কারনে তাদের স্নায়ু বা রক্ত সংযোগও ছিলনা যারা মুলেফার অ্যাক্সল (শিং এর বাকানো নোখ, হাড়) মধ্যে পেচিয়ে যেতো। পুলম্যান দুরদৃষ্টিপুর্ণ একটি পর্যবেক্ষন ছিল, এটি সিস্টেমটি কাজ করতো কারন গ্রহটিতে প্রাকৃতিক ভাবে ব্যাসল্ট এর ফিতা বেছানো রাস্তা ছিল, যা রাস্তা হিসাবে কাজ করতো। রাস্তাহীন অমসৃন ভুমিতে চাকা খুব একটা উপকারী নয়।

[১৩]রিচার্ড ডকিন্সের নোট: (বিস্ময়করভাবে, মাংশপেশীল মুলনীতি আরো একটি তৃতীয় মোডে ব্যবহৃত হয়, কিছু কীটপতঙ্গ, যেমন মৌমাছি, মাছি; যেখানে ওড়ার মাংশপেশীটি মুলত অসিলেটরী, যা রেসিপ্রেকেটিং ইনজিনের মত কাজ করে। অন্য পতঙ্গ যেমন লোকাষ্টরা প্রতিটি পাখনা নাড়ানোর জন্য স্নায়ু সংকেত প্রেরন করে (যেমন পাখীরা), মৌমাছিরা একবারই সংকেত পাঠায় অসিলেটরী মটোরকে সক্রিয় করে (বা নিষ্ক্রিয়); ব্যাকটেরিয়ার যে মেকানিজমটি আছে সেটি সাধারন সংকোচন শীল কিছু (যেমন পাখীদের) নয় বা রেসিপ্রকেটর নয় (যেমন মৌমাছি) বরং একটি সত্যিকারের ঘুর্ণায়মান বা রোটেটর। সেই ক্ষেত্রে এটি বৈদ্যুতিক মটর বা ওয়াঙ্কেল ইন্জিনের মত।)

[১৪] http://www.millerandlevine.com/km/evol/design2/article.html.

[১৫] This account of the Dover trial, including the quotations, is from A. Bottaro, M. A. Inlay and N. J. Matzke, ‘Immunology in the spotlight at the Dover “Intelligent Design” trial’, *Nature Immunology 7,* 2006, 433-5.

[১৬] J. Coyne, ‘God in the details: the biochemical challenge to evolution’,*Nature* 383, 1996, 227-8. The article by Coyne and me, ‘One side can be wrong’, was published in the *Guardian,*1 Sept. 2005:http://www.guardian.co.uk/life/feature/story/0,13026,1559743,00.html. The quotation from the ‘eloquent blogger’ is athttp://www.religionisbullshit.net/blog/2005_09_01_archive.php.

[১৭]Dawkins, R. (1995). *River Out of Eden.* London: Weidenfeld & Nicolson.

রিচার্ড ডকিন্স এর দি গড ডিল্যুশন: চতুর্থ অধ্যায় (তৃতীয় পর্ব)

By K M Hassan

On the first day, man created God.
- Anonymous

কার্টুন সূত্র: ইন্টারনেট

রিচার্ড ডকিন্স এর দি গড ডিল্যুশন এর বাংলা অনুবাদ :
প্রথম , দ্বিতীয় ,তৃতীয় , চতুর্থ অধ্যায় (প্রথম পর্ব) , চতুর্থ অধ্যায় (দ্বিতীয় পর্ব)

রিচার্ড ডকিন্স এর দি গড ডিল্যুশন : চতুর্থ অধ্যায় (তৃতীয় পর্ব)

(অনুবাদ প্রচেষ্টা: কাজী মাহবুব হাসান)

The God Delusion by Richard Dawkins

কেন প্রায় নিশ্চিৎভাবে বলা সম্ভব ঈশ্বরের কোন অস্তিত্ব নেই

চতুর্থ অধ্যায় (দ্বিতীয় পর্ব) এর পরে:

দি অ্যানথ্রপিক প্রিন্সিপাল: প্ল্যানেটারী সংস্করণ

শুন্যস্থানবাদী ধর্মতাত্বিকরা যারা চোখ এবং পাখা, ফ্ল্যাজেলার মটর এবং রোগ প্রতিরোধ তন্ত্রর উপর থেকে হাল ছেড়ে দিয়েছেন, প্রায়ই তারা তাদের আশার শেষ আশ্রয় স্থল হিসাবে বেছে নেন জীবনের উৎপত্তির প্রশ্নটি। অজৈব রসায়নের বিবর্তনের সুচনালগ্ন যে কারনেই হোক না মনে হতে পারে পরবর্তীতে বিবর্তনের নানা পর্যায়ে সুনির্দিষ্ট

অন্তবর্তীকালীন শুন্যস্থানগুলোর চেয়ে আরো বড় কোন শুন্যস্থান উপস্থাপন করছে। এবং একটি অর্থে এটি অপেক্ষাকৃত বড় একটি শুন্যস্থান। তবে সেই একটি অর্থ খুব নির্দিষ্ট, যা ধর্মবাদীদের কোন স্বান্তনার বানী শোনায় না। জীবনের উৎপত্তি শুধু একবারই ঘটতে হবে। সেকারনে আমরা এই ঘটনাটিকে অতি মাত্রায় অসম্ভাব্য বলে মেনে নিতে পারি, আর এই অসম্ভাব্যতার মাত্রা বেশী ভাগ মানুষ যা অনুধাবন করেন তার চেয়েও বহুগুন বেশী। আমি তা ব্যাখ্যা করবো। পরবর্তীতে বিবর্তনের ধাপগুলোর প্রতিলিপি হয়েছে, কম বেশী একই ভাবে, লক্ষ কোটি প্রজাতির মধ্যে স্বতন্ত্রভাবে, ক্রমাগতভাবে যার পুণরাবৃত্তি হয়েছে সময়ের ধারাবাহিকতায়। সুতরাং জটিল জীবনের বিবর্তন ব্যাখ্যা করতে আমরা একই ধরনের পরিসংখ্যানগত যুক্তির আশ্রয় নিতে পারিনা, যা আমরা জীবনের উৎপত্তির ক্ষেত্রে গ্রহন করি। যে ঘটনাগুলো সাদামাটা আটপৌরে বিবর্তনের অংশ, সেগুলো এর একক উৎপত্তি বা সুচনালগ্ন থেকে ভিন্ন (এবং হয়ত কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্রে) এবং যা খুব বেশী অসম্ভাব্য হতে পারেনা।

দুটির মধ্যে এই পার্থক্য বেশ ধাধার মত মনে হতে পারে, আমি অবশ্যই ব্যাখ্যা দিবো, তথাকথিত অ্যানথ্রপিক প্রিন্সিপাল ব্যবহার করে [১৮]; অ্যানথ্রপিক প্রিন্সিপালটির নাম করন করেছিলেন বৃটিশ গনিতজ্ঞ ব্র্যান্ডন কার্টার (Brandon Carter) ১৯৭৪ সালে এবং এর একটি বর্ধিত আকার দেন পদার্থবিজ্ঞানী জন বারো (John Barrow) এবং ফ্র্যাঙক টিপলার (Frank Tipler)এ বিষয়ে তাদের প্রকাশিত একটি বই এ [১৯]; অ্যানথ্রপিক যুক্তি সাধারনত কসমস বা মহাজগত এর প্রেক্ষিতে আরোপিত হয়, পরে সেখানে আসছি; কিন্তু এখানে আমি সেই ধারনাটিকে খানিকটা ক্ষুদ্র পরিসরে উপস্থাপনা করবো, একটি গ্রহের পরিসরে। এই পৃথিবীতে আমাদের অস্তিত্ব, সুতরাং পৃথিবী এমন একটি গ্রহ, যার ক্ষমতা আছে আমাদের সৃষ্টি এবং প্রতিপালন করার , তা সে যত বেশী অসাধারন এবং স্বতন্ত্র গ্রহই হোক না কেন। যেমন, আমাদের মত জীবন, তরল পানি ছাড়া বাচতে পারেনা, আসলেই এক্সোবায়োলজীর বিশেষজ্ঞরা যারা ভীনগ্রহের জীবনের সন্ধান করছেন, তারা মহাবিশ্ব পর্যবেক্ষন করছেন মুলত পানির সন্ধানে। সাধারন একটি তারা, যেমন আমাদের সুর্য, এর চারপাশে আছে সেই তথাকথিত ‘গলডিলকস জোন (Goldilocks zone) [১৯]– যা খুব বেশী গরমও না আবার ঠান্ডাও না বরং ঠিক যতটুক দরকার– কোন গ্রহে তরল পানির অস্তিত্ব থাকার জন্য। সুর্যের চারপাশে একটি অপ্রশস্ত কক্ষপথ আছে, যা খুব বেশী দুরে না সুর্য থেকে, যেখানে পানি বরফে রুপান্তরিত হয়, আবার খুব কাছেও না যেখানে পানি গরমে ফুটতে থাকবে, এই দুয়ের মাঝখানে।

ধারনা করা হয়, জীবন বান্ধব কোন কক্ষপথকে হতে হবে প্রায় বৃত্তাকার। একটি অতিমাত্রায় উপবৃত্তাকার কক্ষপথ, যেমন নতুন আবিষ্কৃত দশম গ্রহ, যার বেসরকারী নাম জেনা, এই গল্ডিলকস জোনের মধ্যে আসার সুযোগ করে দেয় পৃথিবীর সময়ে বেশ কয়েক দশকে বা শতাব্দীতে একবার; জেনা নিজে কিন্তু গল্ডিলস জোনে মোটেও ঢুকতে পারেনা এমন সুর্যের সবচেয়ে কাছাকাছি আসার সময়ও, যা এটি প্রতি ৫৬০ বছর (পৃথিবীর হিসাবে) পর পর পৌছাতে পারে। হ্যালীর ধুমকেতুর তাপমাত্রার তারতম্য হয়, যেমন পেরিহেলিওনে ৪৭ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড থেকে অ্যাপহেলিওনে মাইনাস ২৭০ ডিগ্রী । পৃথিবীর কক্ষপথও, অন্য সব গ্রহের মত টেকনিক্যালী উপবৃত্তাকার (জানুয়ারীতে এটি সুর্যের সবচেয়ে কাছাকাছি এবং জুলাইতে এটি সবচে দুরে থাকে (আপনার যদি ব্যাপারটা অবাক লাগে, তাহলে আপনি নি:সন্দেহে উত্তর গোলার্ধের অতিআত্মমনত্যায় ভুগছেন); কিন্তু বৃত্ত হচ্ছে উপবৃত্তের একটি বিশেষ রুপ, আর পৃথিবী কক্ষপথ,

বৃত্তাকারের এত কাছাকাছি এটি কখনোই গোল্ডিলকস জোনের বাইরে যায় না। সৈরজগতে পৃথিবী নানা ভাবে এত বেশী অনুকুল একটি অবস্থানে, যেন জীবনের বিবর্তনের জন্য এটিকে নির্দিষ্ট করা হয়েছে। বিশাল জুপিটারের মধ্যাকর্ষনের ’ভ্যাকুম ক্লিনার’টি ঠিক এমন জায়গায় অবস্থিত, কোন গ্রহানুকে এটি পৃথিবীর সাথে ভয়াবহ কোন সংঘর্ষ থেকে রক্ষা করে। অপেক্ষাকৃত ভাবে আকারে বড় একটি উপগ্রহ, চাদ আমাদের পৃথিবীর ঘুর্ণনের এর অক্ষপথটি স্থিতিশীল রাখে [২১] এবং জীবনের প্রতিপালনে সহায়তা করে নানাভাবে। নক্ষত্রদের মধ্যে আমাদের সুর্য ব্যতিক্রম কারন এটি বাইনারী নক্ষত্র না, যারা অপর একটি সঙ্গী নক্ষত্রের সাথে একই কক্ষপথে বন্দী; বাইনারী

নক্ষত্রদের গ্রহ থাকা সম্ভব হতে পারে, তবে তাদের কক্ষপথ এতো গোলমেলে ভাবে বিচিত্র হবে, যা জীবন বিবর্তনের জন্য সহায়ক না।

আমাদের এই গ্রহের বিশেষভাবে জীবন বান্ধব হবার কারন হিসাবে দুটি প্রধান ব্যাখ্যা প্রস্তাব করা হয়েছে। ডিজাইন তত্ব বলছে, ঈশ্বর তৈরী করেছেন এই পৃথিবী, এরপর এটি স্থাপন করেছেন গোল্ডিলকস জোনে এবং সুপরিকল্পিতভাবে বাকী সব বিষয়গুলো সাজিয়েছেন আমাদের সুবিধার কথা ভেবে। অ্যানথ্রোপিক দৃষ্টিভঙ্গীটি খুব আলাদা এবং এর একটা হালকা ডারউইনীয় ছোয়া আছে। মহাবিশ্বে বেশীর ভাগ গ্রহই তাদের সংশ্লিষ্ট তারাদের গোল্ডিলোকস জোনে অবস্থান করে না এবং জীবনের জন্য উপযোগীও নয়। এবং সেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠ গ্রহের ক্ষেত্রে কোথাও জীবনের অস্তিত্বও নেই। তবে অল্প কিছু গ্রহ আছে, যেখানে জীবনের বিবর্তনের জন্য উপযোগী পরিস্থিতি থাকতে পারে। আমরা অবশ্যই সেই অল্প কিছু গ্রহের একটি, কারন আমরা এখানে থেকেই এই বিষয়টা নিয়ে ভাবছি।

অবাক একটি সত্য বিষয় হলো, ঘটনাক্রমে, ধর্মবাদীরা অ্যানথ্রোপিক মুলনীতি খুব ভালোবাসে। খুব অদ্ভুত কিছু বিচিত্র এবং অবোধ্য কারনে তারা মনে করেন এটি তাদের প্রস্তাবকে সমর্থন করছে। কিন্তু ঠিক এর বীপরিতটাই সত্যি। অ্যানথ্রোপিক মুলনীতি, প্রাকৃতিক নির্বাচন এর মতই ডিজাইন হাইপোথিসিস এর একটি বিকল্প; এটি আমাদের একটি যৌক্তিক, ডিজাইনের ধারনা মুক্ত কোন ব্যাখ্যা দেয়, কেন এমন একটি পরিস্থিতিতে আমরা অবস্থান করছি, যা আমাদের অস্তিত্বের জন্য অনুকুল। আমি মনে করি ধর্মীয় মানসিকতায় সংশয়টি ওঠার কারন, অ্যানথ্রোপিক মুলনীতি শুধু উল্লেখ করা হয় এমন সমস্যাগুলোর ক্ষেত্রে এবং প্রাসঙ্গিকতায় যা এটি সমাধান করতে পারে। যেমন আমরা যে জীবনবান্ধব একটি জগতে বাস করছি সেই সত্যটায়। ধার্মিক মন যেটা বুঝতে ব্যর্থ হয় তা হলো, সমস্যাটির দুটি সম্ভাব্য সমাধান প্রস্তাব করা হয়েছে, ঈশ্বর হচ্ছে একটি, অ্যানথ্রপিক মুলনীতি হচ্ছে অপরটি। তারা একে অপরের বিকল্প।

আমরা জীবন বলতে যা বুঝি, তার জন্য তরল পানি অবশ্য প্রয়োজনীয়, তবে সেটি এককভাবে পুর্বশর্ত হিসাবে যথেষ্ট না। তারপরও জীবনের উৎপত্তি হতে হবে পানিতে, আর জীবনের উৎপত্তি হওয়াটা ছিল অতি অসম্ভাব্য একটি ঘটনা। এবং জীবনের একবার উৎপত্তি হবার পর ডারউইনীয় বিবর্তন তার খুশী মত কাজ করে গেছে জীবনের উপর; কিন্তু কিভাবে জীবনের সুচনা হয়েছিল ? জীবনের উৎপত্তি ছিল একটি রাসায়নিক ঘটনা, বা ধারাবাহিক কতগুলো রাসায়নিক ঘটনা, যেখানে প্রাকৃতিক নির্বাচনের মুল উপাদানগুলোর প্রথম আবির্ভাব হয়েছিল। প্রধান উপাদানটি হচ্ছে বংশগতি বা হেরেডিটি, যা হয় DNA বা (খুব সম্ভবত) এমন কিছু যা DNA এর মত বা তার চেয়ে কম নির্ভুলভাবে নিজেদের প্রতিলিপি বা কপি তৈরী করতে পারে, হয়ত এর সাথে সম্পর্কিত অনু RNA হতে পারে। একবার যখন এই এই প্রধান উপাদানটি – কোন এক ধরনের জেনেটিক অনু – সৃষ্টি হয়েছে, সত্যিকারের ডারউইনীয় নির্বাচন এর উপর তার কাজ শুরু করে এবং এক সময় জটিল জীবনের উদ্ভব ঘটে এই প্রক্রিয়ার ফলাফল হিসাবে। কিন্তু স্বতঃস্ফুর্তভাবে হঠাৎ করে বা বাই চান্স, প্রথম বংশগতি তথ্য বাহক কোন একটি অনুর সৃষ্টি অনেকের কাছে মনে হতে পারে অসম্ভব একটি ঘটনা। হয়ত তাই, হয়ত এটা খুবই বেশী মাত্রায় অসম্ভাব্য এবং আমি এই বিষয়ে আরো খানিকটা আলোচনা করবো, কারন বইটির এই অংশে এটাই মুল বিষয়।

যদিও এখনও ধারনা নির্ভর, তা সত্ত্বেও জীবন এর উৎপত্তি একটি ক্রমশ সমৃদ্ধ হয়ে ওঠা গবেষনার একটি ক্ষেত্র। এবং এ ক্ষেত্রে গবেষনার জন্য যে দক্ষতাটি লাগবে, সেটি হল রসায়ন এবং যা আমার ক্ষেত্র নয়। আমি সাইডলাইনে বসেই অতি আগ্রহ নিয়ে তাদের অগ্রগতি দেখছি। এবং আমি অবাক হবো যদি আগামী কয়েক বছরের মধ্যে বিজ্ঞানীরা ঘোষনা দেন তারা ল্যাবরেটরীতে নতুন জীবনের উৎপত্তির ঘটনা ঘটাতে সক্ষম হন। যাইহোক সেটা এখনও ঘটেনি। এবং এখনও এটা ধারনা করা যায়, এটি ঘটার সম্ভাবনা এখন এবং সবসময়ই ছিল খুব বেশী ক্ষীন– যদিও এটি একবার ঘটেছিল।

গোল্ডিলক কক্ষপথ নিয়ে আমরা যেমন ব্যাখা দিয়েছিলাম, আমরা প্রস্তাব করতে পারি যে, জীবনের উৎপত্তি, যতই অসম্ভব একটি ঘটনা হোক না কেন, আমরা জানি এটি পৃথিবীতে ঘটেছিল, কারন আমাদের অস্তিত্ব এখানে। এবং আবারো কি হয়েছে তা ব্যাখ্যা করার জন্য এখানে দুটি হাইপোথিসিস আছে: ডিজাইন হাইপোথেসিস এবং বৈজ্ঞানিক বা অ্যানথ্রোপিক হাইপোথিসিস। ডিজাইন দৃষ্টিভঙ্গী প্রস্তাব করছে, একজন ঈশ্বর যিনি এই বিস্তারিত অলৌকিকতাকে নিজে হাতে গড়েছেন, প্রিবায়োটিক বা প্রাক জীবনের স্যুপ বা জৈব মিশ্রনে তার স্বর্গীয় আগুন দিয়ে স্পর্শ করেই ডিএনএবা অন্য সমতুল্য কিছু সৃষ্টির মধ্য দিয়ে, পৃথিবীতে জীবনের অতি অসাধারন যাত্রার সুচনা হয়েছিল।

আবার, গোল্ডিলকস এর মতই, ডিজাইন হাইপোথিসিসের বিকল্প অ্যানথ্রোপিক প্রস্তাবটিও পরিসংখ্যানগত। বিজ্ঞানীরা অনেক বড় সংখ্যার ম্যাজিকের অবতারনা করেন সেই সম্ভাবনা ব্যাখ্যা করতে; অনুমান করা হয় যে, আমাদের ছায়াপথে প্রায় ১ বিলিয়ন থেকে ৩০ বিলিয়ন গ্রহ আছে এবং মহাবিশ্বে প্রায় ১০০ বিলিয়ন গ্যালাক্সী আছে; যদি কিছু শুন্যও বাদ দেয়া যায় পরিমাপের সাধারণ রক্ষনশীলতায়, তারপরও এক বিলিয়ন বিলিয়ন গ্রহর অস্তিত্ব আছে এই মহাবিশ্বে। এখন ধরুন, জীবনের উৎপত্তি, ডিএনএ সমতুল্য কোন কিছুর স্বত:স্ফুর্তভাবে উৎপত্তি সত্যি অকল্পনীয় একটি অসম্ভাব্য ঘটনা, ধরা যাক ঘটনাটির অসম্ভাব্যতা এত বেশী যে, এটি প্রতি ১ বিলিয়ন গ্রহের কেবল একটিতে ঘটে; যে কোন অনুদান দাতা সংস্থা হাসবে, যদি কোন গবেষনার অনুদানপ্রার্থী কোন রসায়নবিদ স্বীকার করেন যে, তার প্রস্তাবিত গবেষনার সফলতার সম্ভাবনা ১০০ তে একবার। আর আমরা এখানে কথা বলছি এক বিলিয়নে একবার ঘটা কোন কিছুর সম্ভাবনা নিয়ে। এবং তারপরও এই অসম্ভব রকমের বিশাল সংখ্যায়, জীবনের উৎপত্তি হতে পারে ১ বিলিয়ন গ্রহে; এবং পৃথিবী, অবশ্যই যাদের মধ্যে একটি [২২]।

এই উপসংহারটি এত বিস্ময়কর, আমি আবার বলছি, যদি কোন গ্রহে স্বতোপ্রণোদিত হয়ে জীবনের উৎপত্তির সম্ভাবনা ১ বিলিয়নে ১ বার হয়, তারপরও সেই অদ্ভুত রকমের অবিশ্বাস্য ঘটনাটি ঘটবে মহাবিশ্বের ১ বিলিয়ন গ্রহে। তবে সেই ১ বিলিয়ন জীবন বহনকারী গ্রহ খুজে পাওয়ার সম্ভাবনা খড়ের গাদায় সুঁচ খোজার সেই প্রবাদবাক্য মনে করিয়ে দেয়। কিন্তু আমাদের বেশী কষ্ট করার কোন প্রয়োজন নেই সেই সুচ খোজার জন্য কারন (আবার অ্যানথ্রোপিক প্রিন্সিপালে ফেরত যাই); কারন এমন কোন জীব, যে কিনা এই খোজার যোগ্য, নি:সন্দেহে তারা অবশ্যই সেকরমই একটি অতিমাত্রায় দুর্লভ সুচেঁর উপরই বসে আছে এমনকি তাদের অনুসন্ধান শুরু হবার আগেই।

যে কোন সম্ভাবনার প্রস্তাবনা করা হয় একটি নির্দিষ্ট পর্যায়ের অজ্ঞতার প্রেক্ষাপটে। আমরা যদি কোন একটি গ্রহ সম্বন্ধে কিছুই না জানি, তারপরও আমরা কিন্তু সেখানে জীবনের উৎপত্তি হবার সম্ভাবনা সম্বন্ধে ধারনা করতে পারি, যেমন, এক বিলিয়নের মধ্যে একবার । কিন্তু যদি আমাদের পরিমাপে কিছু নতুন ধারনা বা তথ্য যোগ করতে পারি, িএই সম্ভাবনারও পরিবর্তন হয়। কোন একটি নির্দিষ্ট গ্রহর হয়ত কিছু নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট থাকতে পারে, যেমন কোন বিশেষ কতগুলো মৌলর উপস্থিতি আছে এর পাথরে, যা জীবনের উৎপত্তির সম্ভাবনার পাল্লা ভারী করতে পারে। কিছু গ্রহ, অন্যভাষায় বলা যায়, অন্য গ্রহদের তুলনায় বেশী ‘পৃথিবী সদৃশ’, পৃথিবী নিজে অবশ্যই বিশেষভাবে পৃথিবী সদৃশ। এই বিষয়টি আমাদের রসায়নবিদদের উৎসাহ দেয়া উচিৎ ল্যাবে কৃত্রিমভাবে সেই পরিবেশ সৃষ্টি করার জন্য, এটি তাদের সফল হবার সম্ভাবনা বাড়িয়ে দেবে। কিন্তু আমার আগের হিসাব দেখিয়েছে যে এমনকি একটি রাসায়নিক মডেল যার সফল হবার সম্ভাবনা এক বিলিয়নে একবার, সেটিও ভবিষ্যদ্বানী করছে মহাবিশ্বে অন্ততপক্ষে এক বিলিয়ন গ্রহে জীবনের উৎপত্তি হবে ; অ্যানথ্রোপিক মুলনীতির সৌন্দর্যটা হচ্ছে এটি আমাদের বলছে, সব অন্তর্জ্ঞানের বীপরিত, যে একটি রাসায়নিক মডেলের শুধু ভবিষ্যদ্বানী করতে হবে ,যে জীবনের উৎপত্তি হতে পারে এক বিলিয়ন বিলিয়ন গ্রহের কেবল একটিতে, যা আমাদের উত্তম এবং সম্পুর্ণভাবে সন্তোষজনক ব্যাখা দেবে এখানে জীবন উপস্থিতির। আমি এক মুহুর্তের জন্য বিশ্বাস করিনা, কোথাও জীবনের উৎপত্তি বাস্তবিকভাবে এতটাই অসম্ভাব্য। এবং আমি মনে করি, অবশ্যই ল্যাবরেটরিতে সেই ঘটনার পুনরাবৃত্তি করার জন্য অর্থ ব্যায় করা যুক্তিসঙ্গত এবং একই কারনে SETI প্রজেক্টও পৃষ্ঠপোষকতা পাওয়ার উপযোগী। কারন আমি মনে করি মহাবিশ্বে বুদ্ধিমান জীবনের সম্ভাবনা আছে। এমনকি যদি স্বত:স্ফুর্তভাবে জীবনের উৎপত্তি হবার সবচেয়ে

নৈরাশ্যবাদী সম্ভাবনার পরিসংখ্যানগত পরিমাপকে আমরা গ্রাহ্য করি, সেই পরিসংখ্যানগত যুক্তি, শুন্যস্থান পুর্ণ করার জন্য কোন ধরনের পরিকল্পনাকারী বা ডিজাইনারের প্রস্তাবকে পুরোপুরি ধ্বংস করে। নিত্যদিনের সম্ভাবনার হার বা ঝুকি পরিমাপে অভ্যস্ত মস্তিষ্কের জন্য বিবর্তনের কাহিনীতে সব আপাত: শুন্যস্থানের মধ্যে জীবনের উৎপত্তি মনে হতে পারে অসমাধানযোগ্য একটি অসম্ভাব্যতা: যে স্কেলে কোন গবেষনা অনুদানকারী কর্তৃপক্ষ রসায়নবিদদের প্রস্তাবিত গবেষনা প্রস্তাবগুলো যাচাই করে। তারপরও এমনকি এমন বড় কোন শুন্যস্থান অনায়াসে পুর্ণ করে পরিসংখ্যানের জ্ঞানপুষ্ট বিজ্ঞান, অন্যদিকে সেই একই পরিসংখ্যানগত বিজ্ঞান কোন স্বর্গীয় সৃষ্টিকর্তার সম্ভাবনা বাতিল করে দেয় পুর্বে উল্লেখিত সেই আল্টিমেট বোয়িং ৭৪৭ এর প্রেক্ষিতে।

কিন্তু আপাতত, এই সেকশনের শুরুর সেই কৌতুহলদ্দীপক বিষয়টিতে ফিরে আসা যাক। ধরা যাক কেউ জৈববৈজ্ঞানিক অভিযোজনের প্রাকৃতিক প্রক্রিয়াটিকে ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করছেন ঠিক যেভাবে আমরা জীবনের উৎপত্তির ব্যাখ্যা করেছিলাম সেভাবে: বিশাল সংখ্যক গ্রহর বিষয়টি প্রতি দৃষ্টি আকর্ষন করে। একটি পর্যবেক্ষিত সত্য হচ্ছে যে প্রতিটি প্রজাতি এবং এই সব প্রজাতির মধ্যে প্রতিটি অঙ্গ, যাদের নিয়ে গবেষনা করা হয়েছে, দেখা গেছে তাদের যার যা কাজ সেই কাজে তারা খুবই দক্ষ। পাখির, মৌমাছি এবং বাদুড় এর পাখা ওড়ার জন্য চমৎকার। দেখার জন্য চোখ হচ্ছে পারদর্শী, উদ্ভিদের পাতারা দক্ষ সালোক সংশ্লেষনে। আমরা এমন একটা গ্রহে বাস করি, যেখানে আমাদের চারপাশে প্রায় ১০ মিলিয়ন প্রজাতি, প্রত্যেকেই স্বতন্ত্রভাবে আপাতদৃষ্টিতে বিশেষভাবে পরিকল্পনা করা হয়েছে বলে একটি শক্তিশালী বিভ্রম সৃষ্টি করে। প্রতিটি প্রজাতি তাদের নিজস্ব বৈশিষ্টময় জীবন যাপনের জন্য বিশেষভাবে দক্ষ। আমরা কি ‘বহু সংখ্যক গ্রহ আছে’ বলে যুক্তি দিয়ে এই সব আলাদা আলাদা ডিজাইনের বিভ্রমের ব্যাখ্যা এড়াতে পারবো । না , আমরা পারবো না, আবারও বলছি, পারবো না; এটাই খুব গুরুত্বপুর্ণ বিষয় যা ডারউইনবাদ সম্বন্ধে সবচেয়ে গুরুতর ভ্রান্ত ধারনার কেন্দ্রে অবস্থিত।

আমরা যে কোন সংখ্যক গ্রহ নিয়ে বাজী খেলিনা কেন, কিছুই আসে যায় না, ভাগ্য নির্ভর কোন চান্স কখনোই যথেষ্ট হবেনা পৃথিবীর জীবনের সমৃদ্ধ বৈচিত্রময়তা ব্যাখ্যা করার জন্য, যেমন করে আমরা যুক্তিটিকে ব্যবহার করি এখানে জীবনের অস্তিত্ব প্রথমে কেমন সৃষ্টি হলো তা ব্যাখ্যা করার জন্য। জীবনের বিবর্তন, জীবনের উৎপত্তি থেকে সম্পুর্ণ আলাদা, কারন, পুনরাবৃত্তি করি, জীবনের উৎপত্তি ছিল একটি অনন্য ঘটনা যা শুধু একবার ঘটতে হবে। কিন্তু কোন প্রজাতির তাদের নিজস্ব পৃথক পরিবেশে অভিযোজনীয় দক্ষতা অর্জনের ঘটনা ঘটছে শত লক্ষবার এবং এখনও তা চলছে।

স্পষ্টতই এখানে পৃথিবীতে আমরা জৈব প্রজাতিদের জীবনধারন ও বংশবিস্তারের জন্য উপযোগী হবার করার একটি প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করছি। যে প্রক্রিয়া সমস্ত গ্রহে প্রতিটি মহাদেশে, দ্বীপে এবং সব সময়ে একই ভাবে কাজ করে যাচ্ছে । আমরা নিরাপদে ভবিষ্যদ্বানী করতে পারি যদি আমরা আরো দশ মিলিয়ন বছর অপেক্ষা করি, সম্পুর্ণ নতুন একসেট প্রজাতিকে দেখা যাবে তাদের জীবনধারা সাথে থাপ খাইয়ে নিয়েছে দক্ষতার সাথে বর্তমানের প্রজাতিরা যেমন তা করেছে তাদের জীবনযাত্রার সাথে। এটি নিরন্তর ভাবে বার বার ঘটা, অনুমেয়, বহু ঘটনার সমষ্টি, কোন পরিসংখ্যানের ভাগ্য না, যা পুর্বদৃষ্টি দ্বারা আমরা শনাক্ত করেছি। এবং ডারউইনের কল্যানে আমরা জানি কেমন করে এসব ঘটেছিল: প্রাকৃতিক নির্বাচনের দ্বারা।

জীবিত প্রানীদের বহুমুখী বিচিত্রতার ব্যাখ্যা দিতে অক্ষম অ্যানথ্রোপিক প্রিন্সিপাল। আমাদের আসলেই ডারউইনের সেই শক্তিশালী রুপক ‘ক্রেইন’ এর প্রয়োজন পৃথিবীতে জীবনের বৈচিত্রতা ব্যাখ্যা এবং ডিজাইনের মোহনীয় বিভ্রমকে মোকাবেলা করার জন্য। জীবনের উৎপত্তি, ঠিক এর বীপরিতার্থেই সেই রুপক ক্রেইনের এখতিয়ারের বাইরে, কারন প্রাকৃতিক নির্বাচন জীবন ছাড়া সামনে অগ্রসর হতে পারেনা। এখানে অ্যানথ্রোপিক মুলনীতি এককভাবে স্বতন্ত্র। জীবনের উৎপত্তির অনন্যতা বিষয়টিকে আমরা মোকাবেলা করতে পারি একটি অতি বিশাল সংখ্যক সম্ভাব্য গ্রহে জীবনের উৎপত্তির সুযোগের সম্ভবনা প্রস্তাব করে। যখনই একবার প্রথম জীবনের উৎপত্তি সম্ভাবনাটি সৌভাগ্যের

স্পর্শ পায় – যা অ্যানথ্রোপিক প্রিন্সিপাল নিশ্চিৎভাবে মন্জুর করে নানা নিয়ামকের সমন্বয়ে – প্রাকৃতিক নির্বাচন তখন এর দায়িত্ব নেয়: আর খুবই সুস্পষ্টভাবেই প্রাকৃতিক নির্বাচন কোন ভাগ্যের খেলা না।

যাই হোক, হতে পারে জীবনের উৎপত্তি বিবর্তনের ইতিহাসে শুধু একটি মাত্র প্রধান শুন্যস্থান নয়, যা শুধুমাত্র অত্যন্ত ভাগ্যক্রমে সম্পর্কযুক্ত এবং অ্যানথ্রোপিক দৃষ্টিভঙ্গীতে সিদ্ধ। যেমন আমার সহকর্মী মার্ক রিডলী তার ’মেন্ডলস ডেমন’ (কৃতজ্ঞতার সাথে স্বীকার করছি, আমেরিকার প্রকাশকরা একে ’দি কোঅপারেটিভ জিন’ নামে খানিকটা সংশয়পুর্ণ পুণ: নামকরণ করেছিলেন) এ প্রস্তাব করেছিলেন, প্রকৃত কোষের উৎপত্তি (আমাদের মত কোষ, যেখানে নিউক্লিয়াস আছে, এবং আরো কিছু জটিল অঙ্গানু আছে, যেমন মাইটোকন্ড্রিয়া, যা ব্যাকটেরিয়ার নেই) যা আরো বেশী গুরুত্বপুর্ণ ঘটনা, কঠিন এবং জীবনের উৎপত্তি থেকেও অনেক বেশী পরিসংখ্যানগত ভাবে অসম্ভাব্য। এরকম একটি স্বতন্ত্র ঘটনা হয়তো ব্যাখ্যা করা সম্ভব হবে অ্যানথ্রোপিক মুলনীতি দিয়ে, খানিকটা নিম্নলিখিত উপায়ে: মহাবিশ্বে হয়তো বিলিয়ন সংখ্যক গ্রহ আছে, যেখানে জীবনের উদ্ভব হয়েছে, ব্যাকটেরিয়া পর্যায়ে, কিন্তু সেই নানা গঠনের জীবনের খুব সামান্য একটি অংশ গুরুত্বপুর্ণ সেই শুন্যস্থানটা অতিক্রম করতে পেরেছে এবং তৈরী করতে পেরেছে প্রকৃত কোষের মত কিছু । এবং এদের মধ্যে আরো ক্ষুদ্র একটি অংশ সেই পরবর্তী ক্রান্তিসীমার রুবিকোন টি পার হতে পেরেছে কনশাসনেস বা চেতনা বা সজ্ঞানতার উদ্ভবের মাধ্যমে [২৩]; যদি এই দুটো ঘটনাই শুধু একবার ঘটতে পারে এমন কোন ঘটনা হয়, আমরা তাহলে সর্বব্যাপী বা সর্বত্র দৃষ্ট কোন ’প্রক্রিয়া’ নিয়ে কথা বলছি না, যেমন সাধারন, আটপৌরে জীববিজ্ঞানের অভিযোজনের ক্ষেত্রে করে থাকি। অ্যানথ্রোপিক মুলনীতি বলছে, যেহেতু আমরা জীবিত, প্রকৃতকোষী এবং সজ্ঞানতা সম্পন্ন, আমাদের গ্রহটিকে অবশ্যই সেই অস্বাভাবিক রকম দুর্লভ গ্রহ হতে হবে, যেখানে এই তিনটি ধাপের মধ্যেই সেতু বন্ধন রচিত হয়েছে।

প্রাকৃতিক নির্বাচন কাজ করে কারন সামগ্রিক ক্রমান্বয়ে উন্নয়নের পথে এটি একমুখী একটি রাস্তা । প্রথমে শুরু করতে খানিকটা ভাগ্যের (জীবনের উৎপত্তি) প্রয়োজন হয়ত আছে এবং বহু ’বিলিয়ন গ্রহে’র অ্যানথ্রোপিক মুলনীতি সেই ভাগ্যটা দিয়েছে। হয়তো পরবর্তীতে বিবর্তনের ইতিহাসে আরো কিছু শুন্যস্থানেরও প্রয়োজন আছে বড় ধরণের ভাগ্যের সংযোগের, তবে তা অ্যানথ্রোপিক মুলনীতির সাথে সামন্জষ্যপুর্ণ। কিন্তু আমরা আর যাই বলিনা কেন, জীবনের ব্যাখ্যায় ’ডিজাইন’ নি:সন্দেহে অর্থহীণ, কারন ডিজাইন শেষ অবধি ক্রমান্বয়ে ক্রমবর্ধমান উন্নতি নয়, সেকারনে এটি যে প্রশ্নগুলোর উত্তর দেয়, তার চেয়ে আরো বড় প্রশ্নের জন্ম দেয় – ডিজাইন আমাদের সরাসরি নিয়ে যায় সেই আল্টিমেট বোয়িং ৭৪৭ এর অসীম ক্রমান্বয়ে পুর্ববর্তী প্রশ্নে ফিরে যাবার বা রিগ্রেস প্রক্রিয়ায়।

আমরা এমন একটি গ্রহে বাস করি যা আমাদের মত জীবনের জন্য সহায়ক, এবং আমরা দেখেছি দুটো কারন, কেন এমনটি হচ্ছে। একটি হচ্ছে , এই পৃথিবীর পরিবেশের দেয়া শর্তানুযায়ীই জীবন বিকশিত হবার মত করেই বিবর্তিত হয়েছে। এর কারন প্রাকৃতিক নির্বাচন। অন্য কারনটি অ্যানথ্রোপিক; মহাবিশ্বে বহু বিলিয়ন গ্রহ আছে, এবং বিবর্তন বান্ধব গ্রহ যতই সংখ্যালঘু হোক না কেন, আমাদের গ্রহটিকে অবশ্যই তাদের একটি হতে হবে। এবার সময় এসেছে অ্যানথ্রোপিক মুলনীতিকে আরো আগের পর্যায়ে নিয়ে যাবার জন্য, জীববিজ্ঞান থেকে পুনরায় কসমোলজীতে।

(চলবে)

পাদটীকা

---

[১৮] Anthropic Principle: In astrophysics and cosmology, the anthropic principle is the philosophical consideration that observations of the physical Universe must be compatible with the conscious life that observes it. Some proponents of the anthropic principle reason that it explains why the Universe has the age and the fundamental physical constants necessary to accommodate conscious life. As a result, they believe that the fact is unremarkable that the universe’s fundamental constants happen to fall within the narrow range thought to be compatible with life (Wikipedia)

[১৯] Carter admitted later that a better name for the overall principle would be ‘cognizability principle’ rather than the already entrenched term ‘anthropic principle’: B. Carter, ‘The anthropic principle and its implications for biological evolution’, Philosophical Transactions of the Royal Society of London A, 310, 1983, 347-63. For a book-length discussion of the anthropic principle, see Barrow and Tipler (1988) : Barrow, J. D. and Tipler, F. J. (1988). The Anthropic Cosmological Principle. New York: Oxford University Press

[২০] Goldilocks zone: The location of planets and natural satellites (moons) within its parent star’s habitable zone (and a near circular orbit) is but one of many criteria for planetary habitability and it is theoretically possible for habitable planets to exist outside the habitable zone. The term “Goldilocks planet” is used for any planet that is located within the circumstellar habitable zone (CHZ)[although when used in the context of planetary habitability the term implies terrestrial planets with conditions roughly comparable to those of Earth (i.e. an Earth analog). The name originates from the story of Goldilocks and the Three Bears, in which a little girl chooses from sets of three items, ignoring the ones that are too extreme (large or small, hot or cold, etc.), and settling on the one in the middle, which is "just right". Likewise, a planet following this Goldilocks Principle is one neither too close nor too far from a star to rule out liquid water on its surface. While only about a dozen planets have been confirmed in the habitable zone, the Kepler spacecraft has identified a further 54 candidates and current estimates indicate "at least 500 million" such planets in the Milky Way (Wikipedia).

[২১] Comins, N. F. (1993). What if the Moon Didn’t Exist? New York: HarperCollins.

[২২] এ বিষয়ে বিস্তারিত যুক্তি আছে রিচার্ড ডকিন্সের The Blind Watchmaker (1986) এ।

[২৩] রুবিকোন অতিক্রম : The Rubicon (Latin: Rubicō, Italian: Rubicone) is a shallow river in northeastern Italy, about 80 kilometres long, running from the Apennine Mountains to the Adriatic Sea through the southern Emilia-Romagna region, between the towns of Rimini and Cesena.The idiom “Crossing the Rubicon” means to pass a point of no return, and refers to Julius Caesar’s army’s crossing of the river in 49 BC, which was considered an act of insurrection (Wikipedia)

রিচার্ড ডকিন্স এর দি গড ডিল্যুশন: চতুর্থ অধ্যায় (চতুর্থ পর্ব)

By K M Hassan

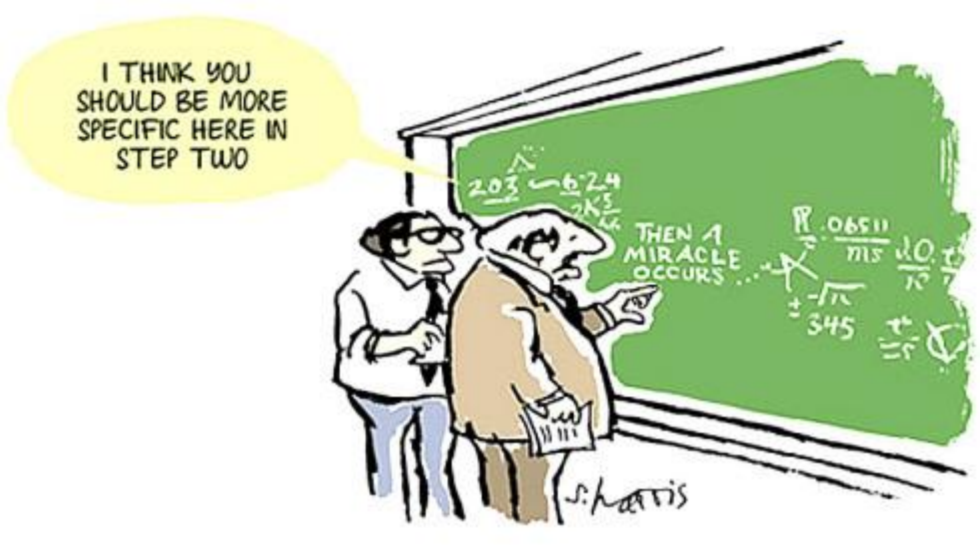
I THINK YOU SHOULD BE MORE SPECIFIC HERE IN STEP TWO
THEN A MIRACLE OCCURS...
345
S.harris

ছবি: সিডনী হ্যারিসের একটি বিখ্যাত কার্টুন (সুত্র ইন্টারনেট)

রিচার্ড ডকিন্স এর দি গড ডিল্যুশন এর বাংলা অনুবাদ :
প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ অধ্যায় (প্রথম পর্ব), চতুর্থ অধ্যায় (দ্বিতীয় পর্ব), চতুর্থ অধ্যায় (তৃতীয় পর্ব)

রিচার্ড ডকিন্স এর দি গড ডিল্যুশন : চতুর্থ অধ্যায় (চতুর্থ পর্ব)
(অনুবাদ প্রচেষ্টা: কাজী মাহবুব হাসান)
The God Delusion by Richard Dawkins

কেন প্রায় নিশ্চিৎভাবে বলা সম্ভব ঈশ্বরের কোন অস্তিত্ব নেই

চতুর্থ অধ্যায় (তৃতীয় পর্ব) এর পরে:

অ্যানথ্রোপিক মুলনীতি: কসমোলজীক্যাল সংস্করন।

শুধুমাত্র একটি মিত্র গ্রহেই আমরা বাস করিনা, একটি মিত্র মহাবিশ্বেও আমাদের বাস। এর কারন, আমাদের অস্তিত্বর সেই সত্যটি, পদার্থবিদ্যার মহাজাগতিক আইনগুলো অবশ্যই যথেষ্ট জীবন বান্ধব হতে হবে জীবনের উৎপত্তির জন্য। সুতরাং বিষয়টা কোন দুর্ঘটনা নয় যে, আমরা যখন রাতের আকাশে তারাদের দেখি, সিংহভাগ রাসায়নিক মৌলর অস্তিত্বের জন্য এই নক্ষত্র অবশ্য প্রয়োজনীয়, আর এই সব মৌল এবং রাসায়নিক উপাদান ছাড়া জীবনের কোন অস্তিত্বই থাকার কথা না। পদার্থবিজ্ঞানীরা পরিমাপ করে দেখেছেন, যদি পদার্থবিদ্যার আইন এবং ধ্রুবগুলো যদি সামান্যতম ভিন্ন হত তাহলে এমন মহাবিশ্ব সৃষ্টি হতো,যেখানে জীবনের উৎপত্তির ঘটনাটি হত অসম্ভব। বিভিন্ন পদার্থবিদরা এটিকে বিভিন্নভাবে উপস্থাপন করেছেন, কিন্তু উপসংহার সবসময়ই এক (পদার্থবিদ ভিক্টর স্টেঙ্গার (যেমন, তার God, The Failed Hypothesis) সাধারন ঐক্যমতের এ বিষয়ে দ্বিমত পোষন করেছেন। এবং ভৌতিক সব আইন এবং ধ্রুব যে বিশেষভোবে জীবন সহায়ক এই বিষয়টি তিনি মানতে নারাজ। যাইহোক আমি একটু অতিমাত্রায় নমনীয় হয়ে বিষয়টি মেনে নেবো, শুধু যুক্তি দেখানোর জন্য যে, যাই হোক না কেন, এই ধারনাটি কোনভাবেই ঈশ্বরবাদীরা ব্যবহার করতে পারেননা যুক্তিসঙ্গত ভাবে ঈশ্বরের অস্তিত্বের স্বপক্ষে তাদের প্রস্তাবনায়); মার্টিন রীস (Martin Rees) তার বই, জাষ্ট সিক্স নাম্বার (Just Six Numbers) এ ছয়টি মৌলিক ধ্রুবর একটি তালিকা করেছিলেন, যা বিশ্বাস করা হয়, সমগ্র মহাবিশ্বে সঠিক। এই ছয়টি সংখ্যার প্রতিটি এমনই সুক্ষভাবে

সাজানো যে, যে তারা যদি সামান্য ভিন্ন হয়, মহাবিশ্বও সুস্পষ্টভাবে ভিন্ন হত এবং তা জীবন বৈরী হত। (আমি বলবো 'সম্ভবত' আংশিকভাবে যার কারন, আমাদের জানা নেই ভিনগ্রহী জীবনের আকার আকৃতি কতটা ভিন্ন আমাদের থেকে, এবং আংশিকভাবে এর অপর কারনটি হল, শুধু মাত্র একটি ধ্রুব এককভাবে পরিবর্তন করলে আমাদের ভুল হবার সম্ভাবনা থাকে বেশী। আসলে কি কয়েকটি ধ্রুবর একটি সমন্বয় থাকতে পারে না, যা হতে পারে জীবন বান্ধব? আমরা যে সমন্বয়টি এখনও আবিষ্কার করতে পারিনি, কারন আমরা ব্যস্ত এককভাবে ধ্রুবগুলোর মাত্রা নিয়ে। যাইহোক আমি আমার আলোচনা করে যাবো, এমনভাবে যেন, আসলেই আপাতদৃষ্টিতে মৌলিক ধ্রুবগুলোর পরিমাপের সুক্ষ্ণ নিয়ন্ত্রন বা ফাইন টিউনিং এর বিষয়টি ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে আসলেই আমাদের বড় একটি সমস্যা আছে)।

রীস এর ছয়টি সংখ্যার একটি উদহারন হচ্ছে, তথাকথিত শক্তিশালী বা স্ট্রং (strong) ফোর্সের মাত্রা, যে শক্তিটি কোন একটি পারমানুর নিউক্লিয়াসের উপাদানগুলোকে একসাথে ধরে রাখে: যে পারমানবিক শক্তিকে অতিক্রম করতে হয় আগে কোন অনুকে বিভাজিত করার আগে। এটি মাপা হয় E দিয়ে, হাইড্রোজেন এর একটি পরমানুর ভরের যে অংশ শক্তিতে রুপান্তরিত হয় যখন হাইড্রোজেন সন্নিবেশিত বা যুক্ত হয়ে হিলিয়াম অনু তৈরী করে। আমাদের মহাবিশ্বে এই সংখ্যার মান, ০.০০৭ এবং মনে করা হচ্ছে যে, কোন রসায়নের (যা জীবনের উৎপত্তির জন্য অবশ্য শর্ত) অস্তিত্বের জন্য, এই E এর মান এই মাত্রার খুব কাছাকাছি হতে হবে। আমরা যে রসায়নের সাথে পরিচিত, তা মুলত, সন্নিবেশিত এবং পুণসন্নিবেশিত হওয়া মোট ৯০ টি বা সেরকম সংখ্যক প্রকৃতিতে উপস্থিত পর্যায় সারণীর মৌলগুলো দিয়েই তৈরী। হাইড্রোজেন হচ্ছে সবচেয়ে সাধারন এবং সবচেয়ে বেশী মাত্রায় বিদ্যমান মৌল। মহাবিশ্বের সব অন্য মৌলই হাইড্রোজেন থেকেই তৈরী হয় নিউক্লিয়ার ফিউশনের (Neuclear Fusion) মাধ্যমে। নিউক্লিয়ার ফিউশন কিন্তু খুবই কঠিন একটি প্রক্রিয়া, যা নক্ষত্রের অভ্যন্তরে খুবই উচু তাপামাত্রার পরিবেশে ঘটে (এবং হাইড্রোজেন বোমায়); অপেক্ষাকৃত ছোট নক্ষত্রগুলো, যেমন আমাদের সুর্য এই প্রক্রিয়া শুধু মাত্র হালকা মৌল তৈরী করতে পারে, যেমন হিলিয়াম, হাইড্রোজেন এর পরেই পর্যায় সারনীয় দ্বিতীয় লঘুতম মৌল । আরো বড় আরো উত্তপ্ত নক্ষত্রর দরকার সেই তাপমাত্রার সৃষ্টি করার জন্য, যা বাকী প্রায় সব ভারী মৌল সৃষ্টি করতে পারে নিউক্লিয়ার ফিউশনের ধারাবাহিক বিক্রিয়া প্রক্রিয়ায়, যার বিস্তারিত প্রক্রিয়াটি উৎঘাটন করেছিলেন ফ্রেড হয়েল এবং তার দুই সহকর্মী (এই আবিষ্কারের স্বীকৃতি সরুপ,রহস্যজনকভাবে অন্য দুইজনের পাওয়া নোবেল পুরষ্কারের ভাগ হয়েলকে দেয়া হয়নি) ; এই বড় নক্ষত্র গুলো সুপারনোভা হয়ে বিস্ফোরিত হতে পারে এবং এভাবে মহাশুন্যে ছড়িয়ে দেয় তাদের তৈরী উপাদানগুলো, পর্যায় সারণীর মৌলগুলো সহ, ধুলার মেঘ হিসাবে। এই ধুলোর মেঘগুলো ঘনীভুত হয়ে তৈরী করে নতুন নক্ষত্র, আমাদের পৃথিবীর মত গ্রহ। একারনে পৃথিবী সর্ব ব্যাপী হাইড্রোজেন এর চেয়েও আরো বেশী অন্য অনেক ধরনের মৌলে সমৃদ্ধ; যে মৌলগুলো ছাড়া রসায়ন, এবং জীবন হতো অসম্ভব।

এখানে প্রাসঙ্গিক বিষয়টি হচ্ছে, স্ট্রং ফোর্সের মান হচ্ছে খুবই গুরুত্বপুর্ণ নিউক্লিয়ার ফিউশন এর ধারাবাহিক বিক্রিয়া পর্যায় সারণীর কোন মৌল অবধি তৈরী হবে তা নির্ণয় করার জন্য । যদি এর পরিমান হয় খুব সামান্য, ধরুন ০.০০৬, ০.০০৭ এর বদলে, মহাবিশ্বে হাইড্রোজেন ছাড়া আর কিছুই থাকতো না, কোন ধরনের উপযোগী রসায়ন এর অস্তিত্বই থাকতো না। এবং এটি যদি খানিকটা বেশী হত, ধরুন ০.০০৮, তাহলে সব হাইড্রোজেন একসাথে ফিউজ হয়ে ভারী মৌলগুলো তৈরী করতো। হাইড্রোজেন ছাড়া কোন রসায়নই আমরা যে জীবনকে চিনি, তা সৃষ্টি করতে পারতো না। একটা কারন তো অবশ্যই কোন পানির অস্তিত্ব থাকতো না। গোল্ডিলকস পরিমাপ হলো ০.০০৭, যা এই মাত্রায় একদম সঠিক, প্রয়োজনীয় মৌল সরবরাহ করার জন্য, একটি চমৎকার এবং জীবন সহায়ক রসায়নের ভিত্তি গড়ে দিতে যার প্রয়োজন।

রীস এর ৬ টি সংখ্যার বাকীগুলো নিয়ে আমি আলোচনা করবোনা। তবে প্রত্যেকটি সম্বন্ধে মুল উপসংহার একই। প্রতিটি সংখ্যার পরিমাপ ঠিক সেই গোল্ডিলকস অনুকুল সীমায় অবস্থান করছে, যার বাইরে জীবনের উৎপত্তি

অসম্ভব একটি ব্যাপার। এ বিষয়ে আমাদের প্রতিক্রিয়া কেমন হওয়া উচিৎ? আবারো, ঈশ্বরবাদীদের উত্তর আছে একদিকে, আর অন্যদিকে আছে অ্যানথ্রোপিক উত্তর। ঈশ্বরবাদীরা বলবেন, ঈশ্বর যখন এই মহাবিশ্ব সৃষ্টি করেছেন, এর মুল ধ্রুবগুলো তিনি নিজহাতে এমনভাবে সুক্ষতা দিয়েছেন, যে প্রত্যেকটি জীবনের উৎপত্তির গোল্ডিলক সীমানায় অবস্থান করে। যেমন, ঈশ্বরের কাছে ৬ টি নব বা সুইচ বা বোতাম ছিল, এবং তিনি সাবধানে সেটা নাড়াচাড়া করে এর গোল্ডিলকস সীমানার মানটি ঠিক করেছেন। সবসময়ে মতই, ঈশ্বরবাদীদের এই উত্তর খুব অসম্পুর্ণ এবং ভীষন অপুর্ণতার চিহ্ন বহন করে। কারন এটি ঈশ্বরের অস্তিত্বকে ব্যাখ্যা করার বিষয়টিকে এড়িয়ে গেছে। একজন ঈশ্বর যিনি ৬ টি সংখ্যার জন্য সঠিক গোল্ডিলকস পরিমান পরিমাপ করতে পারেন , তাকেও অন্ততপক্ষে অবশ্যই সুক্ষভাবে নিয়ন্ত্রন করা সংখ্যাগুলোর মতই অসম্ভাব্য হতে হবে। এবং এই অসম্ভাব্যতাই আসলেই সেই প্রসঙ্গ, যার আলোচনা আমরা করছি। ঈশ্বরবাদীদের উত্তর সম্পুর্ন ব্যর্থ হয়েছে মুল সমস্যাটার সমাধানে উল্লেখযোগ্য কোন অবস্থানে পৌছাতে। আমি কোন বিকল্প দেখছি না এটিকে বাদ দেয়া ছাড়া, এবং একই সাথে বিস্ময়বোধ করছি সেই বিশাল সংখ্যক মানুষদের দেখে, যারা এই সমস্যাটি আদৌ দেখতে পাচ্ছেন না এবং মনে হচ্ছে আন্তরিকভাবেই তারা সন্তুষ্ট, এই স্বগীয় কারো কলকব্জা নাড়িয়ে নিয়ন্ত্রন করার যুক্তিতে।

এ ধরনের বিস্ময়কর অন্ধত্বর মনস্তাত্বিক কারন হয়তো হতে পারে, প্রাকৃতিক নির্বাচন এবং অসম্ভাব্যতাকে এর পোষ মানানোর শক্তি দ্বারা জীববিজ্ঞানীদের মত অনেক মানুষের সচেতনতার স্তরটি আসলে বাড়েনি। জে অ্যান্ডারসন থমসন, বিবর্তন মনস্তাত্বিকতায় তার দৃষ্টিভঙ্গীতে আমাকে দেখিয়েছেন অন্য আরেকটি কারন: সেটা হচ্ছে সকল অজৈব বস্তুকে কোন এজেন্ট বা প্রভাব ফেলতে এবং কাজ করতে সক্ষম এমন কোন সত্ত্বার সাথে একাত্ম করে চিহ্নিত করার আমাদের মনস্তাত্তিক পক্ষপাতিত্ব এবং প্রবণতাটি। থমসন যেমনটি বলেছেন, কোন চোরকে ছায়া ভাবার চেয়ে কোন ছায়াকে চোর ভাবার প্রবণতাই আমাদের বেশী। একটি মিথ্যা পজিটিভ বা যা সত্য বলে ভাবছিলাম তা আসলে মিথ্যা প্রতিপন্ন হওয়াটা হয়তো সময় নষ্ট করে, তবে কোন মিথ্যা নেগেটিভ, বা যা মিথ্যা ভাবছেন তা আসলে সত্যি হলে, এর ফলাফল ভয়ঙ্কর হতে পারে। আমাকে লেখা তার একটি চিঠিতে তিনি প্রস্তাব করেন যে, আমাদের পুর্বপুরুষের অতীতে আমাদের চারপাশে আমাদের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় চ্যালেন্জটা আসলে এসেছে আমাদের স্বগোত্রীয় একে অপরের কাছ থেকে: ‘ মানুষের উদ্দেশ্য নিয়ে সেই ধরে নেয়া বা ডিফল্ট ধারনাটির ফলাফল, প্রায়শই ’ভয়’; আমাদের খুবই কষ্ট হয়, মানুষের দ্বারা সৃষ্টি হয়নি এমন কোন কিছু ভাবতে’; আমরা প্রাকৃতিকভাবে সবকিছু গনহারে ঈশ্বরের উদ্দেশ্য বলে চিহ্নিত করি। এই কোন কিছু কারো দ্বারা সৃষ্ট বা এজেন্ট এর মোহময়তার ধারনায় আবার ফিরে আসবো পরে ৫ অধ্যায়ে।

জীববিজ্ঞানীরা, প্রাকৃতিক নির্বাচনের শক্তি দ্বারা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত তাদের সচেতনতা দিয়েই ব্যাখ্যা দিতে পারে অসম্ভাব্য জিনিসগুলোর উদ্ভবের, তাদের এমন কোন তত্ত্বতে সন্তুষ্ট হবার কথা না যা অসম্ভাব্যতার সমস্যাকে সম্পুর্ণ এড়িয়ে যায়। ঈশ্বরবাদীদের এই অসম্ভাব্যতার ধাধার উত্তর হচ্ছে একটি বিশাল সত্যকে এড়িয়ে যাওয়া। যা সমস্যাটিকে নতুন করে তো ব্যাখ্যা করেই না বরং উদ্ভটভাবে বিষয়টি আরো বিশাল করে তোলে। তাহলে, এবার অ্যানথ্রোপিক বিকল্প ব্যাখ্যাটির দিকে দৃষ্টি ফেরাই। অ্যানথ্রোপিক উত্তর, এর সবচেয়ে সাধারন রুপে হলো, আমরা কেবল মাত্র সে ধরনের মহাবিশ্বে এই প্রশ্নগুলো আলোচনা করতে পারবো, যা কিনা আমাদেরকে তৈরী করতে সক্ষম। সুতরাং আমাদের অস্তিত্ব নির্ধারন করছে যে পদার্থবিদ্যার মৌলিক ধ্রুবগুলোকে থাকতে হবে তাদের সংশ্লিষ্ট গোল্ডিলকস জোনে, বিভিন্ন পদার্থবিদরা ভিন্ন ভিন্ন ধরনের অ্যানথ্রোপিক সমাধানকে সমর্থন করেন আমাদের অস্তিত্বের রহস্য ব্যাখ্যা করতে।

কট্টরপন্হী পদার্থবিদরা বলেন, এই ছয়টি ধ্রুবর সুইচ বা নবগুলো শুরুতেই তাদের নিজেদের ইচ্ছামত পরিবর্তন হবার মত স্বাধীন ছিল না; এবং আমরা যখন শেষ পর্যন্ত আমাদের দীর্ঘদিন আশায় থাকা ‘থিওরী অব এভরিথিং’ এ পৌছাতে পারবো, আমরা দেখবো যে এই ছয়টি প্রধান সংখ্যা একে অপরের উপর নির্ভরশীল বা এমন কিছুর উপর নির্ভরশীল যা এখনও অজানা বা এমনভাবে সম্পর্কযুক্ত যে আজ আমরা তা কল্পনাও করতে পারবো না। এই

ছয়টি সংখ্যা হয়তো দেখা যাবে, বৃত্তের পরিধির সাথে তার ব্যাসের অনুপাতের যে ভিন্নতা থাকতে পারে তার চেয়ে বেশী স্বাধীন না। দেখা যাবে মহাবিশ্ব সৃষ্টি হবার আসলে একটাই উপায় ছিল। সেই ছয়টি নব নাড়া চাড়া করার জন্য ঈশ্বরের প্রয়োজন তো বহুদুরের কথা, কোন নবইতো ছিলনা নাড়াচাড়া করার।

অন্য পদার্থবিদরা (তাদের একজন উদহারন হতে পারেন মার্টিন রীস) মনে করেন, এই ব্যাখ্যাটি সন্তোষজনক না। এবং আমি মনে করি, আমি তাদের সাথে একমত। আসলে এটি যুক্তিযুক্তভাবে ব্যাখ্যাযোগ্য যে মহাবিশ্ব হবার একটি পথই আছে, কিন্তু সেই একটি পথ বা উপায় কেনই বা এমন ভাবে সাজানো আছে যা ধীরে ধীরে আমাদের বিবর্তনের জন্য? কেনই বা এটাকে সেই ধরনের মহাবিশ্ব হতে হবে, যা মনে হয়– তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞানী ফ্রিম্যান ডাইসন এর ভাষায়, মহাবিশ্ব যেন 'অবশ্যই আগে থেকেই জানতো আমরা আসছি?' দার্শনিক জন লেসলী ফায়ারিং স্কোয়াডে মৃত্যুদন্ডপ্রাপ্ত একজন মানুষের রুপক ব্যবহার করে ব্যাখ্যা করেছেন, হতে পারে ফায়ারিং স্কোয়াড টিমের ১০ জনই তাদের বন্দুকের নিশানা ভুল করলো। পুর্বদৃষ্টি দিয়ে দেখলে, এমন অবস্থায় বেচে যাওয়া কেউ তার ভাগ্য নিয়ে আনন্দিত বলতেই পারেন, 'বেশ, নিশ্চয়ই তারা সবাই নিশানা ভুল করেছে নয়তো সে কথা ভাবার জন্য আমি এখানে থাকতাম না।' কিন্তু তারপরও সে কিন্তু ক্ষমাযোগ্য কোন বিস্ময় নিয়ে ভাবতেই পারেন, কেন তারা সবাই নিশানা ভুল করলো, এবং নানা সম্ভাব্য হাইপোথিসিস নিয়ে নাড়াচাড়া করতে পারেন, যেমন তাদের ঘুষ দেয়া হয়েছে অথবা তারা সবাই মাতাল ছিল ইত্যাদি।

এর বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ আরো একটি প্রস্তাব দিয়ে উত্তর দেয়া যেতে পারে, যা মার্টিন রীস নিজেই সমর্থন করেছিলেন, তা হলো অনেক গুলো মহাবিশ্ব আছে, ফেনার বুদ্বুদের মত যারা সহাবস্থান করছে, কোন একটি মাল্টিভার্স বা বহুমহাবিশ্বে (বা মেগাভার্স যেমন লিওনার্ড সাসকিন্ড বলতে পছন্দ করেন); (সাসকিন্ড তার The Cosmic Landscape: String Theory and the Illusion of Intelligent Design এ অ্যানথ্রোপিক প্রিন্সিপালের একটি চমৎকার সমর্থন করেছিলেন মেগাভার্সে। তিনি বলেন, বেশীর ভাগ পদার্থবিদরাই এই ধারনাটি অপছন্দ করেন। যদিও আমি বুঝতে পারিনা কেন. আমি মনে করি এটি দারুন সুন্দর একটি প্রস্তাব – হয়তো এর কারন ডারউইন আমার সচেতনতার স্তরটিকে উন্নীত করেছেন); কোন একটি মহাবিশ্বে আইন এবং ধ্রুবগুলো, যেমন আমাদের দৃশ্যমান মহাবিশ্বে ,আসলে বহুমহাবিশ্ব বা মাল্টিভার্সে হচ্ছে উপআইন বা বাই ল। সম্পুর্ণ মাল্টিভার্সে স্পষ্টতই অসংখ্য সেট বিকল্প উপআইন বা বাই ল আছে। অ্যানথ্রোপিক মুলনীতি এখানে বলছে যে, সেই মহাবিশ্বগুলোর কোন একটিতে (যা সংখ্যায় খুবই কম বলেই অনুমান করা হয়) আমরা অবশ্যই অবস্থান করছি, যেখানকার পদার্থবিদ্যার উপআইনগুলো ঘটনাক্রমে আমাদের ক্রমান্বয়ে বিবর্তনের পক্ষে উপযোগী এবং সেজন্যই আমরা সমস্যাটি নিয়ে ভাবতে পারছি।

মাল্টিভার্স তত্ত্বের একটি মজার সংস্করনের উৎপত্তি হয়েছে আমাদের মহাবিশ্বের সর্বশেষ পরিনতির কথা বিবেচনা করে। মার্টিন রীসের ৬ টি ধ্রুব সংখ্যার মানের উপর নির্ভর করে আমাদের মহাবিশ্ব হয়ত অনির্দিষ্ট কালের জন্য সম্প্রসারনশীল হতে পারে বা এটি একটি ভারসাম্যে স্থিতাবস্থায় পৌছাতে পারে বা এই ক্রমসম্প্রাসারনশীলতা বীপরিতমুখী হতে পারে এবং সৃষ্টি করতে পারে একটি মহাসংকোচন বা বিগ ক্রান্চ। কিছু বিগ ক্রান্চ মডেল এ মহাবিশ্ব আবার সম্প্রসারিত হওয়া শুরু করে এবং এভাবে অনির্দিষ্ট কালের জন্য , যেমন ধরুন ২০ বিলিয়ন বছরের একটি সময় চক্রে। আমাদের স্ট্যান্ডার্ড মডেল মহাবিশ্বে, সময় তার নিজের যাত্রা শুরু করে মহাবিস্ফোরন বা বিগ ব্যাঙ্গ এর সময়ে মহাশুন্যর সুচনার সাথেই প্রায় ১৩ বিলিয়ন বছর আগে। ধারাবাহিক বিগ ক্র্যান্চ মডেল হয়তো এই বাক্যটিকে পরিববর্তন করতে পারে এভাবে: আমাদের সময় এবং মহাশুন্যর আসলে সুচনা হয়েছিল আমাদের বিগ ব্যাঙ্গ এর সময় কিন্তু অসংখ্য বিগব্যাঙ্গ এর সুদীর্ঘ ধারাবাহিকতায় সবচেয়ে সাম্প্রতিকতম; যাদের প্রত্যেকটির শুরু হয়েছিল আবার বিগ ক্রান্চের মাধ্যমে, যা এই ধারাবাহিকতায় এর আগের মহাবিশ্বটির সমাপ্তির কারন। কেউই বুঝতে পারেননি কি ঘটেছিল আসলে বিগ ব্যঙ্গ এর মত কোন সিঙ্গুলারিটি ঘটনার সময়। সুতরাং এটা ধারনা করা যায় যে সব আইন এবং ধ্রুবগুলো নতুন একটি মানে রিসেট হয়, প্রতিবারই এই চক্রে।

যদি এভাবে ব্যাঙ্গ – সম্প্রসারন– সংকোচন– ক্র্যান্চ চক্র চলতেই থাকে মহাজাগতিক অ্যাকর্ডিয়নের মত, আমরা কোন সমান্তরাল কোন মাল্টিভার্সের সংস্করন পরিবর্তে পাবো ধারাবাহিক । আরো একবার অ্যানথ্রোপিক নীতি তার ব্যাখ্যার দায়িত্ব পালন করে। ধারাবাহিক মহাবিশ্বের সবকয়টির মধ্যে হয়তো অল্প কয়েকটির ধ্রুব এবং আইনগুলো এমন করে সাজানো যে তারা জীবনের উৎপত্তির জন্য সহায়ক। এবং অবশ্যই, বর্তমান মহাবিশ্ব সেই সংখ্যালঘু মহাবিশ্বের একটি, কারন আমরা এখানে বসবাস করছি। এই মাল্টিভার্সের এই ধারাবাহিক সংস্করনটি একসময় যেমন ভাবার হতো এখন এর সম্ভাবনাকে সেভাবে ভাবা হয়না। কারন সাম্প্রতিক প্রমান আমাদের মহা সংকোচনের ধারনা থেকে অন্য দিকে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। এখন মনে হচ্ছে আমাদের মহাবিশ্বর নিয়তিতে চিরন্তন সম্প্রসারণই আছে।

লী স্মোলিন (Lee Smolin), আরেকজন তাত্বিক পদার্থবিদ মাল্টিভার্স তত্বটির একটি কৌতুহলোদ্দীপক ডারউইনীয় সংস্করনপ্রস্তাব করেছেন, যারা মধ্যে ধারাবাহিক এবং সমান্তরাল দুটি মহাবিশ্বের ধারনাই বিদ্যমান। স্মোলিন এর ধারনাগুলো– যার বিশদ ব্যাখ্যা আছে ‘দি লাইফ অব দি কসমসে (The life of the cosmos)’ এ – নির্ভর করে আছে সেই তত্বের উপর, যা বলছে, কোন একটি মা মহাবিশ্ব বা ইউনিভার্স থেকে কন্যা ইউনিভার্স সৃষ্টি হয় পুরোমাত্রার মহাসংকোচনের মাধ্যমে না বরং স্থানীয়ভাবে কোন কৃষ্ণ গহবর বা ব্ল্যাক হোল এর মধ্যে। বংশগতির একটি অন্যকরম ধারনা স্মোলিন এখানে তার প্রস্তাবিত তত্বে যোগ করেন: কন্যা মহাবিশ্ব সৃষ্টির সময় তাদের মৌলিক ধ্রুবগুলোও খানিকটা মিউটেশন বা পরিবর্তিত হয় মা মহাবিশ্ব থেকে। ডারউইনীয় প্রাকৃতিক নির্বাচনে এই হেরেডিটি হচ্ছে অপরিহার্য একটি উপাদান, আর স্মোলিন এর বাকী তত্ব এখান থেকেই প্রাকৃতিকভাবেই অগ্রসর হয়। যে মহাবিশ্বগুলোর সেই বৈশিষ্ট আছে যা তাদের ’টিকে’ থাকতে এবং আরো পরবর্তী ’প্রজন্ম’ সৃষ্টি করতে সহায়তা দেয়, মাল্টিভার্স এ সেই সব মহাবিশ্বগুলো ক্রমান্বয়ে প্রাধান্য বিস্তার করে। যেহেতু এই পরবর্তী প্রজন্মের মহাবিশ্ব তৈরীর প্রক্রিয়াটা ঘটে কৃষ্ণ গহবরে, সফল সব মহাবিশ্বগুলোর কৃষ্ণগহবর তৈরী করার জন্য প্রয়োজনীয় গুনাবলী থাকে । এই দক্ষতা ইঙ্গিত করছে, আরো বাড়তি কিছু বৈশিষ্ট্যের। যেমন, পদার্থর ঘনীভুত হয়ে মেঘ এবং নক্ষত্র সৃষ্টি করা ও পরবর্তীতে কৃষ্ণ গহবর সৃষ্টি করা; নক্ষত্রদেরও,যাদের আমরা দেখেছি প্রয়োজনীয় রসায়ন সৃষ্টির এবং সেভাবেই জীবনেরও পুর্বসুরী। সুতরাং স্মোলিন এর প্রস্তাব, মাল্টিভার্সের মহাবিশ্বদের উপরও কাজ করছে একটি ডারউইনীয় প্রাকৃতিক নির্বাচন, যা সরাসরি কৃষ্ণ গহবর সমৃদ্ধ মহাবিশ্বর সৃষ্টি এবং পরোক্ষভাবে জীবনের উৎপত্তিকে বিশেষ সুযোগ করে দিয়েছে। অবশ্যই সব পদার্থবিদরা স্মোলিন এর প্রস্তাবের সাথে একমত নন, যদিও নোবেল জয়ী পদার্থবিদ মারে গেল–মানের এর উদ্ধৃতি, ‘স্মোলিন? সেই ক্ষ্যাপাটে চিন্তার অল্প বয়সী ছেলেটি না? তার ধারনা ভুল নাও হতে পারে।’ [২৪] একজন দুষ্ট জীববিজ্ঞানী হয়তো ভাবতেই পারেন, অন্য কোন পদার্থবিদদের ডারউইনীয় সচেতনতা বৃদ্ধি করার দরকার আছে কিনা ।

খুব সহজ কিন্তু চিন্তা করা (এবং অনেকেই এর স্বীকার) যে, এক গুচ্ছ মহাবিশ্বের ধারনার প্রস্তাব করা মাত্রাতিরিক্ত বিলাসিতা এবং এ ধরনের চিন্তাকে প্রশ্রয় না দেয়াই উত্তম। এক্ষেত্রে তাদের যুক্তিটি হচ্ছে, যদি অসংখ্য মহাবিশ্বের এই বাহুল্যর ধারনাটিকে প্রশ্রয়ই দেয়া হয়, তাহলে আমরা কেনই বা আরেকটু বেশী ধারনা করি না কেন, কেনই বা তাহলে প্রশ্রয় দেই না ঈশ্বরের ধারনাটিকে। উভয় ধারনাদুটি কি সমানভাবে অমিতব্যায়ী না, যা বিশেষ উদ্দেশ্যে প্রস্তাবিত হাইপোথিসিস এবং সমানভাবে অসন্তোষজনক? যারা এভাবে ভাবেন তাদের সচেতনতার স্তর বৃদ্ধি হয়নি প্রাকৃতিক নির্বাচনের দ্বারা। সত্যিকারের বাহুল্যময় ঈশ্বর হাইপোথিসিস এবং আপাতদৃষ্টিতে বাহুল্যময় মাল্টিভার্স হাইপোথিসিস এর মধ্যে প্রধান পার্থক্যটি হচ্ছে মুলত: পরিসংখ্যানগত অসম্ভাব্যতা। মাল্টিভার্স তার সব বাহুল্য আড়ম্বর নিয়েও সরল। ঈশ্বর বা বুদ্ধিমান, সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষমতা সম্পন্ন, গননাকারী কোন এজেন্ট, খুবই অসম্ভাব্য সেই একই পরিসংখ্যানগত পরিমাপের ধারনায় যে সত্বাগুলোর অস্তিত্ব তার ব্যাখ্যা করা কথা।

মাল্টিভার্সকে মনে হতে পারে বাহুল্যময় মহাবিশ্বর সংখ্যার ‘সুবিশাল’ পরিমানে, কিন্তু এই প্রত্যেকটি মহাবিশ্ব কিন্তু তার মৌলিক সুত্রের ক্ষেত্রে সরল। আমরা কিন্তু এখানে এমন কিছু এখন প্রস্তাব করছি না যা খুব বেশী মাত্রায় অসম্ভাব্য। কিন্তু অন্য যে কোন বুদ্ধিমান সৃষ্টিকর্তার ক্ষেত্রে এর ঠিক বীপরিতটাই বলতেই হবে।

কিছু পদার্থবিদ আছেন যারা সবার জানামতেই প্রচলিত ধর্মবিশ্বাসী (রাসেল স্ট্যানার্ড এবং জন পোলকিংহর্ণ, এই দুইজন ব্রিটিশ পদার্থবিদের উদহারন আমি আগেই উল্লেখ করেছি।); যেমনটা হবার কথা ছিল, তারা ভৌত ধ্রুবগুলোর সবকয়টির কম বেশী সংকীর্ণ একটি গোল্ডিলকস সীমায় টিউন করার বিষয়টির অসম্ভাব্যতার বিষয়টি লুফে নিয়েছেন এবং প্রস্তাব করেছেন, নিশ্চয়ই কোন মহাজাগতিক বুদ্ধিমান সত্বা এই টিউনিং এর কাজটি করেছে পরিকল্পিতভাবে। আমি আগেই এই ধারনার অসারতা প্রমান করেছি, কারন এটি যা সমাধান করছে, তারচেয়ে আরো বড় প্রশ্নের জন্ম দেয়। কিন্ত এর উত্তর হিসাবে প্রস্তাব করতে ঈশ্বরবাদীরা কি চেষ্টা করেছে? তারা কিভাবে এই যুক্তির সাথে সমঝোতা করতে পারে, যে কোন ঈশ্বর যিনি এই মহাবিশ্বকে ডিজাইন করতে পারেন,সাবধানে, পুর্বদৃষ্টি নিয়ে এর সব ধ্রুব গুলোকে উপযোগী করে তুলেছেন আমাদের বিবর্তনের জন্য, অবশ্যই তাকে খুবই জটিল এবং অসম্ভাব্য একটি সত্বা হতে হবে, যার অস্তিত্বকে ব্যাখা দেবার জন্য তার যে ব্যাখ্যা প্রস্তাব করার কথা, তার চেয়ে আরো বেশী ব্যাখ্যার প্রয়োজন আছে?

ধর্মতাত্বিক রিচার্ড সুইনবার্ণ (Richard Swinburn), আমরা যেমনটা আশা করতে শিখেছি ধর্মবাদীদের কাছে, ভাবেন এই সমস্যার জন্য তার একটি সমাধান আছে। তিনি তার বই 'ইস দেয়ার এ গড?' (Is There a God ?') এ বিষয়টির বিশদ ব্যাখা দিয়েছেন। তিনি শুরু করেছিলেন, বিষয়টি ব্যাখ্যা করার ভালো উদ্দেশ্য নিয়েই, কেন আমাদের সবসময় সবচেয়ে সরলতম হাইপোথিসিসটিকে বেছে নেয়া উচিৎ যা সব ফ্যাক্ট বা বাস্তবতার সাথে খাপ খায়। বিজ্ঞান সব জটিল জিনিস ব্যাখ্যা করে সরল জিনিসের পারস্পরিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়াকে ব্যাখ্যা করার মাধ্যমে, পরিশেষে মৌলিক কনাদের পারস্পরিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে। আমি (আমি সাহস করে বলতে পারি আপনিও) মনে করি এটি খুব সুন্দর সরল একটি ধারনা যে, সব কিছুই তৈরী হয় মৌলিক কিছু কনা দিয়ে, যা যত অগনিত সংখ্যকই হতে পারুক না কেন তাদের সৃষ্টি সীমিত সংখ্যক এক সেট মৌলিক কনা থেকেই উদ্ভুত। আমরা যদি ধারনাটিতে সংশয় বোধ করি তার কারন শুধু এটাকে খুবই সরল একটি ধারনা বলেই আমরা তা ভাবছি। কিন্ত সুইনবার্ণের জন্য, এটি আসলেই সরল কোন বিষয় একদমই না, বরং ঠিক এর বীপরিত।

কোন একটি নির্দিষ্ট টাইপের পার্টিকেল, যেমন ধরুন ইলেক্ট্রন, এর সংখ্যা এত বিশাল যে, সুইনবার্ণ মনে করেন বিষয়টা শুধু কাকতলীয় কোন ঘটনা হতে পারেনা যে, এদের সবার একই ধরনের বৈশিষ্ট থাকবে। একটি ইলেক্ট্রন তিনি হজম করতে পারবেন, তবে বিলিয়ন বিলিয়ন ইলেক্ট্রন, 'সবার একই বৈশিষ্ট', বিষয়টি তার অবিশ্বাসকে বেশ উত্তেজিত করে তোলে। তার মতে যদি সবগুলো ইলেকট্রন পরস্পর থেকে আলাদা হতো, সেই ব্যাখ্যাটা হত অনেক বেশী সরল, বেশী স্বাভাবিক, প্রাকৃতিক, যথেষ্ট কম কষ্টসাধ্য হত সেই ব্যাখ্যা। আরো খারাপ তার মতে, কোন ইলেকট্রনের উচিৎ না তার প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট একসাথে এক মুহুর্তের বেশী সময় ধরে স্থিতিশীল রাখা, তাদের প্রত্যেকের বৈশিষ্ট বদলানো উচিৎ, নিজের খেয়াল খুশী মত, এলোমেলো, এই মুহুর্ত থেকে অন্য মুহুর্ত আলাদা, দ্রুত পরিবর্তনশীল। সুইনবার্ণের দৃষ্টিতে এটাই সরলাবস্থা, সবকিছুর আদি অবস্থা। সমবৈশিষ্টপুর্ণ (যা আমি বা আপনি হয়তো বলবেন আরো বেশী সরল) কোন কিছুর জন্য দরকার বিশেষ ব্যাখ্যা। 'শুধুমাত্র এর কারন হচ্ছে, ইলেক্ট্রন এবং তামা'র কনাগুলো এবং অন্যান্য সব পদার্থগুলোর বিংশ শতাব্দীতে শক্তি ধারন করে, সেই একই শক্তি তাদের ছিল উনবিংশ শতাব্দীতেও এবং সেই সবকিছুই আগে যেমন ছিল এখনও তেমন আছে।'

এখানে ঈশ্বরের আগমন, ঈশ্বরের প্রবেশ হলো, এই ইচ্ছাকৃত এবং নিরন্তর একই বৈশিষ্ট বজায় রাখার মাধ্যমে এই সব বিলিয়ন বিলিয়ন ইলেক্ট্রন, তামা'র টুকরাদের বুনো এলোমেলো আচরন ও বৈশিষ্ট পরিবর্তনের জন্য তাদের নিজস্ব অন্তর্গত প্রবনতাকে উদ্ধার করতে। এ কারনে আপনি যখন একটি ইলেকট্রন দেখবেন, আপনার সব দেখা হয়ে যাবে. সে কারনেই তামা'র টুকরাগুলো সবাই তামা টুকরার মত আচরন করে। একারনে প্রতিটি ইলেক্ট্রন এবং তামা'র প্রতিটি টুকরো ঠিক নিজের মত থাকে মাইক্রোসেকেন্ড থেকে মাইক্রোসেকেন্ড, শতাব্দীর পর শতাব্দী, এর কারন ঈশ্বর নাকি সারাক্ষনই প্রতিটি কনার উপর তার ঐশী আঙ্গুল দিয়ে রেখেছেন, কোন ধরনের স্বেচ্ছাচারী বাড়াবাড়ি আচরণ

দমনের উদ্দেশ্যে এবং শাসন করে যেন বেয়াড়া কণারা তাদের বাকী ইলেক্ট্রন সহকর্মীদের সাথে এক লাইনেই থাকে; যেন তারা সবাই ঠিক একই রকম আচরন করে।

কিন্তু সুইনবার্ণ পক্ষে কিভাবে সম্ভব হবে তার এই অদ্ভুত হাইপোথিসিসটাকে টিকিয়ে রাখা? যেখানে ঈশ্বর একই সাথে গ্যাজেলিয়ন (অগনিত) আঙ্গুল দিয়ে নিয়ম না মানা ইলেক্ট্রনগুলোকে নিয়ন্ত্রন করেন, এটা কিভাবে একটি ‘সরল’ হাইপোথিসিস হতে পারে? অবশ্যই এটা সরলের ঠিক বীপরিত। সুইনবার্ণ এখানে খেলা দেখালেন তার নিজের মনমত চমক দেখানো একটি বুদ্ধিবৃত্তিক ’ঔদ্ধত্ব’ দেখিয়ে। কোন যৌক্তিকতা ছাড়াই তিনি দাবী করেন যে ঈশ্বর হচ্ছে ‘একক’ একটি বস্তু দিয়ে গঠিত। কি অসাধারন তার কার্যকারন ব্যাখ্যা করার এই অর্থনীতি, যদি তা তুলনা করা হয় ঐ গ্যাজেলিয়ন সংখ্যক ইলেক্ট্রন স্বতন্ত্রভাবে মুলত একই, সেই ধারনার সাথে!

ঈশ্বরবাদীরা দাবী করছেন, প্রতিটি জিনিস যার অস্তিত্ব আছে, তাদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার কারন হচ্ছে মাত্র একটি বস্তু, ঈশ্বর। এবং এটি দাবী করা যে, প্রতিটি বৈশিষ্ট যা প্রতিটি জিনিসের আছে, তার হচ্ছে ঈশ্বরের কারনে বা তার অনুমতিতে শুধুমাত্র তারা অস্তিত্বশীল। এটি বেশ কিছু কারনকে ব্যাখ্যার জন্য সাধারন সরল একটি ব্যাখার বিশিষ্ট উদহারন। এই ক্ষেত্রে সম্ভাবনা আছে একটার বেশী সরলতম কোন ব্যাখ্যা না থাকার, শুধু সেটাই যা কেবল একটি কারনকেই প্রস্তাব করে। বহুঈশ্বরবাদ থেকে ঈশ্বরবাদ এ কারনে সরল। এবং ঈশ্বরবাদ এর জন্য একটি কারন প্রস্তাব করছে, একটি সত্বা (যার আছে) অসীম ক্ষমতাময় (ঈশ্বর যৌক্তিকভাবে সম্ভব এমন সব কিছুই করতে পারেন), অসীম জ্ঞানের অধিকারী (যৌক্তিকভাবে যা জানা সম্ভব তা সবকিছু জানেন ঈশ্বর), অসীম স্বাধীন।

সুইনবার্ণ দয়াপরবশ হয়ে মেনে নিয়েছেন, ঈশ্বর এমন কোন কিছু করতে পারেন না যা ‘যৌক্তিকভাবে’ অসম্ভব এবং তার এই সংযমের জন্য তার প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতা। এটার মেনে নিয়েই বলছি, কোন কিছু ব্যাখ্যা করার উদ্দেশ্যে ঈশ্বরের অসীম ক্ষমতার ব্যবহারের কোন সীমাবদ্ধতা ঈশ্বরবাদীরা অনুধাবন করেননি কখনোই। বিজ্ঞানের কি X ব্যাখ্যা করতে খানিকটা সমস্যা হচ্ছে? কোন অসুবিধা নেই , X নিয়ে আর সময় নষ্ট করার দরকার নেই, ঈশ্বরের অসীম ক্ষমতাকে টেনে নিয়ে আসা হয়ে X কে ব্যাখ্যা করতে (সেই সাথে বাকী সবকিছুই), এবং এটাকে দাবী করা হবে সর্বশ্রেষ্ঠ সরলতম ব্যাখ্যা হিসাবে, কারন, সর্বোপরি ঈশ্বরতো শুধুমাত্র একজন। এর চেয়ে জটিলতামুক্ত আর কি হতে পারে?

বেশ, সত্যিকথা বলতে গেলে, প্রায় সবকিছুই। এমন একজন ঈশ্বর যিনি কিনা মহাবিশ্বের প্রতিটি কণাকে বিরামহীনভাবে পর্যবেক্ষন এবং নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন তিনি তার যাই হোন না কেন সরল কোন সত্বা হতেই পারেন না। তার নিজের অস্তিত্বটির বর্ণনা জন্যই তো প্রয়োজন আছে বিশাল একটি ব্যাখ্যার। আরো খারাপ (সরলতার দৃষ্টিকোন থেকে) ব্যাপার হচ্ছে, ঈশ্বরের অতিকায় চেতনার অন্য প্রান্তগুলোও একই সাথে প্রতিটি মানুষের কর্মকান্ড,তাদের আবেগ ও অনুভতি এবং প্রার্থনা নিয়ে ব্যস্ত ; এছাড়া ১০০ বিলিয়ন গ্যালাক্সীর অন্যান্য গ্রহে যদি অন্য কোন বুদ্ধিমান ভীনগ্রহবাসী থাকে তারাতো আছেনই। সুইনবার্ণের মতে তিনি এমনকি নিরন্তরভাবে সিদ্ধান্ত নিতে থাকেন অলৌকিকভাবে হস্তক্ষেপ ‘না’ করার জন্য আমাদের রক্ষা করতে, যেমন যখন আমরা ক্যান্সারে আক্রান্ত হই। সেটা তিনি কখনই করবেন না, কারন, ‘ ঈশ্বর যদি কোন আক্রান্ত রোগীর স্বজনের বেশীর ভাগ প্রার্থনা মন্জুর করেন তাকে ক্যান্সার থেকে বাচানোর জন্য, তাহলে মানুষের জন্য ক্যান্সার কখনো সমস্যা থাকবে না সমাধানের জন্য।’ তাহলে আমরা আমাদের সময় নিয়ে কি করবো?

সব ধর্মতাত্ত্বিকরা আবার সুইনবার্ণের মত এত দুর যেতে চান না, তবে যাই হোক, ঈশ্বর হাইপোথিসিস যে সরল, এই অদ্ভুত দাবী কিন্তু বেশ কিছু আধুনিক ধর্মতাত্ত্বিকদের রচনায় দেখা যায়, যেমন কিথ ওয়ার্ড (Keith Ward), যখন তিনি অক্সফোর্ডের ডিভিনিটির রিজিয়াস (Regius) অধ্যাপক ছিলেন, তার লেখা ১৯৯৬ সালের একটি বই, গড, চান্স অ্যান্ড নেসেসিটি (God, Chance and Necessity) তে এই বিষয়ে বেশ স্পষ্ট একটি বক্তব্য ছিলো:

আসল কথা হলো, ঈশ্বরবাদীরা দাবী করেন মহাবিশ্বর অস্তিত্বের জন্য ঈশ্বর হচ্ছেন অতি অসাধারন, সুন্দর, সুবিধাজনক এবং কার্যকর একটি ব্যাখ্যা। এটি সহজসাধ্য উপযোগী কারন এটি মহাবিশ্বের সবকিছুর অস্তিত্ব এবং তাদের প্রকৃতির গুনাবলী আরোপ করেছে একটি মাত্র সত্বার উপর, সেই চুড়ান্ত কারন, যা সবকিছুর অস্তিত্বের কারন, এমনকি তার নিজের অস্তিত্বেরও। ধারনাটি সুন্দর , কারন একটি প্রধান ধারনা থেকে, সম্ভবপর এমন কোন নিখুততম স্বত্বা – ঈশ্বরের সম্পুর্ণ প্রকৃতি এবং সমগ্র মহাবিশ্বের অস্তিত্বকে বুদ্ধিমত্তার সাথে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে।

সুইনবার্ণের মত, কোন কিছু ব্যাখ্যা করা বলতে কি বোঝায়, সে বোঝানো ক্ষেত্রেও ওয়ার্ডও একই ভুলটি করেন তার এই বক্তব্যে। এবং মনে হয় তিনি বুঝতে ব্যর্থ হয়েছেন, কোন কিছুকে যদি সরল বলা হয়, আসলে সেটা সম্বন্ধে কি বোঝাচ্ছে। আমি স্পষ্ট না ওয়ার্ড আসলেই কি ঈশ্বরকে সরল ভাবছেন কিনা? বা উপরের অনুচ্ছেদটি অস্থায়ী 'তর্কের খাতিরে বলা' এমন কোন অনুশীলনীর প্রতিনিধিত্ব করছে ? স্যার জন পোলকিংহর্ণ, সায়েন্স অ্যান্ড ক্রিষ্টিয়ান বিলিফ এ ওয়ার্ডে'র টমাস অ্যাকোয়াইনাসের আগের সমালোচনার উদ্ধৃতি ব্যবহার করেছিলেন, ' এটা মৌলিক একটি ভুল, ঈশ্বরকে যৌক্তিকভাবে সরল মনে করা –সরল এখানে শুধুমাত্র এই অর্থে না যে তার স্বত্বা অবিভাজ্য বরং আরো বেশী দৃঢ় অর্থে যে, ঈশ্বরের কোন অংশ সত্যি হলে ঈশ্বর সম্পুর্ণভাবে সত্য। একারনে এটা খুবই যুক্তিসঙ্গত হবে মনে করা যে, ঈশ্বর, যখন অবিভাজ্য, অন্তর্গতভাবে জটিল।' ওয়ার্ড কিন্তু এখানে ব্যাপারটা ঠিকই ধরতে পেরেছেন। আসলে, জীববিজ্ঞানী জুলিয়ান হাক্সলী, ১৯১২ সালে, জটিলতার সংজ্ঞা দিয়েছিলেন গঠনের নানা অংশের বৈসাদৃশ্যতা হিসাবে, যা দিয়ে তিনি একটি বিশেষ ধরনের বৃত্তিগত বা প্রায়োগিক অবিভাজ্যতাকে বোঝাতে চেয়েছিলেন [২৫]।

অন্য জায়গায় ওয়ার্ড কিন্তু যথেষ্ট প্রমান দিয়েছেন, কোথা থেকে জটিল জীবনের উদ্ভব হয়েছে তা বোঝার জন্য ধর্মতাত্বিক মানসিকতার বিশেষ পদ্ধতিগত সমস্যার । তিনি আরেকজন ধর্মবাদী বিজ্ঞানীর উদ্ধৃতি দিয়েছেন, প্রাণরসায়নবিদ আর্থার পিকক (আমার উল্লেক করা বৃটিশ ধর্মীয় বিজ্ঞানীত্রয়ের তৃতীয় সদস্য) জীবিত পদার্থের অস্তিত্বকে 'ক্রমান্বয়ে জটিলতর হবার প্রবণতা' হিসাবে প্রস্তাব করার সময়। ওয়ার্ড যাকে বিশেষায়িত করেছেন বিবর্তনীয় পরিবর্তনের কোন একটি অন্তর্নিহিত নির্দেশনা হিসাবে যা জটিলতাকে ক্রমান্বয়ে বাড়ার বিষয়টিকে বাড়তি সুযোগ দেয়। তিনি এরপর আরো প্রস্তাব করেন, এ ধরনের পক্ষপাতিত্ব, 'হতে পারে কোন মিউটেশন প্রক্রিয়াকে গুরুত্ব দেয়, যেন আরো জটিল মিউটেশনের উদ্ভব হতে পারে।' ওয়ার্ডের এ বিষয়ে সংশয় ছিল, তার যা হওয়া উচিৎ সঙ্গতকারনে। ক্রমশ: জটিলতর হবার পথে বিবর্তনীয় বিভক্তি যে সকল বংশধারায় আদৌ এসেছে, তা তাদের ক্রমান্বয়ে জটিল হবার অন্তর্গত প্রবণতা থেকে না বা পক্ষপাতদুষ্ট কোন মিউটেশনের কারনেও না। এটি হচ্ছে প্রাকৃতিক নির্বাচনের কারনে: যে প্রক্রিয়া, আমরা যতটুকু জানি, এখনও একমাত্র প্রক্রিয়া, যা সরলাবস্থা থেকে জটিলতা সৃষ্টি করতে সক্ষম। প্রাকৃতিক নির্বাচনের তত্ব আসলেই খুবই সরল। এবং যেখান থেকে এটি শুরু করে, সেটিও। কিন্তু অপরদিকে এটি যা ব্যাখ্যা করতে পারে, সেটি বর্ণনাতীতভাবে জটিল: আমরা কল্পনার চেয়েও জটিল, শুধুমাত্র ঈশ্বরবাদীদের প্রস্তাবিত ঈশ্বর ছাড়া যিনি এটি ডিজাইন করতে সক্ষম।

(চলবে) আগামী পর্বে সমাপ্য

পাদটীকা

---

[২৪] Murray Gell-Mann, quoted by John Brockman on the 'Edge' website,http://www.edge.org/3rd_culture/bios/smolin.html.

[২৫] Ward, K. God, Chance and Necessity. Oxford: Oneworld. (1996: 99); Polkinghorne, J. (1994). Science and Christian Belief: Theological Reflections of a Bottom-Up Thinker. London: SPCK (1994: 55).

রিচার্ড ডকিন্স এর দি গড ডিলুশন: চতুর্থ অধ্যায় (শেষ পর্ব)

By K M Hassan

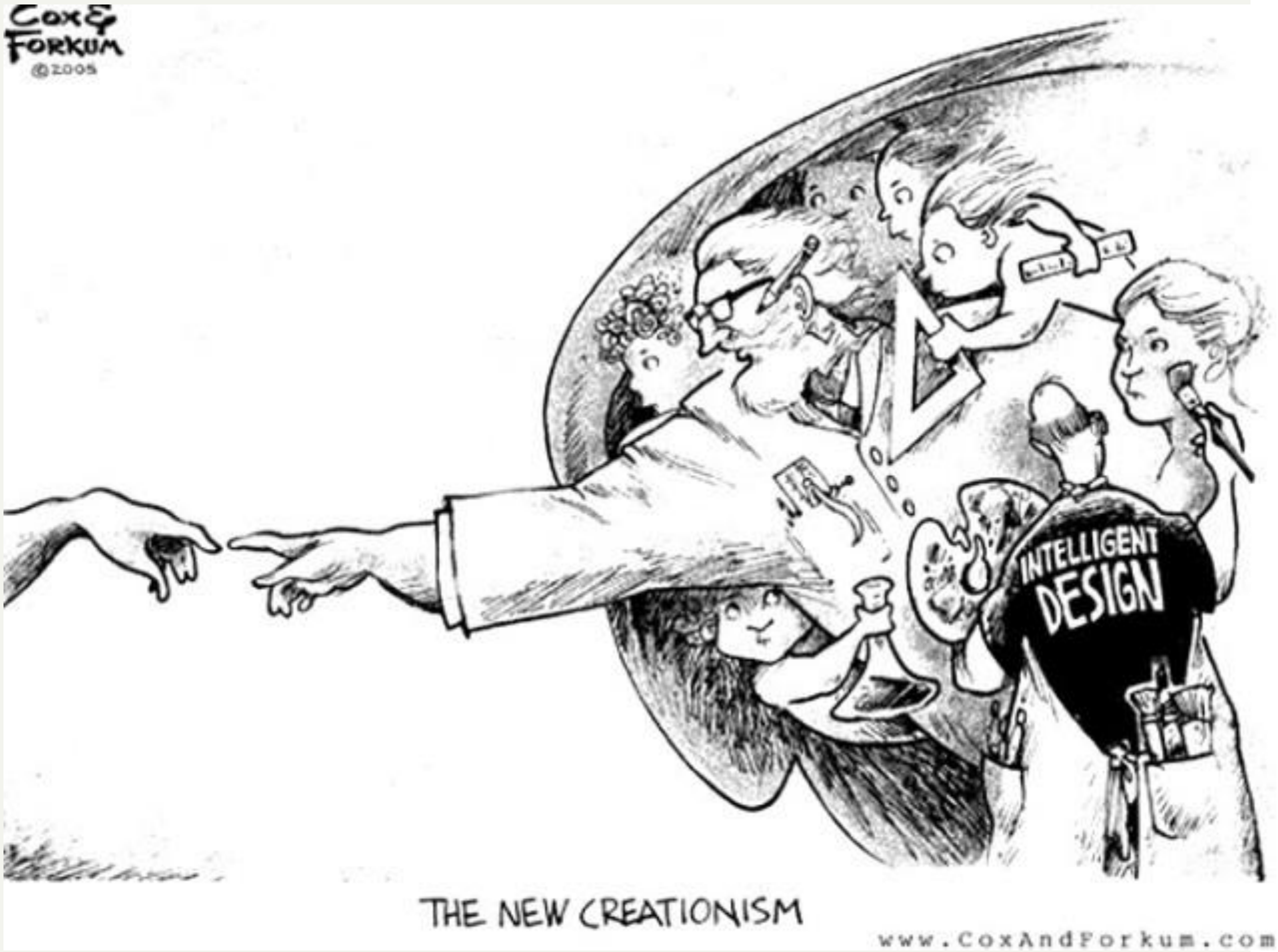
Cox & Forkum
©2005
INTELLIGENT DESIGN
THE NEW CREATIONISM
www.CoxAndForkum.com

কার্টুন: ইন্টারনেট

রিচার্ড ডকিন্স এর দি গড ডিলুশন এর বাংলা অনুবাদ :
প্রথম , দ্বিতীয় ,তৃতীয় , চতুর্থ অধ্যায় (প্রথম পর্ব) , চতুর্থ অধ্যায় (দ্বিতীয় পর্ব) , চতুর্থ অধ্যায় (তৃতীয় পর্ব) , চতুর্থ অধ্যায় (চতুর্থ পর্ব) ,

রিচার্ড ডকিন্স এর দি গড ডিলুশন : চতুর্থ অধ্যায় (শেষ পর্ব)
(অনুবাদ প্রচেষ্টা: কাজী মাহবুব হাসান)
The God Delusion by Richard Dawkins

কেন প্রায় নিশ্চিৎভাবে বলা সম্ভব ঈশ্বরের কোন অস্তিত্ব নেই

চতুর্থ অধ্যায় (চতুর্থ পর্ব) এর পর:

কেমব্রিজে একটি সংক্ষিপ্ত বিরতি :

কেমব্রিজে সম্প্রতি বিজ্ঞান এবং ধর্ম নিয়ে একটি সন্মেলনে এই যুক্তিটি আমি প্রস্তাব করেছিলাম, যা এখানে উল্লেখ করেছি আল্টিমেট বা অন্তিম বোয়িং ৭৪৭ যুক্তি হিসাবে। আমার যা অভিজ্ঞতা হয়েছে, অন্ততপক্ষে সেটি ছিল একটি ঈশ্বরের সরলতা প্রশ্নে চিন্তার সম্মিলনের একটি আন্তরিক ব্যর্থতা। এই অভিজ্ঞতা আমার জন্য ছিল বেশ শিক্ষনীয়, সেই অভিজ্ঞতাটাই আপনাদের সাথে ভাগ করে নেবো এখানে।

প্রথমেই আমার স্বীকার (সম্ভবত এটিই সঠিক শব্দ) করে নেয়া উচিৎ এই সম্মেলনটি পৃষ্ঠপোষকতা করেছিল টেম্পলটন ফাউন্ডেশন। বৃটেন এবং যুক্তরাষ্ট্রের কয়েকজন বিশেষভাবে বাছাই করা কিছু বিজ্ঞান সাংবাদিকরা ছিলেন এর দর্শক। আমন্ত্রিত বক্তাদের মধ্যে আমি ছিলাম একমাত্র নীরিশ্বরবাদী।এদের মধ্যে একজন সাংবাদিক জন হরগান, উল্লেখ করেছিলেন, এই সম্মেলনে অংশগ্রহন করার জন্য অন্য সব খরচ বাদ দিয়ে তাকে ১৫০০০ ডলার এর একটি মোটা পারিশ্রমিক দেয়া হয়েছিল। ব্যাপারটি আমাকে বিস্মিত করেছিল। অ্যাকাডেমিক সম্মেলনের দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা থেকে আমি বলতে পারি, এমন কোন উদহারন নেই যেখানে দর্শকদের অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার জন্য পারিশ্রমিক প্রদান করা হয় (বক্তাদের ছাড়া); আমি যদি আগে জানতাম, সাথে সাথেই তাহলে আমার সন্দেহ হত। টেম্পলটন কি তার অর্থ ব্যবহার করছে বিজ্ঞান সাংবাদিকদের কোন বেআইনী কাজ করার প্ররোচনা দেবার জন্য এবং তাদের বৈজ্ঞানিক সততাটিকে বিপথগামী করা চেষ্ঠায় ? জন হরগান পরবর্তীতে তেমনটি ভেবেছিলেন এবং তার পুরো অভিজ্ঞতা নিয়ে একটি নিবন্ধও লিখেছিলেন [২৬]; যেখানে তিনি প্রকাশ করেন, আমার কারনেই, একজন বক্তা হিসাবে আমার নাম দিয়ে প্রচারনা করার কৌশল তার মতই আরো অনেক সাংবাদিকের সন্দেহ কাটাতে সাহায্য করেছিল:

> বৃটিশ জীববিজ্ঞানী রিচার্ড ডকিন্স-এই মিটিং যার অংশগ্রহন আমাকে এবং আমার অনেক সহকর্মীকে বিশ্বাস যুগিয়েছিল এর বৈধতা সম্পর্কে – ছিলেন একমাত্র বক্তা যিনি ধর্ম বিশ্বাসকে সমালোচনা করেন বিজ্ঞানের সাথে অসামন্জষ্যপুর্ণ, অযৌক্তিক এবং ক্ষতিকর হিসাবে উল্লেখ করে। অন্যান্য বক্তারা – তিনজন অ্যাগনষ্টিক, একজন ইহুদী, একজন দেইষ্ট এবং ১২ জন খৃষ্টীয় (শেষ মুহুর্তে একজন মুসলিম দার্শনিক সম্মেলনে যোগদানে অপারগতা প্রকাশ করেছিলেন) – সবাই সুস্পষ্টভাবে ধর্ম এবং খৃষ্টীয় ধর্মের প্রতি সুস্পষ্টভাবে পক্ষপাতমুলক বক্তব্য রাখেন।

হরগানের এই নিবন্ধটি পছন্দনীয়ভাবে নিরাপদ মাঝামাঝি একটা অবস্থান। তার নানা সংশয়বোধ সত্ত্বেও তার অভিজ্ঞতার বেশ কিছু ব্যাপার ছিল, যা তিনি নি:সন্দেহে স্বীকার করেছেন (এবং আমিও, নীচের অনুচ্ছেদগুলোয় যা সুস্পষ্ট হবে); হরগান লিখেছিলেন:

> বিশ্বাসীদের সাথে আমার কথপোকথন আমার সেই বোধকে দৃঢ় করেছে কেন কিছু বুদ্ধিমান, শিক্ষিত মানুষ ধর্মকে একাত্ম করে নিয়েছেন। একজন রিপোর্টার আলোচনা করেছেন জিহবা দিয়ে কথা বলা বা স্বয়ংক্রিয়, অচেতন স্তরে কথা বলার অভিজ্ঞতা আলোচনা করেছেন এবং আরেকজন যীশুর সাথে ঘনিষ্ট সম্পর্ক থাকার কথা বলেছেন। আমার বিশ্বাস পরিবর্তিত হয়নি কিন্তু অন্যদের হয়েছে। অন্তত একজন সহকর্মী বলেছেন তার বিশ্বাস দোলা খেয়েছে ডকিন্স এর ধর্মকে ব্যবচ্ছেদ করার ফলাফল হিসাবে। এবং যদি টেম্পলটন ফাউন্ডেশন আমার স্বপ্নের সেই ধর্ম মুক্ত পৃথিবী দিকে অগ্রসর হতে সামান্যতম সহায়তা করে, তা কি এমন খারাপ হতে পারে?

লিটারেরী এজেন্ট জন ব্রকমানের ওয়েবসাইট এজ (Edge) এ প্রকাশ করে এটি দ্বিতীয় দফা প্রচারও করা হয় (যাকে বলা অন লাইন বৈজ্ঞানিক সালন (Salon)), যেখানে এটি বিভিন্ন ধরনের প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে, যাদের মধ্যে একটি ছিল তাত্বিক পদার্থবিজ্ঞানী ফ্রিম্যান ডাইসন এর। আমি ডাইসনের মন্তব্যের প্রতিক্রিয়ায় লিখেছিলাম, তিনি যখন টেম্পলটন পুরষ্কার গ্রহন করেছিলেন, সেই সময় দেয়া তার একটি ভাষন থেকে উদ্ধৃতি ব্যবহার করে। তার ভালো লাগুক বা না লাগুক, টেম্পলটন পুরস্কার গ্রহন গ্রহন করে ডাইসন সারা পৃথিবীকে একটি শক্তিশালী অন্য রকম বার্তা দিয়েছিলেন। সেটা হচ্ছে পৃথিবীর সবচে বিখ্যাত পদার্থবিজ্ঞানীর র্ধমকে সমর্থন করার ইঙ্গিত।

’আমি সন্তুষ্ট অসংখ্য খৃষ্ট ধর্মাবলম্বীদের একজন হিসাবে, যারা আদৌ ট্রিনিটির ডকট্রিন বা গসপেলের ঐতিহাসিক সত্য নিয়ে খুব একটা চিন্তিত নয়।’

কিন্তু ঠিক এমন ভাবেই কি বলার কথা না কোন একজন নীরিশ্বরবাদী বিজ্ঞানীর, যিনি নিজেকে একজন খৃষ্টান হিসাবে ধারনা দিতে চাইবেন ? আমি ডাইসনের আরো উদ্ধৃতি ব্যবহার করেছিলাম তার পুরষ্কার গ্রহনকালের সেই ভাষন থেকে, যার মধ্যে কাল্পনিক ব্যাঙ্গাত্মক কিছূ প্রশ্নও জুড়ে দিয়েছিলাম (নীচে ইটালিক হরফে) একজন টেম্পলটন কর্মকর্তার প্রতি।

ওহ, আপনি আরো গভীর কিছু শুনতে চাইছেন তাহলে? বেশ এটা কেমন হয়:

’আমি মন এবং ঈশ্বরের মধ্যে কোন সুস্পষ্ট কোন পার্থক্য করিনা, কারন ঈশ্বর হলো আমাদের মনের একটি অবস্থা যখন এটি আামদের বোধের সীমানা অতিক্রম করে।’

আমি কি যথেষ্ট বলিনি এর মধ্যে, আমি কি আমার পদার্থবিদ্যার গবেষনায় ফেরত যেতে পারি এখন? ওহ, এখনও যথেষ্ট না? বেশ তাহলে, এটা কেমন:

এমন কি বিংশ শতাব্দীর ভয়ঙ্কর অতীত সত্বেও আমি ধর্মের প্রগতির কিছু চিহ্ন দেখতে পাচ্ছি। দুই জন ব্যাক্তি যারা আমাদের শতাব্দীতে শয়তানের প্রতিরুপকে প্রতিনিধিত্ব করেন, অ্যাডলফ হিটলার এবং জোসেফ স্ট্যালিন, তারা দুজনেই আত্মস্বীকৃত গোড়া নাস্তিক ছিলেন (যা পুরোটাই মিথ্যাভাষন, বিস্তৃত আলোচনা আছে সপ্তম অধ্যায়ে)।

এবার কিযেতে পারি আমি?

টেম্পলটনে পুরষ্কার গ্রহনের ভাষনে করা এই উদ্ধৃতিগুলোর প্রভাব ডাইসন কিন্তু অনায়াসে প্রতিরোধ করতে পারতেন, যদি তিনি স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করতে পারতেন, ঈশ্বর বিশ্বাসের স্বপক্ষে তিনি আসলে কি প্রমান পেয়েছেন, যা কিছুটা শুধুমাত্র আইনস্টাইনীয় অর্থের চেয়ে বেশী, যা আমি প্রথম অধ্যায়ে ব্যাখ্যা দিয়েছি, যা আমরা অনেকেই সহজভাবে নিজেদের ধারনার সাথে একাত্ম করতে পারি। আমি যদি হরগান এর বক্তব্যটা বুঝি, এটা হচ্ছে টেম্পলটনের টাকা যা বিজ্ঞানকে কলুষিত করছে দুর্নীতি দিয়ে। কিন্তু তার ভাষন তারপরও দু:খজনক, কারন এটি অন্যদের জন্য উদহারন তৈরী করবে। টেম্পলটন পুরষ্কার কেমব্রিজে সেই সম্মেলনে যোগ দেয়া সাংবাদিকদের দেয়া সন্মানীর অনেক গুন বেশী বেশী, পরিকল্পিত ভাবে এর পরিমানকে রাখা হয়েছে নোবেল প্রাইজের অর্থমুল্যের চেয়ে বেশী। ফাউস্টিয়ান অর্থে আমার বন্ধু ও দার্শনিক ড্যানিয়েল ডেনেট একবার ঠাট্টা করে বলেছিলেন, ‘রিচার্ড, যদি কোন দিন তুমি অর্থকষ্টে পড়ো...’

ভালো হোক কিংবা খারাপ, আমি কেমব্রিজ সম্মেলনে দুই দিনই উপস্থিত ছিলাম, আমার নিজের বক্তৃতা করেছি, আলোচনায় অংশ নিয়েছিলাম বেশ কিছু বত্তৃতায়। আমি ধর্মতাত্বিকদের চ্যালেন্জ করেছিলাম, সেই পয়েন্ট এর উত্তর দিতে, এক ঈশ্বর যে কিনা এই মহাবিশ্বকে ডিজাইন করতে পারেন বা যেকোন কিছু, তাকেও সেই পরিমান জটিল

আর পরিসংখ্যানগতভাবে অসম্ভাব্য হতে হবে। সবচেয়ে কঠিন যে প্রতিক্রিয়া আমি পেয়েছিলাম তাহলো আমি খুব নিষ্ঠুরভাবে একটি বৈজ্ঞানিক এপিসটেমিওলজি বা জ্ঞানগত ধারনাকে অনিচ্ছুক ধর্মতত্ত্বের উপর চাপিয়ে দিচ্ছি (এই অভিযোগ সেই NOMA র কথা মনে করিয়ে দেয়, দ্বিতীয় অধ্যায় যার আলোচনা করেছিলাম); ধর্মতাত্ত্বিকরা চিরকালই ঈশ্বরকে ব্যাখ্যা করেছে খুব সাধারন সরল হিসাবে, আমি কে? একজন বিজ্ঞানী হয়ে ধর্মতাত্ত্বিকদের জ্ঞান দেবার, যে তাদের ঈশ্বরকে জটিল হতে হবে? বৈজ্ঞানিক যুক্তি, যেমন আমি আমার নিজের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে অভ্যস্থ, এখানে তা অপ্রযোজ্য কারন ধর্মতাত্ত্বিকরা মনে করেন তাদের ঈশ্বরের অবস্থান বিজ্ঞানের বাইরে।

আমি কিন্তু এমন মনে হয়নি যে, ধর্মবিদরা যারা এই এড়িয়ে যাবার মত প্রতিরক্ষামুলক অবস্থান নিচ্ছেন তারা ইচ্ছা করেই অসৎ হচ্ছেন। আমি মনে করি তারা সৎভাবেই আন্তরিক। যাই হোক বারবার আমান মনে পড়ে যাচ্ছিল, ফাদার টেইলহার্ড দ্য শারদাঁ র দি ফেনোমেনোন অব ম্যান (The Phenomenon of Man) বইটি সম্পর্কে পিটার মেদাওয়ার এর মন্তব্যটি, যেটাকে বলা যেতে পারে সর্বকালের সেরা নেতিবাচক পুস্তক সমালোচনা: ‘এর লেখককে অসততার জন্য ক্ষমা করা যেতে পারে শুধুমাত্র এই অর্থে যে, তিনি অন্যদের প্রতারণা করার করা আগে নিজেকে প্রতারনা করার জন্য বিশেষ কষ্ট করেছেন।’ [২৭]; আমার সেই কেমব্রিজ এ দেখা হওয়া ধর্মতাত্ত্বিকরা তাদেরকে সুরক্ষা করার চেষ্টা করে যাচ্ছেন একটি এপিসটেমোলজিক্যাল নিরাপদ এলাকায়, যেখানে যৌক্তিক কোন যুক্তি তাদের স্পর্শ করতে পারেনা কারন তারা বিশেষ ঐশী আদেশের মত তারা ঘোষনা দিয়েছেন, এই যুক্তির আক্রমন থেকে তারা মুক্ত। আমি বলার কে , যৌক্তিক যুক্তি হলো একমাত্র গ্রহনযোগ্য যুক্তি? বৈজ্ঞানিক ছাড়াও আরো অনেক প্রক্রিয়া আছে জ্ঞান আহোরণের এবং সেরকম কোন একটি প্রক্রিয়াকে অবশ্যই বেছে নিতে হবে ঈশ্বরকে বুঝতে।

এই অন্যভাবে জানার সবচে গুরুত্বপুর্ণ একটি পথ হচ্ছে ব্যক্তিগত, ঈশ্বর সংক্রান্ত আত্মগত অভিজ্ঞতা। কেমব্রিজে বেশ কয়েকজন আলোচক দাবী করেছিলেন, ঈশ্বর তাদের সাথে কথা বলেছেন, তাদের মাথার মধ্যে, কোন মানুষ যেভাবে কথা বলতে পারে, সেভাবে স্পষ্টভাবে, ব্যক্তিগত ভাবে। আমি তৃতীয় অধ্যায়ে ইল্যুশন বা মায়া এবং হ্যালুসিনেশন নিয়ে কথা বলেছি (ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে যুক্তি); কিন্তু কেমব্রিজ সম্মেলনে আমি দুটি বিশেষ পয়েন্ট যোগ করেছিলাম, যে যদি ঈশ্বর সত্যি সত্যি মানুষের সাথে যোগাযোগ করে থাকেন, তাহলে সেই বিষয় বা সত্যটা খুবই স্পষ্টভাবেই অবশ্যই বিজ্ঞানের আওতার বাইরে না। ঈশ্বর তার কোন অপার্থিব জগতের নিজস্ব নিবাস থেকে হঠাৎ করেই আবির্ভুত হবেন, আমাদের বিশ্বর মধ্য দিয়ে যেখানে তার বার্তা মানুষের মস্তিষ্ক বুঝতে সক্ষম হবে এবং সেই ঘটনার সাথে বিজ্ঞানের কোন সম্পর্ক থাকবে না, তা কি করে হতে পারে? দ্বিতীয়ত, একজন ঈশ্বর যিনি বহু মিলিয়ন মানুষকে একই সাথে বোধগম্য বার্তা পাঠানোর এবং তাদের সবার কাছে থেকে বার্তা একই সাথে গ্রহন করতে সক্ষম, তিনি আর যাই হোক না কেন, সরল কোন সত্ত্বা হতে পারেন না জটিল ছাড়া। এতবেশী ব্যান্ডউইথ! ঈশ্বরের অবশ্যই নিউরন দিয়ে তৈরী কোন মস্তিষ্ক নেই বরং একটি সিপিইউ যা সিলিকন দ্বারা তৈরী। যদি তার যে ক্ষমতা আছে বলে বলা হয়, তিনি অবশ্যই এমন কিছু হবেন যিনি খুব সুক্ষ জটিলতার সাথে বিস্তারিত ভাবে নন র‍্যানডোম ভাবে সৃষ্ট আমাদের জানামতে সবচেয়ে বড় কোন ব্রেইন বা সবচেয়ে বড় কোন কম্পিউটার এর চেয়েও অনেক বিশাল হবে।

বার বার আমার ধর্মত্ত্ববিদ বন্ধুরা একটি বিষয়ের উপর গুরুত্ব দেন, তাহলো, কোন কিছু না থাকার চাইতে কিছু থাকার পেছনে নিশ্চয়ই কোন কারন আছে। সবকিছুর নিশ্চয়ই একটি প্রাথমিক কারণ থাকার কথা এবং আমরাও বরং এর নাম দিলাম ঈশ্বর। হ্যা, আমি বলেছি, এটা অবশ্যই এমন কিছু ছিল যা খুব সাধারন এবং সরল, এবং সুতরাং আমরা একে যে নামেই ডাকিনা কেন ঈশ্বর অবশ্যই এর সঠিক নাম হতে পারেনা (যদি না আমরা স্পষ্ট ভাবে খুব ধর্মীয় মনোভাবাপন্ন বিশ্বাসী কারো মনে ’ঈশ্বর’ শব্দটির সাথে জড়িত নানা অনুসঙ্গ এবং ভাবকে পরিহার করতে পারি); যে প্রথম কারনটাকে আমরা খুজছি, সেটা নিশ্চয়ই খুব সরল একটা ভিত্তি ছিল কোন স্বয়ংক্রিয় এবং স্বত:স্ফূর্ত বা সেল্ফ বুটস্ট্র্যাপিং ক্রেইন এর, যা আমাদের জানা সমস্ত পৃথিবীটাকে টেনে তুলে এনেছে আজকের এই

জটিল অস্তিত্বে। যদি প্রস্তাব করা হয় মুল আদি কারন বা প্রক্রিয়া শুরুকারী সত্ত্বাটি যথেষ্ট জটিল ছিল, যে কিনা ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইন বা পরিকল্পনা সৃষ্টির পিছনে সময় ক্ষেপন করেছে এবং একই সাথে বহু মিলিয়ন মানুষের মন পড়তে পারার ক্ষমতা তো আছেই, ব্যাপারটা অনেক তাশের ব্রীজ খেলায় পারফেক্ট কার্ড বা হাত পাওয়ার সমতুল্য । পৃথিবীতে জীবনের বৈচিত্রর দিকে তাকিয়ে দেখুন, আমাজনের রেইনফরেষ্ট, জালের মত করে ছড়ানো গাছের কান্ড, ব্রোমেলিয়াডের ঝোপ, শিকড় আর ফ্লাইং বাট্রেস, এদের নিজস্ব পিপড়া বাহিনী এবং তাদের জাগুয়ার, টাপির, পেকারী, গেছোব্যাঙ এবং প্যারোট। যা দেখছেন তা হলো সেই পারফেক্ট তাসের হাতের পাওয়ার মত পরিসংখ্যানের সমতুল্য (এবার ভাবুন আরো কতভাবে আপনি এটি সন্নিবেশ করতে পারেন এর অংশগুলো, যার কোনটাই সফল হবে না)– শুধু আমরা জানি কেমন করে এসবের সৃষ্টি হয়েছে : প্রাকৃতিক নির্বাচনের ক্রমান্বয়ে কাজ করা ক্রেইন এর মাধ্যমে। সবকিছু স্বত:স্ফুর্ত ভাবে গড়ে উঠেছে এই প্রস্তাবকে মুখ বুজে মেনে নেয়ার জন্য শুধুমাত্র বিজ্ঞানীরাই প্রতিবাদ করছেন না, আমাদের সাধারন কান্ডজ্ঞানও সরব এর বিরুদ্ধে। প্রথম কারন হিসাবে প্রস্তাব করা ,সেই মহান অজানা যা কোন কিছু না থাকার বদলে অস্তিত্ব থাকার জন্য দায়ী, যে কিনা পুরো মহাবিশ্ব ডিজাইন করতে সক্ষম এবং একই সাথে লক্ষ কোটি মানুষের মনের কথা পড়তে সক্ষম– এ ধরনের প্রস্তাব আসলে কোন ব্যাখ্যা খোজার প্রচেষ্টা থেকে সম্পুর্ণভাবে প্রত্যাহার করে নেয়ার মত। এটি আত্মতুষ্টি ও আত্মপ্রবঞ্চনা, চিন্তাকে অস্বীকারকারী দ্বিতীয় অধ্যায় ব্যাখ্যা করা আকাশ হুক প্রস্তাবের একটি ভয়াবহ প্রদর্শনী।

আমি কোন সংকীর্ণ বৈজ্ঞানিক চিন্তা করার প্রক্রিয়ার ওকালতি করছি না। কিন্তু অন্ততপক্ষে যে কোন সৎ সত্য অনুসন্ধান প্রচেষ্টা অবশ্যই এই অকল্পনীয় সুবিশাল অসম্ভাব্যতাগুলোকে, যেমন কোন রেইন ফরেষ্ট, কোন প্রবাল রীফ বা একটি মহাবিশ্ব ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করে, যা তা হলো ক্রেইন, কোন স্কাই হুক না। এই ক্রেইনকে যে প্রাকৃতিক নির্বাচন হতে হবে তেমন না। তবে স্বীকার করতেই হবে এরচেয়ে ভালো ব্যাখ্যা আর কেউ কখনো ভাবেনি। কিন্তু অন্য প্রক্রিয়াও থাকতে পারে যা এখনও আবিষ্কৃত হয়নি। হয়তো এটাই সেই ইনফ্লেশান যা পদার্থবিদরা প্রস্তাব করেছেন যা মহাবিশ্বের অস্তিত্বের প্রথম ইয়োক্টোসেকেন্ড (১ X১০ ^–২৪) অংশ বিশেষ দখল করে ছিল, যখন হয়তো এটা আরো ভালো করে বোঝা সম্ভব হবে, হয়তো দেখা যাবে এটি একটি কসমোলজিক্যাল ক্রেইন যা ডারউইনের বায়োলজিক্যাল ক্রেইনের মত। বা হয়তো সেই দুর্লভ ক্রেইন যা কসমোলজিষ্টরা খুজে বেড়াচ্ছেন তা হয়তো ডারউইনের ধারনাটারই একটি অন্য সংস্করন: স্মোলিন এর প্রস্তাবিত মডেল বা এর সদৃশ কিছু। বা হয়তো বা এটা হবে সেই মাল্টিভার্স এবং অ্যানথ্রোপিক মুলনীতির, যা মার্টিন রীস এবং অন্যরা সমর্থন করেন। এমনকি এটা হতে পারে কোন অতিমানবীয় ডিজাইনার, কিন্তু, যদি তাই হয়, এটা অবশ্যই সেই ঈশ্বরবাদীদের প্রস্তাবিত ডিজাইনার হবেন না , যিনি হঠাৎ করে অস্তিত্বশীল হওয়া কেউ না বা এমন কেউ না যিনি সবসময়ই ছিলেন। যদি (যা আমি একমুহুর্তের জন্য বিশ্বাস করিনা) আমাদের মহাবিশ্ব ডিজাইন করা হয়ে থাকে, এবং এ ফর্টিওরি বা আরো জোরালো যুক্তির কারনে, যদি ডিজাইনার আমাদের চিন্তা পড়তে পারে, আমাদের সবজান্তা উপদেশ দেয়া, ক্ষমা এবং পাপ থেকে মুক্তি দেন, সেই ডিজাইনার নিজেও কোন এক ধরনের ক্রমান্বয়ে পরিবর্ধনশীল এসকেলেটর বা ক্রেইন এবা অন্য কোন মহাবিশ্বের ডারউইনবাদের একটি সংস্করণের সর্বশেষ ফলাফল ।

কেমব্রিজে আমার সমালোচনাকারীদের শেষ আশ্রয়ের ভরসা ছিল আক্রমন। আমার সমস্ত বিশ্ব চিন্তাকে অপবাদ দেয়া হলো ’উনবিংশ শতাব্দীর’ আখ্যা দিয়ে। এটা এত বাজে একটা যুক্তি, আমি বলতে ভুলেই গিয়েছিলাম প্রায়। কিন্তু দু:খজনকভাবে প্রায়শই এর মুখোমুখি হতে হয় আমার। বলাবাহুল্য, কোন যুক্তিকে উনবিংশ শতাব্দীর বলা কিন্তু এই যুক্তির কি সমস্যা সেটা ব্যাখ্যা করা না। অনেক উনবিংশ শতাব্দীর ধারনাই ছিল বেশ ভালো ধারনা, আর ডারউইনের ভংঙ্কর ধারনাতো অবশ্যই। যাই হোক এই বিশেষ ধরনের সমালোচনা মনে হয় একটু বেশী বাড়াবাড়ি, কারন এটি এমন একজন ব্যক্তির কাছে থেকে এসেছে (একজন বিখ্যাত কেমব্রিজ ভুতত্ত্ববিদ, নি:সন্দেহে ফাউস্তিয় পথ ধরে টেম্পলটন পুরষ্কার পাবার পথে অনেক এগিয়ে আছেন); যিনি তার খৃষ্টীয় বিশ্বাসকে জায়েজ করার চেষ্টা করেছেন একটি প্রস্তাব উথাপন করে, যাকে তিনি বলেছেন, নিউ টেষ্টামেন্ট এর নব্য ঐতিহাসিক সত্যতা। ঠিক এই বিষয়টার প্রতি সন্দেহর প্রশ্ন ছুড়ে দিয়েছিলেন উনবিংশ শতাব্দীর জার্মান ধর্মতাত্ত্বিকরা প্রমান

ভিত্তিক ঐতিহাসিক গবেষনার মাধ্যমে। আসলেই এ বিষয়ে খুব দ্রুত তার দৃষ্টি আকর্ষন করেছিলেন সম্মেলনে উপস্থিত ধর্মবিদরা।

যাই হোক না কেন আমি জানি প্রাচীনদের এই ’উনবিংশ শতাব্দী’র বিদ্রুপটা । এটা সেই ’গ্রামের নাস্তিক’ এর সাথে মানানসই, এটা সেই ’আপনি যা মনে করুন না কেন, হা হা হা, আমরা কোন লম্বা দাড়ীওয়ালা বৃদ্ধ মানুষকে বিশ্বাস করি না আর, হা হা হা’। এই সব ঠাট্টাই অন্য কিছুকে বোঝানোর একটি সংকেত। যেমন ১৯৬০ সালে আমি যখন আমেরিকায় ছিলাম ’আইন শৃঙ্খলা’ ছিল কালোদের বিরুদ্ধে বিরুপ মনোভাবের একটি কোড। তাহলে, ধর্ম সম্পর্কে যুক্তির ক্ষেত্রে আপনার চিন্তাধারা সেই উনবিংশ শতাব্দীর আসলে কি সাংকেতিক বার্তা বহন করে? এটা আসলে সংকেত হচ্ছে এই বাক্যটার: ’এ ধরনের সরাসরি প্রশ্ন আমাকে জিজ্ঞাসা করতে আপনি এত স্থুলরুচির, চক্ষুলজ্জাহীন, কেমন করে আপনি এত অনুভুতিহীন এবং অভদ্র হতে পারলেন: যেমন,’ আপনি কি অলৌকিক অতিপ্রাকৃত ঘটনায় বিশ্বাস করেন ’বা ’আপনি কি বিশ্বাস করেন যীশুর জন্ম হয়েছিল কুমারী মার গর্ভে?’ আপনি কি জানেন না ভদ্র সমাজে এ ধরনের প্রশ্ন কেউ জিজ্ঞাসা করেনা? এই ধরনের প্রশ্নের চলন ছিল উনবিংশ শতাব্দীতে। কিন্তু চিন্তা করুন ধর্মবাদীদের প্রতি আজ এ ধরনের এমন সরাসরি, সত্যিকারের প্রশ্ন করাটা কেন অনম্রতার পরিচয়, কারন এটি বিব্রতকর! কিন্তু প্রশ্ন না এই প্রশ্নগুলোর উত্তর হচ্ছে বিব্রতকর, যদি এদের উত্তর হ্যা হয়ে থাকে।

উনবিংশ শতাব্দীর সম্পর্কটা এখন স্পষ্ট। উনবিংশ শতাব্দীই ছিল শেষ সময়, যখন সম্ভব ছিল কোন শিক্ষিত মানুষের পক্ষে কুমারী মায়ের জন্ম দেয়ার মত অলৌকিক ঘটনাকে কোন বিব্রতাকর পরিস্থিতিতে পড়ার সম্ভাবনা ছাড়াই সত্য বলে বিশ্বাস করা। চাপাচাপি করে প্রশ্নটা করলে, অনেক শিক্ষিত ক্রিষ্টান আজ অনেক বেশী অনুগত, যারা কুমারী মাতার জন্ম দেয়া এবং পুনর্জন্মকে অস্বাকীর করতে পারেন না। কিন্তু বিষয়টি তাদের বিব্রত করে, কারন তাদের যৌক্তিক মন জানে এটি কত অসম্ভব একটি ব্যাপার, সুতরাং তাদের প্রতি এ ধরনের প্রশ্ন না করাটাকে তারা শ্রেয়তর মনে করেন। সেকারনে আমার মত কেউ যদি নাছোড়বান্দার মত এই প্রশ্নটি করতেই থাকে, আমাকেই অভিযুক্ত করা হয় ‘উনবিংশ শতাব্দীর’ মানসিকতা সম্পন্ন বলে। চিন্তা করলে দেখবেন বিষয়টি আসলেই হাস্যকর।

আমি সেই সম্মেলন ত্যাগ করি, আরো প্ররোচিত, নতুন শক্তিতে বলীয়ান এবং আমার বিশ্বাস দৃঢ়করনের মাধ্যমে, যে অসম্ভাব্যতা থেকে যুক্তি –সেই আল্টিমেট বোয়িং ৭৪৭ – প্রস্তাবটি আসলে ঈশ্বরের অস্তিত্বের বিরুদ্ধেই একটি গুরুত্বপূর্ণ যুক্তি, যার বিরুদ্ধে আমি এখনও কোন ধর্মতাত্বিককে কোন যুক্তিযুক্ত উত্তর দিতে শুনিনি, বহুবার তাদের সেই সুযোগ এবং আমন্ত্রন জানানো সত্বেও। ড্যান ডেনেট সঠিকভাবেই বর্ণনা করেছিলেন, ’এটি হচ্ছে একটি অখন্ডনযোগ্য পাল্টা যুক্তি। এখনও এটি শক্তিশালী সেই সময়ের মত যখন দুই শতাব্দী আগে হিউমের সংলাপে ফিলো একে ব্যাবহার করেছিলেন ক্লীনথেসকে পরাজিত করার জন্য। কোন আকাশ থেকে নেমে আসা স্কাইহুক বড়জোর এই সমস্যার সমাধানকে স্থগিত করতে পারে। কিন্তু হিউম তখন কোন ক্রেইনের কথা ভাবতে পারেননি, সুতরাং খানিকটা পিছু তাকে হটতে হয়েছে [২৭]; অবশ্যই ডারউইন, সেই গুরুত্বপর্ণ ক্রেনটি সরবরাহ করেছিলেন, হিউম এটিকে কত বেশী যে পছন্দ করতেন তা বলাবাহুল্য।

এই অধ্যায়ে আমার বই এর কেন্দ্রীয় যুক্তিগুলো আছে এবং সে কারনে, পুরনাবৃত্তি হবার ঝুকি নিয়েও আমি সংক্ষিপ্ত আকারে এই ছয়টি আলাদা পয়েন্টের আকারের ব্যাখ্যা দিচ্ছি:

১. বহু শতাব্দী ধরেই মানুষের বুদ্ধিমত্তার প্রতি সবচেয়ে বড় চ্যালেন্জ্ঞটি ছিল, কেমন করে মহাবিশ্বে জটিল এবং আপাতদৃষ্টিতে অসম্ভাব্য ডিজাইন বা পরিকল্পনার এই রুপটির উদ্ভব হয়েছে।

২. স্বাভাবিক ভাবে প্রবণতা হলো, এই আপাতদৃষ্টিতে ডিজাইন বা পরিকল্পনাকে সত্যিকারের ডিজাইন হিসাবে গুনারোপ করে। মানুষের তৈরী কোন বস্তু যেমন একটি ঘড়ি, যেখানে পরিকল্পনাকারী বা ডিজাইনার আসলেই

একজন বুদ্ধিমান প্রকৌশলী। খুবই লোভনীয় যে একটি চোখ, একটি পাখা, একটি মাকড়শা বা কোন মানুষের ক্ষেত্রেও এই একেই যুক্তি প্রয়োগ করা।

৩. এই লোভনীয় প্ররোচনাটি মিথ্যা, কারন ডিজাইনার হাইপোথিসিসটি আরো বড় একটি প্রশ্নের জন্ম দেয়, কে ডিজাইন করেছে এই সবকিছুর ডিজাইনারকে। আমরা যে মুল সমস্যাটি নিয়ে প্রথমে শুরু করেছিলাম তা ছিল পরিসংখ্যানগত দিক থেকে অসম্ভাব্যতাকে ব্যাখ্যা করার বিষয়টি। বেশী অসম্ভব কিছুকে প্রস্তাব করা অবশ্যই কোন সমাধান নয়। আমাদের দরকার একটি ক্রেইন, কোন স্কাই হুক না। কারন ক্রেনই পারে সেই কাজটি করতে, ধীরে ধীরে ব্যাখ্যা যোগ্য কোন একটি উপায়ে সরলতা থেকে সেই অসম্ভাব্য জটিলতার দিকে অগ্রসর হতে।

৪. সবচেয়ে অসাধারন এবং শক্তিশালী ক্রেইন এই অবধি যা আবিষ্কার হয়েছে তা হলো প্রাকৃতিক নির্বাচেনের মাধ্যমে ডারউইনীয় বিবর্তন। ডারউইন এবং তার পরবর্তী অনুসারীরা প্রমান করেছেন কিভাবে জীবিত প্রানী, তাদের অবিশ্বাস্য রকম চমকপ্রদ পরিসংখ্যানগত অসম্ভাব্যতা ও আপাতদৃষ্টিতে ডিজাইন মনে হওয়ার মত বৈশিষ্টগুলো কিভাবে বিবর্তিত হয়েছে মন্থর একটি ক্রমাগত প্রক্রিয়ায় খুব সরল একটি সুচনা থেকে।আমরা এখন নিরাপদে বলতে পারে, জীবিত প্রানীদের মধ্যে নানা বৈশিষ্টের ডিজাইনের বিভ্রম আসলেই শুধুমাত্র একটি বিভ্রম।

৫. পদার্থবিজ্ঞানের জন্য সমতুল্য কোন ক্রেইন আমাদের নেই। কোন একধরনের মাল্টিভার্স তত্ব নীতিগত ভাবে পদার্থবিদ্যার জন্য সেই ব্যাখ্যার কাজটি পারে যা জীববিজ্ঞানের জন্য ডারউইনবাদ করেছে। এ ধরনের ব্যাখ্যা ডারউইনবাদের জীববিজ্ঞানীয় সংস্করনের হালকাভাবে কম সন্তোষজনক হবে, কারন ভাগ্যর উপর এটি দাবী অনেক বেশী। কিন্তু অ্যানথ্রোপিক প্রিন্সিপাল আমাদের সুযোগ করে দিয়েছে প্রস্তাব করা যে, আমাদের সীমাবদ্ধ মানবীয় অন্তর্দৃষ্টি যতটুকু তে স্বস্তি বোধ করে তার চেয়ে বেশী ভাগ্যর ভুমিকার কথা।

৬. জীববিজ্ঞানে ডারউইনবাদ যেমন শক্তিশালী পদার্থবিজ্ঞানে তেমন শক্তিশালী কোন কিছু, আরো উত্তম কোন ক্রেইনের ব্যাখ্যার জন্য আমাদের আশা ছাড়া ঠিক হবেনা। কিন্তু এমনকি জীববিজ্ঞানের ক্রেইনের মতো আরো বেশী সন্তোষজনক কোন ক্রেনের অনুপস্থিতিতে, অপেক্ষাকৃতভাবে দুর্বল ক্রেইনটি যা বর্তমানে আমাদের আছে, যা সাথে বাড়তি শক্তি হিসাবে যুক্ত অ্যানথ্রোপিক মুলনীতি সুস্পষ্টভাবেই একজন বুদ্ধিমান ডিজাইনারের স্বপরাজিত স্কাইহুক হাইপোথিসিসের চেয়ে উত্তম।

যদি এই অধ্যায়ের যুক্তি গুলো মেনে নেয়া হয়, তাহলে ধর্মকে সত্যি দাবী করার যুক্তি – দি গড হাইপোথিসিস, আসলেই প্রমানযোগ্য থাকে না। ঈশ্বরের প্রায় নি:সন্দেহে কোন অস্তিত্ব নেই। এই বই এর আপাতত এটাই মুল উপসংহার। অনেক ধরনের প্রশ্ন এখন উঠবে। এমনকি আমরা যদি মেনে নেই ঈশ্বরের অস্তিত্ব নেই, তারপরও কি ধর্মের টিকে থাকার বহু রসদ থাকার কথা না? বিষয়টা কি স্বান্তনার না? এটিকি মানুষকে ভালো কাজ করতে প্ররোচিত করেনা? ধর্ম না থাকলে, আমরা কিভাবে কোনটা ভালো তা জানবো? কেনই বা, তাহলে এর প্রতি এত শত্রুভাবাপন্ন হচ্ছি ? যদি এটি মিথ্যাই হয়ে থাকে, তাহলে কেন পৃথিবীর প্রতিটি সংস্কৃতিকে ধর্ম বিষয়টির অস্তিত্ব আছে? সত্যি হোক কিংবা মিথ্যা, ধর্মর উপস্থিতি সর্বব্যাপী, তাহলে কোথা থেকে এটি আসলো ? পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা এই শেষ প্রশ্নটির দেবো।

চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত।

পাদটিকা

---

[২৬] J. Horgan, ‘The Templeton Foundation: a skeptic’s take’, Chronicle of Higher Education, 7 April 2006. See also.http://www.edge.org/3rd_culture/horgan06/horgan06_index.html.

[২৭] P. B. Medawar, review of The Phenomenon of Man, repr. in Medawar, P. B. (1982). Pluto's Republic. Oxford: Oxford University Press (1982: 242).

[২৮] Dennett, D. (1995). Darwin's Dangerous Idea. New York: Simon & Schuster (1995: 155).

রিচার্ড ডকিন্স এর দি গড ডিল্যুশন: পঞ্চম অধ্যায় (প্রথম পর্ব)

By K M Hassan

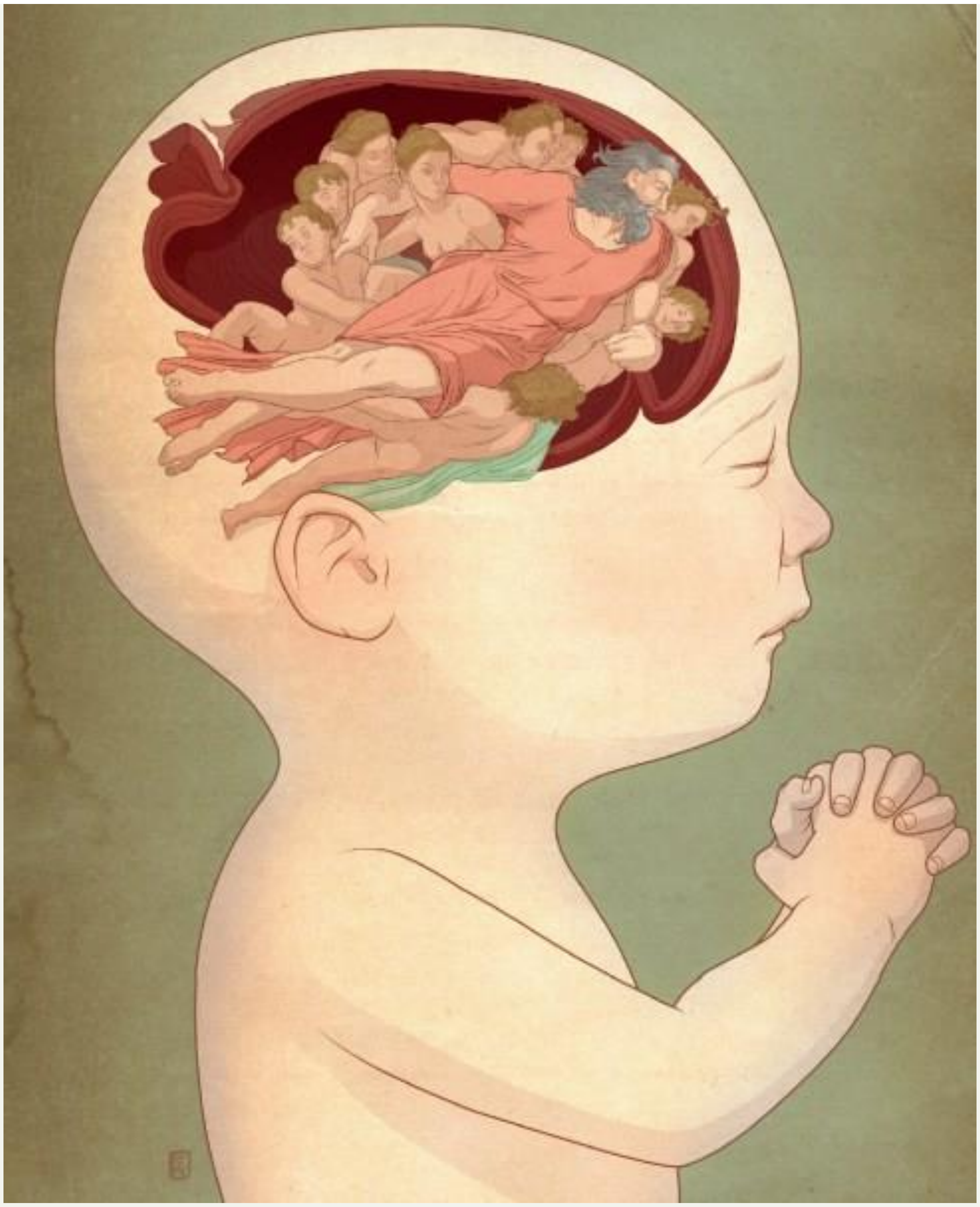

Richard Wilkinson এর একটি ইলাসট্রেশন, সুত্র: The God Issue, Born Believers (NewScientist ,17 March 2012)

রিচার্ড ডকিন্স এর দি গড ডিলুশন : পঞ্চম অধ্যায় (প্রথম পর্ব)

(অনুবাদ প্রচেষ্টা: কাজী মাহবুব হাসান)

The God Delusion by Richard Dawkins

প্রথম অধ্যায়
দ্বিতীয় অধ্যায়
তৃতীয় অধ্যায়
চতুর্থ অধ্যায় (প্রথম পর্ব) , চতুর্থ অধ্যায় (দ্বিতীয় পর্ব) ,
চতুর্থ অধ্যায় (তৃতীয় পর্ব) , চতুর্থ অধ্যায় (চতুর্থ পর্ব) , চতুর্থ অধ্যায় (শেষ পর্ব)

ধর্মের শিকড়

একজন বিবর্তন মনোবিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে, ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের সর্বজনীন আড়ম্বরময় বাহুল্যতা এবং সময়, সম্পদ, কষ্ট এবং আত্মবিসর্জনের মানদন্ডে তাদের মুল্য, মানড্রিল এর পশ্চাৎদেশের মতই সুস্পষ্টভাবে ইঙ্গিত দেয়া উচিৎ যে, ধর্ম হয়তো অভিযোজনীয় একটি কৌশল ◌– মারেক কোন

ডারউইনীয় আবশ্যিকতা:

ধর্ম কোথা থেকে আসলো এবং কেন প্রতিটি মানব সংস্কৃতিতে বিষয়টি বিদ্যমান এ বিষয়ে সবারই নিজস্ব কোন না কোন পছন্দের তত্ব আছে। এটি আমাদের স্বান্তনা দেয়, স্বস্তি দেয়; গোষ্ঠী অভ্যন্তরের সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগীতা আর নৈকট্যকে লালন করে। কেন আমরা বেচে আছি? এটি অস্তিত্বের এই প্রশ্নের উত্তরকে বোঝার জন্য আমাদের তীব্র আকাঙ্খাকে সন্তুষ্ট করে। আমি কিছুক্ষন পরেই এই সব তত্বগুলোর ব্যাখ্যা দেবো, কিন্তু তার আগে আমি একটি পুর্ববর্তী প্রশ্ন দিয়েই শুরু করতে চাই, যে প্রশ্নটি অগ্রাধিকার পাবে বিভিন্ন কারনে, যা আমরা পরবর্তী আলোচনায় দেখবো: প্রাকৃতিক নির্বাচন সংক্রান্ত একটি ডারউইনীয় প্রশ্ন।

আমরা যে ডারউইনীয় বিবর্তনের ফলে ফসল সেই বিষয়টি মনে রেখেই, আমাদের প্রশ্ন করা উচিৎ, প্রাকৃতিক নির্বাচন প্রক্রিয়ায় আরোপিত কোন চাপ বা চাপসমুহ মুলত ধর্মের প্রতি আমাদের তাড়নাকে উৎসাহিত করেছে। এই প্রশ্নটা আরো গুরুত্বপুর্ণ হয়ে ওঠে স্বীকৃত ডারউইনীয় বিবেচনায় মিতব্যায়ীতা অর্থাৎ অর্থনীতির পেক্ষাপটে। ধর্ম এত বেশী অপচয়পুর্ণ, বাহুল্যময় এবং ডারউইনীয় নির্বাচন স্বভাবগত প্রক্রিয়ায় যে কোন ধরনের অমিতব্যায়ীতা নিশানা করে ও তাকে নির্মুল করে। প্রকৃতি খুবই কৃপন স্বভাবের একজন হিসাব রক্ষকের মত,যে প্রতিটি পয়সা যেন টিপে টিপে খরচ করে, সময়ের দিকে নজর রেখে,সামান্যতম বাহুল্যতাকে যে শাস্তি দেয়;যেমন ডারউইন ব্যাখ্যা করেছিলেন, `অবধারিত এবং অবিরামভাবে প্রাকৃতিক নির্বাচন প্রতি দিন, প্রতি ঘন্টায় সারা বিশ্বজুড়ে তার নজরদারী অব্যাহত রাখে , প্রতিটি বৈচিত্রতা, তা যত সামান্যই হোক না কেন; যা ক্ষতিকর সেগুলো বর্জন করে, এবং রক্ষা ও ক্রমশ জমা করতে থাকে যা কিছু উপকারী; নীরবে, অনুভুতিহীন ভাবে সে কাজ করে যাচ্ছে, যেখানে এবং যখনই সেই সুযোগ আসছে, প্রতিটি জীবের উন্নতির লক্ষ্য ’; যদি কোন বন্য জীব স্বভাববশত প্রতিদিনই অর্থহীন কোন কর্মকান্ড করে যেতে থাকে, প্রাকৃতিক নির্বাচন তার প্রতিদ্বন্দী সদস্যদের সহায়তা করবে যারা তাদের সময় এবং শক্তি ও শ্রম, অর্থহীন কোন কর্মকান্ডর পরিবর্তে বরং ব্যায় করে বেচে থাকা ও বংশ বিস্তারের জন্য। প্রকৃতির উপায় নেই কোন খামখেয়ালী অপ্রয়োজনীয় কাজ বা Jeux d’espirit কে প্রশ্রয় দেবার। নিষ্ঠুর উপযোগিতাবাদেরই জয় হয়, এমনকি আপাতদৃষ্টিতে বহু ক্ষেত্রে যখন সেরকম কিছু হচ্ছে বলে আমাদের মনে হয় না।

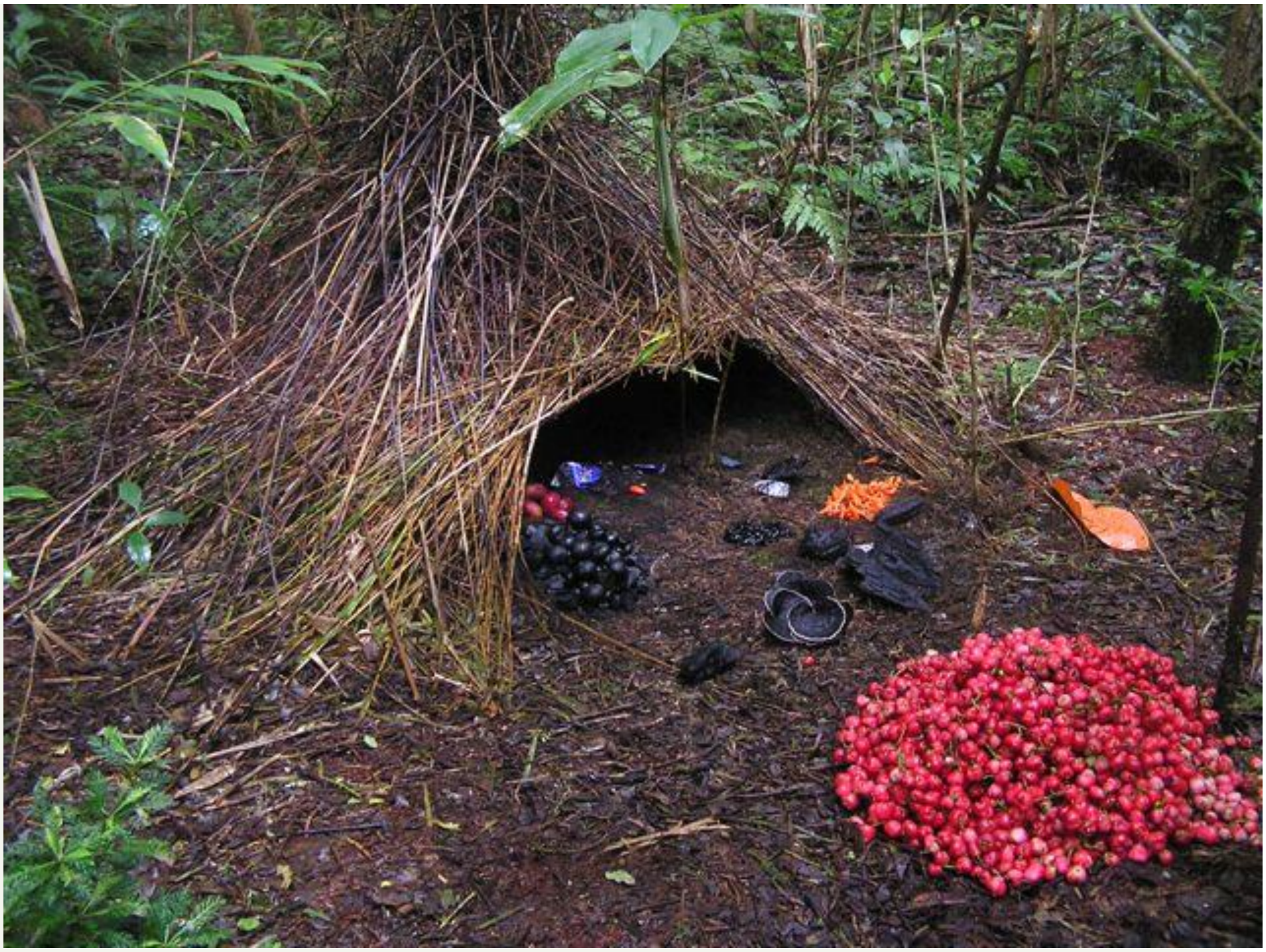

ছবি: পুরুষ বোয়ার পাখিদের বানানো বোয়ার (ছবি সুত্র)

বোয়ার পাখিদের কিছু বোয়ার এর অসাধারন কিছু ছবি আছে টিম লামান এর এই গ্যালারীটিতে)

ছবি: ব্লু জে পাখির অ্যান্টিং (ছবি সুত্র)

প্রথম দেখাতে মনে হবে, ময়ুরের পুচ্ছ হচ্ছে অন্যতম সেরা খামখেয়ালী ইচ্ছার একটি উদহারন;নিশ্চয়ই এটি এর বাহককে বেচে থাকার জন্য কোন বাড়তি সুবিধা প্রদান করছে না; কিন্তু এটি অবশ্যই সহায়তা করছে এর বাহকের জীনকে, কম দৃষ্টিনন্দন কিংবা বিশেষত্ব সম্পন্ন পুচ্ছসহ অন্য বাহক থেকে পৃথক করার মাধ্যমে। ময়ুরের এই পুচ্ছ আসলে বিজ্ঞাপন, যা তাকে তার প্রজনন সঙ্গীনিকে আকর্ষন করার জায়গাটা ক্রয় করার সুযোগ করে দেয় প্রকৃতির অর্থনীতিতে। এবং বিষয়টি ঠিক একই ভাবে সত্যপুরুষ বোয়ার (Bower) পাখিদের ক্ষেত্রে, যারা বিস্ময়কর পরিমান শ্রম ও সময় ব্যয় করে তাদের বোয়ার তৈরী করতে : বোয়ার হচ্ছে গাছের ডালপালা দিয়ে তৈরী একটি স্থাপনা, যাকে বলা যায় একধরনের শরীরের বাইরে তৈরী করা পুচ্ছ, যা পুরুষ বোয়ার পাখীরা গাছের ডাল, ঘাস, রঙ্গীন কোন ফল বা বেরী, এবং যদি পাওয়া যায় নানা রঙ্গের পুতি, বোতলে ছিপি বা কোন রঙ্গীন কোন কিছু দিয়ে সাজায় নারী বোয়ার পাখিকে আকর্ষন করার জন্য। বা আরো একটি উদহারন পছন্দ করা যেতে পারে, যা এরকম কোন বিজ্ঞাপন এর সাথে জড়িত না, যেমন অ্যান্টিং (anting), বেশ কিছু পাখিদের অদ্ভুত একটি অভ্যাস আছে সেটি হলো , হলো ’পিপড়ার ডিবি’তে ’গোছল’ করা বা অন্য কোন উপায়ে পাখিগুলো তাদের নিজেদের পালকে পিপড়ার পাল ছড়িয়ে দেয়ার প্রক্রিয়া। কেউই নিশ্চিৎ না এই কাজটা করার কি উপকারিতা আছে – হতে পারে

এটি কোন ধরনের স্বাস্থ্য রক্ষার একটি উপায়, পালক থেকে পরজীবি জীবানুগুলো পরিষ্কার করার একটি প্রক্রিয়া; আরো অনেক হাইপোথিসিস আছে এ বিষয়ে, কিন্তু কোনটারই স্বপক্ষে তেমন কোন জোরালো প্রমান আপাতত নেই। কিন্তু এধরনের কোন খুটিনাটি বিষয়ে অনিশ্চয়তা কখনোই (এবং কখনো উচিৎ ও না) কোন ডারউইনবাদীদের বেশ আত্মবিশ্বাসের সাথে ধারনা করতে কোন বাধা দেয়না যে, এই অ্যান্টিং এর অবশ্যই কোন কারন আছে। এই ক্ষেত্রে আমাদের সাধারন কান্ডজ্ঞানও হয়তো একমত হবে,কিন্তু ডারউইনীয় যুক্তির এভাবে চিন্তা করার কিছু নির্দিষ্ট কারন আছে, যেমন যদি পাখীরা এভাবে কাজটি না করে, তাহলে হয়তো দেখা যেতে পারে তাদের জীনগত সাফল্যের পরিসংখ্যানগত প্রত্যাশিত সম্ভাবনা ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে, এমন কি যদিও আমরা বর্তমানে জানিনা ঠিক কিভাবে এই ক্ষতিটি হতে পারে। কারন এই উপসংহারের ভিত্তি হলো, প্রাকৃতিক নির্বাচনের জোড় ভিত্তিটি যে, প্রাকৃতিক নির্বাচন সময় এবং শক্তি, এ দুটোর অপচয়কেই শাস্তি দেয় এবং এই সব পাখীদের সময় এবং শক্তি ব্যয় করে অ্যান্টিং করতে দেখা যায় নিয়মিতভাবেই। যদি কোন এক বাক্যের কোন ম্যানিফেষ্টো দিয়ে এই অ্যাডাপশনিষ্ট বা অভিযোজনবাদী মুলমন্ত্রকে প্রকাশ করা যায়, কোন সন্দেহ নেই এটিকে চুড়ান্ত এবং বাড়াবাড়ি রকমের গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ করেছিলেন হার্ভার্ড এর বিখ্যাত জীনতত্ত্ববিদ রিচার্ড লিওনটিন: ’আমার মনে হয় এই বিষয়ে বিবর্তনবাদীরা সবাই একমত হবেন, যে তাদের নিজস্ব পরিবেশে কোন একটি জীব অভিযোজনের জন্য যা করছে তারচেয়ে ভালো কোনভাবে সেই কাজটি করা প্রায় অসম্ভব’(১); যদি অ্যান্টিং এর আচরনটি বেচে থাকা এবং প্রজনন এই দুটি ক্ষেত্রে কোন ইতিবাচক উপযোগিতা না রাখতো, বহু আগেই প্রাকৃতিক নির্বাচন প্রজাতির যে সদস্যরা এটি করছে না তাদের প্রতি পক্ষপাতিত্ব দেখাতো। একজন ডারউইনবাদীও ধর্ম সম্বন্ধে সেভাবে বলার জন্য কোন তাড়না অনুভব করতে পারেন, আর সে কারনে এই আলোচনা।

একজন বিবর্তনবাদীর কাছে ধর্মী আচারগুলো সুর্যের আলোয় উদ্ভাভিত বনের কোন খোলা মাঠে ঝকমক করে দৃষ্টি আকর্ষন করা ময়ুরের পেখম (ড্যান ডেনেট এর ভাষায়) এর মতই মনে হতে পারে। ধর্মীয় আচরন অত্যন্ত স্পষ্ট ভাবেই পাখিদের অ্যান্টিং বা বোয়ার বানানো মত কাজগুলোর মনুষ্য সমতুল্য একটি কাজ। অবশ্যই এই কাজটি সময় সাপেক্ষ, শক্তি খরচকারী, প্রায়ই অতিমাত্রায় বাহুল্যপুর্ণ বা আলঙ্কারিক, বার্ড অব প্যারাডাইসের পালকপুঞ্জের মতই। কখনো ধর্ম, কোন ধার্মিক ব্যক্তির জন্য এবং এমন কি অন্যদের জন্যও জীবন নাশক হতে পারে; লক্ষ হাজার মানুষকে নিষ্ঠুরভাবে অত্যাচার করা হয়েছে কোন বিশেষ ধর্মের প্রতি তাদের প্রদর্শিত আনুগত্যর জন্য, অতি উৎসাহী ধর্মান্ধদের হাতে তাদের সহ্য করতে সীমাহীন নিপীড়ন হয়তো এমন কোন বিশ্বাসের জন্য যা প্রায় ক্ষেত্রেই বিকল্প অন্য বিশ্বাসটি (যাদের অনুসারীদের হাতে নীপিড়নের শিকার হতে হচ্ছে) থেকে খুব সামান্যই আসলে ভিন্ন। ধর্ম অর্জিত সম্পদকে গ্রাস করে, এবং কখনো তার মাত্রা অতিরিক্ত। মধ্যযুগীয় কোন ক্যাথিড্রাল বানানোর জন্য শত মানুষের শতাব্দী কালের পরিশ্রমের প্রয়োজন হয়, অথচ সেই স্থাপনাটি যার পেছনে এত সময়, শ্রম আর সম্পদের ব্যবহার হচ্ছে, সেই স্থাপনাটি কখনোই বসবাসের জন্য বা স্বীকৃত এমন কোন উপযোগী কারনেও বানানো হয় না। এটা তাহলে একধরনের স্থাপত্যকর্মের ময়ুর পুচ্ছ? যদি তাই হয়, তাহলে এর বিজ্ঞাপনটি কাদের প্রতি নির্দেশিত। পবিত্র ভক্তিসঙ্গীত এবং ভক্তিময় চিত্রকলা মধ্যযুগীয় এবং রেনেসার প্রতিভায় প্রায় একচেটিয়া প্রভাব ফেলেছিল। ভক্তিপুর্ণ ধর্মে নিবেদিত কোন মানুষ তার ঈশ্বরের জন্য যেমন মরতেও পারে, অন্যকেও অনায়াসে মারতেও পারে। তারা নিজেদের চাবুক দিয়ে পিটিয়ে শরীরকে ক্ষতবিক্ষত করে রক্তক্ষরন করে, বা কঠিন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয় আজীবন কুমার হয়ে একাকী নির্জনতায় জীবন কাটাতে, সবই ধর্মের জন্য নিবেদিত। কেন ? কিসের জন্য এই সব? ধর্মের কি আসলেই কোন ‘উপকারিতা’ আছে?

এই ’উপকারিতা’ শব্দটি দিয়ে ডারউইনবাদীরা সাধারনত বোঝান কোন একক সদস্যর জীনের বেচে থাকার জন্য কোন ধরনের উপকারী ও উপযোগী পরিবর্ধন। আর এই ধারনার মধ্যে যে বিষয়টি অনুপস্থিত তা হলো ডারউইনীয় কোন উপকারিতা কোন একক জীব সদস্যর জীনের প্রতি সীমাবদ্ধ নয়। উপকারিতার সম্ভাব্য আরো তিনটি বিকল্প নিশানাও থাকতে পারে। একটি আসছে গ্রুপ সিলেকশন (Group Selection) তত্ব থেকে, আর সে বিষয়ে আমি পরে আলোচনায় আসছি। দ্বিতীয়টি আসছে সেই তত্ব থেকে যা আমি ব্যাখ্যা ও সমর্থন করেছিলাম

আমার The extended Phenotype (দি এক্সটেন্ডেড ফেনোটাইপ) বইটিতে: কোন একটি একক জীব যাকে আপনারা দেখছেন, সে হয়তো অন্য আরো একটি একক জীবের জীনের নিয়ন্ত্রণকারী প্রভাবের আওতায় কাজ করছে, হয়তো সেটা হতে পারে কোন পরজীবি। ড্যান ডেনেট আমাদের মনে করিয়ে দিয়েছিলেন, সাধারন সর্দিজ্বরের মতই ধর্মও সব মানুষের মধ্যে সর্বজনীন, তা স্বত্বেও আমরা কিন্তু এমন প্রস্তাব করছি না যে, সর্দিজ্বর আমাদের কোনভাবে উপকার করছে। প্রানী জগতে এমন অনেক উদহারন আছে, যেখানে কোন পরজীবির এক পোষক থেকে অন্য পোষকে বিস্তার লাভ করার সুবিধার জন্য তারা তাদের পোষক জীবটির আচরণগত পরিবর্তন ঘটাতে প্ররোচিত করতে সক্ষম। আমি এই বিষয়টি ব্যাখ্যা করেছিলাম আমার `দি এক্সটেন্ডেড ফেনোটাইপের কেন্দ্রীয় সুত্র’ হিসাবে: কোন জীবের আচরন সেই আচরনের ’জন্য’ নির্দিষ্ট জীনগুলোকে টিকিয়ে রাখার বিষয়টি সর্ব্বোচ্চভাবে নিশ্চিৎ করার চেষ্টা করে, সেই জীনগুলো সেই আচরণ করা প্রানীর শরীরে থাকুক বা না থাকুক।

তৃতীয়, কেন্দ্রীয় তত্ত্বটি হয়ত জীন শব্দটিকে আরো সাধারণ বহুব্যবহৃত রেপ্লিকেটর শব্দটি দিয়ে প্রতিস্থাপিত করতে পারে। একটি ফ্যাক্ট হলো ধর্মের সর্বব্যাপীতা সম্ভবত ইঙ্গিত করছে যে, ধর্মর কোন না কিছুর উপকারিতার জন্য বিষয়টি কাজ করছে কিন্তু সেটা আমাদের বা আমাদের জীনের জন্য নাও হতে পারে। হতে পারে এটি উপকারী শুধু ধর্মীয় ধারনাগুলোর নিজেদের জন্য; এবং তা এমন পর্যায় অবধি যে সেই অর্থে তাদের আচরণ অনেকটাই জীন বা রেপ্লিকেটর এর মত। বিষয়টি নিয়ে পরবর্তীতে আমি আরো বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেছি, ’সাবধানে হাটুন, কারন আপনি আমার মীমের উপর দিয়ে হাটছেন’ এই শিরোনামের অধীনে। তবে তার আগে আমি আরো বেশী ডারউ্ইনবাদের আরো বেশ ঐতিহ্যবাহী ব্যাখ্যাটা নিয়ে আলোচনা চালিয়ে যেতে চাই। যেখানে বেনিফিট বা উপকার বলতে মনে করা হয়েছে কোন একক জীব সদস্যর বেচে থাকা এবং প্রজনন ক্ষেত্রে উপকার।

ধারনা করা হয় আদি পুর্বপুরুষরা যেভাবে বাস করতো অষ্ট্রেলিয়ার আদিবাসী শিকারী সংগ্রহকারী বা হান্টার গ্যাদারার মানবগোষ্ঠী খুব সম্ভবত সেরকম উপায়েই জীবন যাপন করে। নিউজিল্যান্ড/অষ্ট্রেলীয় বিজ্ঞানের দার্শনিক কিম স্টেরেলনাই তাদের জীবনের নাটকীয় কিছু স্ববিরোধীতা বা বৈপরিত্যকে তুলে ধরেছেন। একদিকে যেমন আদিবাসীরা বেচে থাকার জন্য দুর্দান্ত কৌশলী, বিশেষ করে যে বৈরী পরিবেশে ও পরিস্থিতিতে তাদের সকল ব্যবহারিক দক্ষতাকে চুড়ান্তভাবে পরীক্ষা দিতে হয়; কিন্তু স্টেরেলনাই আরো যোগ করেন, আমরা প্রজাতি হিসাবে বুদ্ধিমান হতে পারি, তবে এই বুদ্ধিমত্তাটা বিকৃত। যে মানুষগুলো প্রাকৃতিক বিশ্ব সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান রাখে, জানে সেখানে কিভাবে বেচে থাকতে হয় তারাই আবার কি করে একই সাথে তাদের মনের ভিতরে নানা উদ্ভট বিশ্বাস দিয়ে এলোমেলো করে ভরে রাখে, যে বিশ্বাসগুলো একেবারে স্পষ্টভাবেই মিথ্যা, যার জন্য ’অর্থহীন’ শব্দটিও হবে অতি মাত্রায় একটি স্বল্পভাষন। কিম স্টেরেলনাই নিজে সুপরিচিত ছিলেন পাপুয়া নিউ গিনির আদিবাসীদের সম্বন্ধে। তারা বেচে থাকে ভীষন কঠিন একটি পরিবেশে যেখানে খাদ্যর সন্ধান পাওয়া খুবই কঠিন একটি বিষয়, আর সেটা সম্ভব হয় শুধুমাত্র তাদের চারপাশের জৈববৈজ্ঞানিক পরিবেশ সম্বন্ধে সঠিক জ্ঞান প্রয়োগ করার মাধ্যমেই কেবল, কিন্তু তারা তাদের এই প্রাকৃতিক জ্ঞানটার সাথে যুক্ত করে রেখেছে নারীর মাসিক কালীন দুষিতকরণ এবং ডাকিনীবিদ্যা সম্বন্ধে তাদের গভীরভাবে ক্ষতিকর বদ্ধমুল কিছু ধারনা। অসংখ্য স্থানীয় গোত্র ম্যাজিক এবং ডাকিনীবিদ্যার ভয়ে এবং সেই ভয়ের সাথে জড়িত সহিংস অত্যাচারের শঙ্কায় শঙ্কিত। স্টেরেলনাই আমাদের সামনে চ্যালেন্জ ছুড়ে দেন, কেমন করে আমরা একই সাথে এত বুদ্ধিমান এবং এক নির্বোধ হতে পারি?(২);

খুটিনাটি বিষয়ে পার্থক্য হয়তো থাকতে পারে, কিন্তু সারা পৃথিবী জুড়ে এমন কোন সংস্কৃতিতে নেই, যেখানে কোন না কোন এক সংস্করনের এ ধরনের সময় বিনষ্টকারী, সম্পদ নষ্টকারী, শত্রুতার অনুভুতি উস্কে দেবার মত আচার অনুষ্ঠান, অবাস্তব, অনুৎপাদনশীল ধর্মীয় কল্পকাহিনীর অস্তিত্ব নেই। কিছু শিক্ষিত মানুষ হয়তো ধর্মকে ত্যাগ করেছেন, কিন্তু তারা সবাই প্রতিপালিত হয়েছেন কোন না কোন ধর্মীয় সংস্কৃতির পরিমন্ডলে, যেখান থেকে বেরিয়ে আসার জন্য সাধারনতঃ তাদের সচেতনভাবেই সিদ্ধান্ত নিতে হয়। উত্তর আয়ারল্যান্ডের বেশ পুরোনো কৌতুকটি: ’বেশ ভালো কথা বুঝলাম আপনি নাস্তিক ,কিন্তু আপনি কি প্রটেষ্টান্ট নাস্তিক নাকি ক্যাথলিক নাস্তিক? এখানে কিন্তু

মিশ্রিত আছে তিক্ত সত্যটি। বিষম লিঙ্গের (হেটেরোসেক্সুয়াল) মধ্যে যৌনতার বিষয়টি যেমন সর্বজনীন বলা হয়, ধর্মীয় আচরনও তেমন মানুষের জন্য সর্বজনীন একটি আচরন বলা যেতে পারে। দুই সাধারণীকরনের মধ্যেই সুযোগ আছে এককভাবে ব্যক্তিগত এর থেকে ভিন্ন কোন আচরনের বিষয়টি মেনে নেবার, কিন্তু সেই সব ব্যতিক্রমকেও ব্যাখ্যা দেয়া হয় বা বোঝানো হয় যে, তারা আসলে মুল নিয়ম থেকে সরে এসেছে। আর কোন প্রজাতির মধ্য বিদ্যমান সর্বজনীন কোন বৈশিষ্ট অবশ্যই ডারউইনীয় ব্যাখ্যা দাবী করে।

অবশ্যই কোন জীবের যৌন আচরনের ডারউইনীয় উপযোগিতা ব্যাখ্যা করা তেমন কোন কঠিন কাজ না;এর উদ্দেশ্য হচ্ছে সন্তান তৈরী করা, এমন কি যখন জন্মনিরোধক ব্যবহার বা সমকামিতা আপাতদৃষ্টিতে এ বিষয়টি মিথ্যা এমন একটি ধারনা দেয়। কিন্তু ধর্মীয় আচরন তাহলে কি? কেন মানুষ নিয়মমাফিক উপবাস করে, হাটু ভেঙ্গে মাথা নত করে, নিজেদের চাবুক দিয়ে পেটায়, দেয়ালের দিকে তাকিয়ে পাগলের মত মাথা নাড়ায়, ধর্মযুদ্ধ করে বা অনথ্যায় এমন কিছু কষ্ট আর সময়সাপেক্ষ আচরনের ব্যস্ত হয়, যা তাদের সমস্ত জীবনকে অধিগ্রহন আর গ্রাস করে এবং চরম কিছু ক্ষেত্রে মৃত্যুও নিশ্চিৎ করে;

তথ্য সুত্র:

(১) Dawkins, R. (1982). The Extended Phenotype. Oxford: W. H. Freeman.
(২) K. Sterelny, ‘The perverse primate’, in Grafen and Ridley (2006:213-23).

রিচার্ড ডকিন্স এর দি গড ডিলুশন : পঞ্চম অধ্যায় (দ্বিতীয় পর্ব)

By K M Hassan

ছবি: ডেভিড কাটলার (David Cutler) এর একটি ইলাসট্রেশন, Curiosity

রিচার্ড ডকিন্স এর দি গড ডিল্যুশন : পঞ্চম অধ্যায় (দ্বিতীয় পর্ব)

(অনুবাদ প্রচেষ্টা: কাজী মাহবুব হাসান)

The God Delusion by Richard Dawkins

প্রথম অধ্যায়
দ্বিতীয় অধ্যায়
তৃতীয় অধ্যায়
চতুর্থ অধ্যায় (প্রথম পর্ব), চতুর্থ অধ্যায় (দ্বিতীয় পর্ব),
চতুর্থ অধ্যায় (তৃতীয় পর্ব), চতুর্থ অধ্যায় (চতুর্থ পর্ব), চতুর্থ অধ্যায় (শেষ পর্ব)
পঞ্চম অধ্যায় (প্রথম পর্ব)

ধর্মের শিকড়

All religions are the same: religion is basically guilt, with different holidays-Cathy Ladman

ধর্মের প্রস্তাবিত সরাসরি কিছু উপকারিতা:

ধর্মীয় বিশ্বাস মানুষকে স্ট্রেস বা মানসিক চাপ থেকে সৃষ্ট নানা অসুখ থেকে রক্ষা করে এমন প্রস্তাবের স্বপক্ষে খুব সামান্যই প্রমান খুজে পাওয়া যায়। এমনকি যে প্রমানগুলো আছে তারা কোনটাই তেমন মজবুত না। কিন্তু যদি বিষয়টি সত্যিও হয় তাহলেও কিন্তু এটি অবাক হবার মত কোন বিষয় হবে না, কারন সেই একই, বিশ্বাস নির্ভর নিরাময় যেমন কিছু কিছু ক্ষেত্রে যে কারনে কাজে লেগে যায়। ধর্মের দাবীর আসল মুল্যকে আরো জোরদার করতে, আমি মনে করিনা এই উপকারী প্রভাবের বিষয়টি এর সাথে যোগ করার কোন দরকার থাকতে পারে। জর্জ বার্ণার্ড শ এর ভাষায়, ’কোন সন্দেহবাদীর তুলনায় কোন বিশ্বাসী যে সুখে আছে এই সত্যটা ,একজন মাতাল ব্যক্তি যেমন নেশাগ্রস্থ নয় এমন কারো চেয়ে সুখী যে কারনে, তার চেয়ে অতিরিক্ত কিছু নয়’।

কোন একজন রোগীকে চিকিৎসা সেবা হিসাবে কোন একজন ডাক্তার যা দিতে পারেন, তার একটি অংশ হচ্ছে স্বান্তনা এবং আশ্বাস। রোগীর উপর এই বিষয়টির প্রভাব কিন্তু একেবারে উড়িয়ে দেয়া যাবে না। আমার ডাক্তার হয়তো তার হাত দিয়ে আক্ষরিক অর্থে ’বিশ্বাস নির্ভর নিরাময়’ এর কোন প্রাকটিস করেন না, কিন্তু অনেকবারই ছোট খাট রোগব্যাধী থেকে আমি প্রায় সাথে সাথেই `নিরাময়` লাভ করেছি, যখনই স্টেথোস্কোপ পরা একটি বুদ্ধিদ্বীপ্ত মানুষের আশ্বস্ত করার মত কন্ঠ আমি শুনেছি। ’প্ল্যাসিবো প্রভাব’ নিয়ে বেশ গবেষনাও হয়েছে এবং এবং এটি খুব রহস্যময়ও কোন ব্যাপারও না; ডামি পিল বা ঔষধকল্প, যাদের কোন ধরনেরই ফার্মাকোলজী নির্ভর বা ঔষধীয় কোন প্রভাব নেই, কিন্তু দেখা গেছে সেটি রোগীর অবস্থার উন্নতি করছে। একারনেই সব ডাবল ব্লাইন্ড (গবেষক এবং রোগীদের কাছে অজানা) গবেষনায় প্লাসিবোকে অন্তর্ভুক্ত করা হয় কন্ট্রোল (যার সাথে মুল ঔষধটি আসলেই কার্যকরী কিনা তা তুলনা করে দেখা হয়) হিসাবে। এবং একারনেই হোমিওপ্যাথীর ‘চিকিৎসাগুলো’ কাজ করে বলে মনে হয়, এমনকি তারা এমনই লঘু মাত্রার যে, একই মাত্রায় প্ল্যাসিবো কন্ট্রোলদের মতই তাদেরও একই পরিমান সক্রিয় উপাদান থাকে অর্থাৎ শুন্য সংখ্যক অনু। ঘটনাচক্রে, আইনজীবিদের ডাক্তারদের ক্ষমতার এখতিয়ারে হস্তক্ষেপ করার একটি দুর্ভাগ্যজনক বাই-প্রোডাক্ট বা উপজাত বিষয় হচ্ছে, ডাক্তাররা এখন তাদের সাধারন প্র্যাকটিসের সময় ব্যবস্থাপত্রে প্ল্যাসিবো পিল উল্লেখ করতে ভয় পান বা আমলাতান্ত্রিকতা তাদের বাধ্য করে কোনটি প্ল্যাসিবো সেটি লিখিতভাবে চিহ্নিত করার জন্য, যা কিনা রোগী নিজেই দেখতে পায়, এবং যে কারনে অবশ্যই প্ল্যাসিবো পিলের মুল উদ্দেশ্যটাই ব্যহত হয়। হোমিওপ্যাথরা এক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত সফলতা অর্জন করেছেন কারন তারা প্রচলিত চিকিৎসকদের ব্যতিক্রম, কেননা রোগীদের এখনও অন্য নামে প্ল্যাসিবো ঔষধ দেবার জন্য তাদের অনুমতি আছে, উপরন্তু তাদের হাতেও সময়ও থাকে বেশী, ফলে তারা রোগীর সাথে অনেক সময় ধরে কথা বলার ও বাড়তি সহানুভুতিশীল ও দয়াপরবশ হবারও সুযোগও পান অপেক্ষাকৃতভাবে বেশী । হোমিও চিকিৎসার দীর্ঘ ইতিহাসের প্রথমাংশে, এর সুনাম কিন্তু বৃদ্ধি পেয়েছিল ঘটনাচক্রে, যার প্রধান একটি কারন ছিল এর ঔষধগুলো কোন কিছুই করে না এবং যা স্পষ্টতই ব্যতিক্রম ছিল তৎকালীন প্রথাগত চিকিৎসা পদ্ধতিগুলো থেকে, যেমন, রক্তপাত করানো; যা সরাসরি রোগীর ক্ষতির কারন হতো।

তাহলে ধর্ম কি একটি প্ল্যাসিবো যা জীবনকে প্রলম্বিত করে এর মানসিক চাপ ও অবসাদ হ্রাস করে? সম্ভবত, যদিও এই তত্বটিকে সন্দেহবাদীদের ছাকুনী অতিক্রম করতে হয়েছে, যারা সফলভাবেই দেখিয়েছেন, যে অনেক পরিস্থিতিতেই কমানোর চেয়ে ধর্ম বরং মানসিক চাপের পরিমান বাড়িয়ে দেয়। যেমন বিশ্বাস করা খুবই কঠিন যে, কারো স্বাস্থ্যের কোন উন্নতি হতে পারে, সারাজীবন ধরে বয়ে বেড়ানো ভয়াবহ অপরাধবোধের প্রায় চিরস্থায়ী কোন অবস্থায়, যা কিনা সাধারন মানবিক দুর্বলতা সম্পন্ন ও অপেক্ষাকৃত কম বুদ্ধিমান কোন রোমান ক্যাথলিক ভুগে

থাকেন। হয়তো শুধু মাত্র ক্যাথলিকদের আলাদা করে চিহ্নিত করাটা তাদের প্রতি সুবিচার হচ্ছে না। যুক্তরাষ্টের কমেডিয়ান ক্যাথী ল্যাডমান এর পর্যবেক্ষন: সব ধর্মই তো এক: মুলত ধর্মই হচ্ছে অপরাধবোধ, শুধু যাদের ছুটির দিন গুলো ভিন্ন ভিন্ন’;তবে যাই হোক না কেন, আমি মনে করি ধর্ম ফেনোফেনাটির ব্যাপকভাবে বিশ্বব্যাপী সর্বব্যাপীতা ব্যাখ্যা করার জন্য এ ধরনের প্ল্যাসিবো তত্বটি যথেষ্ট নয়। আমি মনে করিনা, আমাদের পুর্বপুরুষদের স্ট্রেস বা মানসিক চাপ কমাতে বলেই ধর্মর অস্তিত্বটি টিকে গেছে,এই কার্যকারনটি ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে প্লাসিবো তত্বটি যথেষ্ট ব্যপক কোন তত্ব নয়, যদিও এটি একধরনের সহায়ক বা সাবসিডিয়ারী কোন দায়িত্ব পালন করে থাকতেও পারে। ধর্ম একটি বিশাল ব্যাপার,বড় মাপের একটি ফেনোমেনা,এর ব্যাখ্যার জন্য প্রয়োজন বড় কোন একটি তত্ব।

অন্য তত্বগুলো ডারউইনীয় ব্যাখ্যার মুল বিষয়টি আদৌ স্পর্শ করতে পারেনি। আমি সেই ব্যাখ্যাগুলোর কথা বলছি যেমন: ‘ধর্ম মহাবিশ্ব এবং সেখানে আমাদের অবস্থান সম্বন্ধে আমাদের কৌতুহলকে নিবৃত্ত করে’ বা ’ধর্ম স্বান্তনাদায়ক’; কিছু মনস্তাত্বিক সত্যতা হয়তো এখানে আছে, যা আমরা অ্ধ্যায় ১০ এ আলোচনায় দেখবো, কিন্তু কোনটাই এককভাবে ডারউইনীয় দৃষ্টিভঙ্গীতে ব্যাখ্যা নয়। যেমন স্টিভেন পিংকার সরাসরি স্বান্তনাদায়ক বা আশ্বস্তকারী তত্বের বিষয়ে বলেছেন তার হাউ দ্য মাইন্ড ওয়ার্কস বইটিতে: ’এটি শুধুমাত্র আরেকটি প্রশ্নের জন্ম দেয়, ’কেন’ এমন একটি মন বা মনস্তাত্বিক কাঠামোর বিবর্তন হবে,যা এমন কোন একটি বিশ্বাসে স্বস্তি পাবে, যাকে কিনা এটি সুস্পষ্টভাবে মিথ্যা বলে বুঝতে পারে। একজন শীতার্ত ব্যাক্তি শুধু নিজেকে উষ্ণ ভেবে কোন স্বস্তি পেতে পারেননা কিংবা সিংহের মুখোমুখি দাড়ানো কোন মানুষ, সিংহকে খরগোশ ভেবে বিশ্বাস করে কখনই সহজ হতে পারেনা’; কমপক্ষে এই কনসোলেশন বা স্বান্তনা তত্বটিকে ডারউইনীয় শব্দমালায় অর্থবহ হতে হবে, এবং আপনি যা ভাবছেন বিষয়টি তার চেয়ে বেশ কঠিন। কিছু বিশ্বাসকে মানুষদের পছন্দ বা অপছন্দ করার প্রক্রিয়াটির মনস্তাত্বিক ব্যাখ্যগুলো প্রক্সিমেট পকৃতির, অর্থাৎ এটি তাৎক্ষনিক, অবশ্যই চুড়ান্ত বা আল্টিমেট কারনগুলোর ব্যাখ্যা নয়।

ডারউইনবাদীরা এই প্রক্সিমেট এবং আল্টিমেট বা তাৎক্ষনিক ও চুড়ান্ত, এই দুটির মধ্যে পার্থক্যকে বিশেষ গুরুত্ব দেন।ইন্টারনাল কমবাশন ইন্জিনের সিলিন্ডারে বিস্ফোরনের তাৎক্ষনিক ব্যাখ্যা হিসাবে প্রতীয়মান হয়,স্পার্কিং প্লাগ। কিন্তু আল্টিমেট বা চুড়ান্ত ব্যাখ্যা হলো কি উদ্দেশ্যে এই বিস্ফোরণটি পরিকল্পনা করা হয়েছে: সিলিন্ডার থেকে পিস্টনটা বাইরের দিকে বের করে গতিশীল করা বা চালানোর জন্য, এবং তার মাধ্যমে মুল ক্র্যাঙ্কশ্যাফটটিকে ঘোরানো। ধর্মের প্রক্সিমেট কারন হতে পারে আমাদের ব্রেনের কোন একটি অংশ বা অংশসমুহ বা নোড এর অতিসক্রিয়তা। আমি স্নায়ু বৈজ্ঞানিক সেই ‘গড সেন্টার’ এর ধারনা এখানে আলোচনা করবো না,কারন প্রক্সিমেট কারন নিয়ে আমি আলোচনা করতে চাচ্ছিনা। তার মানে এই না,আমি এদের খাটো করে দেখছি, আমি পাঠকদের মাইকেল শেরমার এর হাউ উই বিলিভ: দ্য সার্চ ফর গড ইন এজ অব সায়েন্স বইটা পড়ার জন্য বিশেষ অনুরোধ করছি এ বিষয়ে স্বচ্ছ এবং সুনির্দিষ্ট একটি আলোচনার জন্য, যেখানে মাইকেল পেরসিংগার এবং অন্যদের প্রস্তাবও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে যা প্রস্তাব করছে যে,বড় কোন ধরনের এবং উজ্জ্বল নানা দৃশ্যকল্প সমৃদ্ধ কোন ধর্মীয় অভিজ্ঞতার সাথে টেম্পোরাল লোব এপিলেপসি (মৃগী রোগ,যা মস্তিষ্কের কোন কোন অংশের অতিসক্রিয়তার কারনে সৃষ্ট হতে পারে, যেমন এখানে টেমপোরাল লোব) সম্পর্ক আছে।

কিন্তু এই অধ্যায়ে আমার মুল উদ্দেশ্য হচ্ছে ডারউইনীয় দৃষ্টিকোন থেকে ‘আল্টিমেট’ ব্যাখ্যাটি অনুসন্ধান করা। স্নায়ুবিজ্ঞানীরা মস্তিষ্কের মধ্যে কোন ‘গড সেন্টার’ যদি খুজেও পান, আমার মত ডারউইনীয় বিজ্ঞানীরা তারপরও সেই বিশেষ প্রাকৃতিক নির্বাচনী চাপ বা সিলেকশন প্রেশারটি বুঝতে চাইবে, যা এমন কোন ’গড সেন্টার’ এর বিবর্তনে বিশেষ সহায়তা ও পক্ষপাতিত্ব করেছে। কেন আমাদের পুর্বপুরুষদের মধ্যে যাদের ’গড সেন্টার’ তৈরী হবার জীনগত প্রবণতা ছিল,তারা বেশী বেচে ছিলেন এবং বেশী সংখ্যক বংশধর সৃষ্টি করে গেছেন,তাদের প্রতিদ্বন্দীদের তুলনায়, যাদের এ ধরনের কোন প্রবণতা ছিলনা। ডারউইনীয় আল্টিমেট প্রশ্ন কিন্তু স্নায়ুবিজ্ঞানীদের প্রক্সিমেট প্রশ্নর

তুলনায় অপেক্ষাকৃত উত্তম প্রশ্ন না কিংবা অপেক্ষাগত গভীর বা প্রগাঢ় কোন প্রশ্নও না, এমন কি বেশী বৈজ্ঞানিক প্রশ্নও বলা যাবে না; কিন্তু সেই প্রশ্নটাই নিয়ে আমি এখানে কথা বলছি।

ডারউইনবাদীরা কোন রাজনৈতিক ব্যাখ্যা দ্বারাও সন্তুষ্ট হবেন না, যেমন, 'ধর্ম একটি কৌশল বা উপকরণ যা দিয়ে শাসক শ্রেনীগোষ্ঠী তাদের অধস্তন শোষিত শ্রেনী গোষ্ঠীকে নিয়ন্ত্রন করে'; নিশ্চিৎভাবে এটা সত্য যে যুক্তরাষ্ট্রে কৃষ্ণাঙ্গ ক্রীতদাসরা অন্য জীবনের প্রতিশ্রুতিতে স্বান্তনা খুজে পেত, যা তাদের বর্তমান জীবন নিয়ে অসন্তুষ্টি ও কষ্টর অনুভুতিকে সহনশীল করে তুলতো, যা প্রকান্তরে সহায়তা করতো তাদের শোষক মালিকদেরকেই। কিন্তু আসলেই দুরভীসন্ধিপুর্ণ কোন যাজক বা শাসকরা সুচিন্তিতভাবে ধর্ম পরিকল্পনা করেছিল কিনা এই প্রশ্নটা বেশ কৌতুহলোদ্দীপক, যার উত্তর খুজতে পারেন কেবল ঐতিহাসিকরা, কিন্তু এটিও স্বতন্ত্রভাবে ডারউইনীয় প্রশ্ন না। ডারউইনবাদীরা তারপরও জানতে চায়, কেন মানুষ ধর্মের মাদকতায় সহজে মোহাচ্ছন্ন হয়, শিকার হয় ধর্মের নানা ছল চাতুরী আর প্রতিশ্রুতিতে, আর সেকারনেই যাজক, রাজনীতিবিদ এবং রাজাদের শোষনেরও শিকার হবারও সম্ভাবনাও থাকে তাদের বেশী।

দুরভিসন্ধীপুর্ণ কোন নৈরাশ্যবাদী ধুর্ত কেউ যৌন লালসাকে রাজনৈতিক শক্তি নিয়ন্ত্রনের হাতিয়ার হিসাবে ব্যাবহার করতে পারে, কিন্তু তারপরও আমাদের ডারউইনীয় একটি ব্যাখ্যার প্রয়োজন আছে কেন এটি কাজ করে তার অভীষ্ট লক্ষ্য পুরণে। যৌন লালসার ক্ষেত্রে এই উত্তরটা সহজ: আমাদের মস্তিষ্কের কাঠামো গঠিত হয়েছে এমন করে যে আমরা যৌনকর্মকে উপভোগ করি কারন,যৌনকর্ম তার স্বাভাবিক প্রাকৃতিক অবস্হায় সন্তান উৎপাদন করে। অথবা কোন রাজনৈতিক কলকাঠি নিয়ন্ত্রক কুটকৌশলী হয়ত শারীরিক নিপীড়ণ বা নির্যাতনকে বেছে নিতে পারে তার মতলব হাসিলের জন্য। আবারো ডারউইনবাদীদের অবশ্যই ব্যাখ্যার যোগান দিতে হবে কেন নির্যাতন কার্যকরী ফলাফল দিচ্ছে এখানে, কেন আমরা প্রচন্ড শারীরিক যন্ত্রনাকে এড়ানোর জন্য প্রায় যে কোন কিছু করতে রাজী আছি। আবারো স্পষ্টভাবে এর কারন খুবই আটপৌরে সাধারন হওয়া সত্বেও ডারউইনবাদীদের সেটা স্পষ্ট করে ব্যাখ্যা দিতে হবে যে, প্রাকৃতিক নির্বাচন শারীরিক ব্যাথা বা যন্ত্রনা অনুভব করার ক্ষমতাকে জীবননাশী শারীরিক কোন ক্ষতির চিহ্ন হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেছে, এবং এ ধরনের পরিস্থিতি এড়ানোর জন্য এটি আমাদের ভেতর শক্তিশালী জৈবিক তাড়না সৃষ্টির প্রয়োজনীয় নির্দেশও বিবর্তিত করেছে। কিছু দুর্লভ মানুষ আছেন, যারা কোন কষ্ট বা যন্ত্রনা অনুভব করতে পারেনা বা সেটা নিয়ে আদৌ চিন্তিত না, তারা সাধারনত অল্প বয়সে আঘাত প্রাপ্ত হয়ে মারা যান, যে আঘাতগুলো আমরা অন্যরা বিশেষ উদ্যেগ নিয়ে এড়িয়ে চলি। কেউ কোন খারাপ উদ্দেশ্যে ব্যবহার করুক কিংবা স্বতঃস্ফুর্তভাবে এটি নিজেকে প্রকাশ করুক না কেন, কি সেই চুড়ান্ত কারন যা আসলে ব্যাখ্যা করে দেবদেবী বা ঈশ্বরদের পুজা করার প্রতি আমাদের সর্বজনীন লালসাটিকে।

রিচার্ড ডকিন্স এর দি গড ডিল্যুশন : পঞ্চম অধ্যায় (তৃতীয় পর্ব)

By K M Hassan

ছবি: ডেভিড কাটলার (David Cutler) এর একটি ইলাসট্রেশন

রিচার্ড ডকিন্স এর দি গড ডিলুশন : পঞ্চম অধ্যায় (তৃতীয় পর্ব)

(অনুবাদ প্রচেষ্টা: কাজী মাহবুব হাসান)

The God Delusion by Richard Dawkins

প্রথম অধ্যায়
দ্বিতীয় অধ্যায়
তৃতীয় অধ্যায়
চতুর্থ অধ্যায় (প্রথম পর্ব), চতুর্থ অধ্যায় (দ্বিতীয় পর্ব),
চতুর্থ অধ্যায় (তৃতীয় পর্ব), চতুর্থ অধ্যায় (চতুর্থ পর্ব), চতুর্থ অধ্যায় (শেষ পর্ব)
পঞ্চম অধ্যায় (প্রথম পর্ব), পঞ্চম অধ্যায় (দ্বিতীয় পর্ব)

ধর্মের শিকড়

It only raises the question of why a mind would evolve to find comfort in beliefs it can plainly see are false. A freezing person finds no comfort in believing he is warm; a person face-to-face with a lion is not put at ease by the conviction that it is a rabbit. *Steve Pinker (How the Mind Works)*

গ্রুপ সিলেকশন:

কিছু প্রস্তাবিত আল্টিমেট ব্যাখ্যা আসলে দেখা যাচ্ছে প্রায় অথবা পুরোপুরিভাবেই গ্রুপ সিলেকশন তত্ব নির্ভর। ’গ্রুপ সিলেকশন’ একটি বিতর্কিত ধারনা যা দাবী করে, ডারউইনীয় নির্বাচন বিভিন্ন প্রজাতিদের মধ্যে বা অন্য কোন জীবসদস্যদের ’গ্রুপ’ বা গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে বাছাই করে। কেমব্রিজের প্রত্নতত্ত্ববিদ কলিন রেনফ্রিউ প্রস্তাব করেছিলেন যে, খৃষ্ট ধর্ম এক ধরনের গ্রুপ সিলেকশনের মাধ্যমেই তার অস্তিত্ব রক্ষা করেছে কারন এটি গ্রুপের মধ্যে বা অন্ত:গ্রুপ আনুগত্য ও ভাতৃপ্রতিম ভালোবাসাকে প্রতিপালন করেছিল, যা বেশী ধার্মিক গোষ্ঠীগুলোকে অপেক্ষাকৃত কম ধার্মিক গ্রুপগুলো থেকে টিকে থাকতে সাহায্য করেছিল। যুক্তরাষ্ট্রের গ্রুপ সিলেকশন তত্ত্বের অন্যতম প্রচারক ডি এস উইলসন স্বতন্ত্রভাবে একই ধরেনের একটি প্রস্তাব দাড় করিয়েছিলেন আরো বিস্তারিতভাবে, তার ডারউইনস ক্যাথিড্রাল (*Darwin’s Cathedral*) বইটিতে।

ধর্মের গ্রুপ সিলেকশন তত্ব আসলে কি বলছে,তা বোঝানোর জন্য একটি কল্পিত উদহারণ দেয়া যাক: একটি গোত্র, যারা অতিমাত্রায় এক যুদ্ধবাজ ‘যুদ্ধের দেবতা’র উপাসনা করে, তারা শান্তি আর ঐক্যর তাগিদ দেয় এমন দেবতাদের পুজারী প্রতিদ্বন্দী গোত্রর বা কোন দেবতারই পুজা করে না এমন কোন গোত্রর সাথে সংঘটিত যুদ্ধে জয় লাভ করে; যোদ্ধারা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে,যুদ্ধে শহীদ হিসাবে তাদের মৃত্যু তাদেরকে সরাসরি স্বর্গে জায়গা করে দেবে, তারা অত্যন্ত সাহসের সাথে যুদ্ধ করে এবং নিজের জীবন উৎসর্গ করে স্বেচ্ছায় দ্বিধাহীন ভাবে। সুতরাং এমন ধর্ম বিশ্বাসে বিশ্বাসী গোত্রদের আন্তঃগোত্র যুদ্ধ বিগ্রহে জয়ী হয়ে টিকে থাকার সম্ভাবনা বেশী, তারা তাদের প্রতিপক্ষ গোত্রের গবাদীপশু দখল ও তাদের নারীদের অপহরণ করে উপপত্নী বানাবে। এধরনের গোত্র আরো সমমনা কন্যা গোত্রের জন্ম দেবে দ্রুত উৎপাদনশীল হারে,যারা সবাই একই গোত্র দেবতার পুজা করবে। এই গ্রুপের অন্য কন্যা গ্রুপের জন্ম দেয়ার ধারনাটি, অনেকটা কোন মৌচাক থেকে একগুচ্ছ মৌমাছিকে ছুড়ে ফেলা দেবার মত, একেবারে অসম্ভব, নয় যদিও। নৃতত্ববিদ নেপোলিয়ন শ্যাননন,এধরনের বিভিন্ন গ্রামের সংযুক্তিকে বিশদভাবে ব্যাখ্যা দিয়েছেন, তার দক্ষিন আমেরিকার জঙ্গলে ইয়ানোমামো আদিবাসী, হিংস্র বা *Fierce people* গবেষনায় (৩) ;

শ্যানন গ্রুপ সিলেকশনের সমর্থক ছিলেন না, আমিও না। কারন এর বিরুদ্ধে বেশ শক্ত কিছু যুক্তি আছে। এই বিতর্কের একজন যোদ্ধা হিসাবে আমাকে অবশ্যই সতর্ক থাকতে হবে এটি নিয়ে আলোচনা করার সময় যেন এই বইটির মুল বিষয়ের অনেক বাইরে যেন চলে না যাই। অনেক জীববিজ্ঞানীর সংশয় আছে ‘সত্যিকারের’ গ্রুপ সিলেকশন, যা আমি আমার যুদ্ধের দেবতা পুজারী গোত্রের কাল্পনিক উদহারনের ব্যাখ্যা করেছি এবং অন্য একটি বিষয়ের মধ্যে, যাদের তারা ভ্রান্তভাবেই গ্রুপ সিলেকশন ’বলছেন’, অথচ ভালো করে যা লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে সেটি আসলে হয় ’কিন সিলেকশন’ কিংবা ’রেসিপ্রোকাল আলট্রুইজম বা পারস্পরিক পরোপকারিতা (অধ্যায় ৬ যা ব্যাখ্যা করবো বিশেষ ভাবে) ;

আমরা যারা গ্রুপ সিলেকশনকে খাটো করে দেখি তারা স্বীকার করি নীতিগতভাবে এটা হতেও পারে। তবে আসল প্রশ্নটি হচ্ছে ,সেটি বিবর্তনের একটি গুরুত্বপুর্ণ চালিকা শক্তি হতে পারে কিনা? যখন এটি আরো নীচের স্তরের নির্বাচনে সাথে তুলনা করা হয় – যেমন যখন গ্রুপ সিলেকশনকে ব্যাক্তিগত আত্মবিসর্জনের ব্যাখ্যা হিসাবে তুলনামুলক প্রস্তাব করা হয় – তখন নীচের স্তরের নির্বাচনই প্রমানিত হয় আরো শক্তিশালী হিসাবে; আমাদের কাল্পনিক সেই গোত্রে কল্পনা করুন একজন স্বার্থপর যোদ্ধাকে, যেখানে মুলত প্রাধান্য বিস্তার করে আছে গোত্রের জন্য শহীদ হয়ে স্বর্গীয় পুরষ্কার পেতে উৎসুক যোদ্ধারা; নিজের গা বাচানো প্রচেষ্ঠায় যুদ্ধে পেছনের দিকে সাবধানে থাকার কারনে তার জয়ী দলে শেষ পর্যন্ত বেচে থাকার সম্ভাবনা খানিকটা বেশী হবে মাত্র। গড়পড়তা তাদের সবার যতটুকু উপকার করার কথা, তার সহযোদ্ধাদের আত্মদান তাকেই খানিকটা বেশী উপকার করবে, কারন সে ছাড়া বাকী তখন মৃত। সুতরাং মৃত সহযোদ্ধাদের তুলনায় তার প্রজনন সুযোগ ও পরবর্তী প্রজন্ম সৃষ্টি করার সম্ভাবনাও বেশী, সুতরাং এই আত্মত্যাগের প্রবণতার হার ক্রমান্বয়ে কমে যাবে ভবিষ্যৎ প্রজন্মেগুলোর মধ্যে।

এট একটি সরলীকৃত খেলনা সুলভ উদহারন, কিন্তু এটি ব্যাখ্যা দিচ্ছে গ্রুপ সিলেকশন সম্বন্ধে একটি চিরন্তন সমস্যার। ব্যাক্তিগত আত্মত্যাগের গ্রুপ সিলেকশন তত্বটি সবসময়ই এর ভিতর থেকে ব্যার্থ হবার সম্ভাবনায় থাকে; পুরো গ্রুপের বিলুপ্তি বা সংযুক্তির তুলনায়,ব্যাক্তিগত মৃত্যু ও প্রজনন সময়ের মাপকাঠিতে বেশ দ্রুত ঘটে: গানিতীক মডেলও তৈরী করা যেতে পারে কিছু বিশেষ পরিস্থিতির যেখানে গ্রুপ সিলেকশন শক্তিশালী বিবর্তনীয় চালিকা শক্তি হিসাবে দেখানো যায়। এই বিশেষ পরিস্থিতিগুলো সাধারণত: পকৃতিতে কল্পনা করাটা খানিকটা বাস্তবতা বিবর্জিত, কিন্তু যুক্তি দেখানো যেতে পারে মানুষের গোত্রগত দলবদ্ধতায় ধর্মগুলো সেই বাস্তবতা বিবর্জিত বিশেষ পরিস্থিতিগুলো প্রতিপালন করতে পারে। এটি একটি কৌতুহলোদ্দীপক তত্ব , আমি বিষয়টি নিয়ে আর বিস্তারিত আলোচনায় যাবো না, শুধু মেনে নেয়া ছাড়া যে ডারউইন নিজেই, যদিও তিনি প্রজাতির একক সদস্যর ক্ষেত্রে নির্বাচন কাজ করে এমন ধারনার দৃঢ় সমর্থক ছিলেন, তিনিও গ্রুপ সিলেকশন ধারনার যতটুকু কাছে আসা সম্ভব, ততটুকুই এসেছিলেন, মানুষের গোত্র বা ট্রাইব নিয়ে আলোচনার সময়:

> যখন একই দেশে বসবাসকারী আদি মানবদের দুটি গোত্র বা গোষ্ঠী পারস্পরিক কোন প্রতিদ্বন্দীতায় আসে, যদি একটি গ্রুপে (অন্য সব পরিস্থিতি অপরিবর্তিত থাকবে এমন শর্তে) বেশী সংখ্যক সাহসী,সহানুভুতিশীল এবং অনুগত বিশ্বাসী সদস্য থাকে,যারা সবসময় একে অপরকে বিপদ থেকে সতর্ক করতে সাহায্য করতে এবং একে অপরকে রক্ষা করতে প্রস্তুত,তাহলে সন্দেহ নেই এই গোত্রটি সবচেয়ে সফল হবে এবং অন্য গোত্রদের জয় করতে সক্ষম হবে;স্বার্থপর আর বিবাদপ্রিয় মানুষরা একসাথে জোট বাধতে বা সহাবস্থান করতে পারেনা,আর সহযোগিতা ছাড়া কোন কিছুরই ফলাফল মেলে না। কোন গোত্র যাদের সদস্যদের উপরে বর্নিত সব গুনাবলী সব্বোষ্চভাবে বিদ্যমান তারা দ্রুত সম্প্রসারিত হবে আকারে এবং অন্য সব গোত্রকে জয় করে নেবে। কিন্তু সময়ের ধারাবাহিকতায়,এই গোত্রটিও,অতীতের সকল ইতিহাস যা বলে,আরো উন্নত গুনাবলী সম্পন্ন কোন গোত্র দ্বারা বিজিত হবে (৪)।

জীববিজ্ঞানে বিশেষজ্ঞ যারা হয়তো এই বইটি পড়তে পারেন,তাদের আশ্বস্ত করার জন্য আমার উচিৎ হবে যোগ করা যে,ডারউইনের এই ধারনাটি পুরোপরি গ্রুপ সিলেকশন নয়. সফল গ্রুপ সিলেকশন সত্যিকার অর্থে যা বোঝায়, সফল গ্রুপ গুলো কন্যা গ্রুপ সৃষ্টি করবে,যাদের হার গননা করা যাবে নানা গ্রুপের একটি মেটাপপুলেশনে বা জনসংখ্যায় ;বরং ডারউইন গোত্রগুলোকে দেখেছেন অ্যালট্রুইস্টিক্যালী বা নিঃস্বার্থ পরোপকারী পরস্পর সহযোগিতাকারী সদস্যদের বিস্তার এবং সদস্যদের সংখ্যায় ক্রমেই বেড়ে যাবার দৃষ্টিকোন থেকে;ডারউইনের মডেল,ব্রিটেনে অনেকটা লাল কাঠবিড়ালীদের জায়গায় ধুসর কাঠবিড়ালীর বিস্তারের মত:পরিবেশগত প্রতিস্থাপন বা ইকোলজিক্যাল রিপ্লেসমেন্ট,সত্যিকারের গ্রুপ সিলেকশন নয়।

তথ্যসুত্র:

(৩) *N. A. Chagnon*, ‘Terminological kinship, genealogical relatedness and village fissioning among the Yanomamo Indians’, in Alexander and Tinkle (1981: ch. 28).
(৪) *C. Darwin*, The Descent of Man (New York: Appleton, 1871),vol. 1, 156

রিচার্ড ডকিন্স এর দি গড ডিল্যুশন : পঞ্চম অধ্যায় (চতুর্থ পর্ব)

By K M Hassan

ব্র্যাড হল্যান্ড এর ইলাসট্রেশন (সূত্র: TIME ম্যাগাজিন, God Vs Science, জানুয়ারী ১৫, ২০০৭)

রিচার্ড ডকিন্স এর দি গড ডিলুশন : পঞ্চম অধ্যায় (চতুর্থ পর্ব)

(অনুবাদ প্রচেষ্টা: কাজী মাহবুব হাসান)

The God Delusion by Richard Dawkins

প্রথম অধ্যায়
দ্বিতীয় অধ্যায়
তৃতীয় অধ্যায়
চতুর্থ অধ্যায় (প্রথম পর্ব) , চতুর্থ অধ্যায় (দ্বিতীয় পর্ব) ,
চতুর্থ অধ্যায় (তৃতীয় পর্ব) , চতুর্থ অধ্যায় (চতুর্থ পর্ব) , চতুর্থ অধ্যায় (শেষ পর্ব)
পঞ্চম অধ্যায় (প্রথম পর্ব), পঞ্চম অধ্যায় (দ্বিতীয় পর্ব) , পঞ্চম অধ্যায় (তৃতীয় পর্ব)

ধর্মের শিকড়

For excellent reasons related to Darwinian survival, child brains need to trust parents, and elders whom parents tell them to trust. An automatic consequence is that the truster has no way of distinguishing good advice from bad. The child cannot know that ‘Don’t paddle in the crocodile-infested Limpopo’ is good advice but ‘You must sacrifice a goat at the time of the full moon, otherwise the rains will fail’ is at best a waste of time and goats. Both admonitions sound trustworthy. Both come from a respected source and are delivered with a solemn earnestness that commands respect and demands obedience. *Richard Dawkins*

অন্য কোন কিছুর বাই-প্রোডক্ট বা উপজাত হিসাবে ধর্ম:

যাইহোক,আমি এখন গ্রুপ সিলেকশনকে একপাশে সরিয়ে রাখতে চাই এবং ধর্মের ডারউইনীয় সারভাইভাল ভ্যালু বা বেচে থাকার জন্য এর প্রয়োজনীয়তা নিয়ে আমার নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী ব্যাখ্যা করতে চাই। সংখ্যায় ক্রমশ বাড়তে থাকা জীববিজ্ঞানীদের মত আমিও ধর্মকে দেখি অন্য কোন কিছুর একটি ’উপজাত’ বা ’বাই-প্রোডাক্ট’ হিসাবে।আরো সাধারনভাবে,আমি বিশ্বাস করি যে, ডারউইনীয় সারভাইভাল ভ্যালু সম্বন্ধে আমরা যারা ধারনা করার চেষ্টা করছি তাদের প্রয়োজন ’বাই-পোডাক্ট এর চিন্তা করা’;যখন আমরা কোন কিছুর বেচে থাকার ক্ষেত্রে তার কি উপযোগিতা মুল্য আছে তা জানতে চাই,তখন হয়তো হয়তো ভুল প্রশ্নটি করে থাকি;আমাদের আরো খানিকটা সহায়ক পন্থায় প্রশ্নটি নতুন করে লিখতে হবে। যে বৈশিষ্টটি নিয়ে আমাদের বিশেষ উৎসাহ (এই ক্ষেত্রে যেমন ধর্ম), হয়তো তার সরাসরি কোন নিজস্ব সারভাইভাল ভ্যালুই নেই (বা এমন কোন গুনাবলী সেই যা বেচে থাকার ক্ষেত্রে ডারউইনীয় অর্থে সহায়ক হতে পারে) কিন্তু এটি এমন কিছু একটির উপজাত বা বাই-প্রোডাক্ট,যার সেই সারভাইভাল ভ্যালুটি আছে। আমার নিজের গবেষনার ক্ষেত্র,প্রানী আচরণের একটি উদহারন দিয়ে এই উপজাত বা বাই-প্রোডাক্ট এর ধারনাটাকে ব্যাখ্যা করলে আমি মনে করি সেটি বোঝার জন্য সহায়ক হতে পারে।

মোমবাতির জ্বলন্ত শিখায় মথদের সরাসরি ঝাপিয়ে পড়তে দেখা যায় এবং ভালো করে লক্ষ্য করলে কিন্তু মনে হয়না এটি কোন দুর্ঘটনা;তারা যেন অতিউদ্যোগী হয়ে নিজেদের পুড়িয়ে আত্মাহুতি দেয়;তাদের এই অদ্ভুত আচরনকে আমরা নাম দিতে পারি ’আত্মহত্য করার উদ্দেশ্যে নিজেকে আগুনে পোড়ানো বা সেলফ ইমোলেশন আচরণ’এবং এই রহস্যময় নামের আড়ালে বিস্মিত হই কেমন করে, প্রাকৃতিক নির্বাচন এধরনের একটি আচরণ বিবর্তনে সহায়ক ভুমিকা পালন করতে পারে;আর এখানে আমার বক্তব্য হচ্ছে, অবশ্যই আমাদেরকে নতুন করে প্রশ্নটি লিখতে হবে,এমনকি কোন বুদ্ধিমান উত্তর খোজার চেষ্টা করার আগেই। এটি আত্মহত্যা নয়। আপাতদৃষ্টিতে এই আত্মহত্যা অন্য কোন একটা কিছুর অযাচিত বা অনাকাঙ্খিত কোন পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া বা উপজাত বা বাই-প্রোডাক্ট। উপজাত বা বাই-প্রোডাক্ট,কিন্তু কার? বেশ,নীচে বর্নিত হয়েছে এমন একটি সম্ভাবনা,যা হতে পারে এবং যেটি বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করতে সাহায্য করে।

রাতের পৃথিবীকে কৃত্রিম আলোর আবির্ভাব বেশ সাম্প্রতিক, এর আগে রাতে আলো যা চোখে পড়ত তা ছিল চাদ আর তারারা, কিন্তু তাদের অবস্থান ছিল দৃষ্টিসীমার অসীমে বা অপটিক্যাল ইনফিনিটিতে, সুতরাং সেই উৎস থেকে আসা আলোক রশ্মিগুলো সমান্তরাল, কম্পাস বা দিক নির্দেশনার চিহ্ন হিসাবে ব্যবহার করার জন্য তাদেরকে উপযোগী করে এই বৈশিষ্টটি; জীববিজ্ঞানীদের কাছে বিষয়টি অজ্ঞাত নয় যে, সাধারনতঃ পতঙ্গরা মহাকাশে অবস্থিত বস্তু যেমন সুর্য কিংবা চাদ থেকে আসা আলোর রশ্মি ব্যবহার করে সরাসরি পথে বা সরল রেখায় যাতায়াত করার জন্য এবং খাদ্য সন্ধানের অভিযান শেষে ঠিক সেই কম্পাসটাই তারা ব্যবহার করে বীপরিতমুখী পথে ঘরে ফেরার জন্য; পতঙ্গদের স্নায়ুতন্ত্র খুব দক্ষ একটি সাময়িক গড়পড়তা নিয়ম বেধে করার জন্য, যেমন: ’এমন পথ ধরে যেতে হবে যেন আলোক রশ্মি তোমার চোখে ৩০ ডিগ্রী কোনে আঘাত করতে পারে’; যেহেতু পতঙ্গদের চোখ হচ্ছে যৌগিক (যেখানে লম্বা সোজা টিউব বা আলোকে গাইড করার টিউব চোখের কেন্দ্র থেকে বাইরের দিকে ছড়িয়ে থাকার মত সাজানো থাকে, হেজহগদের (বা সজারুর গায়ের কাটাগুলোর মত), তাদের কাছে এই নিয়মের অর্থ হচ্ছে নির্দিষ্ট একটি সেকশনের লাইট টিউব বা ওমাটিডিয়ামে শুধু আলোটাকে ধরে রাখার জন্য তাদের অনুশীলন করতে হয়।

কিন্তু গুরুত্বপুর্ণ একটি বিষয় হচ্ছে লাইট কম্পাসটির সফলভাবে কাজ করার বিষয়টি অপরিহার্যভাবে নির্ভর করে এই সব মহাজাগতিক আলোর উৎসগুলোর দৃষ্টিসীমার অসীমে থাকার উপর। যদি তা না হয়, আলোর রশ্মিগুলো আর সমান্তরাল থাকে না বরং কোন চাকার স্পোকদের মত চারিদিকে ছড়িয়ে থাকে রশ্মিগুলো; একটি স্নায়ুতন্ত্র ৩০ ডিগ্রী কোন (বা যে কোন সুক্ষ কোন হতে পারে) বা অ্যাঙ্গেল এর ধরাবাধা নিয়ম যদি চাপিয়ে দেয়া হয়

কাছাকাছি থাকা কোন মোমবাতির আলোক উৎসর উপর, যেন সেই মোমবাতিটি হলো অসীম দৃষ্টিসীমায় থাকা চাদ, এটি মথকে সর্পিলকার একটা পথের দিকে চালিত করে নিয়ে যাবে, সরাসরি আগুনের শিখার দিকে; আপনার নিজের বোঝার জন্য বিষয়টি একে দেখুন, আপনিও একটি চমৎকার লগারিদম নির্ভর একটি সর্পিলাকার ট্রাজেক্টরী পাবেন মোমবাতির শিখা বরাবর।

যদিও এই বিশেষ পরিস্থিতির জন্য বিষয়টি প্রানঘাতী, তবে মথদের মস্তিষ্কের এই গড়পড়তা একটি ধরাবাধা নিয়ম কিন্তু বেশ ভালো, কারণ গড়পড়তা কোন একটি মথের জন্য চাদের চেয়ে বরং মোমবাতির দেখা পাওয়াটাই বেশী দুর্লভ; আমরা কখনো খেয়াল করি না, শত শত মথ নীরবে এবং খুব কার্যকরীভাবেই চাদের বা কোন উজ্জল তারার আলো এবং এমনকি দুরের কোন শহর থেকে আসা হালকা আলোর আভা ব্যবহার করে তাদের পথ খুজে নিচ্ছে রাতের অন্ধকারে। শুধু মথগুলোকে আমরা মোমবাতির শিখার দিখে ঘুরে ঘুরে পড়তে দেখি এবং ভুল প্রশ্নটা করি: কেন এই মথগুলো আত্মহত্যা করছে? বরং আমাদের জিজ্ঞাসা করা উচিৎ কেন তাদের এমন একটি স্নায়ুতন্ত্র আছে যা তাদের আলোক রশ্মির সাথে একটি নির্দিষ্ট কোন বা অ্যাঙ্গেল অবলম্বন করে উড়তে নির্দেশ দেয়, যে কৌশলটা শুধুমাত্র আমাদের নজরে পড়ে কোথাও ভুল হলে। যখন প্রশ্নটা নতুনভাবে করা হয়, রহস্যও বাষ্পীভুত হয়ে উবে যায়। এটিকে আত্মহনন কখনোই বলা ঠিক না, এটি সাধারনত সবসময় কাজ করে এমন একটি উপযোগি কম্পাসের হঠাৎ ভুল করে ঘটে যাওয়া একটি উপজাত বা বাই-প্রোডাক্ট;

এখন এই বাই-প্রোডাক্টের উদহারনটির শিক্ষা মানুষের ধর্মীয় আচরনের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করুন। আমার লক্ষ্য করতে পারি যে বহু মানুষ,কোন কোন জায়গায় যা শতকরা ১০০ ভাগ-তারা এমন কিছু বিশ্বাসকে ধারন করে যা সরাসরি প্রমানযোগ্য সকল বৈজ্ঞানিক সত্যকে এবং সেই সাধে অন্যদের বিশ্বাস করা ধর্মকেও অস্বীকার করে;আর মানুষ যে এই বিশ্বাসগুলো লালন করে তীব্র আবেগময়তায় চরম সত্য হিসাবে মেনে নেয় শুধু তাই নয়, উপরন্তু তারা এই বিশ্বাস ধারন করার কারনে সৃষ্ট বা এর নির্দেশিত নানা ব্যয়বহুল কর্মকান্ডে তাদের সময় এবং কষ্টার্জিত সম্পদও ব্যয় করে;

এই বিশ্বাসের কারনে তারা মৃত্যুকে বরণ করে বা এর জন্য হত্যা করতে দ্বিধাবোধ করে না। আমরা এটি দেখে বিস্মিত বোধ করি,ঠিক যেমন অবাক হই মথদের মোমবাতির শিখায় আত্মহননের আচরন দেখে (সেলফ ইমমোলেশন); হতভম্ব আমরা জানতে চাই, কেন ? কিন্তু এখানে আমার বক্তব্যটা হচ্ছে, হয়তো আমরা ভুল প্রশ্নটা করছি। ধর্মীয় আচরন হয়তো যা হয়তো হবার কথা ছিল না এমন কোন মিসফায়ারিং,হয়তো কোন অন্তর্হিত মানসিক প্রবনতার একটি দুর্ভাগ্যজনক উপজাত বা বাইপ্রোডাক্ট , যা অন্য কোন পরিস্থিতিতে, তা বর্তমানে কিংবা অতীতের কোন একসময় উপযোগি ছিল। এই দৃষ্টিভঙ্গীতে এই্ প্রবণতাটি যা প্রাকৃতিক নির্বাচন প্রক্রিয়ায় নির্বাচিত হয়েছিল আমাদের পুর্বপুরুষদের মধ্যে ,তা হয়তো সেই অর্থে ধর্ম ছিল না;এর অন্য কিছু উপকারিতা ছিল এবং শুধুমাত্র ঘটনাচক্রে এটি প্রকাশিত হয়েছে ধর্মীয় আচরনের মধ্য দিয়ে। আমরা ধর্মী আচরণকে বুঝতে পারবো শুধুমাত্র এটিকে পুণঃ নামকরণ করার মাধ্যমে।

তাহলে,যদি ধর্ম অন্যকিছু একটি উপজাত বা বাই-প্রোডাক্টই হয়ে থাকে, তাহলে সেই অন্য কিছুটি আসলে কি? মহাজাগতিক আলোক রশ্মির কম্পাস ব্যবহার করে দিক নির্দেশনা ও চলাফেরা করার মথদের সেই আচরনটির অপর সংস্করণটি কি?কি সেই আদিমভাবে সুবিধাজনক বৈশিষ্ট যেটা কখনো মিসফায়ার বা ভুল করে ধর্মের উদ্ভব করে? আমি একটি প্রস্তাব দেবো, উদহারনের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করে; কিন্তু আমি জোর দিতে চাই একটি বিষয়ে, সেটি হচ্ছে আমি 'ধরনের' বিষয় বোঝাতে চাইছি এটি শুধু তার একটি উদহারন মাত্র; এবং আমি এর সমান্তরালে অন্যরা যা প্রস্তাব দিয়েছেন, তারও ব্যাখ্যা দেবো ক্রমান্বয়ে। যে কোন একটি নির্দিষ্ট উত্তরের চেয়ে বরং আমি সেই মুলনীতির ধারনাটিরই বেশী সমর্থন করি: প্রশ্নটাই আসলে ঠিক মত হওয়া উচিৎ,প্রয়োজন হলে নতুন করে লিখতে হবে;

আমার নির্দিষ্ট হাইপোথিসিসটি শিশুদের নিয়ে। অন্য যে কোন প্রজাতির চেয়ে, আমরা বেচে থাকার জন্য সবচেয়ে বেশী নির্ভর করি আমাদের পুর্ব প্রজন্মগুলোর পুন্জ্ঞীভুত অভিজ্ঞতার উপর আর সেই অভিজ্ঞতাকে পরবর্তী প্রজন্মের শিশুদের কাছে হস্তান্তরিত করা প্রয়োজন, তাদের সুরক্ষা ও কল্যানের জন্য। তাত্বিকভাবে শিশুরা কিন্তু ব্যাক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিতে পারে,যেমন,খাড়া পাহাড়ের খুব কিনারায় না যাওয়া,আগে পরীক্ষা করে খেয়ে দেখা হয়নি এমন বুনো ফল না খাওয়া,কুমির আছে এমন পানিতে সাতার না কাটা ইত্যাদি। কিন্তু নিদেনপক্ষে এটা স্পষ্ট যে সেই শিশুদের মস্তিষ্ক একটি বিশেষ সিলেকটিভ বা নির্বাচনী সুবিধা পাবে, যে মস্তিষ্ক একটি গড়পড়তা নিয়ম বা রুল অব থাম্ব ধারন করে: কোন প্রশ্ন ছাড়াই বিশ্বাস করো,তোমাদের গুরুজনরা যা বলেন, তোমাদের পিতামাতাকে মান্য কর; গোত্রের গুরুজনদের মান্য কর, বিশেষ করে যখন তারা গম্ভীর এবং ভীতিপ্রদর্শন করার মত কন্ঠ ধারন করে; কোন প্রশ্ন ছাড়া তোমাদের গুরুজনদের বিশ্বাস করো। কোন শিশুর জন্য সাধারনত এটি মুল্যবান একটি নিয়ম,কিন্তু মথদের যেমন হয়,এটি ফলাফল খারাপও হতে পারে।

শৈশবে আমার স্কুলের গীর্জায় যাজকের দেয়া একটি ভয়াবহ সারমন আমি কখনোই ভুলতে পারিনি;এখন ভাবলে এর ভয়াবহতাটা বোধগম্য হয়,অর্থাৎ সেটি সেই সময় আমার শিশু মস্তিষ্ক গ্রহন করে নিয়েছিল যাজক যে উদ্দেশ্যে তা বলেছিলেন সেভাবেই;তিনি আমাদের একদল সেনাদের গল্প বলেছিলেন,যারা রেলওয়ে লাইনের পাশে কুচকাওয়াজ করছিলেন,কোন একটা গুরুত্বপুর্ণ সময়ে যখন ড্রিল সার্জেন্ট এর মনোযোগ বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে. তিনি তাদের থামবার নির্দেশটি দিতে ভুলে যান;কিন্তু সেনারা কোন প্রশ্ন ছাড়াই নির্দেশ মান্য করার শিক্ষায় এমনই দীক্ষা পেয়েছিল,তারা সরাসরি এগিয়ে আসা একটি ট্রেনের অভিমুখে তাদের কুচকাওয়াজ অব্যাহত রাখে; অবশ্যই আমি গল্পটা বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে করিনা এবং আমি আশা করি ধর্মযাজক নিজেও সেটা বিশ্বাস করেননি। কিন্তু আমার বয়স যখন নয় আমি তা বিশ্বাস করেছিলাম,কারন আমি এটা শুনেছিলাম একজন প্রাপ্তবয়স্ক ও আমার উপর কর্তৃত্ব আছে এমন একজন মানুষের নিকট থেকে। তিনি সেটা বিশ্বাস করুন বা না করুন,যাজক সৈন্যদের সেই ক্রীতদাসের মতো কোন প্রশ্ন ছাড়াই কোন কর্তৃত্ব স্থানীয় কারো নির্দেশ, যেটা যত ভয়াবহই আর অবিশ্বাস্য হোক না কেন, মানার মানসিকতাকে যেন আমরা শিশুরা প্রশংসার দৃষ্টিতে দেখি এবং নিজেদের সেই আদলে গড়ে তুলি। আমার কথা যদি বলি,আমি মনে করি আমরা ব্যাপারটা সপ্রশংস দৃষ্টি নিয়ে দেখেছিলাম,কিন্তু প্রাপ্তবয়স্ক হিসাবে পরবর্তীতে আমার শৈশবে সেই আমিকে কোন কৃতিত্ব দিতে পারিনি, যে কিনা ভেবেছিল ট্রেনের নীচে অবধারিত মৃত্যু জেনে কুচকাওয়াজ অব্যাহত রাখার মত সেই সাহস আছে কিনা । কিন্তু যাই হোক,এভাবেই আমার সেই অনুভুতিটাকে মনে পড়ে। যাজকের সেই সার্মন অবশ্যই আমার মনে গভীর একটি দাগ ফেলেছিল,কারন আমি এটা মনে করেছি এবং আপনাদের সাথে সেটা ভাগ করে নিয়েছি এখানে প্রকাশ করার মাধ্যমে।

নিরপেক্ষভাবে যদি ভাবি, আমার মনে হয় না যাজক আদৌ মনে করেছেন তিনি আমাদের কোন ধর্মীয় উপদেশ বিতরণ করছেন, ধর্মীয় কোন বিষয়ের তুলনায়, এটি মুলত সামরিক, টেনিসনের বিখ্যাত ‘চার্জ অব দ্য লাইট ব্রিগেড‘ এর মুলসুরে, সম্ভবত যার উদ্ধৃতি তিনি দিয়েছিলেন।

‘Forward the Light Brigade!’
Was there a man dismayed?
Not though the soldiers knew
Some one had blundered:
Theirs not to make reply,
Theirs not to reason why,
Theirs but to do and die:
Into the valley of Death
Rode the six hundred.

(মানুষের কন্ঠস্বর এর রেকর্ডিং এর অন্যতম পুরোনো নিদর্শনের একটি হচ্ছে লর্ড টেনিসনের নিজের কন্ঠে আবৃত্তি করা এই কবিতাটি, এবং যেন অতীতের গভীর থেকে বেরিয়ে আসা কোন দীর্ঘ সুড়ঙ্গের মধ্য দিয়ে ভেসে আসা ফাপা সেই আওয়াজ শিহরণ জাগানোর জন্য খুবই প্রযোজ্য) ; সামরিক কোন হাই কমান্ডের দৃষ্টিভঙ্গীতে ব্যাপারটাকে চুড়ান্ত পাগলামি মনে হতে পারে যে, প্রতিটি সৈনিক কোন নির্দেশ মানবে কি মানবে না, সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়ার অনুমতি তাদের উপর ন্যস্ত করা; যে জাতির পদাতিক সৈন্যরা তাদের ব্যাক্তিগত উদ্যোগে কাজ করে, অনুমতি না মেনেই যুদ্ধে যায়, সাধারনত তাদের পরাজয় ঘটে। সুতরাং কোন জাতির দৃষ্টিভঙ্গীতে এটি সরল সহজ গড়পড়তা নিয়ম হিসাবে উপযোগী এমনকি যদিও কখনো কখনো এটি ব্যাক্তিগত ভয়াবহ পরিস্থিতির কারন হতে পারে। সৈন্যরা এমনভাবে প্রশিক্ষিত হয় যেন তারা যতটা সম্ভব অটোম্যাটা বা কম্পিউটার এর মত হয়;

কম্পিউটারকে যা নির্দেশ দেয়া হয় তারা সেটা করে। তারা ক্রীতদাসের মত যে কোন নির্দেশ মান্য করে তাদের নিজস্ব প্রোগ্রামিং এর ভাষায়। এভাবেই তারা নানা উপযোগী কাজ করতে পারে যেমন ওয়ার্ড প্রসেসিং বা স্প্রেডশীটের নানা গণণা। কিন্তু, এরই একটি অবশ্যম্ভাবী উপজাত বা বাই–প্রোডাক্ট হিসাবে, তারা পুরোপুরি রোবটের মতই আচরণ করে কোন বাজে নির্দেশ মান্য করার ক্ষেত্রে। তাদের কোনভাবেই বলার কোন উপায় নেই, কোন নির্দেশের কি ফলাফল হতে পারে, খারাপ কিংবা ভালো। তাদের কাজ শুধমাত্র সেই কম্যান্ড বা নির্দেশগুলো মেনে চলে, সৈনিকরা যেমন করতে বাধ্য মনে করা হয়। তাদের এই শর্তহীন আনুগাত্য কম্পিউটারকে এর যেমন পরিণত করেছে একটি উপযোগি যন্ত্র হিসাবে আবার সেই ঠিক একই জিনিশ তাদের অবশ্যই নিশ্চিতভাবে শিকারে পরিণত করে কোন সফটওয়্যার ভাইরাস বা ওয়ার্ম এর আক্রমনের; কোন খারাপ উদ্দেশ্যে লেখা একটি প্রোগাম যা বলে, ’আমাকে কপি করে, এবং হার্ড ডিস্কে তুমি যেকয়টা ঠিকানা পাও, সব ঠিকানায় আমাকে পাঠাও’, কম্পিউটারের পক্ষে তা না অমান্য করা সম্ভব না, আর এই অনুগত ভাবে নির্দেশ মানার ঘটনাটি ঘটবে প্রতিটি কম্পিউটারেই , যারা সেই নির্দেশ পেয়েছে। খুবই কঠিন একটি কাজ হবে. হয়তো বা অসম্ভব এমন কোন কম্পিউটারের পরিকল্পনা করা, যা কাজে লাগবার মত অনুগত অবার একই সাথে কোন ধরনের ভাইরাসের সংক্রমনের আক্রমন থেকে সুরক্ষিত।

বিষয়টিকে সহজভাবে ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে আমি যদি সফল হয়ে থাকি, আপনি হয়তো ইতিমধ্যেই শিশুর মস্তিষ্ক ও ধর্ম নিয়ে আমার যুক্তিটি সমাপ্ত করে ফেলেছেন; প্রাকৃতিক নির্বাচন শিশুর ব্রেইনকে এমন করে গড়ে তোলে যে, তারা তাদের পিতামাতা বা গোত্রের গুরুজনরা যা বলে,তারা সেটাই পুরোপুরি বিশ্বাস করে। এধরনের বিশ্বাসনিষ্ঠ আনুগত্য বেচে থাকার জন্য খুবই মুল্যবান: চাদের আলোক রশ্মির সহায়তায় মথদের পথ চলার মত। কিন্তু বিশ্বাসনিষ্ঠ আনুগাত্যর অপর পিঠ হচ্ছে অতিমাত্রায় নির্বিচারে বিশ্বাস করার দাস সুলভ প্রবণতা। এর একটি অবশ্যম্ভাবী উপজাত বা বাই–প্রোডাক্ট হল মনের ভাইরাস দ্বারা সংক্রমিত হবার প্রবণতা। ডারউইনীয় সারভাইভাল বা টিকে থাকার সাথে খুবই সঙ্গত কারনে সংশ্লিষ্ট,কোন শিশুর মস্তিষ্কর প্রয়োজন আছে তার বাবা মাকে এবং বাবা মার নির্দেশিত গুরুজনদের বিশ্বাস করা।এর একটি স্বয়ংক্রিয় পরিনতি হচ্ছে যে বিশ্বাসকারীর ভালো একটি উপদেশ থেকে খারাপ কোন উপদেশকে পৃথক করার কোন উপায়ই জানা নেই;শিশুরা জানার উপায় নেই, ’কুমির ভরা লিম্পোপো নদীতে সাতার কাটবে না’ হচ্ছে একটি ভালো উপদেশ,কিন্তু ’তোমাকে একটা ছাগল কোরবানী দিতে হবে পুর্নিমার দিনে, নয়তো বৃষ্টি হবে না’,এই উপদেশটি বড়জোর সময় আর ছাগলের অপচয় ছাড়া আর কিছু নয়।শিশুর মনে এই নির্দেশ একই রকম বিশ্বাসযোগ্য লাগবে শুনতে; দুটোই এসেছে ভক্তি করা হয় এমন একটি উৎস থেকে এবং তাদের যে ভাবগম্ভীর আন্তরিকতায় প্রদান করা হয়, তা অনায়াসে যেমন সমীহ জাগায় তেমনি এর প্রতি নিশর্ত অনুগত্যও দাবী করে। এবং ঠিক একই ঘটনা ঘটে এই পৃথিবী সম্বন্ধে বিভিন্ন ধারনার ক্ষেত্রেও,যেমন কসমস বিষয়ে,নৈতিকতা প্রসঙ্গে এবং মানুষের প্রকৃতি সংক্রান্ত বিষয়ে;এবং খুব সম্ভবত, যখন শিশুটি বড় হয় এবং তাদের নিজেদেরও সন্তান হয়,খুব স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় সেও তার পরবর্তী প্রজন্মকে,সেই একই সংক্রমনযোগ্য ভাবগম্ভীর আচরণ ও ব্যবহারের মাধ্যমে অনেক অর্থহীন এবং অর্থবহ জ্ঞান হস্তান্তর করে।

এই মডেল এ আমাদের প্রত্যাশা করা উচিৎ যে,বিভিন্ন ভৌগলিক অঞ্চলে,বিভিন্ন কাল্পনিক বিশ্বাসগুলো,যাদের কোন বাস্তব ভিত্তি নেই হস্তান্তরিত হবে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে,বহু প্রজন্মের উপযোগী ঐতিহ্যগত কোন জ্ঞানের মতই একই দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে,যেমন,সার ফসলের জন্য উপকারী এমন বিশ্বাসটি। আমাদের আরো প্রত্যাশা করা উচিৎ যে কুসংস্কার এবং অবাস্তব বিশ্বাসগুলো স্থানীয়ভাবে বিবর্তিত হবে – কয়েক প্রজন্মের ধারাবাহিকতায় পরিবর্তিত হবে– হয় এলোমেলো কোন পরিবর্তন বা ড্রিফট এর মাধ্যমে নয়তো ডারউইনীয় নির্বাচনের সমরুপী কোন প্রক্রিয়ায়– যা কোন এক সময় এর মুল উৎস থেকে উল্লেখযোগ্য রকমের ভিন্নতা প্রদর্শন করবে (এই বিষয়ে আমি কয়েক মুহুর্ত পর আবার আলোচনায় আসবো);সম্ভবত একই ভাবে বিষয়টা সত্য ভিত্তিহীন কাল্পনিক বিশ্বাস এবং নানা নিষেধাজ্ঞাগুলোর ক্ষেত্রেও, যা প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে হস্তান্তরিত হয়েছে – সেই বিশ্বাসগুলো,শিশু মস্তিষ্কের সহজে প্রোগামিং করার ক্ষমতা যাদের একটা ভিত্তি গড়ে তুলতে সাহায্য করেছে।

আর ধর্মীয় নেতারা কিন্তু খুব ভালো করেই শিশু মস্তিষ্কের এই প্রবণতার কথা জানেন, আর একারনে শৈশবেই দীক্ষা দেবার তাগিদটা তারা এত গুরুত্বর সাথে প্রচার করে থাকেন।জেসুইটরা গর্বিত উদ্ধৃতি, ‘জীবনের প্রথম সাত বছরে কোন শিশুকে আমার কাছে দাও,আমি তোমাকে একটি পুর্নবয়স্ক মানুষ হিসাবে ফেরত দেব’-কিন্তু বহু ব্যবহারে তার সত্যতা (বা এর ভয়াবহতা) হারায়নি। আধুনিক সময়ে যেমন জেমস ডবসন,বর্তমান সময়ের কুখ্যাত ‘ফোকাস অন দি ফ্যামিলি মুভমেন্ট’* এর প্রতিষ্ঠাতা,খুব ভালো করে এই মুলনীতির সাথে পরিচিত:’তরুনদের কি শেখানো হবে বা তারা কি ধরনের অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হবে–কি তারা দেখবে,চিন্তা করবে ও বিশ্বাস করবে, এ সব কিছু যারা নিয়ন্ত্রন করেন,তারাই জাতির ভবিষ্যতের পথ নির্দেশ করে।’ (আমি বেশ মজা পেয়েছিলাম যখন ‘Focus on your own damn family’ লেখা একটি বাম্পার স্টিকার কলোরাডো তে একটি গাড়ীর পেছনে দেখি, কিন্তু এখন ব্যপারটা ঠিক সেরকম কৌতুককর মনে হয়না আর; হয়তো কোন কোন শিশুর সত্যি সত্যি তাদের নিজেদের পিতা মাতাদের দ্বারা মন্ত্রে দীক্ষিত হবার প্রক্রিয়া থেকে রক্ষা করার প্রয়োজনীয়তা আছে, অধ্যায় ৯ এ এ বিষয়ে আলোচনা করেছি) (৫);

কিন্তু মনে রাখবেন,শিশুর উপকারী বিশ্বাসপ্রবণ মন সম্বন্ধে আমার এই বিশেষ প্রস্তাব শুধু একটি উদহারণ সেই সব কিছুর যা কিনা চাদের বা তারার আলোক রশ্মির সাহায্যে মথদের পথ খুজে চলা প্রক্রিয়ার সমতুল্য বা সমরুপ কোন একটি প্রক্রিয়া হতে পারে। প্রাণীদের আচরণ বিশেষজ্ঞ বা এথোলজিষ্ট রবার্ট হিন্ড তার Why Gods Persist এ এবং নৃতত্ববিদ পাসকাল বয়ের, তার Religion Explained ও স্কট আটরান, In Gods We Trust এ স্বতন্ত্রভাবে যে সাধারন ধারনাটি প্রস্তাব করেছেন তাহলো, ধর্ম হচ্ছে স্বাভাবিক মনোবৈজ্ঞানিক বা মনস্তাত্বিক কাঠামোর বাই–প্রোডাক্ট বা উপজাত –আমার বরং বলা উচিৎ ‘অনেকগুলো’ বাই–প্রোডাক্ট; কারন নৃতত্ববিদরা বিশেষভাবে ব্যস্ত বিশ্বের নানা ধর্মের বৈচিত্রতাকে ব্যাখ্যা করে তাদের মধ্যে পারস্পরিক সদৃশ্যতার উপর গুরুত্ব আরোপ করা। নৃতত্ববিজ্ঞানীদের নানা গবেষনার ফলাফল ও আবিষ্কার আমাদের কাছে বিস্ময়কর আর অদ্ভুত মনে হয় কারন তারা অপরিচিত আমাদের কাছে;প্রতিটি ধর্মীয় বিশ্বাসই যারা সেই বিশ্বাসের আবহে বড় হয়নি তাদের কাছে অদ্ভুতই মনে হবে;বয়ের ক্যামেরুনের ফাঙ (Fang) নৃগোষ্ঠীর মধ্যে গবেষনা করেছিলেন,যারা বিশ্বাস করে যে ....

> ডাইনীদের শরীরে একটির বাড়তি আভ্যন্তরীন অঙ্গ থাকে, যা রাতের বেলায় উড়ে গিয়ে অন্য মানুষের ফসল নষ্ট করে বা তাদের রক্ত বিষাক্ত করে। এবং তারা এটাও মনে করে যে, কখনো কখনো এই ডাইনীরা একসাথে জড়ো হয়ে বিশাল ভোজের আয়োজন করে সেখানে তারা তাদের শিকারদের খায় এবং ভবিষ্যৎ আক্রমনের পরিকল্পনা করে। অনেকেই আপনাকে বলবে, যে তার কোন বন্ধুর বন্ধু, সত্যি সত্যি গ্রামের উপর দিয়ে উড়ে যাওয়া ডাইনীদের দেখেছে কলা পাতার উপর চড়ে, তারা অতর্কিতে যাদুর তীর ছুড়ে ঘায়েল করছে তাদের শিকারদের।

বয়ের তার ব্যাক্তিগত একটি অভিজ্ঞতা এর সাথে যোগ করেন:

কেমব্রীজ কলেজে এক নৈশভোজের সময় আমি এইসব এবং আরো কিছু বিচিত্র চমকপ্রদ কাহিনী বলছিলাম,তখন আমাদের একজন অতিথি,কেমব্রীজের প্রখ্যাত একজন ধর্মতত্ত্ববিদ,আমার দিকে ঘুরে তাকান এবং মন্তব্য করেন:’এই কারনে নৃতত্ত্ববিদ্যা এত বিস্ময়কর এবং কঠিনও বটে। কারন আপনাকে ব্যাখ্যা করতে হয়, ”কিভাবে মানুষ এই সব আজগুবি জিনিস বিশ্বাস করতে পারে”; কিছুক্ষনের জন্য মন্তব্যটি আমাকে হতবাক করে দিয়েছিল, কেতলী কিংবা চায়ের পট সম্বন্ধে প্রাসঙ্গিক কোন প্রত্যুত্তর খুজে পাবার আগে কথপোকথনটি ভিন্ন দিকে মোড় নিয়েছিল।

কেমব্রিজ এই ধর্মতাত্বিক মুলধারার একজন খৃষ্ট ধর্ম বিশ্বাসী হবেন এমন ধারনা করে নিয়ে আমরা বলতে পারি যে,তিনি সম্ভবত নিম্নে উল্লেখিত এমন কিছু বিষয়ে এক বা একাধিক বিশ্বাস করে থাকেন:

- আমাদের পুর্বপুরুষদের সেই প্রাচীন সময়ে, একজন পুরুষ,যিনি জন্মগ্রহন করেছিলেন একজন কুমারী মা গর্ভে,যেখানে তার জন্মের জন্য কোন মানব (জৈববৈজ্ঞানিক) পিতার ভুমিকাই ছিল না।
- সেই একই পিতৃহীন পুরুষ ব্যাক্তিটি তার ল্যাজারাস নামক একজন বন্ধুকে আহবান করেছিলেন,যিনি পচন ধরে যাবার মত সময়কাল ধরে মৃত এবং সেই আহবান শুনে ল্যাজারাস দ্রুত জীবন্ত হয়ে উঠেছিলেন।
- পিতৃহীন এই পুরুষ মানুষটি নিজেও মৃতাবস্থা এবং কবর দেবার পর তৃতীয় দিনে জীবিত সশরীরে ফিরে আসেন;
- এবং এর চল্লিশ দিন পর এই পিতৃহীন মানুষটি নিজেই একটি পাহাড়ের চুড়ায় আরোহন করেন এবং স্বশরীরে তিনি আকাশে অদৃশ্য হয়ে যান।
- যদি আপনি কোন চিন্তা আমার মাথার মধ্যে ব্যাক্তিগতভাবে ফিসফিস করে উচ্চারন করেন, পিতৃহীন ব্যাক্তি এবং তার পিতা (তিনি নিজেও সেই জন) আপনার সেই চিন্তা শুনতে পান এবং যদি তিনি চান সে বিষয়ে কিছু পদক্ষেপও নিতে পারেন। এছাড়াও তিনি একই সাথে সারা পৃথিবীর অন্য সবাই কি চিন্তা করছেন সেটা শুনতে পান।
- আপনি খারাপ যদি কিছু করে থাকেন, বা ভালো কিছু, সেই একই পিতৃহীন পুরুষ সবই দেখতে পাবেন,এমনকি যখন আর কেউই সেটা না দেখতে পান না। আপনার কর্মানুযায়ী আপনি হয়তো পুরষ্কার কিংবা শাস্তি পেতে পারেন, বর্তমানে এবং আপনার মৃত্যুর পরেও।
- পিতৃহীন এই পুরুষটির কুমারী মা কখনো মৃত্যুবরণ করেননি, তিনিও সশরীরের স্বর্গে ’আরোহন’ করেছিলেন।
- রুটি এবং মদ,যদি কোন যাজক দ্বারা আর্শীবাদপুষ্ট হয় (যার অবশ্যই অন্ডকোষ থাকতে হবে), সেগুলো তাহলে সেই পিতৃহীন পুরুষ মানুষটির শরীর এবং রক্তে ’পরিনত’ হয়;

এবার ভাবুন, কেমব্রিজে ফিল্ডওয়ার্কের সময় যদি কোন একজন নৈব্যাক্তিক নৃতত্ববিদ এই ধরনের বিশ্বাসের মুখোমুখি হন, তাহলে তিনি এর কি ব্যাখ্যা দেবেন?

(৫) Blaker, K., ed. (2003). The Fundamentals of Extremism: The Christian Right in America. Plymouth, MI: New Boston.

রিচার্ড ডকিন্স এর দি গড ডিল্যুশন : পঞ্চম অধ্যায় (পঞ্চম পর্ব)

By K M Hassan

ব্র্যাড হল্যান্ড (Brad Holland) এর একটি ইলাসট্রেশন

রিচার্ড ডকিন্স এর দি গড ডিল্যুশন : পঞ্চম অধ্যায় (পঞ্চম পর্ব)

(অনুবাদ প্রচেষ্টা: কাজী মাহবুব হাসান)

The God Delusion by Richard Dawkins

প্রথম অধ্যায়
দ্বিতীয় অধ্যায়
তৃতীয় অধ্যায়
চতুর্থ অধ্যায় (প্রথম পর্ব) , চতুর্থ অধ্যায় (দ্বিতীয় পর্ব) ,

চতুর্থ অধ্যায় (তৃতীয় পর্ব) , চতুর্থ অধ্যায় (চতুর্থ পর্ব) , চতুর্থ অধ্যায় (শেষ পর্ব)
পঞ্চম অধ্যায় (প্রথম পর্ব), পঞ্চম অধ্যায় (দ্বিতীয় পর্ব) , পঞ্চম অধ্যায় (তৃতীয় পর্ব)
পঞ্চম অধ্যায় (চতুর্থ পর্ব)

ধর্মের শিকড়

Our innate dualism prepares us to believe in a ‘soul’ which inhabits the body rather than being integrally part of the body. Such a disembodied spirit can easily be imagined to move on somewhere else after the death of the body. We can also easily imagine the existence of a deity as pure spirit, not an emergent property of complex matter but existing independently of matter. (Richard Dawkins)

ধর্মবিশ্বাসী হবার জন্য মনস্তাত্বিক পুর্বপ্রস্তুতি:

মনস্তাত্বিক উপজাত বা বাই-প্রোডাক্ট এর ধারনাটি খুব স্বাভাবিকভাবেই বেড়ে উঠেছে গুরুত্বপুর্ণ ও ক্রমবর্ধমান বিবর্তন মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্র থেকে। বিবর্তন মনোবিজ্ঞানীরা প্রস্তাব করেন যে, চোখ যেমন দেখার জন্য বিবর্তিত একটি অঙ্গ, ডানা যেমন উড়বার জন্য বিবর্তিত একটি অঙ্গ, আমাদের মস্তিষ্ক বা ব্রেইনও এ গুচ্ছ প্রতঙ্গ (বা মডিউল) এর একটি সমষ্টি, যাদের মুল কাজ হচ্ছে বিশেষায়িত তথ্য ও উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণ । সেখানে একটি মডিউল আছে, যা আত্মীয়তা বা কিনশীপের বিষয়টি নিয়ন্ত্রণ করে, একটি মডিউলের কাজ যেমন পারস্পরিক আদান প্রদান (রেসিপ্রোকাল এক্সচেন্জ্ঞ),একটি মডিউলের কাজ সমবেদনা বা এমপ্যাথী নিয়ে এবং এভাবে আরো বেশ কিছু মডিউলের সমন্বয়। এবং ধর্মকে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে, এধরনের একাধিক মডিউলের মিসফায়ারিং (বা যা করা তার মুল উদ্দেশ্য না) এর উপজাত বা বাই-প্রোডাক্ট ফলাফল হিসাবে। যেমন, থিওরী অব আদার মাইন্ড (বা মানসিক অবস্থা আরোপ করার ক্ষমতা, যেমন বিশ্বাস, উদ্দেশ্য, আকাঙ্খা, ভান করা বা জ্ঞান ইত্যাদি, নিজের উপর কিংবা অন্যদের – এবং বুঝতে পারার ক্ষমতা যে, অন্যদেরও বিশ্বাস, আকাঙ্খা কিংবা উদ্দেশ্য কারো নিজের থেকে ভিন্ন হতে পারে) তৈরীর মডিউল, কোয়ালিশন বা সহযোগী জোট তৈরী করার জন্য মডিউল,আগান্তুকদের তুলনায় একই গ্রুপের সদস্যদের সহযোগীতা করা পক্ষপাতমুলক আচরনের মডিউল; এর যে কোনোটি মথদের তারা কিংবা চাদের আলো ব্যবহার করে দিক নির্দেশনা দেবার মানবীয় একটি সংস্করণ হতে পারে, যার মিসফায়ারিং হবার স্বাভাবিক প্রবণতা থাকে, শৈশবের অতি বিশ্বাসপ্রবণতার ক্ষেত্রে আমি যেমন করে ব্যাখ্যা দিয়েছি। মনোবিজ্ঞানী পল ব্লুম, বাই প্রোডাক্ট হিসাবে ধর্মের উৎপত্তি সংক্রান্ত ধারনার আরো একজন প্রস্তাবক সেই বিষয়টিকে যেভাবে ব্যাখ্যা করেছেন তা হলো, শিশুদের একটি স্বাভাবিক প্রবণতা থাকে ’মনের দ্বৈততা বা ডুয়ালিস্টিক’ তত্ত্বের জন্য। ধর্ম তার মতে, এই সহজাত দ্বৈততার একটি বাই-প্রোডাক্ট বা উপজাত। তার প্রস্তাব অনুযায়ী আমরা মানুষরা, বিশেষকরে শিশুরা, জন্মগতভাবেই দ্বৈতবাদী;

একজন দ্বৈতবাদী মন এবং বস্তুর মধ্যে একটি মৌলিক পার্থক্য স্বীকার করে নেন. মোনিষ্ট বা একাত্মবাদীরা বিশ্বাস করেন মন হচ্ছে বস্তুর বা ম্যাটারের – মস্তিষ্কের কোন অংশ, বা হয়তো বা একটি কম্পিউটারের – একটি প্রকাশ,এবং বস্তু থেকে এর আলাদা কোন অস্তিত্ব নেই। দ্বৈতবাদী বা ডুলালিস্টরা বিশ্বাস করেন, মন হচ্ছে এক ধরনের শরীর বিচ্ছিন্ন কোন আত্মা যা শরীরের মধ্যে বসবাস করে এবং সুতরাং বোধগম্য কারনে এটি শরীরকে ত্যাগ করতে পারে এবং অন্য কোথাও থাকতে পারে। ডুয়ালিষ্টরা মানসিক অসুখকে খুব সহজে ব্যাখ্যা করে, ’অশুভ শয়তানের দ্বারা আচ্ছন্ন’ হওয়া একটি অবস্থা হিসাবে। এই শয়তানগুলো যেহেতু ’আত্মা’, শরীরে তাই তাদের অবস্থান সাময়িক, এবং সেকারনে তাদের শরীর থেকে ’বিতাড়িত’ করাও সম্ভব। দ্বৈতবাদীরা সুযোগ পেলেই প্রাণহীন যে কোন

ভৌত বস্তুকে পারসোনিফাই বা মানবীয় কোন বৈশিষ্ট আরোপ করেন, তারা জলপ্রপাত কিংবা মেঘে আত্মা এবং দানবের উপস্থিতি দেখতে পান।

এফ আন্সটে র ১৮৮২ সালের উপন্যাস Vice Versa যে কোন দ্বৈতবাদীর কাছেই অর্থবহ মনে হতে পারে,কিন্তু বিষয়টি আমার মত খাটি একাত্মবাদী বা মোনিষ্টদের কাছে অবোধ্য হওয়া উচিৎ। জনাব বাল্টিটুড এবং তার পুত্র রহস্যজনকভাবে লক্ষ্য করেন, তাদের শরীরের অদল বদল ঘটেছে। পুত্রের বিশেষ আনন্দ যেহেতু, বাবাকে পুত্রের শরীরে স্কুলে যেতে হচ্ছে এবং অন্যদিকে পুত্র বাবা শরীরের তার অপরিপক্ক সিদ্ধান্তের জন্য বাবার ব্যবসাকে প্রায় ধ্বংস হবার উপক্রম করে। পি জি উডহাউস Laughing Gas এ প্রায় একই ধরনের একটি কাহিনীসুত্র ব্যবহার করেছিলেন, যেখানে হ্যাভারশটের আর্ল এবং একজন শিশু চলচ্চিত্র তারকা একই সাথে পাশাপাশি দাতের ডাক্তারের চেম্বারে অজ্ঞান করার ঔষধ পান এবং একে অপরের শরীরে তাদের ঘুম ভাঙ্গে; আবারো এই গল্পের প্লট অর্থবহ হতে পারে শুধু দ্বৈতবাদীদের কাছে,লর্ড হ্যাভারশটের এমন কিছু আছে যা তার শরীরের অংশ নয়,নতুবা কি করে তিনি শিশু অভিনেতা শরীরে জেগে উঠতে পারেন।

বেশীর ভাগ বিজ্ঞানীদের মতই আমি ডুয়ালিষ্ট নই,কিন্তু তাসত্বেও Vice Versa ও Laughing Gas এর মজা আমি সহজেই উপভোগ করতে পারি। এ বিষয়ে পল ব্লুম যা বলবেন তা হলো, যদিও আমি বুদ্ধিবৃত্তিক স্তরে মোনিষ্ট বা একাত্মবাদী হতে শিখেছি,আমি যেহেতু একজন মানুষ প্রানী সুতরাং সহজাতভাবে দ্বৈতবাদী বা ডুয়ালিষ্ট হিসাবে বিবর্তিত হয়েছি। আমার চোখের পেছনে একটা ‘আমি’ যে ঘাপটি মেরে বসে আছে এবং নিদেনপক্ষে যে কিনা অন্ততপক্ষে গল্পে আরেকজনের মস্তিষ্কে প্রবেশ করতে পারে– এই ধারনাটি আমার এবং অন্য যেকোন মানব মস্তিষ্কের অনেক গভীরে প্রোথিত হয়ে আছে, একাত্মবাদ বা মোনিজম এর প্রতি আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিক যে অবস্থানই থাকুক না কেন;ব্লুম তার এই দাবীর স্বপক্ষে বেশ কিছু পরীক্ষামুলক প্রমানও প্রস্তাব করেন,তিনি দেখান যে, শিশুরা প্রাপ্তবয়স্কদের তুলনায় আরো বেশী দ্বৈতবাদী,বিশেষ করে খুবই অল্প বয়সের শিশুরা। এটাই ইঙ্গিত করে যে দ্বৈতবাদ বা ডুয়ালিজমের একটি প্রবণতা আছে আমাদের মস্তিষ্কের অন্তর্গত একটি সহজাত প্রক্রিয়া হিসাবে তার পুর্বাপস্থিতি বজায় রাখা এবং ব্লুমের মতে যা আমাদের ধর্মীয় ধারনাকে সাদরে গ্রহন করার জন্য স্বাভাবিক একটি পরিস্থিতি ও প্রাকপ্রস্তুতিমুলক অবস্থা সৃষ্টি করেই রাখে।

ব্লুম আরো প্রস্তাব করেন যে,জন্মগতভাবেই আমাদের সৃষ্টিবাদী হবার প্রবণতা থাকে। প্রাকৃতিক নির্বাচন ইনটুইটিভ বা সহজাতভাবেই অর্থবহ হয়না আমাদের কাছে; শিশুরা, বিশেষ করে সবকিছুর উপরে কারন বা উদ্দেশ্য আরোপ করে, যা মনোবিজ্ঞানী ডেবোরাহ কেলেমান তার প্রবন্ধ ‘Are children intuitive theists?’ এ আমাদের জানিয়েছেন; ’বৃষ্টির’ জন্য মেঘ,পাথরের সুচালো কোনা থাকে কারন ‘কোন জন্তুর যখন গা চুলকায় তারা সেখানে গা ঘষে চুলকিয়ে নিতে পারে’; সবকিছুর পেছনের কোন উদ্দেশ্য আরোপ করাকে বলে টেলিওলজী বা পুর্বকারনবাদ। শিশুরা জন্মগতভাবেই টেলিওলজিষ্ট এবং অনেকেই এর থেকে আর বের হতে পারেনা;

এই জন্মগত ডুয়ালিজম এবং টেলিওলজী,উপযুক্ত শর্তাবলীর উপস্থিতিতে আমাদের ধর্মে প্রতি আকৃষ্ট হবার প্রবনতা সৃষ্টি করে,ঠিক যেমন করে আমার ইতিপুর্বে উদহারন দেয় মথদের আলো–কম্পাসের প্রতি প্রতিক্রিয়া যেমন তাদের ভুল অনিচ্ছাকৃত তথাকথিত ’আত্মহত্যা’র প্রবণতা বৃদ্ধি করে। আমাদের সহজাত দ্বৈতবাদ আমাদেরকে ’আত্মা’র ধারনায় বিশ্বাস করতে প্রস্তুত করে,যা শরীরের প্রত্যক্ষ অংশ হবার বদলে আমাদের ভিতরে বসবাস করে।এই ধরনের শরীর বিচ্ছিন্ন আত্মাকে নিয়ে খুব সহজেই কিন্ত ভাবা যায়,আমাদের মৃত্যুর পর এটি অন্য কোথায় চলে যায়; এছাড়া কোন জটিল কোন বস্তুর বিকশিত কোন বৈশিষ্ট হিসাবে না বরং বস্তু থেকে স্বাধীন হিসাবে আমরা খুব সহজে ’বিশুদ্ধ আত্মা‘ হিসাবে ঈশ্বরকে বা দেবদেবীদের কল্পনা করতে পারি এবং আরো স্পষ্টভাবে,শিশুসুলভ টেলিওলজী ধর্মের জন্য আমাদের প্রস্তুত করে। যদি সবকিছুরই কোন কারণ বা উদ্দেশ্য থাকে,তাহলে সেগুলো কার উদ্দেশ্য? অবশ্যই ঈশ্বরের।

কিন্তু মথদের আলোক কম্পাসের যে ’উপযোগিতা’ এখানে তার সমতুল্য কি? তাহলে প্রাকৃতিক নির্বাচন কেন দ্বৈতবাদ এবং পুর্বকারনবাদকে সহায়তা করেছে আমাদের পুর্বপুরুষ ও তাদের সন্তানদের মস্তিষ্কে? আপাতত,‘জন্মগত ডুয়ালিষ্ট’ তত্ব সম্বন্ধে আমার ব্যাখ্যা প্রস্তাব করছে যে,মানুষ হচ্ছে জন্মগত ভাবেই ডুয়ালিষ্ট এবং টেলিওলজিষ্ট,কিন্তু এর ডারউইনীয় সুবিধাটি কি হতে পারে? আমাদের চারপাশের জগতে উপস্থিত নানা এনটিটি বা সত্বার আচরণ সম্বন্ধে পুর্ব ধারনা আমাদের বেচে থাকার জন্য গুরুত্বপুর্ণ এবং আমরা প্রত্যাশা হয়তো করতে পারি যে প্রাকৃতিক নির্বাচন আমাদের মস্তিষ্কের গঠনটাকে এই কাজটি দ্রুত ও দক্ষতার সাথে করার উপযোগী করে গড়ে তুলেছে। ডুয়ালিজম আর টেলিওলজী কি আমাদের এই ক্ষমতায় কোন সহায়তা করে? এই হাইপোথিসিসটাকে আমরা হয়তো ভালো বুঝতে পারি দার্শনিক ড্যানিয়েল ডেনেট যাকে বলেছেন intentional stance বা উদ্দেশ্যমুলক দৃষ্টিভঙ্গীর আলোকে।

ডেনেট স্ট্যান্স (Stance) বা দৃষ্টিভঙ্গীর ত্রিমুখী শ্রেনীবিভাগের একটি বোধগম্য প্রস্তাব করেছেন,যে স্ট্যান্স আমরা অবলম্বন করি বুঝবার চেষ্টা করার জন্য এবং সেকারনেই নানা সত্বার আচরণ সম্বন্ধে পুর্বধারনা করতে পারি,যেমন কোন প্রানী বা যন্ত্র বা একে অন্যেরে।এই স্ট্যান্সগুলো হচ্ছে,ভৌতিক বা ফিজিক্যাল স্ট্যান্স,ডিজাইন স্ট্যান্স এবং ইনটেশনাল স্ট্যান্স। ভৌতিক বা ’ফিজিক্যাল স্ট্যান্স’ সবসময় নীতি মেনে কাজ করে,কারন সবকিছুই পদার্থবিদ্যার সুত্র মেনে চলে। কিন্তু ফিজিকাল স্ট্যান্স ব্যবহার করে কোন কিছুর ব্যাখ্যা করার পক্রিয়া বেশ মন্থর গতির হতে পারে; যতক্ষনে আমরা কোন একটি জটিল বস্তুর নানা চলমান অংশগুলোর ক্রিয়া প্রতিক্রিয়াগুলো হিসাব নিকেশ শেষ করবো, ততক্ষনে এর আচরণ সংক্রান্ত কোন পুর্বধারনা সম্ভবত আমাদের জন্য বেশ দেরী হয়ে যাবে। কোন একটি বস্তু যা আসলেই ডিজাইন করা হয়েছে,যেমন ওয়াশিং মেশিন বা একটি ক্রশবো,ডিজাইন স্ট্যান্স একটি মিতব্যায়ী শর্টকার্ট হতে পারে; আমরা পদার্থবিদ্যার ব্যাখ্যা একপাশে সরিয়ে রেখে কিন্তু অনুমান করতে পারে বস্তুটির আচরন কি হতে পারে,সরাসরি এর ডিজাইন বা পরিকল্পনার দিকে নজর দিয়ে। যেমন ডেনেট বলেছেন,

> এর বাইরের দিকটাকে একটু ভালো করে পর্যবেক্ষন করলেই প্রায় যে কোন কেউ ভবিষ্যদ্বানী করতে পারে একটি অ্যালার্ম ঘড়ি কখন শব্দ করবে; এটা কি স্প্রিং প্যাচানে,নাকি ব্যাটারী চালিত,নাকি সুর্যালোক,তামার চাকা নাকি রত্নের বিয়ারিং বা সিলিকন চিপস এ বিষয় নিয়ে কারো এত মাথাব্যাথা নেই – শুধু ধারনা করে নেয়া যায়,এমনভাবে এটি ডিজাইন করা যে ঠিক তখনই অ্যালার্মের শব্দ বাজবে ঠিক যখন বাজবার জন্য এটি সেট করা হয়েছে।

জীবিত প্রানীরা ডিজাইন বা পরিকল্পিত নয়,কিন্তু ডারউইনীয় প্রাকৃতিক নির্বাচন ডিজাইন দৃষ্টিভঙ্গীর একটি সংস্করণকে এখানে অনুমতি দেয় তাদের ক্ষেত্রে প্রয়োগের জন্য; এভাবেই আমরা আমাদের হৃৎপিন্ডকে বোঝার জন্য একটি শর্টকাট পাই,যদি আমরা ধরে নেই এটি ডিজাইন করা হয়েছে রক্তকে পাম্প করার জন্য। কার্ল ভন ফ্রিশ মৌমাছিদের কালার ভিশন নিয়ে একটি গবেষনার নেতৃত্ব দিয়েছিলেন (বিশেষ করে যখন মুলত সবার ধারনা ছিল মৌমাছিরা রঙ দেখতে পারেনা বা তারা কালার ব্লাইন্ড) কারন তিনি ধারনা করেছিলে ফুলদের উজ্জ্বল রং আসলে ’পরিকল্পিত’ হয়েছে মৌমাছিদের আকর্ষন করার জন্য। পরিকল্পিত বা ডিজাইন শব্দটিকে উদ্ধৃতির চিহ্ন দিয়ে আবদ্ধ করার উদ্দেশ্য মিথ্যাচারী সৃষ্টিবাদীদের খানিকটা ভয় দেখিয়ে দুরে সরিয়ে দেবার জন্য,নয়তো তারা হয়তো দাবী করে বসবেন বিখ্যাত অষ্ট্রিয় প্রাণীবিজ্ঞানী তাদের মতই একজন সৃষ্টিবাদী ছিলেন। বলাবাহুল্য তিনি পুরোপুরি দক্ষ ছিলেন ডিজাইন দৃষ্টিভঙ্গীটাকে সঠিক ডারউইনীয় ভাষায় ব্যাখ্যা করার জন্য।

ইনটেশনাল স্ট্যান্স (উদ্দেশ্যমুলক দৃষ্টিভঙ্গী) হচ্ছে আরেকটি শর্টকাট এবং এটি ডিজাইন দৃষ্টিভঙ্গী থেকে আরো একধাপ উপরে:কোন এনটিটি বা সত্বাকে ধরে নেয়া হয় শুধু বিশেষ কোন উদ্দেশ্যেই তাদের ডিজাইনই শুধু করা হয়নি,উপরন্তু এরা হচ্ছে ’এজেন্ট’ বা কোনে ’এজেন্ট’ ধারন করে,তাদের সব কর্ম উদ্দেশ্য দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করার লক্ষ্যে। আপনি যখন কোন বাঘকে দেখেন,আপনার তখন দেরী করা উচিৎ হবে না তার সম্ভাব্য আচরণ সম্বন্ধে অনুমান করতে। এর অনুপরমানুর পদার্থবিদ্যা নিয়ে বা এর পা,নোখ,দাতের আকৃতির ডিজাইন সম্বন্ধে তখন আর

কোন চিন্তার অবকাশ নেই;বাঘ আপনাকে খেতে চাইছে,এবং এটি তার পা,নোখ এবং দাত অত্যন্ত দক্ষতা আর সাবলীলতার সাথে ব্যবহার করতে পারে তার সেই উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করবে;সবচে দ্রুত এর সম্ভাব্য আচরণ অনুমান করার একমাত্র উপায় হল, পদার্থবিদ্যা আর শরীরবৃত্তীয় কোন ভুল সরাসরি এর উদ্দেশ্য বা ইনটেনশন সম্বন্ধে ধারন করে নেয়া; লক্ষ্য করতে হবে,ডিজাইন দৃষ্টিভঙ্গী ডিজাইন করা এমন কিছুর ক্ষেত্রে যেমন প্রযোজ্য তেমনি কাজে লাগানো যায় ডিজাইন করা নয় এমন কিছুর ক্ষেত্রেও সুতরাং এই উদ্দেশ্যমুলক দৃষ্টিভঙ্গীও সেভাবে কাজ করে,যাদের কোন সুনির্দিষ্ট সচেতন কোন উদ্দেশ্য নেই সেই সব জিনিসের ক্ষেত্রেও, যাদের তা আছে তাদের ক্ষেত্রে যেমন কাজ করে;

আমার মনে হয় এটা খুবই সম্ভাব্য ব্যাখ্যা হতে পারে, যে বেচে থাকার জন্য এই ইনটেনশনাল বা উদ্দেশ্যমুলক দৃষ্টিভঙ্গীর একটা গুরুত্ব আছে, যা একটি ব্রেন মেকানিজম হিসাবে সিদ্ধান্ত নেবার প্রক্রিয়াটি দ্রুততর করে যে কোন বিপজ্জনক এবং গুরুত্বপুর্ণ সামাজিক পরিস্থিতিতে। সহজেই কিন্তু স্পষ্ট হয়না যে দ্বৈতবাদী উদ্দেশ্যমুলক দৃষ্টিভঙ্গীর এরই একট অপরিহার্য অনুসঙ্গ। আমি ব্যাপারটা এখানে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করত যাবো না, কিন্তু আমি মনে করি কোন এক ধরনের 'থিওরী অব আদার মাইন্ড' সংক্রান্ত একটি কেস এখানে গড়ে তোলা যেতে পারে ব্যাখ্যা করার উদ্দেশ্যে, যাকে অনায়াসে বর্ণনা করা যেতে পারে ডুয়ালিস্টিক বা দ্বৈতবাদী, যা ইনটেনশনাল স্ট্যান্সের বা উদ্দেশ্যমুলক দৃষ্টিভঙ্গীর ভিত্তি গড়তে পারে –বিশেষ করে জটিল কোন সামাজিক পরিস্থিতিতে,এমন কি বিশেষকরে যেখানে আরো উচু পর্যায়ের ইনটেনশনালাটির বা উদ্দেশ্যময়তার ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয়।

ডেনেট তৃতীয় মাত্রার ইনটেনশনালটি (থার্ড অর্ডার ইনটেনশনালটি) বা উদ্দেশ্যমুলকতার (পুরুষটি বিশ্বাস করে যে, নারীটি জানে সে তাকে কামনা করছে); চতুর্থ মাত্রার বা ফোর্থ অর্ডার(নারীটি বুঝতে পারছেন যে,পুরুষটি বিশ্বাস করে নারীটি জানে সে তাকে কামনা করে); এমনকি পঞ্চম মাত্রার উদ্দেশ্যমুলকতারও (শামান অনুমান করছেন যে নারীটি বুঝতে পেরেছে,পুরুষটি বিশ্বাস করে যে নারীটি জানে সে তাকে কামনা করছে) কথা উল্লেখ করেছেন; খুব বেশী মাত্রার ইনটেনশনালিটি সম্ভবত সীমাবদ্ধ কল্পকাহিনীতে, মাইকেল ফ্রায়ান তার অত্যন্ত্য কৌতুকপ্রদ উপন্যাস The Tin Man এ যেমন শ্লেষাত্মক ভাষায় লিখেছিলেন,'নুনোপুলোস কে দেখে,রিক জানতো যে সে প্রায় নিশ্চিৎ যে, অ্যানা তীব্র ঘৃণা অনুভব করেছিল ফিডলিংচাইল্ড এর তার অনুভুতিগুলো বুঝতে না পারার ব্যর্থতার প্রতি এবং সে (অ্যানা) জানতো যে, নীনা আগে থেকেই জানতো যে সে (অ্যানা) জানে নুনোপুলোস এর এ বিষয়ে ধারনা ...; ' কিন্তু ফ্যাক্টটি হলো, আমরা এই অন্য কারো মন সম্বন্ধে নেয়া সিদ্ধান্তগুলো নিয়ে একরম জটিল প্যাচ দেখে যে হাসতে পারছি সম্ভবত এটি আমাদের গুরুত্বপুর্ণ কিছুর ইঙ্গিত দিচ্ছে, যেমন আমাদের মন কেমন করে বাস্তব জগতে কাজ করার জন্য প্রাকৃতিকভাবে নির্বাচিত হয়েছে;

নিদেনপক্ষে কম মাত্রায় ইনটেনশনাল স্ট্যান্স,ডিজাইন স্ট্যান্স এর মত সময় বাচায়,যা বাচার জন্য অত্যন্ত্ গুরুত্বপুর্ণ হতে পারে। ফলাফলে প্রাকৃতিক নির্বাচন শর্টকাট হিসাবে ইনটেনশনাল স্ট্যান্সকে ব্যবহার করার উপযোগি করে আমাদের মস্তিষ্ককে গড়ে তুলেছে; আমরা জৈববৈজ্ঞানিকভাবেই প্রোগ্রাম করা, যে কোন সত্বা উপর উদ্দেশ্য আরোপ করা যাদের আচরণ আমাদের কাছে গুরুত্বপুর্ণ। আরো একবার,পল ব্লুম শিশুদের মধ্যে এর পরীক্ষামুলক প্রমান উল্লেখ করে বলেছেন, যে শিশুরা বিশেষভাবে ইনটেনশনাল স্ট্যান্সটিকেই বেছে নেয়। যখন ছোট শিশুরা কোন বস্তু দেখে অপর একটি বস্তুকে অনুসরণ করছে(যেমন কোন কম্পিউটার স্ক্রিন),তারা ধরে নেয় সক্রিয় ভাবে একটি আরেকটির পিছু নিচ্ছে, আর এই অনুগমন একটি উদ্দেশ্য সহ এজেন্ট এর কথা স্মরণ করিয়ে দেয় এবং তারা সত্যিকারের বিস্ময় প্রকাশ করে যখন কাল্পনিক সেই এজেন্টটি ব্যার্থ হয় তার এই ধাওয়া করে ধরার প্রচেষ্টায়।

ডিজাইন স্ট্যান্স ও ইনটেনশনাল স্ট্যান্স খুব উপকারী দুটি ব্রেন মেকানিজম, কোন সত্বা সম্বন্ধের ধারনার প্রক্রিয়াটিকে এরা দ্রুত করে,যা সার্ভাইভাল বা বাচার জন্য বিশেষ গুরুত্বপুর্ণ, যেমন আক্রমন করতে পারে এমন শিকারী প্রানী বা সম্ভাব্য প্রজনন সঙ্গী। কিন্তু অন্য ব্রেন মেকানিজমের মত এই স্ট্যান্সগুলো ভুল করতে পারে।

শিশুরা ও আদি মানুষরা আবহাওয়ার,ঢেউ,স্রোত,গড়িয়ে পড়া পাথরের উপর উদ্দেশ্য আরোপ করে আমাদের সবারই যন্ত্রের সাথে সেই একই কাজ করার প্রবণতা আছে,বিশেষ করে যখন তারা ঠিক মত কাজ না করে আমাদের হতাশ করে। অনেকেই হয়তো খানিকটা ভালোলাগার সাথে মনে রাখতে পারেন, যেদিন বাসিল ফল্টির (বৃটিশ টেলিভিশন কমেডি The Faulty Towers এ) গাড়ী নষ্ট হয়ে গিয়েছিল বিশেষ একটি রাতের ভোজসভার আয়োজন বাচানোর প্রচেষ্টায় নেয়া গুরুত্বপুর্ণ একটি মিশনের সময় তার গাড়ী হঠাৎ নষ্ট হয়ে গিয়েছিল, তিনি গাড়ীটিকে প্রথমে সাবধান বাণী শোনান,তিন পর্যন্ত গণনা করেন,এরপর গাড়ী থেকে বের হয়ে একটা গাছের ডাল যোগাড় করেন,সমানে গাড়ীটিকে পেটাতে থাকেন যেন প্রায় মেরে ফেলবার অভিপ্রায়ে; আমাদের অনেকের জীবনে এই পরিস্থিতি হয়েছে,ক্ষনকালের জন্য হলেও,সে অভিজ্ঞতা গাড়ী নিয়ে না হলে হয়তো কম্পিউটার নিয়ে। জাস্টিন ব্যারেট একটি সংক্ষিপ্ত রুপ প্রস্তাব করেছিলেন, hyperactive agent detection device এর জন্য, HADD; আমরা অতিসক্রিয় হয়ে কোন এজেন্টকে খুজে বের করি,যখন সেখানে কোন এজেন্টরই অস্তিত্ব আসলে নেই এবং এটাই আমাদের সন্দেহ প্রবণ করে তোলে এমন কোথাও খারাপ বা ভালো উদ্দেশ্য নিয়ে,যেখানে আসলে প্রকৃতি শুধুমাত্র নির্বিকার। আমি আমাকে ক্ষনিকের জন্য হলেও লক্ষ্য করেছি মনে তীব্র বুনো বিতৃষ্ণা পোষন করতে, কোন নির্দোষ প্রানহীন বস্তুর প্রতি, যেমন আমার সাইকেলের চেইন; একটি দুঃখজনক সাম্প্রতিক ঘটনা জানাচ্ছে, এক ব্যক্তি তার ঠিকমত বাধা না থাকা জুতোর ফিতায় জড়িয়ে সিড়ি বেয়ে নীচে গড়িয়ে পড়েছিলেন, কেমব্রিজের ফিটজউইলিয়াম মিউজিয়ামে,এই নীচে গড়িয়ে পড়ার সময় তিনি দুর্লভ এবং অমুল্য একটি কিং (Quing)ডায়ন্যাষ্টির সময়কালের একটি ভাসের উপর এসে পড়েন, যা টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙ্গে যায়। মিউজিয়াম কর্মচারী সেখানে উপস্থিত হয়ে দেখতে পান ব্যাক্তিটি সেই ভেঙ্গে যাওয়া ভাসটির অজস্র টুকরোর ঠিক মাঝখানে বসে আছেন হতবাক হয়ে, যেন তীব্র শকে তারা বাকরুদ্ধ হয়ে চারদিকে সবাই যখন গভীর নীরবতায় চুপ করে আছেন,ব্যক্তিটি বার বার তার জুতার ফিতার দিকে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে বলছিল,‘এই যে, এটাই আসল অপরাধী’।

ধর্মের অন্য বাই-প্রোডাক্ট ব্যাখ্যাগুলো প্রস্তাব করেছিলেন হিন্দ (Hinde),শেরমার (Shermer), বয়ের (Boyer), ডেনেট (Dennett), আটরান (Atran), ব্লুম (Bloom), কেলেম্যান (Keleman) সহ অনেকে। একটি বিশেষ কৌতুহলোদ্দীপক সম্ভবনার কথা উল্লেখ করেছিলেন ডেনেট, ধর্মের অযৌক্তিকতা হচ্ছে আমাদের ব্রেইনের একটি নির্দিষ্ট ইনবিল্ট বা অন্তর্গত অযৌক্তিকতারই একটি বাই-প্রোডাক্ট বা উপজাত:সেটি হচ্ছে আমাদের প্রেমে পড়ার প্রবণতা,যার সম্ভবত জীনগত কিছু সুবিধা আছে;

নৃতত্ত্ববিদ হেলেন ফিশার,তার Why We Love এ রোমান্টিক ভালোবাসার উন্মত্ত পাগলামোটাকে সুন্দরভাবে প্রকাশ করেছিলেন এবং কিভাবে একে অতি মাত্রায় তুলনা করা হয় এমন কিছুর সাথে, যা মনে হতে পারে অবশ্যই প্রয়োজনীয়। বিষয়টি এভাবে লক্ষ্য করুন: কোন পুরুষের দৃষ্টিভঙ্গীতে তার পরিচিতদের মধ্যে শুধু মাত্র একজন নারী অন্যান্য নিকটতম প্রতিদ্বন্দী অপেক্ষা শতগুন বেশী ভালোবাসার যোগ্য হবার সম্ভাবনা কিন্তু খুবই কম। কিন্তু তারপরেও পুরুষটি এভাবেই তার ভালোবাসার পাত্রীকে বর্ণনা করে থাকে যখন সে তার ‘প্রেমে’ পড়ে। এই উন্মত্ত গোড়া একগামী আনুগত্যর প্রবণতা যার শিকার হবার সম্ভাবনা আমাদের সবারই,তার তুলনা কিন্তু একধরনের পলিআমোরী বা বহুপ্রেম এর চেয়ে বেশী যৌক্তিক মনে হতে পারে (পলিঅ্যামোরী,হচ্ছে সেই বিশ্বাস, যে কেউ একই সাথে বীপরিত লিঙ্গর কয়েকজন সদস্যকে ভালোবাসতে পারে,ঠিক যেমন করে কেউ একাধিক মদ,সুরকার,বই কিংবা খেলা ভালোবাসতে পারে) ;আমরা আনন্দের সাথে মেনে নেই যে,আমরা একাধিক শিশু,পিতামাতা,ভাইবোন,শিক্ষক,বন্ধু কিংবা পোষা প্রানীদের ভালোবাসতে পারি;আপনি যখন বিষয়টা এভাবে ভাবেন,তখন এই স্পাউজাল বা স্বামী স্ত্রী বা সঙ্গী,সঙ্গীনির ভালোবাসার মধ্যে আমরা যে একচেটিয়া অধিকার দাবী করি সেটা কি অবশ্যই বেশ অদ্ভুত মনে হয় না ? তারপরও আমরা ঠিক ‘সেটাই’ প্রত্যাশা করি এবং সেটা অর্জন করার জন্য জন্যই আমাদের প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকে; নিশ্চয়ই কোন একটি কারণ আছে এর পেছনে।

হেলেন ফিশার এবং অন্যান্যরা আমাদের দেখিয়েছেন যে, ভালোবাসায় আপ্লুত থাকার সাথে সংশ্লিষ্ট আমাদের মস্তিষ্কের অন্যন্য কিছু পরিস্থিতি,যেমন কিছু স্নায়বিক প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত রাসায়নিক দ্রব্য (যাদের আসলে প্রাকৃতিক মাদক দ্রব্য) যারা এই ধরনের পরিস্থিতির জন্য বিশেষভাবে নির্দিষ্ট এবং বৈশিষ্টপুর্ণ। বিবর্তনী মনোবিজ্ঞানীরা একমত তার (ফিশার) সাথে,এই অযৌক্তিক বজ্রাঘাত (Coup de foudre) হতে পারে অপর সহ–মাতা বা সহ–পিতার প্রতি আনুগত্যকে নিশ্চিৎ করার একটি প্রক্রিয়া,যা যথেষ্ট দীর্ঘ হয় যেন তারা একসাথে একটি সন্তানের প্রতিপালন করতে পারেন। ডারউইনীয় দৃষ্টিভঙ্গী থেকে দেখলে,কোন সন্দেহ নেই,একজন ভালো জীবন সঙ্গী বা সঙ্গীনি নির্বাচন করা খুবই গুরুত্বপুর্ণ,নানাবিধ কারনে। কিন্তু একবার নির্বাচন করে ফেলার পর– এমনকি সেটা খারাপ হোক– এবং একটি সন্তান ধারন করার পর,যে কোন পরিস্থিতিতে একে অপরের সাথে থাকাটা আরো বেশী প্রয়োজনীয়,কমপক্ষে শিশুটি যতদিন মায়ের বুকের দুধ না ছাড়ে।

অযৌক্তিক ধর্ম বিশ্বাস কি সেই অযৌক্তিকতা মেকানিজমের একটি বাই–প্রোডাক্ট, যা প্রাকৃতিক নির্বাচন মুলত আমাদের ব্রেইনের একটি অন্তর্গত প্রক্রিয়া হিসাবে সৃষ্টি করেছে প্রেমে পড়ার জন্য? নিশ্চয়ই, ধর্মীয় বিশ্বাস এর বেশ কিছু বৈশিষ্ট আছে যা প্রেমের পড়ার মতই (দুই অবস্থারই অনেকগুলো বৈশিষ্ট মনে হতে পারে মাদকদ্রব্যে আসক্ত হয়ে থাকার মতই); নিউরোসাইক্রিয়াটিষ্ট জন স্মিথিস আমাদের সতর্ক করেছেন যে,ব্রেনের যে এলাকাগুলো এই দুই ম্যানিয়া বা উন্মত্ততায় সক্রিয় হয় তার মধ্যে স্পষ্ট কিছু তারতম্য আছে,তবে তাসত্ত্বেও বেশ কিছু মিলও আছে তাদের মধ্যে:

ধর্মের বহু রুপের একটি রুপ হচ্ছে, একটি অকিপ্রাকৃত সত্বার প্রতি নিবেদিত তীব্র ভালোবাসা,যেমন, ঈশ্বর; এছাড়া এই সত্বার নানা আইকন বা নিদর্শনের প্রতি তীব্র শ্রদ্ধা। মানুষের জীবন প্রধানত পরিচালিত হয় আমাদের স্বার্থপর জীনগুলো এবং রিইনফোর্সমেন্ট প্রক্রিয়ার মাধ্যমে; ইতিবাচক বা পজিটিভ রিইনফোর্সমেন্ট এর অনেকটাই আসে ধর্ম থেকে:ভালোবাসা পাবার সেই উষ্ণ এবং স্বস্তি জাগানো অনুভুতি এবং বিপদজ্জনক এই পৃথিবী থেকে সুরক্ষিত বোধ করার সেই অনুভুতি,মৃত্যুভয়কে হারানো, খারাপ সময়ে সেই পাহাড়ের চুড়া (I will lift up my eyes to the hills, from where comes my help: Psalm 121:1) থেকে প্রার্থনার উত্তরে আসা সহযোহিতা ইত্যাদি। ঠিক সেভাবেই বাস্তবে উপস্থিত সত্যিকার কোন মানুষের প্রতি (সাধারনত অন্য লিঙ্গের) রোমান্টিক ভালোবাসা সেই একই গভীর মনোসংযোগের উপস্থিতি নিদর্শন বহন করে এবং এটাও পজিটিভ রিইনফোর্সমেন্টর সাথে যুক্ত। এই অনুভুতি গুলো সুচনা করতে পারে অন্যজনের কোন নির্দশন এর দেখার মাধ্যমে,যেমন,চিঠি,ফটোগ্রাফ,আর সেই ভিক্টোরিয়ার যুগে এক গোছা চুল,ভালোবাসায় নিমজ্জিত হয়ে থাকার সেই অবস্থায় অনেক শরীরবৃত্তীয় অনুসঙ্গ আছে,যেমন,ফার্নেসের মত দীর্ঘশ্বাস ফেলা;

১৯৯৩ সালে আমি ভালোবাসায় নিমজ্জিত হওয়া এবং ধর্মের মধ্যে তুলনামুলক একটি আলোচনা করেছিলাম,যেখানে আমি উল্লেখ করেছিলাম,খুব বিস্ময়করভাবে ধর্ম দ্বারা সংক্রমিত হওয়া কোন ব্যক্তির উপসর্গগুলো,সাধারনত যৌন ভালোবাসার সাথে সংশ্লিষ্ট উপসর্গগুলোর কথা মনে করিয়ে দেয়। আমাদের ব্রেনে এটি অত্যন্ত জোরালো একটি শক্তি এবং আদৌ বিস্ময়কর কোন ব্যাপার না যে কিছু 'ভাইরাস' বিবর্তিত হতেই পারে এটিকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করতে পারার ক্ষমতা অর্জন করার ক্ষেত্রে ('ভাইরাস' এখানে ধর্মের রুপকার্থে ব্যবহৃত হয়েছে:আমার সেই নিবন্ধের নাম ছিল 'Viruses of the mind');St Teresa of Avila র সেই তীব্র যৌনসুখানুভুতি বা অর্গাজম এর মত বিখ্যাত ভিশন তো যথেষ্ট কুখ্যাত এখানে পুনরায় উল্লেখ করার জন্য। তবে আরো গুরুত্বের সাথে এবং আরো খানিকটা কম স্থুল ইন্দ্রিয়পরায়নতার পর্যায়ে,দার্শনিক অ্যান্থনী কেনী চমৎকার কিছু সাক্ষ্য লিপিবদ্ধ করেছেন যে কি বিশুদ্ধ তীব্র আনন্দ অপেক্ষা করছে তাদের জন্য,যারা ট্রান্সসাবস্টানশিয়েশন (রোমান ক্যাথলিক ধর্মমতে ট্রান্সসাবস্টানশিয়েশন হচ্ছে একটি মতবাদ যা প্রস্তাব করছে, ইউক্যারিষ্ট এর সময় বা হলি কমিউনিয়ন এর সময়, গমের রুটি এবং আঙ্গুরের রসের মদ রুপান্তরিত হয় যীশু খৃষ্টের শরীর এবং রক্তে) এর রহস্যটিতে কোনভাবে তাদের বিশ্বাস স্থাপন করতে পারবেন;রোমান ক্যাথলিক যাজক হিসাবে তার দীক্ষা নেবার এবং মাস অনুষ্ঠান

পরিচালনা করার তাকে বিশেষ ক্ষমতায়ন করেছিলো কিভাবে তা ব্যাখ্যা করে তিনি বেশ জীবন্ত ভাবে তার স্মৃতিচারন করেন:

> প্রথম মাসগুলোর সেই তীব্র আনন্দের কথা যখন আমার ক্ষমতা ছিল মাস পরিচালনা করার;সাধারনত দেরী করে ধীরে সুস্থে উঠতে অভ্যস্ত আমি সকালে প্রায় লাফ দিয়ে বিছানা থেকে উঠতাম,পুরোপুরি সজাগ এবং তীব্র উত্তেজনা অনুভব করতাম,যে গুরুত্বপুর্ণ কাজটি করার জন্য সুযোগ আমি পেয়েছি সেটা চিন্তা করে। খৃষ্টের শরীর স্পর্শ করার সুযোগ, যীশুর যাজকদের কাছাকাছি আসার সুযোগ,আমাকে ভীষন আন্দোলিত করতো। আমি হোস্ট এর দিকে তাকাতাম, কনসেক্রেশন এর শব্দগুলো উচ্চারন করার পর,শান্ত দৃষ্টি মেলে যেমন করে কোন কোন প্রেমিক বা প্রেমিকা তাদের ভালোবাসার মানুষের দিকে তাকিয়ে থাকে ..... সেই যাজক জীবনের শুরুর দিনগুলো আমার স্মৃতিতে চিরভাস্বর হয়েছে পুর্ণতৃপ্তি আর তীব্র সুখের দিন হিসাবে, যা অমুল্য এবং দীর্ঘস্থায়ী হবার নয় এমন ভঙ্গুরও, যেমন কোন রোমান্টিক ভালোবাসা যার সমাপ্তি ঘটে কোন অসামন্জষ্যপুর্ণ বিবাহের বাস্তবতায়।

মথদের আলো–কম্পাসের প্রতিক্রিয়ার সমতুল্য হচ্ছে আপাতদৃষ্টিতে অযৌক্তিক তবে একজন এবং শুধু মাত্র বীপরিত লিঙ্গের একজন মাত্র সদস্যর সাথে প্রেমে পড়ার উপযোগী কার্যকর আচরণটি। মিস ফায়ারিং বা ভুল প্রতিক্রিয়ার উপজাত যেমন মোমবাতির আগুনে উড়ে আত্মাহুতি দেবার সমতুল্য – হচ্ছে ইয়াওয়ের বা ঈশ্বরের প্রেমে পড়া (বা কুমারী মেরী বা আল্লাহ) এবং এধরনের ভালোবাসা দ্বারা তাড়িত হয়ে অযৌক্তিক আচরন করা;

জীববিজ্ঞানী লুইস ওলপার্ট,তার Six Impossible Things Before Breakfast এ একটি প্রস্তাব করেছিলেন যা গঠনমুলক অযৌক্তিকতার ধারনাটির একটি সাধারনীকরণ রুপ হিসাবে দেখা যেতে পারে। তার বক্তব্য ছিল অযৌক্তিকভাবে ধারন করা কোন দৃঢ় বিশ্বাস মনের প্রায়শ দ্রুত পরিবর্তনশীলতার বিরুদ্ধে রক্ষা করে: যদি যে বিশ্বাসগুলো জীবন বাচিয়েছিল তাদের দৃঢ়ভাবে ধারন করা না হত,সেটা আদি মানুষের বিবর্তনের জন্য সুবিধাজনক হতো না। বরং খুবই অসুবিধার কারন হতো সেটি,যেমন, শিকার করার সময় বা টুল বা হাতিয়ার তৈরীর সময়,দ্রুত মন পরিবর্তন করা। ওলপার্টের যুক্তির একটি অর্থ হলো নিদেনপক্ষে কোন কোন পরিস্থিতিতে,দোদুল্যমান অনিশ্চয়তায় না বরং অযৌক্তিক বিশ্বাসে অটল থাকা শ্রেয়,এমনকি যখন নতুন প্রমান বা যুক্তি পরিবর্তনের স্বপক্ষে অবস্থান করে। খুবই সহজ কিন্তু প্রেমে পড়ার যুক্তিটি একটি বিশেষ কেস হিসাবেদেখা এবং একই ভাবে খুব সহজ এটি দেখা যে ওলপার্টের এই 'অযৌক্তিক স্থিতিশীলতা' আরো একটি উপযোগী মানসিক প্রবণতা যা অযৌক্তিক ধর্মীয় আচরনের গুরুত্বপুর্ণ কিছু বিষয় ব্যাখ্যা করতে পারে:আরো একটি উপজাত বা বাইপ্রোডাক্ট।

রবার্ট ট্রিভারস তার Social Evolution বইটিতে ১৯৭৬ সালের আত্ম প্রবঞ্চনার বিবর্তনীয় তত্বটি ব্যাখ্যা করেন বিস্তারিতভাবে:

> আত্ম প্রবঞ্চনা হলো সচেতন মন থেকে সত্যকে লুকিয়ে রাখা, যেন সেটি অন্যদের কাছ থেকেও লুকিয়ে রাখা যায় উত্তমভাবে। আমাদের প্রজাতিতে আমরা সেটা শনাক্ত করতে পারি, দৃষ্টি এড়ানোর প্রচেষ্টা, ঘেমে ওঠা হাতের তালু এবং ফেটে যাওয়া গলার আওয়াজ হয়তো সেই ছলনা করার সচেতন জ্ঞান থেকে উদ্ভুত চাপের বহিঃপ্রকাশ। এই ছলনার ব্যপারটিকে সচেতন স্তরে উপেক্ষা করার মাধ্যমে, ছলনাকারী এই সব চিহ্ন একজন পর্যবেক্ষককারীর কাছ থেকে লুকিয়ে রাখতে পারে; সেই ব্যক্তিটি অনায়াসে মিথ্যা কথা বলতে পারে ছলনার সংশ্লিষ্ট উত্তেজনা, অস্থিরতা ছাড়াই।

নৃতত্ববিদ লায়োনেল টাইগার এধরনের কিছু কথা বলেছেন তার Optimism: The Biology of Hope বইটিতে। গঠনমুলক অযৌক্তিকতা যা আমরা আলোচনা করছিলাম সেটা দেখা যাবে ট্রিভার্স এর ' উপলব্ধিগত প্রতিরক্ষা' বিষয়ক একটি অনুচ্ছেদে:

মানুষের একটি প্রবণতা আছে, সচেতনভাবে তারা যা চায় তা দেখতে পারে। নেতিবাচক কোন কিছু দেখতে তাদের আক্ষরিক অর্থেই কষ্ট হয় যেমন ঠিক ততটাই সহজে তারা ইতিবাচক বিষয়গুলো দেখতে পায়। যেমন যে শব্দগুলো চিন্তার উদ্রেক করে, হয়তো এর সাথে সংশ্লিষ্ট কারো ব্যক্তিগত ইতিহাস বা পরীক্ষামুলক কোন ম্যানিপুলেশন, সেগুলোবোধগম্য হবার আগেই প্রয়োজন আরো বিষদ ব্যাখ্যা;

ধর্মের খামখেয়ালী চিন্তার সাথে এর প্রাসঙ্গিকতা বিষদ ব্যাখ্যার কোন প্রয়োজন পড়ে না।

দুর্ঘটনাবশত সৃষ্ট উপজাত হিসাবে ধর্ম – কোন উপযোগী কিছুর মিসফায়ারিং এই সাধারন তত্ত্বটি আমি স্বপক্ষে আমার অবস্থান। এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা বহুরুপের, জটিল এবং বিতর্কিত। উদহারণ দেবার খাতিরে, আমি আমার ’অতি বিশ্বাসপ্রবণ’ শিশুর তত্ত্বটি সাধারন বাই–প্রোডাক্ট তত্ত্বের একটি প্রতিনিধিত্বকারী হিসাবে ধরে আলোচনায় অগ্রসর হবো। এই তত্ত্বটি যে, শিশুর মস্তিষ্ক, কিছু উত্তম কারনেই, মানসিক ভাইরাস দিয়ে আক্রান্ত হবার প্রবনতা থাকে – পাঠকদের কাছে হয়তো অসমাপ্ত মনে হতে পারে। হতে পারে মন আক্রম্য, সহজেই যে আক্রান্ত হচ্ছে, কিন্তু কেন এটি ’এই’ ভাইরাস দিয়েই, অন্য কিছু না, আক্রান্ত হবে? কোন কোন ভাইরাস কি বিশেষভাবে দক্ষ এধরনের সহজে আক্রম্য কোন মনকে সংক্রমিত করার জন্য? কেন এই ‘সংক্রমন’ আত্মপ্রকাশ করে ধর্ম হিসাবে, অন্য কোন ভাবে না কেন? আমি যা বলতে চাইছি তার অংশ বিশেষ হচ্ছে, বিশেষ কোন ধরনের অর্থহীনতা শিশুর মস্তিষ্কে আক্রান্ত করে তাতে কিছু যায় আসেনা, একবার সংক্রমিত হলে, শিশুটি বড় হবার পর তার পরবর্তী প্রজন্মকে সংক্রমিত করে একটি অর্থহীনতা দিয়ে, সেটা যাই হোক না কেন?

নৃতাত্ত্বিক বিশ্লেষন যেমন ফ্রেজারের Golden Bough আমাদের চমৎকৃত করে মানুষের বৈচিত্রময় অযৌক্তিক বিশ্বাস সমুহের বিবরণ। একবার যখন সংস্কৃতির গভীরে এরা প্রোথিত হয়, তারা টিকে থাকে, বিবর্তিত হয় এবং নানা ধারায় বিভাজিত হয়, জীববিজ্ঞানের বিবর্তনের কথা মনে করিয়ে দেয় তাদের বিবর্তনের প্রক্রিয়া। তারপরও ফ্রেজার কিছু সাধারন নীতিমালা চিহ্নিত করেছেন, যেমন, ’হোমিওপ্যাথীর ম্যাজিক’; যেখানে নানা মন্ত্র বাস্তব পৃথিবীর কোন কিছুর প্রতীকি রুপকে ধার করে যাকে তারা প্রভাবিত করতে চাইছে। এধরনের বিশ্বাসের দৃঃখজনক ফলাফলের একটি উদহারণ হচ্ছে, গন্ডারে শিং এর গুড়া যৌনউত্তেজনা বৃদ্ধি করার গুণাবলী আছে; অসার তো বটেই, এই ভ্রান্ত ধারনার জন্ম দৃঢ় উত্থিত পুরুষাঙ্গর সাথে গন্ডারের শিং (যদি এটি শিং নয়) এর সাদৃশ্য। হোমিওপ্যাথীর যাদুময়তার সর্বব্যাপিতা প্রস্তাব করে যে, এই অর্থহীনতা যা আক্রম্য মস্তিষ্ককে সংক্রমন করে আসলে পুরোপুরিভাবে র‍্যানডোম বা এলোমেলো, কাল্পনিক অর্থহীনতা নয়।

একটি জীববিজ্ঞানীয় সমতুল্য কিছুর কল্পনা করাটা বেশ লোভনীয়, যেমন প্রাকৃতিক নির্বাচনের মতো কি কোন কিছু কি এখানে কাজ করছে? কিছু ধারনা কি আসলেই অন্য ধারনাদের চেয়ে বেশী দ্রুত বিস্তার লাভ করে, এর অন্তর্নিহিত আবেদন বা গুন বা বিদ্যমান মানসিক গঠনের সাথে সামন্জষ্য হবার কারনে, আর এটা কি সত্যিকার ধর্মর, আমরা তাদের যেভাবে দেখি, তার প্রকৃতি বা বৈশিষ্টর ব্যাখ্যা দিতে পারে, যেমন প্রাকৃতিক নির্বাচন যেমন সকল জীবের বৈশিষ্ট ও প্রকৃতি ব্যাখ্যা করতে পারে? গুরুত্বপুর্ণ বিষয় যেটি মনে রাখতে হবে সেটা হলো: এর ’গুন বা মেরিট’ এর অর্থ এখানে শুধু বেচে থাকা আর বিস্তার লাভ করা; এর অর্থ এই না যে এটি ইতিবাচক মানের বিচার প্রত্যাশা করে – এমন কোন কিছু যা নিয়ে আমরা মানবিকভাবে গর্ব করতে পারি।

এমনকি কোন বিবর্তনীয় মডেলে, সেখানে কোন প্রাকৃতিক নির্বাচন থাকার বাধ্যবাধকতা নেই। জীববিজ্ঞানী মেনে নিয়েছেন যে কোন একটি জীন জনসংখ্যার মধ্যে বিস্তার লাভ করতে পারে, কারন যে এটা কোন ভালো জীন তাই না বরং শুধু এর কারন ভাগ্য; আমরা একে জেনেটিক ড্রিফ্ট বলি; প্রাকৃতিক নির্বাচন এর মুখোমুখি এটি কতটুকু গুরুত্বপুর্ণ তা বিতর্কিত। কিন্তু বর্তমানে এটি ব্যপকভাবে গ্রহনযোগ্য তথাকথিত নিউট্রাল থিওরী অব মলিক্যুলার জেনেটিক্স এর একটি রুপ হিসাবে। যদি কোন জিন মিউটেশন হয়ে তার নিজেরই একটি ভিন্ন সংস্করণ সৃষ্টি করে যা ঠিক একই ধরনের প্রভাব আছে, তখন এই পার্থক্যটা নিউট্রাল বা নিরপেক্ষ; প্রাকৃতিক নির্বাচন কোনটার প্রতি

বিশেষ পক্ষপাতিত্ব করতে পারেনা। যাই হোক পরিসংখ্যানবিদদের ভাষায় যাকে বলা হয় ’সাম্পলিং এরর’ বহু প্রজন্ম ধরে; নতুন মিউট্যান্ট জনসংখ্যায় জীন পুলে এই জীনটি ধীরে ধীরে মুল রুপটিকে প্রতিস্থাপিত করবে। পরমানুর পর্যায়ে এটা সত্যিকারে বিবর্তনীয় পরিবর্তন (এমনকি পুরো প্রানীর পর্যায়ে কোন পরিবর্তন যদি লক্ষ্য করাও না যায়); এটি একটি নিরপেক্ষ বিবর্তনীয় পরিবর্তন যার উপর নির্বাচনী চাপ বা সুবিধার কোন প্রভাব নেই।

জেনেটিক ড্রিফট এর সাংস্কৃতিক সমতুল্য একটি জোরালো সম্ভাবনা যা আমরা উপেক্ষা করতে পারিনা যখন ধর্মের বিবর্তন নিয়ে আমরা চিন্তা করি।

ভাষা বিবর্তিত হয় একটি প্রায়–জৈববৈজ্ঞানিক একটি উপায়ে এবং এর বিবর্তনে যে দিকটি সে অনুসরণ করে মনে হতে পারে তা অনির্দিষ্ট, অনেকটা র‍্যানডোম ড্রিফট এর মত; জেনেটিক এর একটি সাংস্কৃতিক অনুরুপ এর মাধ্যমে এটি হস্তান্তরিত হয়, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হয় যতক্ষন না পর্যন্ত্য প্রতিটি সুত্রই এতোটাই বদলে যায়, পারস্পরিক বোধগম্যতা আর থাকে না। সম্ভব হতে পারে যে, ভাষার বিবর্তনের কিছু অংশ এক ধরনের প্রাকৃতিক নির্বাচন দিয়ে পরিচালিত হয়। কিন্তু এর স্বপক্ষে যুক্তিগুলো তেমন জোরালো নয়। আমি নীচে ব্যাখ্যা দেব, এধরনের কিছু ধারনা যা প্রস্তাব করা হয়েছে ভাষা প্রধান ধারাগুলোকে ব্যাখ্যা করতে, যেমন দি গ্রেট ভাওয়েল শিফট, যা ইংরেজী ভাষায় ঘটেছে পঞ্চদশ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যে। কিন্তু এধরনের ‘ফাঙ্কশনাল হাইপোথিসিস’ যথেষ্ট না আমরা যা দেখি তা ব্যাখ্যা করার জন্য। সম্ভবত মনে হতে পারে যে ভাষা সাধারণত বিবর্তিত হয়েছে র‍্যানডোম জেনেটিক ড্রিফট এর কোন সাংস্কৃতিক সমরুপ প্রক্রিয়ায়; ইউরোপের বিভিন্ন অংশে ল্যাটিন ভাষা বদলে হয়েছে স্প্যানিশ, পর্তুগীজ, ইতালীয়, ফরাসী, রোমানশ এবং এই ভাষাগুলোর নানা ডায়ালেক্ট এ। নিদেনপক্ষে বলতেই হবে, এইসব বিবর্তনীয় পরিবর্তন স্থানীয় সুবিধা বা কোন ’নির্বাচনী চাপ’কে প্রতিফলিত করছে সেই বিষয়টি কিন্তু স্পষ্ট না ।

আমি সারাংশ করবো যে, ধর্ম, ভাষার মত, বিবর্তিত হয়েছে যথেষ্ট র‍্যানডোমনেস নিয়ে, যার শুরুটা ছিল যথেষ্ট কাল্পনিক যা জন্ম দিয়েছে হতবাক করা –এবং কখনো বিপজ্জনক –বৈচিত্রময়তার সমাহার যা আমরা দেখছি। এবং একই সাথে সম্ভবত প্রাকৃতিক নির্বাচনের মতো কোন একটি কিছু, মানব মনস্তাত্বিকতার মৌলিক সমরুপতার সাথে যা যুক্ত হয়ে নিশ্চিৎ করেছে, বৈচিত্রময় বিভিন্ন ধর্মগুলোর গুরুত্বপুর্ণ কিছু বিষয়ে যেন সাদৃশ্যতা থাকে। অনেক ধর্ম, যেমন, শিক্ষা দেয় নৈব্যাক্তিকভাবে অসম্ভব, ব্যাখ্যার অতীত, তবে নিজস্ব ধারণাগতভাবে আকর্ষনীয় সেই মতবাদ যে, আমাদের ব্যাক্তিত্ব শরীরের মুত্যুর পরও বেচে থাকে। অমরত্বের ধারনা নিজেই টিকে থাকে এবং বিস্তার লাভ করে কারন এটি পছন্দনীয় অভিলাষী চিন্তাকে প্রশ্রয় দেয়। এবং এই সব চিন্তারও গুরুত্ব আছে, কারন মানুষের মনোজগত প্রায় সর্বজনীন প্রবণতা আছে বিশ্বাসকে তাদের নানা আকাঙ্খার রঙে রন্জিত করার (’হ্যারী,তোমার ইচ্ছাটাই হচ্ছে সেই চিন্তার জনক’, শেক্সপিয়ার এর হেনরী ফোর্থ পার্ট ২, তার পুত্রের উদ্দেশ্যে)।

মনে হয় এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, ধর্মের অনেক বৈশিষ্টই আসলে ধর্মের নিজের এবং মানুষের সংস্কৃতির মিশ্রনে সেই সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্টগুলোর অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য সহযোগিতা করার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে উপযোগি; এখন প্রশ্ন যে তাহলে এই ভালো সামন্জষ্যতাটি কি অর্জিত হয়েছে ’ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইন’ দিয়ে নাকি ’প্রাকৃতিক নির্বাচন’ দিয়ে। উত্তর সম্ভবত দুটোই। ডিজাইনের পক্ষে ধর্মী নেতারা সম্পুর্ণভাবে দক্ষ ধর্মকে টিকে থাকার জন্য প্রয়োজনী শব্দাবলী, আচার এবং কৌশল ব্যবহার করার ক্ষেত্রে। মার্টিন লুথার খুব ভালো করে জানতেন যুক্তি হচ্ছে ধর্মের সবচেয়ে বড় শত্রু। এবং তিনি প্রায়শই যুক্তির বিপজ্জনক রুপটি নিয়ে সাবধান বানী উচ্চারণ করে গেছেন: ’যুক্তি হচ্ছে বিশ্বাসের সবচেয়ে বড় শত্রু, আত্মিক কোন বিষয়ে এটি কখনোই সাহায্যে আসেনা এবং বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই এটি স্বর্গীয় জগতের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে, এবং ঈশ্বরের কাছ থেকে যা কিছু এসেছে সব কিছুর প্রতি এটি অবজ্ঞা পোষন করে। আবার যেমন বলেছেন:’ যারাই ক্রিষ্টান হতে চান, তাদের চোখ সরাতে হবে তার যুক্তির বাইরে। এবং আবারো, যেমন: ’সব খৃষ্ঠীয় ধর্মাবলম্বী সবার মধ্যে যুক্তিকে নিশ্চিহ্ন করা উচিৎ’; লুথারের কোন সমস্যাই হোত না

ধর্মকে টিকে থাকতে সাহায্য করার এর বুদ্ধিমত্ত্বাহীন অংশটিকে অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে ডিজাইন করতে। কিন্তু তার অর্থ এই না যে, তিনি বা অন্য কেউ এটি ডিজাইন করেছেন। এটি বিবর্তিত হতে পারে একটি (জেনেটিক বা জীননির্ভর) নয় এমন কোন প্রাকৃতিক নির্বাচনের একটি রুপের মাধ্যমে, যা ডিজাইনার লুথার নন , তবে তিনি অত্যন্ত বুদ্ধিমান যিনি এর কার্য্যকারীতা ভালোভাবে লক্ষ্য করেছিলেন।

যদিও প্রথাভিত্তিক জীনদের ডারউইনীয় নির্বাচন হয়তো সহায়তা করেছে সেই ধরনের মনস্তাত্বিক কাঠামোগুলোকে তৈরী করতে যা উপজাত বা বাইপ্রোডাক্ট হিসাবে ধর্মকে সৃষ্টি করেছে, তবে এর খুটিনাটি বিষয়গুরোর আকার দেবার ব্যাপারে এর ভুমিকা না থাকারই কথা। আমি এর আগেই এ ব্যাপারে কিছু ইঙ্গিত দিয়েছিলাম যে, যদি আমার কোন এধরনের নির্বাচনী তত্ব এর খুটিনাটি বিস্তারিত বিষয়গুলোর উপর প্রয়োগ করার বিষয়টি ভাবতে চাই, আমাদের জীনের দিকে না বরং তাদের সাংস্কৃতিক কোন সমতুল্যর দিকে তাকানো উচিৎ; ধর্মগুলো মিমদের (meme) মতই এমন কিছু?

তথ্যসূত্র:

Deborah Keleman, ‘Are children “intuitive theists”?’, Psychological Science 15: 5, 2004, 295-301.

Dennett, D. C. (1987). The Intentional Stance. Cambridge, MA: MIT Press.

Smythies, J. (2006). Bitter Fruit. Charleston, SC: Booksurge.

রিচার্ড ডকিন্স এর দি গড ডিল্যুশন : পঞ্চম অধ্যায় (ষষ্ঠ পর্ব)

By K M Hassan

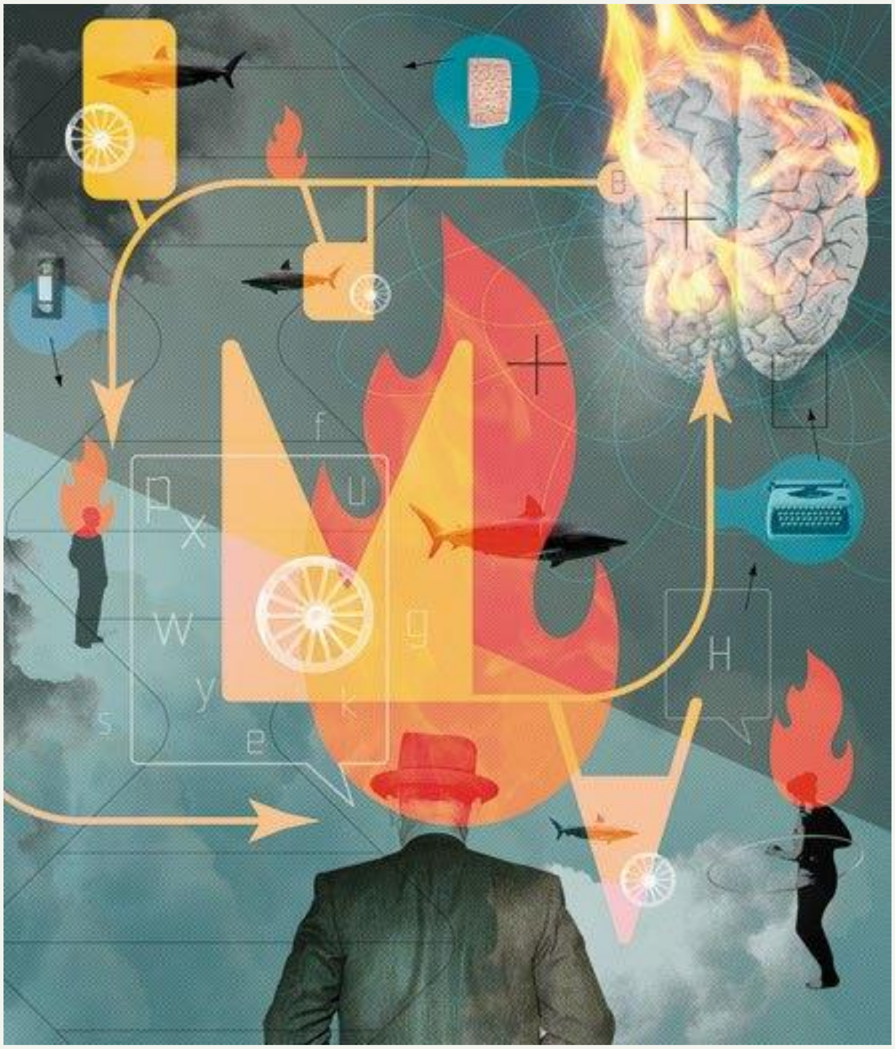

ছবি: স্টুয়ার্ট ব্র্যাডফোর্ডের একটি ইলাসট্রেশন (সুত্র, What defines a meme? *Smithsonian* magazine, May 2011)

রিচার্ড ডকিন্স এর দি গড ডিল্যুশন : পঞ্চম অধ্যায় (ষষ্ঠ পর্ব)

(অনুবাদ প্রচেষ্টা: কাজী মাহবুব হাসান)

The God Delusion by Richard Dawkins

প্রথম অধ্যায়
দ্বিতীয় অধ্যায়
তৃতীয় অধ্যায়
চতুর্থ অধ্যায় (প্রথম পর্ব), চতুর্থ অধ্যায় (দ্বিতীয় পর্ব),
চতুর্থ অধ্যায় (তৃতীয় পর্ব), চতুর্থ অধ্যায় (চতুর্থ পর্ব), চতুর্থ অধ্যায় (শেষ পর্ব)
পঞ্চম অধ্যায় (প্রথম পর্ব), পঞ্চম অধ্যায় (দ্বিতীয় পর্ব), পঞ্চম অধ্যায় (তৃতীয় পর্ব)
পঞ্চম অধ্যায় (চতুর্থ পর্ব), পঞ্চম অধ্যায় (পঞ্চম পর্ব)

ধর্মের শিকড়

ধর্মর ক্ষেত্রে সত্যটি হচ্ছে শুধুমাত্র সেই মতামটি যা টিকে গেছে: অস্কার ওয়াইল্ড

সাবধানে হেটো, কারন তুমি আমার মীমদের উপর দিয়ে হাটছো:

এই অধ্যায়টি শুরু হয়েছিল একটি পর্যবেক্ষন দিয়ে: যেহেতু ডারউইনীয় প্রাকৃতিক নির্বাচন যে কোন ধরনের অপচয়কে সহ্য করতে পারেনা, সে কারনেই কোন প্রজাতির মধ্যে সর্বব্যাপী দৃশ্যমান কোন বৈশিষ্ট,যেমন ধর্ম, নিশ্চয়ই কিছু উপযোগিতা প্রদান করেছিল নতুবা এটি টিকে থাকতো না। কিন্তু আমি ইঙ্গিত করেছিলাম সেই উপযোগিতা বা সুবিধাটির, প্রজাতির কোন সদস্যর বেচে থাকা বা প্রজনন সাফল্যের ক্ষেত্রে গুরুত্বপুর্ণ অবদান থাকতে হবে এমন কোন বাধ্যবাধকতা নেই। আমরা যেমনটি দেখেছি, সর্দি জ্বরের ভাইরাসের জীনগুলোর প্রদর্শিত উপযোগিতাই স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করার জন্য যথেষ্ট, আমাদের প্রজাতির মধ্যে কেন এই কষ্টকর অসুস্থতার অভিযোগের সর্বব্যাপীতা। এবং আমাদের উপকার করা মতো কোন জীনে এর থাকতে হবে এমন কোন প্রয়োজনীয়তাও নেই। যে কোন একটা রেপ্লিকেটর বা অনুলিপি কারক হলেই চলে। রেপ্লিকেটরের সবচেয়ে সুস্পষ্ট উদহারন হচ্ছে শুধুমাত্র জীনরা, তবে এই মর্যাদা পাবার অন্যান্য প্রতিদ্বন্দীরা হচ্ছে, কম্পিউটার ভাইরাস এবং সাংস্কৃতিক বংশগতির বাহক মীম (Meme) ইউনিটগুলো এবং যারা এই অংশের যেটা আলোচ্য বিষয় *(মীম (Meme) হচ্ছে কোন ধারনা, আচরন বা রীতি যা কোন একটি সংস্কৃতিতে একজন ব্যক্তি থেকে অন্য ব্যক্তির মধ্যে বিস্তার লাভ করে। মীম সাংস্কৃতিক ধারনা, রীতি বা প্রতীক বহনকারী একটি একক হিসাবে কাজ করে, যা একটি মন থেকে অন্য মনে বিস্তার লাভ করতে পারে, লেখা, কথা, আচরন, আচার বা অন্য কোন অনুকরণ করা সম্ভব এমন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। যারা মীম তত্ত্বের সমর্থক তারা একে জীন এর সমতুল্য একটি রুপ হিসাবে দেখেন, যা রা নিজেদের অনুলিপি করতে পারে, পরিবর্তিত হতে পারে (মিউটেশন) এবং নির্বাচনী চাপের প্রতি সংবেদনশীল; মীম শব্দটি mimeme একটি সংক্ষিপ্ত রুপ (জীন এর মত একই মডেলে) (শব্দটির উৎপত্তি প্রাচীন গ্রীক mīmēma শব্দ থেকে যার অর্থ কোন কিছুর অনুকরন করা); শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন বৃটিশ বিবর্তন জীববিজ্ঞানী রিচার্ড ডকিন্স ১৯৭৬ সালে তার The Selfish Gene বইটিতে বিভিন্ন আইডিয়া এবং সাংস্কৃতিক ফেনোমেনাগুলোর বিস্তারের ক্ষেত্রে বিবর্তনীয় ধারনাটি আলোচনা করার জন্য। কিছু মীম এর উদহারন যেমন সেখানে ছিল .. মেলোডি, কিছু বহুব্যবহৃত বাক্য, ফ্যাশন, এছাড়া আর্চ বা খিলান বানানোর কৌশল ইত্যাদি।)*

আমাদের যদি মীমদের বুঝতে হয়, আমাদের একটু বিশেষভাবে লক্ষ্য করতে হবে ঠিক কিভাবে প্রাকৃতিক নির্বাচন তার কাজ করে থাকে। এর সবচেয়ে সাধারনতম রুপে, প্রাকৃতিক নির্বাচনকে অবশ্যই বিকল্প রেপ্লিকেটদের মধ্য থেকে কোন একটিকে বেছে নিতে হয়। একটি রেপ্লিকেটর হচ্ছে কোড কৃত তথ্যমালা যা ঠিক তার হুবুহু অনুলিপি সৃষ্টি করতে সক্ষম, তবে কখনো কখনো একেবারে হুবুহু না হয়ে সামান্য ভিন্ন অনুলিপির সৃষ্টি করে (মিউটেশন); এর একটি কারন হচ্ছে ডারউইনীয়, যে ধরনের রেপ্লিকেটরগুলো নিজেদের অনুলিপি তৈরী করার প্রক্রিয়ায় দক্ষ, তারা সংখ্যায় ক্রমশ বৃদ্ধি পাবে অনুলিপি সৃষ্টিতে অপেক্ষাকৃত অদক্ষ রেপ্লিকেটরদের তুলনায়। এটাই প্রাকৃতিক নির্বাচনের একেবারে মুল কথা। সবচেয়ে আদর্শ রেপ্লিকেট হচ্ছে জীন (Gene), ডিএনএ এর বেস অনুক্রম একটি অংশ যার অনুলিপি সৃষ্টি হয় প্রায় সবসময় অত্যন্ত্য নিখুতভাবে, অসীম সংখ্যক প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে। মীম তত্ত্বের কেন্দ্রীয় প্রশ্নটি হচ্ছে, সাংস্কৃতিক অনুকরণেরও কি অনুরুপ কোন একক আছে , যারা সত্যিকারের রেপ্লিকেটর, যেমন জীনের মত আচরণ করে? আমি বলছি না যে, মীমরা অবশ্যেই জীনের সবচেয়ে নিকটবর্তী অনুরুপ, শুধু, যতই তারা জীনদের মত আচরণ করে, মীম তত্বটি ততই ভালো ভাবে কাজ করতে পারে;এবং এই অংশটির উদ্দেশ্য হচ্ছে এই প্রশ্নটাই জিজ্ঞাসা করা মীম তত্বটি ধর্মের এই বিশেষ ক্ষেত্রে হয়তো কাজ করে কিনা?

জীনদের জগতে, অনুলিপি করার প্রক্রিয়ার মাঝে মাঝে ঘটা ত্রুটি (মিউটেশন) যে দ্বায়িত্ব পালন করে তা হলো মুল জীন সম্ভার বা পুলে যে কোন জীনের বিকল্প রুপগুলোর উপস্থিতি নিশ্চিৎ করা – 'অ্যালীল' – সুতরাং যে বিকল্প রুপগুলোকে হয়তো মনে করা যেতে পারে একে অপরের সাথে প্রতিদ্বন্দীতা করছে, কিন্তু কিসের জন্য সেই প্রতিদ্বন্দীতা;ক্রোমোজোমের একটি নির্দিষ্ট জায়গা বা লোকাসের জন্য কি যেখানে সেই সেট অ্যালীলগুলো অবস্থান করে; এবং কিভাবে তারা প্রতিযোগিতা করে? সরাসরি একটি অনুর সাথে প্রতিদ্বন্দী অনুর যুদ্ধ নয়, তাদের প্রতিনিধি প্রক্সির মাধ্যমে। এই প্রক্সিটি হলো তাদের ফেনোটাইপিক ট্রেইট – কিছু বাহ্যিক দৃশ্যমান বৈশিষ্ট যেমন, পায়ের দৈর্ঘ বা লোমের রং: জীনের যে প্রকাশ প্রতিফলিত হয় গঠনগত, শরীরবৃত্তীয়, প্রাণ রসায়নিক কিংবা আচরনের মাধ্যমে। কোন জীনের নিয়তি নির্ভর করে সেই শরীরগুলোর উপর যেখানে তারা ধারাবাহিকভাবেই অবস্থান করে। শরীরের উপর তাদের প্রভাব কেমন, এই বিষয়টি প্রজাতির সামগ্রিক জীনপুলে তার টিকে থাকার সম্ভাবনাকে প্রভাবিত করে; জীন পুলে অনেক প্রজন্মান্তরে জীনগুলোর উপস্থিতির হার বাড়ে কিংবা কমে মুলত তাদের ফেনোটাইপিক (বাহ্যিক বা প্রকাশিত বৈশিষ্টর) প্রক্সির কল্যানে;

মীমদের ক্ষেত্রেও কি এমন কিছু সত্য হতে পারে? একটি ক্ষেত্রে তারা জীনদের মত না কারন, এখানে সুস্পষ্টভাবে ক্রোমোজোম বা লোকাই বা অ্যালীল বা যৌন পুনর্বিন্যাস বা রিকম্বিনেশন এর অনুরুপ কিছু নেই। মীম পুলের গঠন জীন পুল অপেক্ষা সংগঠিত না । তাসত্বেও কোন একটি মীম পুলের কথা বলাটা খুব একটা অর্থহীন হবে বলে মনে হয়না, যেখানে কোন নির্দিষ্ট মীম এর উপস্থিতির হার হয়তো পরিবর্তিত হতে পারে বিকল্প মীমগুলোর পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দীতার ফলাফল হিসাবে।

অনেকেই মীম নির্ভর ব্যাখ্যার বিরোধীতা করেছেন; বিরোধীতার কারনও ভিন্ন, তবে মোটামুটি ভাবে সব কারনগুলো সাধারনত উদ্ভুত হয়েছে মীমরা আসলে পুরোপরিভাবে জীনদের মত না সেই সত্য থেকে। জীনের সঠিক ভৌত বৈশিষ্ট এবং প্রকৃতি এখন আমাদের জানা (এটি ডিএনএ এর অনুক্রম), মীম দের সম্বন্ধে সেকরম কিছু জানা যায়নি। এবং বিভিন্ন মীমতত্ত্ববিদরাও কোন একটি ভৌত মাধ্যম থেকে অন্য মাধ্যমে মীমের উপস্থিতি পরিবর্তন করার মাধ্যেমেও একে অপরকে সংশয়ে ফেলে দিয়েছেন। শুধুমাত্র আমাদের মস্তিষ্কে কি মীম দের অস্তিত্ব আছে? বা ধরা যাক, কোন একটি লিমেরিক এর প্রতিটি পেপার কপি এবং ইলেক্ট্রনিক কপিকেও কি মীম বলা যেতে পারে? তাছাড়া জীন তার অনুলিপি তৈরী করে যথেষ্ট নিখুত ভাবে, যদি মীমরা আদৌ তাদের অনুলিপি সৃষ্টি করতে পারে, তারা কি যথেষ্ট কম নিখুত ভাবে সেটা করবে না?

মীমদের নিয়ে প্রস্তাবিত এই সমস্যাগুলো খানিকটা অতিরন্জিত। মীম তত্ত্বের বিরুদ্ধে প্রস্তাবিত সকল অভিযোগগুলোর মধ্যে প্রধান হচ্ছে, ডারউইনীয় 'রেপ্লিকেটর' হিসাবে কাজ করার জন্য মীমগুলো যথেষ্ট নিখুতভাবে তাদের অনুলিপিগুলো সৃষ্টি করতে পারেনা। মুল সন্দেহটা হচ্ছে, যদি প্রতিটি প্রজন্মেই মিউটেশনের বা পরিবর্তনের হার গ্রহনযোগ্য সীমা অতিক্রম করে যায়, তাহলে মীম পুলে তাদের উপস্থিতির হারের উপর ডারউইনীয় প্রাকৃতিক নির্বাচন কোন প্রভাব ফেলার আগেই মীমরা মিউটেশনের মাধ্যমেই নিজেদের অস্তিত্ব বিলোপ করে ফেলবে; কিন্তু সমস্যাটা কাল্পনিক, একজন মাষ্টার কাঠের কারিগরের কথা ভাবুন কিংবা কোন প্রাগৈতিহাসিক কোন ফ্লিন্ট পাথরের হাতিয়ার তৈরীর কারিগর, যিনি তার নবীন শিক্ষার্থীকে কোন একটি বিশেষ কৌশল শেখাচ্ছেন হাতে কলমে তা দেখিয়ে, যদি শিক্ষার্থীটি সম্পুর্ণ নিষ্ঠার সাথে তার শিক্ষকের প্রতিটি হাতের কাজ পুণরাবৃত্তি করেন, তারপরও সত্যিই আপনি আশা করতে পারেন যে, এই মীমটি পরিবর্তিত হবে পুরোপুরি, শিক্ষক/শিক্ষার্থীদের কয়েক প্রজন্মের মধ্য সেটি বিস্তারিত হবার পর। কিন্তু অবশ্যই শিক্ষার্থী তার শিক্ষকের দেখানো হাতের প্রতিটি নাড়াচাড়াকে হুবুহু নকল করেন না। আর খুবই হাস্যকর হবে এমন করাটা, বরং সে লক্ষ্য করে মুল সেই ফলাফলটা, যা তার শিক্ষক অর্জন করার চেষ্টা করছেন এবং সেটাকেই তিনি অনুকরণ করেন। যেমন, পেরেকটাকে হাতুড়ী দিয়ে ঠুকতে হবে যতক্ষন না পর্যন্ত সেটি পুরোপুরি ঢুকে যায়, যত সংখ্যক হাতুড়ীর আঘাত লাগুক না কেন, তার সেই সংখ্যাটি তার শিক্ষকের প্রদর্শিত সংখ্যার সাথে নাও মিলতে পারে। এই ধরনের নিয়মগুলোই যা অপরিবর্তিত হয়ে হস্তান্তর হয় অসীম সংখ্যক

অনুকরন ’প্রজন্ম’ হিসাবে, তাদের কাজটি সম্পাদন করার প্রক্রিয়াটি ব্যাক্তি বিশেষে এবং কেস বিশেষে ভিন্ন হতে পারে। বোনার কাজের সময় সেলাই , দড়িতে বাধা গিট বা মাছ ধরার জাল, অরিগ্যামীর কাগজ ভাজ করা, কাঠের বা পটারী বা মৃৎশিল্পের নানা উপযোগী কৌশল, এই সব কিছুকে পৃথক উপাদান হিসাবে ভাবা সম্ভব যা আসলেই অসংখ্য সংখ্যক অনুকরণ প্রজন্ম হিসাবে অপরিবর্তিত অবস্থায় হস্তান্তরিত হতে পারে। খুটিনাটি গুলো একক ব্যক্তি পর্যায়ে যতই বৈচিত্রময় হোক না কেন মুল বিষয়টি কিন্তুটি অপরিবর্তিত হয়ে বিস্তার লাভ করে এবং জীন এর সাথে মীম এর সমরুপ ব্যাখ্যাটিকে কাজ করার জন্য আসলে শুধু সেটুকই প্রয়োজন।

সুসান ব্ল্যাকমোরের The Meme Machine এর মুখবন্ধ লেখার সময় আমি চীনা জাঙ্ক (Chinese Junk: প্রাচীন চীনা জাহাজ) এর মডেল বানানোর অরিগ্যামী প্রক্রিয়ার একটি উদহারন বর্ণনা করেছিলাম; প্রক্রিয়াটি এমনিতেই একটি জটিল পদ্ধতি, প্রায় ৩২ টি ভাজ (বা সে রকম কিছু) ছিল। শেষ ফলাফল (চাইনীজ জাঙ্ক কাগজের জাহাজটি) এবয় সেই সাথে ক্রমবিকাশে মধ্যবর্তী কমপক্ষে এর তিনটি ধাপ : ’কাটামারান’, ’দুটি ঢাকনী সহ একটি বাক্স’, এবং ’ছবির ফ্রেম’ খুবই দৃষ্টিনন্দন; পুরো প্রক্রিয়াটি আসলেই মনে করিয়ে দেয়, নানা ভাজ আর খাজ সহ কোন ভ্রুণ যেন নিজেকে রুপান্তরিত ব্ল্যাস্টুলা থেকে গ্যাস্ট্রুলা থেকে নিউরালা; আমি চাইনীজ জাঙ্ক বানাতে শিখেছিলাম ছেলে বেলায়, আমার বাবার কাছ থেকে, যিনি ঠিক একই বয়সে সেই দক্ষতাটা অর্জন করেছিলেন তার বোর্ডিং স্কুলে পড়ার সময়; তিনি স্কুলে থাকার সময় চাইনীজ জাঙ্ক বানানো ধুম পড়ে গিয়েছিল যার সুচনা করেছিলেন স্কুলের মেট্রণ, পুরো স্কুলে এটি ছড়িয়ে পড়েছিল যেন হামের মহামারী, অবশ্য হামের মহামারী মতোই এই কাগজের জাঙ্ক বানানোর গন উৎসাহেও ভাটা পড়ে একসময়। ছাব্বিশ বছর পর, যখন সেই মেট্রণ রুপান্তরিত হয়েছেন পুরোনো স্মৃতিতে, আমিও সেই একই স্কুলে পড়তে গিয়েছিলাম, চাইনীজ জাঙ্ক বানানোর ধুমটা আমি আবার নতুন করে শুরু করি, এবং আবারো এটি ছড়িয়ে পড়ে, আরেকটি হামের মহামারীর মত এবং তার আবারো ম্লান হয়ে হারিয়ে যায়। এখানে মুল বিষয়টি হলো, এধরনে হাতে কলমে শেখানো সম্ভব কোন দক্ষতা মহামারীর মত যে ছড়িয়ে পড়তে পারে, এই বিষয়টা আমাদের কিছু মীম নির্ভর সাংস্কৃতিক বৈশিষ্টের বিস্তারের নিখুততা সম্বন্ধের কিছু ইঙ্গিত দেয়। আমরা নিশ্চিৎ ভাবেই বলতে পারি, ১৯২০ এর দশকে আমার বাবার প্রজন্মের স্কুলের শিক্ষার্থীদের বানানো জাঙ্ক, আমার ১৯৫০ এর প্রজন্মের স্কুল ছাত্রদের বানানো জাঙ্ক থেকে সাধারন বৈশিষ্টে খুব একটা আলাদা কিছু ছিল না।

আমরা এই ফেনোমেননটা আরো একটু পদ্ধতিগতভাবে অনুসন্ধান করতে পারি একটি পরীক্ষার মাধ্যমে: শিশুতোষ একটি খেলা, চাইনীজ হুইসপারের (যুক্তরাষ্ট্রের শিশুরা যাকে টেলিফোন নামে চেনে) একটি ভিন্ন রুপের মাধ্যমে। প্রথমে দুইশ মানুষকে একত্র করুন যারা কোনদিনও চাইনীজ জাঙ্ক বানাননি, এবার প্রতি দশ জনকে নিয়ে একটি টিম করে মোট বিশটি টিম গঠন করুন। তারপর প্রতিটি টীমের যারা প্রধান, তাদেরকে একসাথে জড়ো করুন এবং তাদের সবার সামনে একটি চাইনীজ জাঙ্ক বানিয়ে হাতে কলমে শেখান কিভাবে চাইনীজ জাঙ্ক বানাতে হয়। এরপর তাদের নিজেদের টীমে ফেরত পাঠান এবং নির্দেশ দেন যেন তার প্রত্যেকে তাদের টীম থেকে নিজের বাছাই করা শুধু দ্বিতীয় আরেকজনকে নির্বাচন করতে যাকে, যাকে সে চাইনীজ জাঙ্ক হাতে কলমে বানিয়ে দেখানোর মাধ্যমে শেখাবে; প্রতিটি দ্বিতীয় প্রজন্মের শিক্ষার্থী তার টীমে এরপর তৃতীয় অন্য একজনকে শেখাবে কিভাবে চাইনীজ জাঙ্ক বানাতে হয়, এবং এভাবে প্রতিটি টীমের দশম সদস্যপর্যন্ত শেখাবে তার আগের প্রজন্মের শিক্ষকরা ধারাবাহিকভাবে; এই প্রশিক্ষনের সময় তৈরী করা প্রতিটি জাঙ্ক সঠিকভাবে চিহ্নিত করে রাখতে হবে, টীম ও প্রজন্ম নং দিয়ে,পরবর্তী পর্যবেক্ষনের জন্য।

আমি নিজে এই পরীক্ষাটি করিনি (অবশ্যই আমি করতে চাই) , কিন্তু খুব দৃঢ়ভাবেই আমার মনে হয় যে, আমি পুর্বধারনা করতে পারি, এর ফলাফলটি কি হতে পারে। আমার ধারনা হচ্ছে, এই বিশটি টীমের সবকটি টীম তাদের টীমের দশম সদস্য পর্যন্ত এই কৌশলটি শেখাতে বা হস্তান্তর করতে সফল হবে না। তবে মোটামুটি একটি উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ক্ষেত্রে তারা সফল হবে; কোন কোন টীমে ভুল ভ্রান্তি হবে; হয়তো শিক্ষকদের ধারাবাহিকতায়

কোনেএকটি দুর্বল যোগসুত্রে কেউ হয়তো একটি গুরুত্বপুর্ণ ধাপ অনুকরণ করতে ভুলে যেতে পারেন এবং তার পরবর্তী সবাই সেই একই ভুল করার মাধ্যমে তাদের উদ্দেশ্য সফলে ব্যর্থ হবেন; যেমন, হয়তো টীম ৪ ’কাটামারান’ পর্যায় পৌছাতে পারে, তবে এরপর আর না। হয়তো ১৩ নং টীমের অষ্টম সদস্য একটি পরিবর্তিত বা মিউট্যান্ট রুপ, যা ’বক্স উইথ টু লীডস’ এবং ’পিকচার ফ্রেম’ এর মাঝামাঝি কোন রুপ সৃষ্টি করে বসেন এবং তার টীমের নবম এবং দশম সদস্য এই পরিবর্তিত রুপটাই অনুকরনের মাধ্যমে সৃষ্টি করবেন।

এখন যে সব টীমে যেখানে শেখানো এই দক্ষতাটি দশম প্রজন্ম পর্যন্ত হস্তান্তরিত হয়েছে সফল ভাবে, সেখানে আমি আরো একটি প্রাক ধারনা করতে চাই। আপনি যদি তাদের তৈরী জাঙ্কগুলোকে তাদের প্রজন্মানুযায়ী ’ক্রমানুসারে’ সাজান আপনি প্রজন্ম সংখ্যার সাথে ক্রমান্বয়ে পদ্ধতিগত কোন গুনগত অবনতি লক্ষ্য করতে পারবেন না। কিন্তু যদি আপনি এমন কোন একটি পরীক্ষা পরিচালনা করেন, যা সবদিক থেকে হুবুহু শুধু মাত্র যে দক্ষতা হস্তান্তরিত হয়েছে সটা কোন অরিগ্যামী নয় বরং জাঙ্ক এর ‘ড্রইং’ এর একটি অনুলিপি আকা, তাহলে সেখানে আপনি পদ্ধতিগতভাবেই অবশ্যই গুনগত মানের অবমুল্যায়ন দেখতে পাবেন এর নিখুততায়, যেভাবে প্রজন্ম ১ থেকে প্রজন্ম ১০ অবধি টিকে যায় প্যাটার্ণটি।

পরীক্ষাটির ড্রইং সংস্করনে, প্রজন্ম ১০ এর সবকটি ড্রইং প্রজন্ম ১ এর সব ড্রইংগুলোর সাথে খানিকটা সদৃশ্যতা বহন করবে। এবং প্রতিটি টীমের মধ্যে এই সদৃশ্যতা কম স্থির ভাবে অবনতি হতে থাকে প্রজন্মান্তরে। এর থেকে ভিন্ন অরিগ্যামি সংস্করনের পরীক্ষায়, এই ভুলটি হয় হয় সম্পুর্ণ নয়তো একেবারে না। তাদের পরিবর্তনটা হবে ’ডিজিটাল’ মিউটেশনের মত। হয় কোন টীম কোন ভুলই করবে না এবং প্রজন্ম ১০ এর জাঙ্ক খুব খারাপও হবে না আবার ভালো হবে নাম গড়পড়তায় তা প্রজন্ম ৫ বা প্রজন্ম ১ এর বানানো জাঙ্কের মতই হবে বা হয়তো কোন একটি নির্দিষ্ট প্রজন্মে কোন একটি মিউটেশন হবে ফলে এর পরবর্তী প্রজন্মের সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হবে পুরোপুরি, হুবুহু মিউটেশনটিকে অনুলিপি করার মাধ্যমে;

এই দুই দক্ষতার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপুর্ণ পার্থক্যটা কি? সেটা হচ্ছে, অরিগ্যামির ক্ষেত্রে দক্ষতাটা হচ্ছে ধারাবাহিকভাবে করতে হবে এমন কতগুলো সুনির্দিষ্ট ক্রিয়া, যাদের কোনটাই এককভাবে করা কোন কঠিন কাজ নয়, বেশীর ভাগই সেই ক্রিয়াগুলো যেমন, ’ঠিক মাঝখানে ভাজ করুন দুই পাশে’; টীমের কোন একটি নির্দিষ্ট সদস্য হয়তো এই ধাপটি অনুকরণ করেন অদক্ষভাবে, তবে পরবর্তী সদস্যটি যিনি শিখছেন তার কাছে স্পষ্ট অনুভুত হবে, সে আসলে কি করার ’চেষ্টা’ করছে। অরিগ্যামী ধাপগুলো আসলে ’সেলফ নরমালাইজিং’, এবং এটাই একে ডিজিটাল বৈশিষ্ট দিয়েছে; এটা আমার কাঠের মিস্ত্রির মাষ্টারের উদহারনটির মত, যার ’কাঠের মধ্যে পেরেকের মাথাটা পুরোপুরি ঢুকাতে হবে’ এই উদ্দেশ্যটা তার শীক্ষার্থীর কাছে পরিষ্কার,হাতুড়ী আঘাত এর খুটিনাটি যাই হোক না কেন। অরিগ্যামীর ক্ষেত্রে আপনি হয় কোন একটি ধাপ ঠিকমত ধরতে পারবেন অথবা পারবেন না। অন্যদিকে আকার দক্ষতা মুলত অ্যানালগ একটি দক্ষতা, প্রত্যেকেই একবার চেষ্ঠা করে দেখতে পারেন, তবে কোন কোন মানুষের অনুলিপি অপেক্ষাকৃত বেশী নিখুততর হবে অন্যদের তুলনায় এবং কেউ একেবারে সঠিকভাবে এর হুবুহ অনুলিপি তৈরী করতে পারবেন না। কোন একটি ড্রইং এর সংস্করণ এর নিখুততাও নির্ভর করে, কি পরিমান সময় এবং সাবধানতা অবলম্বন করা হয়েছে এর প্রতি এবং এটি ক্রমাগতভাবে পরিবর্তনশীল একটি নিয়ামক ।দলের কিছু সদস্য উপরন্তু আরো খানিকটা অলঙ্করণ এবং ’গুনগতমানের ’উন্নতি’ বৃদ্ধি করবে শুধুমাত্র এর আগের প্রতিলিপিটি হুবুহ নকল করতে দেবার বদলে।

শব্দ – অন্ততপক্ষে তাদের অর্থ যখন বোধগম্য হয় – তা সেলফ নরমালাইজিং হয়, যেমন অরিগ্যামি অপারেশনের ক্ষেত্রে হয়। চাইনীজ হুইসপারের (টেলিফোন) মুল খেলায় প্রথম শিশুকে একটি গল্প বা বাক্য শোনানো হয়, এর**পর তাকে বলা** হয় সেটি তার পরবর্তী শিশুকে কানে কানে জানাতে এবং এভাবে খেলাটি অগ্রসর হয়; যদি বাক্যটি সাত শব্দের কম হয়, এবং প্রত্যেকটি শিশুদের মাতৃভাষায় হয়ে থাকে, খুবই সম্ভাবনা আছে শেষ অবধি বাক্যটি টিকে

যাওয়ার, অপরিবর্তিত হয়ে দশটি প্রজন্ম অবধি। যদি সেটা অচেনা কোন ভীন দেশী ভাষার হয়ে থাকে এবং প্রতিটি শব্দ শব্দ হিসাবে উচ্চারণ না করে যদি শিশুরা বাধ্য হয় তাদের ধ্বণি অনুযায়ী বা ফোনেটিক মেরে উচ্চারণ করার জন্য, তাহলে বার্তাটি শেষ অবধি টিকতে পারেনা, প্রজন্মের ক্রমানুসারে এই অবনতি সেই ড্রইং এর মতই আরো অস্পষ্ট,অবোধ্য হয়ে যায়। যখন বার্তাটি শিশুর নিজের ভাষায় কোন অর্থ বহন করে এবং যদি কোন অপরিচিত শব্দ যেমন ’ফেনোটাইপ’বা ’অ্যালীল’ না থাকে, এটি টিকে থাকে, তখন শব্দগুরোকে তাদের ধ্বণি অনুযায়ী উচ্চারণ না করে, শিশুরা প্রতিটি শব্দকে তাদের সীমাবদ্ধ শব্দভান্ডারের সদস্য হিসাবে চিহ্নিত করে, এবং একই শব্দগুলাকে বাছাই করে, যদিও যখন তারা পরবর্তী শিশুর নিকট বার্তাটি হস্তান্তর করে, খুব সম্ভবত তারা তা উচ্চারণ করে ভিন্ন কোন বাচনভঙ্গীতে; লিখিত ভাষাও সেল্ফ নরমালাইজিং, কারন কাগজে লেখা নানা বর্ণ, তাদের খুটিনাটি বিষয়ে যতেই ভিন্নতা থাকুক না কেন, তাদের একটি সীমাবদ্ধ (ধরা যাক) ছাব্বিশটি বর্ণের পরিবার থেকেই সংগ্রহ করা হয়েছে।

মীমরা কখনো কখনো তাদের অনুলিপি করন প্রক্রিয়ায় খুব বেশী মাত্রার নিখুততা প্রদর্শন করতে পারে এধরনের সেল্ফ নরমালাইজেশন প্রক্রিয়ার জন্য, এই সত্যটাই যথেষ্ট মীম/জীন সমরুপতা সংক্রান্ত কোন ধরনের অভিযোগের উত্তর দেবার জন্য। এছাড়া যাই হোক না কেন, এর বিকাশের এই আদি পর্যায়ে মীম তত্বের মুল উদ্দেশ্য,ওয়াট ক্রিক এর জীনতত্বের সমমানের সংস্কৃতি সংক্রান্ত কোন ধরণের বোধগম্য পুর্ণাঙ্গ তত্ব প্রদান করা না; মীমকে সমর্থন করার আমার মুল উদ্দেশ্য ছিল, আসলে সেই ধারনাটির মোকাবেলা করা, যে জীনরাই শুধু একমাত্র ডারউইনীয় প্রভাবের বিষয়, যে ধারনাটি নয়তো The Selfish Gene প্রচার করছে এমন একটা ঝুকি থেকে যাবার সম্ভাবনা ছিল। পিটার রিচারসন ও রবার্ট বয়েড এই বিষয়টির উপর জোর দিয়েছিলেন তাদের মুল্যবান এবং চিন্তার খোরাক যোগানো বই Not by Genes Alone এর শিরোনামের মাধ্যমে। যদিও তারা তাদের কারন বলেছেন কেন তারা মীম শব্দটি গ্রহন করেননি, বরং কালচারাল ভ্যারিয়ান্ট শব্দটা পছন্দ করেছেন; স্টিফেল শেনান এর Genes, Memes and Human History আংশিক অনুপ্রেরণা বয়েড ও রিচারনসনের এর আগের একটি অসাধারণ বই Culture and the Evolutionary Process; মীম নিয়ে আলোচনা করা অন্য পুর্ণাঙ্গ বইগুলো মধ্যে আছে রবার্ট আঙ্গার এর The Electric Meme, কেট ডাস্টিন এর The Selfish Meme এবং রিচার্ড ব্রডির Virus of the Mind: The New Science of the Meme;

কিন্তু সুসান ব্ল্যাকমোর তার The Meme Machine এ মেমেটিক তত্বটি যে কোন কারোর চেয়েই বেশী বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা দিয়েছেন, তিনি বারবার ব্রেন বা মস্তিষ্ক (বা অন্য কোন গ্রহন বা ধারনকারী বা কোন চ্যানেল বা মাধ্যম) দিয়ে পুর্ণ একটি পৃথিবী এবং যেখানে মীমরা একে অপরের সাথে ধাক্কাধাক্কি করে সেই জায়গাগুলো দখল করার চেষ্টা করছে, এমন একটি দৃশ্যকল্পের কথা বলেছেন; জীনপুলের জীনদের মত, মীমরা যারা শেষ অবধি টিকে যাবে, সেগুলো আসলে তারা, যারা কিনা নিজেদের অনুলিপি করতে দক্ষ। এর কারন হতে পারে তাদের একটি সরাসরি আবেদন আছে, যেমন, ধারনা করা যেতে পারে ’অমরত্বের’ মীম, কিছু মানুষের কাছে যেমন বিশেষ আবেদন আছে। অথবা হতে পারে তারা সবচেয়ে বেশী বিকশিত হয় অন্য কিছু মীমদের উপস্থিতিতে যারা ইতিমধ্যেই মীম পুলে অসংখ্য। এটি মীম পুলে মীম কমপ্লেক্স বা মীমপ্লেক্স এর সৃষ্টি করে । মীমদের ব্যাপারে যথারীতি আমরা আরো ভালো করে বুঝতে পারি এর সাথে জীনতাত্বিক তুলনার উৎসে ফেরত গিয়ে।

বোঝানোর জন্যই আমি জীনদের এমন ভাবে ব্যাখ্যা করেছি যেন, তারা স্বতন্ত্র একক, যারা স্বাধীনভাবে কাজ করতে সক্ষম; কিন্তু অবশ্যই তারা পরস্পর থেকে স্বাধীন নয়, এই বিষয়টি প্রকাশ পায় দুটি উপায়ে: প্রথম, ক্রোমোজোমের উপর সরলরৈখিকভাবে জীনগুলো সাজানো থাকে, এবং প্রজন্মান্তরে তারা তাদের নিকটবর্তী ক্রোমোজমের লোকাই এর অন্যান্য জীনগুলোকে নিয়ে বিস্তার লাভ করে। আমরা যে যোগসুত্রকে বলি লিংকেজ এবং আমি এই বিষয়ে আর বলছি না কারন মীমদের জীনদের মত কোন ক্রোমোজোম কিংবা আলীল নেই বা যৌন পুণ:সন্নিবেশনও ঘটে না। অন্য আরেকটি ক্ষেত্রে জীনগুলো সে স্বাধীন নয় তা জেনেটিক লিংকেজ থেকে খুবই ভিন্ন এবং এখানে বেশ ভালো

মেমেটিকের অনুরুপ একটি তুলনা আছে, এটি ভ্রুণতত্ব বিষয়ক – এবং যে সত্যটি প্রায়ই ভুল বোঝা হয় – এটি জীনতত্ব থেকে সম্পুর্ণ ভিন্ন; আমাদের শরীর জিগশ’ পাজলের এর মত টুকরো টুকরো জোড়া লাগানো নানা ফেনোটাইপের অংশ না, যারা কিনা প্রত্যেকে আলাদা ভাবে ভিন্ন ভিন্ন জীনের অবদান; কোন সরাসরি একক ভাবে কোন জীনের সাথে সংযোগ নেই শরীরের গঠন বা আচরণগত বৈশিষ্টর; আরো শতাধিক অন্যান্য জীনের সাথে পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে কোন একটি বিভিন্ন বিকাশ প্রক্রিয়া পরিচালনা করে যার ফলাফল পুর্ণ হয় – শরীর সৃষ্টির মাধ্যমে। ঠিক যেমন করে কোন রেসিপির নানা শব্দ রান্না করার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে একটি বিশেষ ডিশ তৈরী করে। রেসিপির প্রতিটি শব্দ ডিশটির নানা টুকরোকে সরাসরি প্রতিনিধিত্ব করছে, এমনটি কিন্তু না।

সুতরাং জীনরা আসলে দলবদ্ধ হয়ে একসাথে সহযোগিতার মাধ্যমে শরীরকে তৈরী করে এবং এটি ভ্রুণতত্ত্বের একটি মুলনীতি। প্রাকৃতিক নির্বাচন এক দল জীনকে সহায়তা করে অন্যান্য বিকল্প একদল জীনদের তুলনায় এমন ভাবে বলার একটা প্রলোভন এড়ানো কঠিন। এবং এখানেই সংশয়; আসলে যেটা ঘটে, তাহলো জীনপুল অন্যান্য জীনরা সেই পরিবেশের একটি বড় অংশ তৈরী করে, যেখানে প্রতিটি জীন বনাম তার বিকল্প অ্যালীল নির্বাচিত হয়। যেহেতু প্রতিটি জীন নির্বাচিত হবার ক্ষেত্রে সফলতা অর্জন করে অন্য জীনদের উপস্থিতিতে – যারা নিজেরাও একই ভাবে নির্বাচন প্রক্রিয়ায় নির্বাচিত হয়েছে – এভাবে সহযোগী জীনদের গুচ্ছ বা কার্টেল নির্বাচনের মাধ্যমে ’উদ্ভব’ হয়। আমাদের যেটা আছে সেটা পরিকল্পিত নিয়মিত অর্থনীতির তুলনায় বরং অনেকটাই মুক্ত বাজার অর্থনীতির মত। এখানে কসাই আছে একজন, বেকার আছে একজন,কিন্তু বাজারে একটি শুন্যস্থান হয়তো আছে একজন মোমবাতির কারিগরের। প্রাকৃতিক নির্বাচনের অদৃশ্য হাত সেই শুন্যস্থান পুর্ণ করে। এটি কিন্তু একজন কেন্দ্রিয় পরিকল্পনাকারীর উপস্থিতির ধারনা থেকে ভিন্ন, যিনি কসাই–বেকার আর মোমবাতির কারিগরের এই ত্রিমুখী সহযোগী গ্রুপগুলোকে সমর্থন করেন; পরস্পর সহযোগিতা পুর্ণ জীন গুচ্ছ বা কার্টেল অদৃশ্য হাত দিয়ে এক জায়গায় জড়ো করার ধারনাটি ধর্মের মীমগুলো এবং কিভাবে তারা কাজ করে বুঝতে আমাদের সাহায্য করে;

বিভিন্ন ধরনের জীনদের গ্রুপ বা কার্টেল এর উদ্ভব হয় বিভিন্ন জীন পুলে। মাংশাসী জীন পুলে এমন জীন থাকবে যা শিকার ধরার ইন্দ্রিয়, শিকার ধরার মত নখর, মাংশাসী দাত, মাংশ হজম করার জন্য প্রয়োজনী উৎসেচক এবং আরো অন্যান্য জীন, সবাই বিশেষভাবে একে অপরের সাথে সহযোগীতা করবে প্রয়োজনী অঙ্গ এবং নানা শারীরবৃত্তীয় পরিবেশ সৃষ্টি করেতে। এবং একই সাথে, নিরামিশভোজীদের প্রানীদের জীন পুলে ভিন্ন পারস্পরিক সামন্জষ্যপুর্ণ জীনগুলো সহায়তা পাবে তাদের নিজেদের মধ্যে সহযোগিতা করার জন্য। আমরা সেই ধারনার সাথে পরিচিত যে, একটি জীন প্রজাতির বহিঃপরিবেশের সাথে এর প্রকাশ বা ফেনোটাইপ এর পারস্পরিক সামন্জষ্যতার কারনে বিশেষ সহায়তার জন্য নির্বাচিত হয়: মরুভুমি, বনভুমি বা সেটা যেখানে হোক না কেন। আমি যে বিষয়টা এখানে উল্লেখ করতে চাইছি তা হলো, এছাড়াও সহায়তার জন্য এটি নির্বাচিত হয় কোন একটি নির্দিষ্ট জীনপুলে অন্যান্য জীনের সাথে এর পারস্পরিক সামন্জষ্যতার উপরেও ভিত্তি করে। কোন মাংশাসী জীন নিরামিশভোজী প্রানীদের জীনপুলে টিকতে পারবেনা এবং এর উল্টোটাই ঘটে মাংশাসী জীন পুলে কোন নিরামিশাষী জীনগুলোর ক্ষেত্রে। যদি জীনের দীর্ঘদৃষ্টি দিয়ে ব্যাপারটা দেখা হয়, কোন প্রজাতির জীন পুল – জীনদের সেই সেট যা বারবার বিন্যাস এবং পুনর্বিন্যাস হচ্ছে যৌন প্রজণনের মাধ্যমে – তারা সেই জীনতাত্বিক পরিবেশ তৈরী করে যেখানে প্রতিটি জীন নির্বাচিত হয় তাদের পারস্পরিক সহযোগিতা করার ক্ষমতার উপর নির্ভর করে। যদিও মীমদের পুল জীনপুলের মত এতো নিয়ম নির্ভর বা গোছানো নয়, তাসত্বেও আমরা একটি মীম পুলের কথা বলতে পারি মীমপ্লেক্স এর প্রতিটি মীম এর জন্য গুরুত্বপুর্ণ ’পরিবেশ’ হিসাবে।

মীমপ্লেক্স হচ্ছে এক সেট মীম যারা, নিজেরা এককভাবে টিকে থাকতে তেমন দক্ষ না হলেও, মীমপ্লেক্স এর অন্যান্য সদস্যদের উপস্থিতিতে এরা সফলভাবে টিকে থাকতে সক্ষম। এর আগের সেকশনে আমি সন্দেহ প্রকাশ করেছিলাম ভাষার বিবর্তনের খুটিনাটি ক্ষেত্রগুলো বিশেষ কোন সুবিধা পায়না একধরনের প্রাকৃতিক নির্বাচন প্রক্রিয়ায়। আমার ধারনা যে ভাষার বিবর্তন বরং নিয়ন্ত্রণ করে র‍্যানডোম ড্রিফট; অনুমান করা সম্ভব যে কিছু স্বরবর্ণ বা ব্যাঞ্জন

বর্ণ পাহাড়ী পরিবেশে অন্য স্বরবর্ণ বা ব্যাঞ্জন বর্ণ অপেক্ষা বেশী প্রযোজ্য এবং সেকারনে সেগুলো বৈশিষ্টমুলক যেমন, সুইস, তীব্বতীয় এবং আন্দেজ পর্বতাঞ্চলের ভাষার ডায়ালেক্ট। অন্যদিকে যেমন কিছু শব্দ ফিসফিস করে বলার জন্য উপযুক্ত, যেমন গভীর জঙ্গলে, একারনে বৈশিষ্টমুলক পিগমী বা আমাজনীয় ভাষায়। কিন্তু ভাষা নিয়ে যে উদহারণ আমি উল্লেখ করেছিলাম সেগুলো প্রাকৃতিকভাবে নির্বাচিত হয়েছে – গ্রেট ভাওয়েল শিফট এর তত্বটি হয়তো একটি ব্যাখ্যা আছে – যদি সেই ব্যাখ্যাটি এই ধরণের না হতে পারে। বরং এটি হতে পারে পারস্পরিক সামন্জষ্যপুর্ণ মীমপ্লেক্সে এ মীমদের উপযুক্ত জায়গা খুজে নেবার মাধ্যমে। একটি স্বরবর্ণ প্রথমে শিফট হয়, অজানা কোন কারণে – হয়তো কোন প্রশংসার পাত্র বা শক্তিশালী কোন ব্যাক্তির মত করে ফ্যাশন দুরস্ত উচ্চারন অনুকরণের মাধ্যমে, যেমনটা বলা হয় স্প্যানীশ লিস্প এর কারণ হিসাবে; কিভাবে গ্রেট ভাওয়েল শিফট হলো সেটা যাই হোক না কেন: এই তত্বানুযায়ী একবার যখন প্রথম স্বরবর্ণটি পরিবর্তিত হয়, অন্য স্বরবর্ণগুলো সেটি পালাক্রমে অনুসরণ করে যে কোন ধরনের অস্পষ্টতাকে হ্রাস করার প্রচেষ্টায়, এভাবে ধাপে ধাপে পর্যায়ক্রমে। এবং দ্বিতীয় পর্বে ইতিমধ্যে বিদ্যমান মিমপুল থেকে মীম রা নির্বাচিত হয়, যারা পারস্পরিক সামন্জষ্যপুর্ণ মীমদের নিয়ে মীমপ্লেক্স তৈরী করে।

অবশেষে ধর্মের মেমেটিক তত্বটি নিয়ে আলোচনা করার জন্য এখন আমরা যথেষ্ট উপকরণ সংগ্রহ করেছি; কিছু ধর্মীয় ধারনা , কিছু জীনের মতই হয়তো টিকে সাথে শুধুমাত্র এর নিজের যোগ্যতায়। এই মীমগুলো টিকে থাকতে পারে যে কোন মীম পুলে, তাদের চারপাশে যে মীমরা ই থাকুক না কেন (এই গুরুত্বপুর্ণ বিষয়টি নিয়ে আমি অবশ্যই আবার বলছি যে যোগ্যতা বা মেরিট এই অর্থে মীম পুলে টিকে থাকার ’যোগ্যতা’ মাত্র, এর বাইরে এই শব্দটির বিশেষ চুড়ান্ত কোন মুল্য বিচার নেই); কিছু ধর্মীয় ধারনা টিকে যায় কারন তারা অন্য মীমগুলোর সাথে সামন্জষ্যপুর্ণ হবার কারনে এবং ইতিমধ্যেই মীমপুলে যাদের সংখ্যাও অনেক মীম কমপ্লেক্স বা মীমপ্লেক্স এর অংশ হিসাবে। নীচে আমি ধর্মীয় মীমদের একটি আংশিক তালিকা উল্লেখ করলাম, যা সম্ভবত মীম পুলে টিকে থাকার বিশেষ যোগ্যতা আছে , হয় সম্পুর্ণ তাদের একক ’যোগ্যতা’ অথবা বিদ্যমান মীমপ্লেক্সগুলোর সাথে এর সামন্জষ্যতার কারনে।

- আপনার মৃত্যুর পরও আপনি বেচে থাকবেন।
- যদি আপনি শহীদ হিসাবে মৃত্যুবরণ করেন তবে আপনার জায়গা হবে বেহেশতের বিশেষ একটি স্থানে যেখানে আপনি বাহাওরটি কুমারী নারী ভোগ করতে পারবেন (সেই দুর্ভাগা কুমারীর জন্য একটু ভেবে দেখুন)
- ধর্মীয় ভিন্নমতাবলম্বী বা হেরেটিক, অবমাননাকারী এবং স্বধর্মত্যাগীদের হত্যা করা উচিৎ (বা তাদের অন্য কোনোভাবে শাস্তি প্রদান করা উচিৎ যেমন তাদের পরিবার থেকে তাদের সম্পর্কচ্যুত করা ইত্যাদি)
- ঈশ্বরে বিশ্বাস করা হচ্ছে সবচে বড় গুন বা ভার্চু। আপনি যদি কখনো অনুভব করেন যে, আপনার বিশ্বাস দোদ্যুল্যমান, তবে সেটিকে স্থির ও দৃঢ় করার জন্য কঠোর পরিশ্রম করুন এবং ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করুন আপনার অবিশ্বাসের দ্বন্দে তিনি যেন আপনাকে সাহায্য করেন (পাসকালের বাজী সম্বন্ধে আলোচনার সময় আমি উল্লেখ করেছিলাম, সেই অদ্ভুত ধারনাটি কথা, যে ঈশ্বর আমাদের কাছে আসলে যে জিনিসটা চান সেটা হচ্ছে তার উপর আমাদের বিশ্বাস। সেই সময় আমি এটাকে একটি ব্যতিক্রম হিসাবে চিহ্নিত করেছিলাম, তবে এখন এর জন্য একটি কারন আছে আমাদের);
- আস্থা বা ফেইথ(কোন ধরনের প্রমান ছাড়াই যে বিশ্বাস) হচ্ছে একটি উত্তম গুন। আপনার বিশ্বাস যত বেশী প্রমানকে উপেক্ষা করবে , ততবেশী ধর্মীয় গুনে গুনান্বিত হবেন আপনি। একনিষ্ঠ গুনবান বিশ্বাসীরা যত বেশী অদ্ভুত কিছু বিশ্বাস করতে সক্ষম হন, যা অসমর্থিত এবং কোনভাবেই সমর্থনযোগ্য না কোন প্রমানের নীরিখে বা যুক্তিতে, তারা তাদের এই অন্ধবিশ্বাসের জন্য বিশেষভাবে পুরষ্কৃত হবেন।
- প্রত্যেকেই, এমনকি যাদের কোন ধর্মীয় বিশ্বাস নেই, ধর্ম বিশ্বাসীদের বিশ্বাসকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে এবং প্রশ্নাতীতভাবে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করবে, এবং অন্য ধর্ম বিশ্বাসের প্রতি সাধারনত যা করা হয়, তার চেয়ে

অনেক বেশী মাত্রায় তাদের সেই বিশ্বাসের প্রতি সন্মান দেখাতে হবে (অধ্যায় ১ এ বিষয়টি আলোচনায় এসেছে);

- বেশ অদ্ভুত কিছু বিষয় আছে (যেমন, ট্রিনিটি, ট্রান্সসাবস্টানশিয়েশন, ইনকারনেশন) যা আমাদের ’বোঝার’ জন্য না; এমনকি এসব কোন কিছু বোঝার কোন ’চেষ্টা’ করারও দরকার নেই কারন বিষয়গুলো বোঝার প্রচেষ্টার প্রক্রিয়া সেগুলোকে ধ্বংশ করে দিতে পারে। বরং শিখুন এগুলোকে ’রহস্য’ হিসাবে চিহ্নিত করে কিভাবে পুর্ণতা এবং সন্তুষ্টি অর্জন করা যায়;
- সুন্দর সঙ্গীত, শিল্পকলা এবং ধর্মীয় গ্রনহ হলো নিজেরাই স্বপ্রতিলিপিকারী ধর্মীয় ধারনার টোকেন।(((*বিভিন্ন ঘরানা এবং জনরার শিল্পকর্মগুলো বিশ্লেষন করা যেতে পারে বিকল্প মীম কমপ্লেক্স বা মীমেপ্লেক্স হিসাবে, যেহেতু শিল্পীরা তাদের পুর্ববর্তী শিল্পীদের নানা আইডিয়া ও মোটিফ অনুসরণ ও অনুকরণ করেন এবং নতুন মোটিফগুলো শুধুমাত্র টিকে থাকতে পারে, যদি তারা অন্যগুলোর সাথে মিশে যেতে পারে। আসলেই শিল্পকলার ইতিহাসের পুরো শাখাটাই দেখা যেতে পারে মীমপ্লেক্সিটির একটি বিস্তারিত গবেষনা হিসাবে, বিশেষ করে তাদের সুক্ষ এবং নিয়মমাফিক নানা আইকোনোগ্রাফি বা সিম্বোলিজমের বিস্তারিত গবেষনাগুলো সেটারই ইঙ্গিত দেয়। যে খুটিনাটি বিষয়গুলো সমর্থিত হয়েছে বা সমর্থন হারিয়েছে মীম পুলে উপস্থিত অন্য সদস্যদের কারনে এবং যেখানে অনেক ক্ষেত্রেই ধর্মীয় মীমগুলোর ভুমিকা ছিল।))))*

উপরে তালিকায় বর্ণিত কিছু মীম এর সম্ভবত চুড়ান্ত সারভাইভাল মুল্য আছে এবং সেটি যে কোন মীমপ্লেক্স এ ভালোভাবেই টিকে থাকতে পারে সফলতার সাথে। কিন্তু, জীনের ক্ষেত্রে যেমন হয়, কিছু মীম টিকে থাকে অন্য বেশ কিছু মীমের উপস্থিতিতে সৃষ্ট একটি উপযুক্ত পরিবেশে, যা বিকল্প নানা মীমপ্লেক্সগুলো গড়ে উঠতে সহায়তা করে। দুটি ভিন্ন ধর্ম বিশ্বাসকে দেখা যেতে পারে, দুটি বিকল্প মীমপ্লেক্স হিসাবে, যেমন হয়তো ইসলাম হচ্ছে মাংশাসী জীন কমপ্লেক্স এর অনুরুপ, এবং বৌদ্ধধর্মবাদ যেমন নিরামিশাষী জীন কমপ্লেক্স এর অনুরুপ। চুড়ান্ত কোন অর্থে কিন্তু কোন ধর্মের ‘ধারনাগুলো’ অন্য কোন একটি ধর্মের ’ধারনাগুলো’র চেয়ে উত্তম না; ঠিক যেমন মাংশাসী জীন নিরাষাশী জীন থেকে উত্তম না যে অর্থে। এধরনের ধর্মীয় মীমগুলোর চেয়ে চুড়ান্তভাবে টিকে থাকার থাকার কোন বিশেষ গুনাবলী থাকতেই হবে এমন কোন প্রয়োজনীয়তাও কিন্তু নেই। তাসত্বেও, তারা টিকে থাকার ক্ষেত্রে দক্ষ এই অর্থে যে, তারা শুধূ তাদের ধর্মের অন্য মীমদের উপস্থিতিতে ভালোভাবেই তাদের জায়গা করে নিতে পারে, বিকশিত হতে পারে, যা অন্য ধর্মের মীমদের উপস্থিতিতে ঘটে না। এই মডেলে, রোমান ক্যাথোলিকবাদ ও ইসলাম, ধরুন অবশ্যই কোন একক ব্যাক্তির সৃষ্টি নয়, বরং তারা বিবর্তিত হয়েছে পৃথক পৃথক ভাবে বিকল্প মীমদের একটি গুচ্ছ হিসোবে যারা পুর্ণ বিকাশ হবার সুযোগ পেয়েছে একই মীমপ্লেক্স দের সহাবস্থানে।

সংগঠিত ধর্ম সংগঠিত হয়েছে মানুষের দ্বারাই: যাজক এবং বিশপ, রাবাই, ইমাম, আয়াতোল্লাহ দের দ্বারাই। কিন্তু আমি মার্টিন লুথারের সংক্রান্ত যে বিষয়টির অবতারণা করেছিলাম আগে, সেই বিষয়টির পুণরাবৃত্তি করেই বলছি, এর অর্থ কিন্তু এটা নয়, যে ধর্মের প্রথম ধারনার সুত্রপাত বা পরিকল্পনা করেছে কোন মানুষ; এমনকি যেখানে ধর্মকে অপব্যবহার ও নিয়ন্ত্রন করা হয়েছে ক্ষমতায় থাকা মানুষগুলোর স্বার্থে। প্রবল সম্ভাবনা আছে যে, প্রতিটি ধর্মের খুটিনাটি অনেক বিষেই মুলত তার আকৃতি পেয়েছে অচেতন বিবর্তনের প্রক্রিয়ায়। কোন জীনতাত্বিক প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে না, কারন সেই প্রক্রিয়া খুবই ধীর, যা ধর্মের দ্রুত বিবর্তন ও এবং নানা বিভাজনকে ব্যাখ্যা করতে পারেনা। এই কাহিনীতে জীনতাত্বিক প্রাকৃতিক নির্বাচনের ভুমিকা হলো, প্রয়োজনীয় প্রাক-প্রবণতা এবং পক্ষপাতিত্ব সহ সেই মস্তিষ্ককে সরবরাহ করা-একটি হার্ডওয়ার প্ল্যাটফর্ম ও লো লেভেল সিস্টেম সফটওয়্যারটি যা মেমেটিক বা মীম নির্ভর নির্বাচনের প্রেক্ষাপট তৈরী করে। এই প্রেক্ষাপটে আমার কাছে মনে হয় কোন একধরনের মীম নির্ভর প্রাকৃতিক নির্বাচনই ব্যাখ্যা করতে পারে কোন একটি নির্দিষ্ট ধর্মের বিস্তারিত বিবর্তন প্রক্রিয়াটিকে। ধর্মীয় বিবর্তনের প্রাথমিক ধাপগুলোতে, এটি কোন সংগঠিত রুপ নেবার আগে, সাধারন মীমগুলো টিকে থাকে মানুষের মনস্তাত্বিকতার প্রতি তাদের বিশেষ আবেদনের জন্য; এবং এখানেই ধর্মের মীম তত্ব এবং মানসিক কোন প্রক্রিয়ার উপজাত হিসাবে ধর্মের উৎপত্তি তত্বটি একে অপরের সাথে মিশে যায়। পরবর্তী পর্যায়ে যখন ধর্ম

রুপান্তরিত হয়ে সংগঠনে, বিস্তারিত নানা ধরনের আচার এবং কাল্পনিক নানা নিয়মকানুনের মাধ্যমে ভিন্নতা পায় অন্যান্য ধর্মগুলো থেকে, সেই পর্যায়ের ধর্মের নানা বিষয়গুলো ব্যাখ্যা করার জন্য মীমপ্লেক্স তত্ত্বটি বেশ যথেষ্ট – পারস্পরিক সামনজষ্যপুর্ণ মীমদের কার্টেল বা গ্রুপ; এটি অবশ্য যাজক কিংবা অন্যদের পরিকল্পনা মাফিক বাড়তি কিছু ম্যানিপুলেশনের ভুমিকা থাকার সম্ভবনাকে বাতিল করেনা; ধর্ম সম্ভবত কিছুটা অংশ, ইন্টেলিজেন্টলি ডিজাইন করা হয়েছে, যেমন করে শিল্পকলার ক্ষেত্রে নানা স্কুল বা ঘরানা বা ফ্যাশনগুলো সৃষ্টি করা হয়ে থাকে।

প্রায় সম্পুর্ণ যে একটি ধর্ম ইন্টেলিজেন্টভাবে ‘ডিজাইন’ করা হয়েছে, তাহলো সায়েন্টোলজী (Scientology), কিন্তু আমার সন্দেহ এটি ধারার ব্যতিক্রম হবার সম্ভাবনাই বেশী। পুরোপুরি ডিজাইনকৃত ধর্মের খেতাব পাবার আরেকটি দাবীদার হচ্ছে মরমনিজম (Mormonism); জোসেফ স্মিথ, এই ধর্মটির অত্যন্ত বিশেষ প্রকৃতির সৃজনশীল ও মিথ্যাচারী আবিষ্কারক, এক অস্বাভাবিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে সম্পুর্ণ নতুন একটি পবিত্র গ্রন্হ সৃষ্টি করেছিলেন, বুক অব মর্মন, যেখানে একেবারে শুন্য থেকে তিনি নতুন একটি আমেরিকার মিথ্যা কাল্পনিক ইতিহাসের অবতারণা করেন ভুয়া সপ্তদশ শতকের ইংরেজী ভাষা ব্যবহার করে। তাস্বত্ত্বেও উনবিংশ শতাব্দীতে এর সৃষ্টি হবার পর মর্মনবাদ বিবর্তিত হয়েছে বেশ এবং এখন এটি যুক্তরাষ্ট্রের মুলধারার সন্মানজনক একটি ধর্ম হিসাবে প্রতিষ্ঠিত; আসলেই, দাবী করা হচ্ছে এটি সবচেয়ে দ্রুত বর্ধনশীল ধর্মগুলোর একটি এবং এখন কথা হচ্ছে তাদের ভবিষ্যত একজন প্রেসিডেন্ট ক্যান্ডিডেটকে খুজে বের করার ব্যাপারে।

সব ধর্মই বিবর্তিত হয়। ধর্মীয় বিবর্তনের যে তত্ত্বই আমরা গ্রহন করিনা কেন, সেই তত্ত্বটিকে উপযুক্ত পরিবেশ পেলে যে বিস্ময়কর হারে ধর্মীয় বিবর্তন প্রক্রিয়া অগ্রসর হতে পারে, সেটি ব্যাখ্যা করতে হবে।একটি কেস স্টাডি আলোচনা করা যাক:

রিচার্ড ডকিন্স এর দি গড ডিল্যুশন : ষষ্ঠ অধ্যায় (প্রথম পর্ব)

By K M Hassan

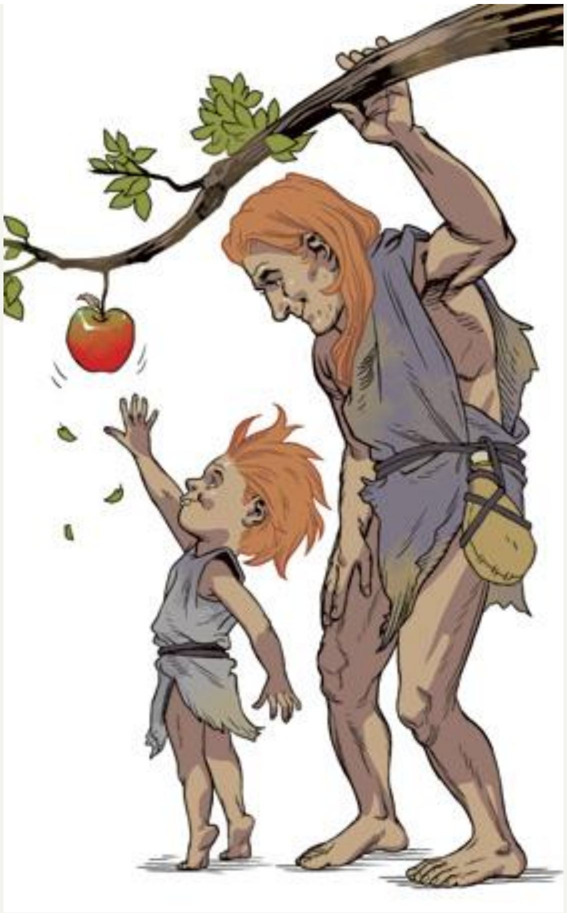

ছবি: ষাটের দশকে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের জীববিজ্ঞানী বিল হ্যামিলটন প্রথম প্রজাতির সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার গানিতীক মডেলটি প্রস্তাব করেছিলেন, তিনি প্রথম ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন নিজের ক্ষতি করেও অন্যের উপকার করার মানসিকতাটির, যে পরোপকারী মানসিকতার জন্ম হয় যখন প্রজাতির কোন সদস্য তার জীনগত আত্মীয়দের জীন রক্ষার্থে নিজেকে ঝুকির মধ্যে ফেলে; এমনকি যদি সেও মৃত্যুবরণ করে, তার সুফল ভোগ করবে তারই নিকটবর্তী জীনগত আত্মীয়, তারই পারিবারিক বংশধারা, তাদের সামগ্রিক ডিএনএ – সেই সাথে তার নিজেরটাও; এভাবেই জন্ম হয়েছিল ইনক্লুসিভ ফিটনেস এর তত্ত্বটি; প্রানীদের প্রবনতা আছে নিজেদের আত্মীয় বা জীনগত কিনদের দেখাশোনা করার, বিপদ থেকে রক্ষা করার, সম্পদ ভাগাভাগি, বিপদের সতর্ক করার বা কোন না কোন ভাবে নি:স্বার্থ ব্যবহার করার কারন স্পষ্টতই পরিসংখ্যানগতভাবে সম্ভাবনা থাকে তাদের আত্মীয়রা তাদের মত একই জীনের কপি বহন করে; কোন জীন যা কোন অর্গানিজম বা জীবদের একক কোন সদস্যদের প্রোগ্রাম করে তাদের জীনগত আত্মীয় বা জেনেটিক কিন দের সহায়তা করার জন্য পরিসংখ্যাগতভাবে সেই জীন এর অনুলিপি হবার সুবিধা পাবার সম্ভাবনাও বেশী; এই ধরনের জীনের সংখ্যা প্রজাতির জীনপুলে বেড়ে যেতে পারে এমন হারে যে যেখানে জীনগত আত্মীয় বা কিন পরার্থবাদীতা বা অ্যালট্রুইজম খুব স্বাভাবিক হয়ে দাড়াতে পারে; নিজেদের সন্তানদের প্রতি উপকারী হওয়া এর একটি স্পষ্ট উদহারন, কিন্তু এটাই একমাত্র এমন উদহারন নয়; মৌমাছি, ওয়াস্প, পিপড়া, টারমাইট এবং থানিকটা, কিছু নির্দিষ্ট মেরুদন্ডী যেমন ন্যাকেড মোল র‍্যাটস, মীরকাটস এবং অ্যাকর্ণ উডপেকাররা এমন একটি সমাজের বিবর্তন ঘটিয়েছে যেমন বড় ভাইবোনরা তাদের ছোট ভাইবোনদের দেখাশোনা করে (যাদের সাথে তারা তাদের জীনগুলোকে শেয়ার করার সম্ভাবনা থাকে) ; (Illustration by Asaf Hanuka)

রিচার্ড ডকিন্স এর দি গড ডিল্যুশন : ষষ্ঠ অধ্যায় (প্রথম পর্ব)

(অনুবাদ প্রচেষ্টা: কাজী মাহবুব হাসান)
The God Delusion by Richard Dawkins

প্রথম অধ্যায়
দ্বিতীয় অধ্যায়
তৃতীয় অধ্যায়
চতুর্থ অধ্যায় (প্রথম পর্ব), চতুর্থ অধ্যায় (দ্বিতীয় পর্ব),
চতুর্থ অধ্যায় (তৃতীয় পর্ব), চতুর্থ অধ্যায় (চতুর্থ পর্ব), চতুর্থ অধ্যায় (শেষ পর্ব)
পঞ্চম অধ্যায় (প্রথম পর্ব), পঞ্চম অধ্যায় (দ্বিতীয় পর্ব), পঞ্চম অধ্যায় (তৃতীয় পর্ব)
পঞ্চম অধ্যায় (চতুর্থ পর্ব), পঞ্চম অধ্যায় (পঞ্চম পর্ব), পঞ্চম অধ্যায় (ষষ্ঠ পর্ব)

নৈতিকতার শিকড়: কেন আমরা ভালো?

এই পৃথিবীতে আমাদের পরিস্থিতি খুবই অদ্ভুত; এখানে প্রত্যেকেই আমরা স্বল্প সময়ের অতিথি, আর আমাদের জানাও নেই কেন, তারপরও, মাঝে মাঝে আপাতদৃষ্টিতে স্বর্গীয় রুপ দিয়ে সৃষ্টি করি কোন একটি উদ্দেশ্য। যদিও, দৈনন্দিন জীবনের দৃষ্টিকোন থেকে অন্তত একটা বিষয় আমাদের জানা আছে তা হলো: আমরা মানুষরা এখানে, অন্য মানুষের জন্য –আর সবার উপরে, বিশেষ করে তাদের জন্য, যাদের মুখের হাসি এবং ভালো থাকার উপরে আমাদের নিজেদের সুখী হবার বিষয়টি নির্ভরশীল; আলবার্ট আইনস্টাইন

অনেক ধার্মিক মানুষের জন্য কল্পনা করা বেশ কঠিন, কিভাবে, ধর্ম ছাড়া, কোন একজন মানুষ ভালো হতে পারে বা ভালো হবার জন্য আদৌ কোন ইচ্ছা বোধ করতে পারে। আমি এ ধরনের প্রশ্নগুলোই আলোচনা করবো এই অধ্যায়ে; কিন্তু সন্দেহ আসলে আরো সর্বব্যপী এবং কিছু ধার্মিক মানুষ, তাদের বিশ্বাসকে ’বিশ্বাস’ করেন না যারা, প্রায়শই তাদের প্রতি তীব্র ঘৃনায় আবেগাক্রান্ত হয়ে পড়েন। এটি খুবই গুরুত্বপুর্ণ, কারন অন্যান্য বিষয়গুলোর প্রতি ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গীর পেছনে যে নৈতিকতার বিবেচ্য বিষয়গুলি লুকিয়ে থাকে, তাদের আসলেই নৈতিকতার সাথে কোন সত্যিকারের যোগসুত্র নেই; বিবর্তনের বিষয়গুলো নিয়ে শিক্ষাদান করার বিরোধীতার একটি বিশাল অংশরই আসলে বিবর্তনের সাথে বা কোন বৈজ্ঞানিক কিছূর সাথে কোন সম্পর্ক নেই, এটি উস্কে দিয়েছে দিয়ে নৈতিকতা নির্ভর তীব্র কিছু ক্ষুদ্ধ প্রতিক্রিয়া, যা হতে পারে একেবারে সরল বুঝতে না পারা থেকে উদ্ভুত, যেমন, ’আপনি যদি আপনার সন্তানকে শেখান যে, তারা বানর থেকে বিবর্তিত হয়েছে, তাহলে তারা সবাই বানরের মতই আচরণ করবে’ থেকে আরো জটিল অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য যেখানে ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইন এর ওয়েজ বা কাঠের গোজ স্ট্রাটেজী (যেখানে সৃষ্টিবাদী বা ক্রিয়েশনিষ্টরা ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইন এর ওয়েজ বা কাঠের গোজ স্ট্রাটেজী ব্যবহার করে বিজ্ঞান শিক্ষার মধ্যে প্রবেশ করতে চাইছে), যে অশুভ উদ্দেশ্যটির বিষয় নির্দয়ভাবে উন্মোচন করেছে বারবারা ফরেষ্ট এবং পল গ্রস তাদের Creationism’s Trojan Horse: The Wedge of Intelligent Design বইটিতে;

আমার বইগুলোর জন্য আমি পাঠকদের কাছ থেকে অসংখ্য চিঠি পাই, যাদের বেশীর ভাই অত্যন্ত উৎসাহব্যজ্ঞক ভাবে বন্ধুভাবাপন্ন, তাদের কিছু গঠনমুলক সমালোচনাপুর্ণ, কিছু খুবই নোংরা মানসিকতার এবং এমনকি খুবই হিংস্র;

এবং আমি দু:খের সাথে বলছি সবচেয়ে নোংরা মানসিকতার চিঠিগুলোর মুল প্রণোদনা দায়ক বিষয়টি হচ্ছে ধর্ম; এধরনের অখৃষ্টসুলভ দুর্ব্যবহার সচরাচরই মুখোমুখি হতে হয় তাদের যাদেরকে খৃষ্ট ধর্মের শত্রু হিসাবে মনে করা হয়; উদহারন হিসাবে একটি চিঠি, যা ইন্টারনেটে পোষ্ট করা হয়েছিল ব্রায়ান ফ্লেমিং কে উদ্দেশ্য করে, যিনি নীরিশ্বরবাদকে সমর্থন করে চমৎকার হৃদয়স্পর্শী এবং আন্তরিক একটি চলচ্চিত্র The God Who Wasn’t There এর লেখক এবং পরিচালক; ‘Burn while we laugh’ শিরোনামে ব্রায়ান এর উদ্দেশ্যে লেখা এই চিঠিটির সময়কাল ২১ ডিসেম্বর ২০০৫, এবং যার ভাষা ছিল এরকম:

আপনার যে যথেষ্ট পরিমান সাহস আছে সে বিষয়ে আমি নিশ্চিৎ; আমি খুবই চাই একটি ছুরি নিয়ে আপনাদের মত নির্বোধদের নাড়ি ভুড়ি বের করে দেই এবং আনন্দে চিৎকার করি, যখন আপনাদের সামনেই আপনাদের নাড়িভুড়িগুলো বের হয়ে আসতে থাকবে। আপনি সেই পবিত্র যুদ্ধটি শুরু করার চেষ্টা করছেন, যখন কোন একদিন আমি এবং আমার মত অনেকেই উপরে বর্নিত কাজটি করতে আনন্দের সাথে দায়িত্ব নেবে;

চিঠির এই পর্যায়ে লেখক হয়তো দেরিতে হলেও বুঝতে পেরেছিলেন, তার ভাষাটা আদৌ খুব খৃষ্ট সুলভ না, কারন এর পর খানিকটা উদারতার সুরে তিনি উল্লেখ করতে থাকেন,

যদিও ঈশ্বর আমাদের প্রতিশোধ না নেবার, বরং , আপনাদের মত সবার জন্য প্রার্থনা করার জন্যই শিক্ষা দেন;

অবশ্য তার এই দয়াশীলতা খুবই স্বল্পমেয়াদী:

তবে আমি শান্তি পাবো এই জেনে যে, আপনার উপর ঈশ্বর যে শাস্তি আরোপ করবেন, তা আমার দেয়া যে কোন শাস্তির তুলণায় আপনি ১০০০ গুন বেশী যন্ত্রনা ভোগ করবেন; সবচেয়ে ভালো ব্যপারটা হচ্ছে আপনি অনন্তকাল ধরে নরক যন্ত্রণা ভোগ করবেন এই সব পাপের জন্য, যা সম্বন্ধে আপনি সম্পূর্ণ অজ্ঞ; ঈশ্বরের ক্রোধ কোন দয়া প্রদর্শন করেনা; আপনার জন্যই, আমি আশা করি, সত্যটা আপনার কাছে উন্মোচিত হোক, ছুরি আপনার মাংশে স্পর্শ করার আগেই; শুভ বড়দিন!

পুনশ্চ: আপনার মতো মানুষদের আসলে কোন ধারনা নেই কি আপনাদের কপালে আছে, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাই… আমি আপনি না;

আমার কাছে আসলেই ধাধার মত মনে হয়, ধর্মীয় চিন্তাধারার সামান্যতম মতপার্থক্য কি পরিমান বিষাক্ততার জন্ম দিতে পারে; আরো একটি উদহারন দেয়া এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, Freethought today (ফ্রিথট টুডে) শীর্ষক একটি ম্যাগাজিনের সম্পাদকের পোষ্টব্যাগ থেকে যা সংগৃহিত; ফ্রিথট টুডে প্রকাশ করে Freedom from Religion Foundation (FFRF), যারা শান্তিপুর্ণভাবে প্রতিবাদ করে আসছেন, চার্চ ও রাষ্ট্রের মধ্যে সাংবিধানিকভাবে স্বীকৃত পৃথক অবস্থানকে যখন উপেক্ষা করা হচ্ছে;

হ্যালো, পনির খাওয়া জঘন্য ব্যক্তিরা, তোমাদের মত অপদার্থদের তুলনায় আমরা খৃষ্টানদের সংখ্যা বহু বেশী; চার্চ এবং রাষ্ট্রের মধ্যে কোন পৃথকীকরন হবে না এবং তোমরা নরকের কীটরা অবশ্য হার স্বীকার করবে.... ;

পনিরের ব্যপারটা আসলে কি? আমার আমেরিকান বন্ধুরা অবশ্য প্রস্তাব করেছেন, কুখ্যাত ভাবে উদারপন্হী অঙ্গরাজ্য উইসকনসিন সাথে এর একটা সম্পর্ক থাকতে পারে; Freedom from Religion Foundation (FFRF) এর কার্যালয় এবং ডেয়ারী শিল্পর কেন্দ্র হচ্ছে উইসকনসিন; কিন্তু নিশ্চয়ই ব্যাখ্যাটা এত সরল নয়..এবং তাহলে ঐসব ফরাসী পনির খেকো আত্মসমপর্নকারী বানররা তাহলে কি? এখানে পনির এর ভাষায় ব্যবহারে শব্দগত আইকনোগ্রাফীটি কি?

চিঠিটার ভাষায় ফিরে আসা যাক আবার...

শয়তান পুজারী অপদার্থ.... দয়া করে মরো এবং নরকে যাও..... আমি আশা করি যেন মলনালীতে ক্যান্সারের মত খুব কষ্টদায়ক কোন অসুখ হয় এবং ধীরে ধীরে খুব কষ্ট ভোগ করে যেন মৃত্যু হয়, তাহলে আপনি আপনার ঈশ্বর, শয়তানের সাথে দেখা করতে পারবেন...... এই ধর্ম থেকে স্বাধীনতা খুবই খারাপ একটা বিষয়, সুতরাং আপনারা ফ্যাগ (Fag:পুরুষ সমকামী অবজ্ঞাসুচক শব্দ) এবং ডাইকসদের (dykes: নারী সমকামী অবজ্ঞাসুচক শব্দ) বেশী উত্তেজিত হবার কোন কারন নেই বরং চিন্তা করেন কোথায় আপনারা যাচ্ছেন, কারন যখন আপনারা আদৌ খেয়াল করবেন না ঠিক তখনই ঈশ্বর আপনাদের শায়েস্তা করবে, যদি আপনাদের এই দেশ বা এই দেশ যা কিছুর উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেটা ভালো না লাগে, তাহলে আপনার কৃষ্ণাঙ্গ পশ্চাৎদেশটি এখনই থেকে দুর হয়ে যান এই দেশ থেকে;

পুনশ্চ: কমিউনিষ্ট বেশ্যা,আপনার কৃষ্ণাঙ্গ পশ্চাৎদেশটি নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র থেকে দুর হয়ে যান; তোমাদের কোন অজুহাত আর নেই; সৃষ্টি যথেষ্ট প্রমান মহান যীশু খৃষ্টর সর্বময় ক্ষমতার;

কেন আল্লাহ র সর্বময় ক্ষমতা না? বা ব্রহ্মারই বা না কেন? বা এমন কি ইয়াওয়ের?

আমরা নীরবে সরে যাবো না, ভবিষ্যতে যদি সহিংসতার প্রয়োজন হয়, মনে রাখবেন এর জন্য আপনারাই দায়ী; আমার রাইফেলে গুলি ভরা আছে,

কেন ? আমি না ভেবে থাকতে পারছি না, কেন এই ঈশ্বরের এধরনের ভয়ঙ্কর হিংস্রতার সাথে প্রতিরক্ষা প্রয়োজন আছে বলে মনে করা হয়? যে কারোরই তো মনে হবার কথা তিনি নিজেকে সুরক্ষা করার জন্য যথেষ্ট পরিমানে যোগ্য; মনে রাখতে হবে, এই সব কুৎসিত হিংস্র বাক্যর অপমান আর হুমকির নিশানা কিন্তু শান্ত শিষ্ট ভদ্র, চমৎকার একজন তরুনী;

হয়তো আমি আমেরিকায় বসবাস করিনা, আমাকে লেখা বেশীর ভাগ ঘৃনার চিঠির ভাষা পুরোপুরি এই স্তরের না, তবে তারা সেই দয়া প্রদর্শনের সুবিধার কথাও বলেনা, যে দয়াশীলতার জন্য খৃষ্ট ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা বিশেষভাবে সুপরিচিত; মে ২০০৫ এর তারিখ সহ পরের চিঠিটির লেখক একজন বৃটিশ মেডিকেল ডাক্তার; যদিও এটি নি:সন্দেহে ঘৃনা সমৃদ্ধ, তবে পুরোপুরি নোংরা হবার চেয়ে বরং আমার কাছে মনে হয়েছে পত্র লেখকের অন্তর্দ্বন্দের কষ্ট এবং যা তিনি প্রকাশ করেছেন কেমন করে নৈতিকতার পুরো বিষয়টি নীরিশ্বরবাদীতার বিরুদ্ধে সকল সহিংসতার উৎস; শুরুতেই বেশ কিছু অনুচ্ছেদে বিবর্তনকে ব্যবচ্ছেদ করার পর (এবং শ্লেষাত্মকভাবে জিজ্ঞাসা সহ যে তাহলে নিগ্রো কি এখনও বিবর্তনের প্রক্রিয়ায় আছে?), ব্যাক্তিগত পর্যায়ে ডারউইনকে অপমান করে, ভ্রান্তভাবে হাক্সলীকে বিবর্তন বিরোধী হিসাবে উল্লেখ করার পর এবং আমাকে একটি বিশেষ বই পড়ার জন্য উৎসাহ প্রদান করে (যা আমি পড়েছি), যা যুক্তি দেখিয়েছে পৃথিবী মাত্র আট হাজার বছর প্রাচীন (তিনি কি আসলেই চিকিৎসক হতে পারেন?), তিনি পরিশেষে লিখেছিলেন:

আপনার নিজের বইগুলো, অক্সফোর্ডে আপনার সন্মান, যা কিছু আপনি জীবনে ভালোবাসেন, এবং অর্জন করেছেন, সবই ব্যর্থ প্রচেষ্টা ...... কামু'র প্রশ্ন –চ্যালেন্জ এখানে এড়ানো অসম্ভব, কেন আমরা সবাই আত্মহত্যা করি না?
সত্যি, আপনার বিশ্বধারনা ছাত্রদের এবং আরো অনেকের উপর এই ধরনের প্রভাব ফেলে, যে আমরা সবাই বিবর্তিত হয়েছি অন্ধ আপতন বা চান্সের মাধ্যমে, কোন কিছু থেকে না, কোন কিছুতেই প্রত্যাবর্তন করবো না, এমন কি ধর্ম যদি সত্যিও না হয়, তাও উত্তম, অনেক বেশী উত্তম, একটি মহান পুরাণ কাহিনীকে বিশ্বাস করা, প্লেটোর মত, যদি তা কারো মনে শান্তি দিতে পারে আমাদের এই জীবনকালে; কিন্তু আপনার বিশ্ব ধারনা সৃষ্টি করে দুশ্চিন্তা মাদকাসক্তি, হিংস্রতা, নৈরাজ্যবাদ, ভোগবাদীতা, ফ্রাঙ্কেনস্টাইনীয় বিজ্ঞান এবং পৃথিবীতে নরক ও তৃতীয় বিশ্ব যুদ্ধ; আমি

ভাবছি আপনি আপনার ব্যক্তিগত জীবনে কতটা সুখী? তালাকপ্রাপ্ত? বিপত্নীক? সমকামী? আপনাদের মত মানুষরা কখনো সুখী হতে পারেনা; বা তারা খুবই চেষ্টা করে প্রমান করতে কোন সুখ নেই বা কোন কিছুরই কোন অর্থ নেই;

এই চিঠির আবেগ, যদিও এর ভাষা নয়, অন্য অনেক চিঠির মতই বৈশিষ্টমুলক; এই ব্যক্তিটি বিশ্বাস করেন ডারউইনিজম, অন্তর্গতভাবেই এর প্রকৃতিতে নৈরাশ্যবাদী, যা শিক্ষা দেয় আমরা বিবর্তিত হয়েছি অন্ধ চান্স বা আপতনের মাধ্যমে (অসংখ্যবারের মত আবারও বলছি, প্রাকৃতিক নির্বাচন চান্স বা আপতন প্রক্রিয়ার ঠিক বীপরিত) এবং নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে আমরা যখন মারা যাবো; এধরনের অভিযোগকৃত নেবিবাচকতার সরাসরি ফলাফল হিসাবে সব ধরনের অশুভ জিনিস প্রবাহিত হয়; ধরে নেয়া যেতে পারে, তিনি সত্যি বলতে চাননি যে বৈধব্য আমার ডারউইনিজমের সরাসরি ফলাফল হতে পারে; কিন্তু তার চিঠি, এই বিষয়টি ধরে, উন্মত্ত অশুভ কামনার রুপের সেই পর্যায় আমি শনাক্ত করেছি বার বার আমার খৃষ্টীয় পত্র লেখকদের; আমি আমার পুরো একটি বই উৎসর্গ করেছি (Unweaving the Rainbow) সেই জীবনের মুল অর্থ, বিজ্ঞানের কাব্যময়তার প্রতি, এবং যুক্তি খন্ডন করেছি হালকা এবং বিস্তারিতভাবে এই নৈরাশ্যবাদী নেতিবাচকতার অভিযোগটির, সুতরাং এখানে আমি নিজেকে সংযত করছি; এই অধ্যায়টি খারাপ এবং এর বীপরিত, ভালো বিষয় নিয়ে; নৈতিকতা বিষয়ে: কোথা থেকে এটি এসেছে, কেন আমাদের এটিকে সাদরে গ্রহন করা উচিৎ এবং তা করতে কি আমাদের ধর্মের কি কোন প্রয়োজন আছে কিনা;

আমাদের নৈতিকতাবোধের কি কোন ডারউইনীয় উৎস আছে?

বেশ কিছু বই যেমন রবার্ট হিন্ড এর Why Good is Good, মাইকেল শেরমার এর The Science of Good and Evil, রবার্ট বাকমানের Can We Be Good Without God? এবং মার্ক হাউসার এর Moral Minds, যুক্তি দেখিয়েছে যে, আমাদের ভালো ও মন্দ বোঝার ক্ষমতার উৎপত্তি হয়েছে আমাদের ডারউইনীয় অতীতে; এই অংশে আমি সেই যুক্তিগুলোর নিজস্ব সংস্করণ উপস্থাপন করবো:

বাহ্যিক দিক থেকে ডারউইনীয় ধারনাটি, প্রাকৃতিক নির্বাচন দ্বারা পরিচালিত বিবর্তন প্রক্রিয়াকে মনে হয় আমাদের ধারনা করা ভালোত্ব বৈশিষ্টটি বা আমাদের নৈতিকতা, শ্লীলতা, সমমর্মিতা এবং করুনা সংক্রান্ত আমাদের অনুভুতিগুলো ব্যাখ্যা করার অনুপোযুক্ত; প্রাকৃতিক নির্বাচন খুব সহজেই ব্যাখ্যা করতে পারে ক্ষুধা, ভয়, এবং যৌন তাড়না; যেগুলো সরাসরি আমাদের বেচে থাকা এবং আমাদের জীনের সুরক্ষা করার ক্ষেত্রে ভুমিকা পালন করে; কিন্তু সেই হৃদয় নিংড়ানো সহানুভুতির ব্যাখ্যা কি, যা আমরা অনুভব করি যখন কোন এতিম শিশুকে কাদতে , বা বৃদ্ধ বিধবার একাকীত্বের হতাশা বা যন্ত্রনায় কাতরাতে থাকা কোন প্রানীকে দেখে? কোন জিনিসটি বা কি আমাদের তীব্রভাবে তাড়িত করে বেনামে পৃথিবীর অন্যপ্রান্তে ঘটা সুনামীর শিকারদের অর্থ সাহায্য বা কাপড় পাঠাতে যাদের কারোর সাথেই আমাদের কোনদিনও দেখা হবে এবং যারা খুব সম্ভবত কোনদিনও এই সহায়তার কোন প্রতিদানও দিতে পারবে না? আমাদের মধ্যে এই ভালো পরোপকারী বা সামারিটান বৈশিষ্টগুলো কোথা থেকে আসলো? ভালোত্ব এই বৈশিষ্টগুলো কি স্বার্থপর জীন তত্ত্বের সাথে সামন্জষ্যপুর্ণ হওয়ার কথা না, তাই নয় কি? না, এই তত্ত্বটি সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারনাগুলোর মধ্যে এটি সবচে সুপরিচিত, হতাশাব্যঞ্জক (এবং পুর্বধারনা স্বাপেক্ষে পুর্বপ্রত্যাশিত) ভুল ধারনা*; সঠিক শব্দটির উপর জোর দেয়া এখানে প্রয়োজনীয়; সেলফিশ বা স্বার্থপন ’জীন’ শব্দটার উপর জোর দেয়া ঠিক হবে, কারন এটি স্বার্থপর কোন ’জীব’ বা ধরা যাক, প্রজাতি ধারনাটির সাথে পার্থক্য সৃষ্টি করে; আমি বিষয়টি ব্যাখ্যা করছি। *(আমি রীতিমত শঙ্কিত হয়েছিলাম গার্ডিয়ান পত্রিকায় (অ্যানিমাল ইনস্টিঙ্কটস, ২৭ মে ২০০৬) পড়ে যে, কুখ্যাত এনরন কর্পোরেশনের সিইও জেফ স্কিলিং এর প্রিয় বই হচ্ছে দি সেলফিশ জীন এবং এর সোস্যাল ডারউইনিজমের একটি রুপ থেকে তিনি নাকি অনুপ্রাণিত হয়েছেন’; গার্ডিয়ানের সাংবাদিক রিচার্ড কনিফ এই ভুল বোঝাবুঝির একটি ভালো ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন*

(http://money.guardian.co.uk/workweekly/story/0,,1783900,00.html.); আমিও ভবিষ্যতে এধরনের ভুল বোঝার সম্ভাবনাকে প্রতিহত করার জন্য অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় প্রেসের সম্প্রতি The Selfish Gene এর ত্রিশ তম প্রকাশনা বার্ষিকী সংস্করণের ভুমিকায় এ বিষয়ে ব্যাখ্যা দিয়েছি);

ডারউইনবাদের এর যুক্তি বলছে যে একক টি জীবনের হায়ারার্কি বা প্রাধান্যপরম্পরায় টিকে থাকে এবং প্রাকৃতিক নির্বাচনের ছাকুনী অতিক্রম করতে পারে তার স্বার্থপর হবার প্রবণতা থাকারই কথা; এই পৃথিবীতে টিকে থাকবে সেই একক বা ইউনিট গুলো যারা তাদের নিজস্ব স্তরে প্রাধান্যপরম্পরায় অন্যান্য প্রতিদ্বন্দী ইউনিটগুলোর সাথে প্রতিদ্বন্দিতায় সফল হয়েছে; এই প্রাসঙ্গিকতায় স্বার্থপর বলতে ঠিক এটাকেই বোঝায়; এখন প্রশ্ন হলো, এই প্রক্রিয়াটি ঠিক কোন পর্যায়ে বা স্তরে বা লেভেলে ঘটছে? স্বার্থপর জীনের পুরো ধারনাটি – 'জীন শব্দটির উপর যথাযোগ্য গুরুত্ব আরোপ করা সাপেক্ষে' – হচ্ছে যে প্রাকৃতিক নির্বাচনের একক (বা আত্মস্বার্থের একক) কোন স্বার্থপর অর্গানিজম বা জীব নয়, স্বার্থপর কোন গ্রুপ না বা স্বার্থপর প্রজাতি না বা স্বার্থপর কোন ইকোসিস্টেম বা পরিবেশমন্ডল না, বরং স্বার্থপর "জীন"; এবং এই জীনটি, যা তথ্য রুপে, হয় বহু প্রজন্ম ধরে টিকে থাকে, নয়তো না; জীনের মত করে (এবং তর্কসাপেক্ষে মীম) কোন অর্গানিজম বা জীব, গ্রুপ কিংবা প্রজাতি সেই অর্থে একক হিসাবে কাজ করতে পারেনা, কারন তারা তাদের হুবুহু প্রতিলিপি তৈরী করতে পারেনা, এবং এ ধরনের স্বঅনুলিপিকারী সত্বা বা এনটিটিদের পুলে তারা প্রতিদ্বন্দীতাও করতে পারে না; এবং জীনরা ঠিক সেটাই করে এবং সেটাই – মুলতঃ যৌক্তিক – ডারউইনীয় বিশেষ স্বার্থপর অর্থে জীনকে স্বার্থপরতার একক হিসাবে চিহ্নিত করার জন্য বেছে নেবার স্বপক্ষে যৌক্তিকতা;

সবচেয়ে সুস্পষ্ট যে উপায়ে জীনগুলো তাদের নিজস্ব স্বার্থপর বেচে থাকাটা নিশ্চিৎ করে অন্যান্য জীনের সাপেক্ষে তাহলো তাদের বহনকারী কোন একক অর্গানিজমকে স্বার্থপর করে তোলার মাধ্যমে; আসলেই এমন বহু পরিস্থিতি আছে যেখানে কোন একটি অর্গানিজমের টিকে থাকার মাধ্যমে তার বহন করা জীনগুলোকে টিকে থাকতে সহায়তা করে; কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন পরিস্থিতিতে ভিন্ন ভিন্ন কৌশল প্রাধান্য পায়, কিছু পরিস্থিতি আছে –খুব বেশী দুর্লভ নয় – যেখানে জীন তাদের নিজেদের স্বার্থপর টিকে থাকাটা নিশ্চিৎ করে তাদের বহনকারী জীবদের নিঃস্বার্থভাবে, পরোপকারী বা পরার্থে আচরন করানোর মাধ্যমে; এই পরিস্থিতিগুলো সম্বন্ধে আমাদের এখন ভালো ধারনা আছে এবং এদের মুল দুটি ভাগে ভাগ করা যায়: কোন জীন যা কোন অর্গানিজম বা জীবদের একক কোন সদস্যদের প্রোগ্রাম করে তাদের জীনগত আত্মীয় বা জেনেটিক কিন দের সহায়তা করার জন্য পরিসংখ্যাগতভাবে সেই জীন এর অনুলিপি হবার সুবিধা পাবার সম্ভাবনাও বেশী; এই ধরনের জীনের সংখ্যা প্রজাতির জীনপুলে বেড়ে যেতে পারে এমন হারে যে যেখানে জীনগত আত্মীয় বা কিন পরার্থবাদীতা বা অ্যালট্রুইজম খুব স্বাভাবিক হয়ে দাড়াতে পারে; নিজেদের সন্তানদের প্রতি উপকারী হওয়া এর একটি স্পষ্ট উদহারন, কিন্তু এটাই একমাত্র এমন উদহারন নয়; মৌমাছি, ওয়াস্প, পিপড়া, টারমাইট এবং খানিকটা, কিছু নির্দিষ্ট মেরুদন্ডী যেমন ন্যাকেড মোল র‌্যাটস, মীরকাটস এবং অ্যাকর্ণ উডপেকাররা এমন একটি সমাজের বিবর্তন ঘটিয়েছে যেমন বড় ভাইবোনরা তাদের ছোট ভাইবোনদের দেখাশোনা করে (যাদের সাথে তারা তাদের জীনগুলোকে শেয়ার করার সম্ভাবনা থাকে); সাধারণত যা আমার প্রয়াত সহকর্মী ডাবলিউ ডি হ্যামিলটন দেখিয়েছিলেন, প্রানীদের প্রবনতা আছে নিজেদের আত্মীয় বা জীনগত কিনদের দেখাশোনা করার, বিপদ থেকে রক্ষা করার, সম্পদ ভাগাভাগি, বিপদের সতর্ক করার বা কোন না কোন ভাবে নি:স্বার্থ ব্যবহার করার কারন স্পষ্টতই পরিসংখ্যানগতভাবে সম্ভাবনা থাকে তাদের আত্মীয়রা তাদের মত একই জীনের কপি বহন করে;

অ্যালট্রুইজম বা পরার্থবাদিতার অন্য প্রধান প্রকারটি, যার জন্য আমাদের খুব ভালোভাবে ব্যাখ্যা করা ডারউইনীয় যুক্তি আছে, তা হলো পারস্পরিক বা রেসিপ্রকাল পরার্থবাদিতা (তুমি আমার পিঠ চুলকিয়ে দাও আমি তোমার পিঠ চুলকিয়ে দেবো); এই তত্বটি বিবর্তন জীববিজ্ঞানে প্রথম উপস্থাপন করেন রবার্ট ট্রিভারস এবং প্রায়ই এটিকে প্রকাশ করা হয় গেম থিওরীর গানিতীক ভাষায়, এবং এটি শেয়ার করা বা একই জীন ভাগাভাগি করার মত

কোন পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে না; আসলেই এটা একই ভাবে কাজ করে, সম্ভবত আরো ভালোভাবে, পুরোপুরি ভিন্ন প্রজাতিদের মধ্যে, যখন অনেক সময় এদের বলা হয় সিমবায়োসিস বা মিথোজীবিতা; একই নীতি মানুষেরও সকল বানিজ্য এবং আদান প্রদান কর্মকান্ডের ভিত্তি; শিকারীর প্রয়োজন বর্শা আর কুমারের প্রয়োজন মাংশ, চাহিদার এই অসাম্যতা একটা বানিজ্যের ভিত্তি হিসাবে চুক্তি রচনা করে, মৌমাছির দরকার মধু আর ফুলের দরকার পরাগায়ন; ফুল যেহেতু উড়তে পারেনা, তারা নেকটার এর মাধ্যমে মৌমাছিকে অর্থ মুল্য পরিশোধ করে তাদের পাখনার ভাড়া হিসাবে; হানিগাইড নামের পাখি মধু কোথায় খুজে পাওয়া যাবে তা জানে কারন তারা’মৌচাক খুজে বের করে জানে, তবে মৌচাক তারা ভাঙ্গতে পারেনা; কিন্ত হানি ব্যাজার (রাটেল) মৌচাক ভাঙ্গতে পারে, তবে পাখিদের মত তাদের ডানা নেই যে তারা মৌচাক খুজে বের করতে পারবে; হানিগাইডরা রাটেলদের (এবং কখনও মানুষদেরও) মধুর উৎসের দিকে নিয়ে যায় একটি বিশেষ প্রলুদ্ধকর ওড়ার কৌশল ব্যবহার করার মাধ্যমে, যে কৌশল হানিগাইড শুধুমাত্র এই কাজটির জন্যই ব্যবহার করে থাকে; উভয় পক্ষই এই আদান প্রদানের মাধ্যমে সুবিধাপ্রাপ্ত হয়; একটি বড় পাথরের নীচে হয়তো সোনার একটি বড় খন্ড চাপা দেয়া আছে, আর পাথরটা খুবই ভারী যে কারোর একার পক্ষে সেটি সরানো সম্ভব নয়, সে তখন অন্যদের সাহায্য নেয় কাজটা করার জন্য, যদিও এজন্য তাকে ভাগ দিতে হয় সেই সোনার, কারন তা না করলে সে তো কিছুই পাবেনা; জীবজগতে এধরনের পারস্পরিক সাহায্য নির্ভর সম্পর্কর সংখ্যা অগনিত; ষাঢ় এবং অক্সপেকারস, লাল টিউব্যুলার ফুল এবং হামিংবার্ড, গ্রুপার এবং ক্লিনার ওয়ারাসেস, গরু এবং তাদের পেটের অনুজীবরা; পারস্পরিক পরহিতকারী বা পরার্থবাদী সম্পর্ক কাজ করে কারন তাদের নিজস্ব প্রয়োজন এবং এবং সেই প্রয়োজন মেটানোর ক্ষেত্রে এককভাবে তাদের নিজেদের দক্ষতা বা ক্ষমতায় ভিন্নতা বা অসাম্যতা আছে; একারনে এটি বিশেষভাবে কার্যকরী হয় দুটি ভিন্ন প্রজাতির জীবের মধ্যে: যেখানে দুটি প্রজাতির প্রয়োজন বা চাহিদায় অসাম্যতাও অনেক বেশী।

ছবি: কুমির আর প্লোভার (কুমিরের দাত থেকে মাংশর টুকরো ছাড়িয়ে খায় এরা, কুমিরের দাত পরিষ্কার হয় আর পাখিদের খাওয়াও মেলে (সুত্র)

ছবি: হানিব্যাজার বা র‍্যাটেল আর হানিগাইড পাখি (হানিগাইডরা এদের চিনিয়ে দেয় কোথাও মৌচাক আছে, মৌচাক ভাঙ্গার পর মধুর ভাগও তাদের জোটে (সুত্র)

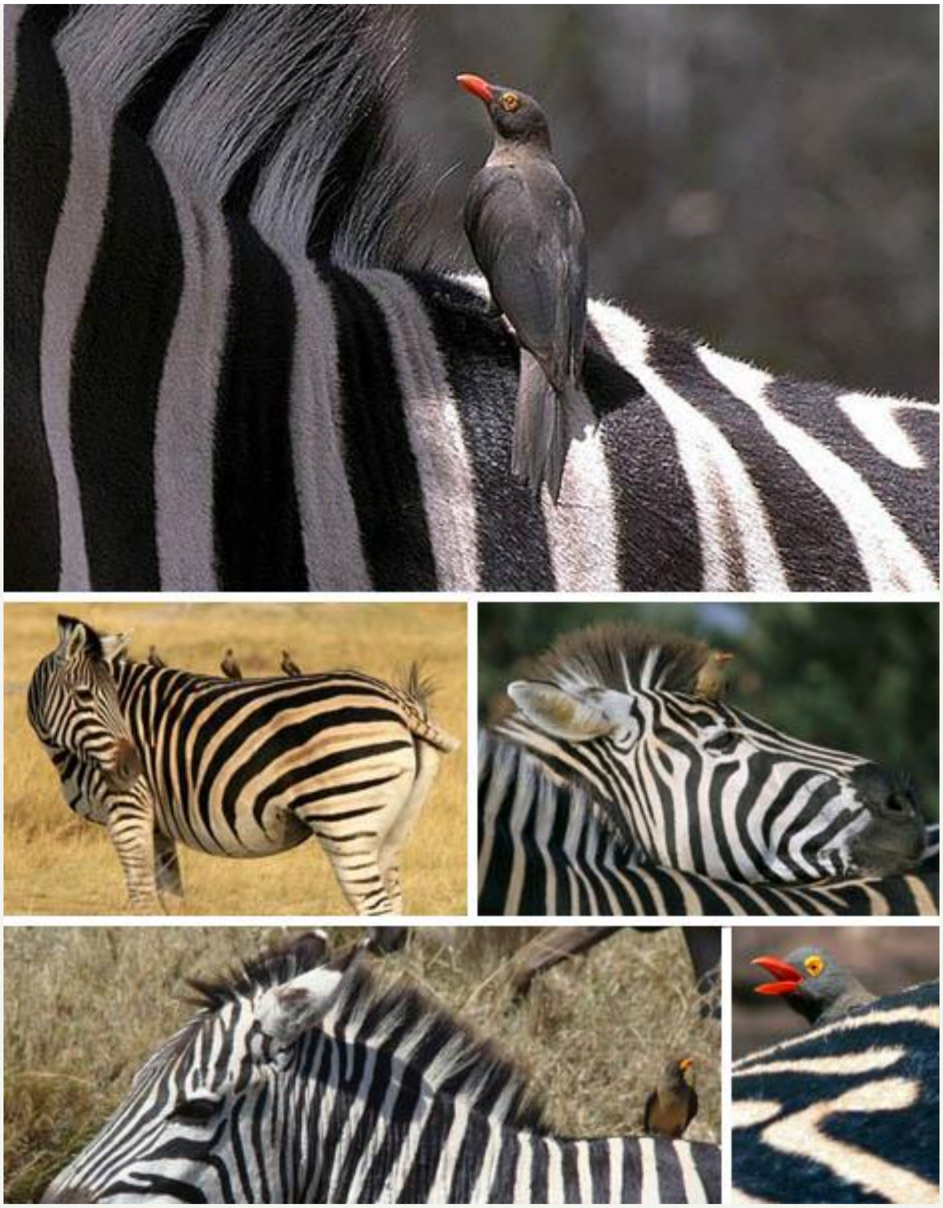

ছবি: অক্সপেকার আর জেবরা; অক্সপেকাররা এদের গা থেকে এরা উকুর, টিক, ছোটখাট কিছু পরজীবি প্রানী খেয়ে পরিষ্কার রাখে (সুত্র)

মানুষের ক্ষেত্রে ঋণপত্র বা আওউ (IOU) এবং অর্থ হচ্ছে সে রকম কিছু উপকরণ যা কোন কিছু আদান প্রদানের ক্ষেত্রে বিলম্ব সৃষ্টি করে; বানিজ্য করছে এমন পক্ষগুলো কিন্তু সাথেই সাথেই তাদের দ্রব্য একে অপরকে হস্তান্তর করছে না কিন্তু তারা ঋণ সে গচ্ছিত রাখতে পারে ভবিষ্যতের জন্য বা এমনকি ঋনটি অন্য বানিজ্যের ক্ষেত্রেও ব্যবহার করতে পারে; আমি যতদুর জানি, মানুষ ছাড়া আর অন্য কোন বন্য প্রানী সরাসরি টাকার অনুরুপ কোন মাধ্যম ব্যবহার করে না; কিন্তু এককভাবে কোন সদস্যর পরিচয় সম্পর্কে স্মৃতি খানিকটা অনানুষ্ঠানিকভাবে সেই একই দায়িত্ব এখানে পালন করে; ভ্যাম্পায়ার ব্যাটরা শিখে নেয় তাদের সামাজিক গ্রুপের কোন সদস্যর উপর নির্ভর করা যেতে পারে, যারা কিনা তাদের ঋণ শোধ করবে (রিগার্জিটেটেড রক্ত বা গিলে ফেলা আংশিক পরিপাক হওয়া রক্ত পুনরায় গলা দিয়ে বের করে আনা) এবং কারা তাদের সাথে প্রতারনা করবে; প্রাকৃতিক নির্বাচন সেই সব জীনগুলোকে টিকে থাকতে সহায়তা করে, যা কোন জীবের একক সদস্যদের, যারা একটি

অপ্রতিসম ভিন্ন ভিন্ন প্রয়োজন ও সুযোগ এর পারস্পরিক সম্পর্কে বজায় রাখছে, তাদের কোন কিছু দান করতে বা দিতে যখন তারা পারে বা সক্ষম হয় এবং যখন তারা তা পারেনা তখন তারা সেই রকমই প্রতিদানের জন্য অন্য সদস্যদের কাছে অনুরোধ করার বা চেয়ে নেবার প্রবনতার কারন হয়; এটি কোন দ্বায়িত্ব ও কর্তব্য মনে রাখা, কোন বিদ্বেষ মনে রাখা, পারস্পরিক আদান প্রদানের সম্পর্কটি নজরদারি করার, এবং যারা নেয় কিন্তু তাদের সময় হলে বিনিময়ে কিছু দেয় না এমন প্রতারকদের শাস্তি দেবার প্রবনাটাকে গড়ে উঠতে সহায়তা করে;

যেহেতু সবসময়ই প্রতারকরা থাকবে এবং পারস্পরিক সহযোগিতার গেম তত্ত্বের এই ধাধা বা কোনানড্রামটির স্থায়ী সমাধানে সব সময় এমন কিছু থাকে যা প্রতারকদের শাস্তির ব্যপারটা নিশ্চিৎ করে; গানিতীক তত্ব দুটি বড় শ্রেনীর স্থায়ী সমাধানের অনুমতি দেয় এ ধরনের ‘গেম’ এর ক্ষেত্রে, সবসময় ‘খারাপ’ হতে হবে, এটি স্থায়ী এই অর্থে যে, যদি সবাই একই কাজ করে তাহলে একজন ভালো কোন সদস্যর একার পক্ষে তার চেয়ে ভালো কিছু করতে পারেনা; কিন্তু এছাড়া আরেকটি সুস্থির সমাধান বা কৌশল হচ্ছে (এখানে সুস্থির অর্থ যখন কোন জনসংখ্যায় এটি একটি নির্দিষ্ট সীমার হার অতিক্রম করবে, এর কোন বিকল্প তার চেয়ে ভালো কিছু করতে পারেনা) ; এই কৌশলটা হলো, প্রথমে সবার সাথে ভালো ভাবে লেনদেন শুরু করা, অন্যদের বিশ্বাস করে কিছু সুযোগ দেয়া, এরপর ভালো কাজের প্রতিদান ভালো কাজের মাধ্যমে শোধ করা, তবে খারাপ কাজের জন্য যথাযথ প্রতিশোধ নেয়া; গেম থিওরীর ভাষায় এই কৌশল (বা একই ধরনে কৌশলগুলোর সমষ্ঠী) এর নানা নাম আছে, যেমন টিট ফর ট্যাট (ইটের বদলে পাটকেল) , সমুচিত পাল্টা জবাব এবং পারস্পরিক দেয়া নেয়া; কিছু কিছু পরিস্থিতিতে এটি বিবর্তনীয়ভাবে স্থিতিশীল এই অর্থে যে, যদি কোন জনসংখ্যায় পারস্পরিক দেয়া নেয়া কারীদের সংখ্যা প্রাধাণ্য বিস্তার করে, যেখানে কোন খারাপ যেমন কেউ নেই এবং একজনও নিঃশর্তভাবে ভালো সদস্য নেই, বেশ ভালো ভাবে কাজ করবে; আরো একটা বেশ জটিল টির ফর ট্যাট এর ভিন্নরুপ আছে,, যা কোন কোন পরিস্থিতিতে আরো ভালো ব্যাখ্যার কাজ করে;

আমি আগেই উল্লেখ করেছি যে, আত্মীয়তা বা কিনশিপ এবং পারস্পরিক দেয়া নেয়ার সম্পর্কটি ডারউইনীয় বিশ্বে আলট্রুইজম বা পরার্থবাদিতার দুটি স্তম্ভ; কিন্তু এছাড়া আরো কিছু কাঠামো এই দুই প্রধান স্তম্ভের উপর ভর করে আছে; বিশেষ করে মানুষের সমাজে, ভাষা এবং কথোপকথন গল্পগুজবের ব্যপকতা যেখানে প্রকট, সেখানে সুনাম খুবই গুরুত্বপুর্ণ; কোন এক ব্যক্তির হয়তো সুখ্যাতি আছে তার দয়াশীলতা ও উদারতার বৈশিষ্টের, অন্য কারো হয়তো কুখ্যাতি আছে অবিশ্বস্ততার জন্য, প্রতারনার জন্য, কোন চুক্তিকে অসন্মান করার জন্য; আবার অন্য কারো হয়তো সুখ্যাতি আছে দয়াশীলতার যখন পারস্পরিক বিশ্বাসর ভিত্তিটা গড়ে উঠে সম্পর্কে, তবে কোন ধরনের প্রতারণার নিষ্ঠুর শাস্তি দিতে যে ইতস্তত বোধ করেনা; পারস্পরিক পরার্থবাদিতার অনাড়ম্বর তত্ত্বটি আশা করছে যে, কোন প্রজাতির সদস্যরা তাদের স্বপ্রজাতির অন্যান্য সদস্যদের এ ধরনের বৈশিষ্ট্যগুলোর প্রতি সৃষ্ট অচেতন একটি প্রতিক্রিয়ার উপর নির্ভর করে তাদের আচরণ নিয়ন্ত্রন করবে; মানুষের সমাজগুলোয় আমরা ভাষার শক্তি যুক্ত করেছি, যে ভাষা কারো সুনাম বা দুর্ণাম ছড়িয়ে দেয়, সাধারন গসিপ বা গালগল্পের আকারে; ধরুন, জনাব এক্স যখন কোন পানশালায় বা পাবে সবাইকে পান করানোর জন্য তার রাউন্ডটা এড়িয়ে গিয়েছিল, সে সময় আপনার সেখানে থাকার দরকার নেই, বা আপনার সরাসরি ক্ষতিগ্রস্থ হবারও দরকার নেই তার আচরণে, কারন আপনি, লতায় পাতায় কিংবা বাতাসে ভেসে আসা নানা গুজবে তার সম্বন্ধে জানতে পারবেন, এক্স খুবই কৃপন বা একটি বিরুপ প্রতিক্রিয়া এই উদহারনে যোগ হতে পারে – যে জনাব ওয়াই হচ্ছে মিথ্যা গল্পবাজ, এক্স সম্বন্ধে এসব কথা ছড়িয়েছে, কারো জন্য তার খ্যাতি খুবই গুরুত্বপুর্ণ এবং শুধমাত্র একজন ভালো রেসিপ্রকেটর বা যে কোন কিছুর পাওয়ার বিনিময়ে কিছু দিতে প্রস্তুত এমন হওয়াটাই যথেষ্ট না উপরন্তু এই দেয়া নেয়ার ব্যাপারে তার সততা সংক্রান্ত একটি সুনামও লালন করার মধ্যে যে একটি ডারউইনীয় টিকে থাকার মুল্যবান বিষয় আছে তা জীববিজ্ঞানীরা স্বীকার করেন; ম্যাট রিডলীর The Origins of Virtue বইটি ডারউইনীয় নৈতিকতাবোধের পুরো ক্ষেত্রটির চমৎকার স্পষ্ট একটি বিবরণ ছাড়াও, এটি বিশেষ দক্ষতার সাথে ব্যাখ্যা করতে পেরেছে, সুনাম বা দুর্নাম বা খ্যাতির বিষয়টি;

ছবি: একজোড়া ক্লিনার ফিশ Labroides dimidiatus , Acanthurus mata কে পরিষ্কার করছে (Credit: Photo by Gerry Allen, Image courtesy of The Swedish Research Council)

রেপুটেশন বা খ্যাতি শুধু মানুষের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়; সম্প্রতি দেখা গেছে এটি প্রানী জগতে পারস্পরিক উপকারীতার অন্যতম একটি ধ্রুপদী উদহারনের ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করা যায়; ক্ষুদ্র ক্লিনার ফিস এবং তাদের খদ্দের বড় মাছের পারস্পরিক মিথোজীবি সম্পর্কে; একটি অসাধারন বুদ্ধিমত্তার পরীক্ষার মাধ্যমে গবেষকরা লক্ষ্য করেছেন যে, একক কোন ক্লিনার ওয়ারাসকে (*Labroides dimidiatus*) যখন কোন সম্ভাব্য খদ্দের লক্ষ্য করে যে সে খুব ভালোভাবে তার কাজটি করছে আর তার অন্য কোন প্রতিদ্বন্দী Labroides dimidiatus, তার কাজে অবহেলা করছে, এদের দুজনের মধ্য থেকে পরিশ্রমী Labroides dimidiatus কে বেছে নেবার প্রবনতা লক্ষ্য করা যায় তাদের খদ্দের বড় মাছগুলোর; R. Bshary and A. S. Grutter, ‘Image scoring and cooperation in a cleaner fishmutualism’, Nature 441, 22 June 2006, 975-8.

নরওয়েজীয় অর্থনীতিবিদ থরস্টেইন ভেবলেন এবং খানিকটা ভিন্নভাবে ইসরায়েলীয় প্রানীবিজ্ঞানী আমোৎজ জাহাবী আরো একটি চমৎকর ধারনা এর সাথে যুক্ত করেছিলেন, পরহিতকর কোন কাজে বা পরার্থে কোন কিছু দেয়া হতে পারে প্রাধান্য বিস্তার বা নিজের শ্রেষ্ঠশীলতা প্রমানের জন্য একটি বিজ্ঞাপন; নৃতত্ত্ববিদদের কাছে এটি পরিচিত Potlatch বা পটল্যাচ Effect হিসাবে, এর নামটি এসেছে একটি সামাজিক প্রথা থেকে, উত্তর পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপবাসী নানা গোত্রগুলোর প্রতিদ্বন্দী গোত্র প্রধানরা একে অপরের সাথে দ্বন্দরত হয় খুবই উদারতার সাথে নিজেদের ধ্বংস করে দেবার মত বিশাল ভোজসভার আয়োজন করার মাধ্যমে; কিছু চরম ক্ষেত্রে এই পাল্টা ভোজ সভা চলতে থাকে যতক্ষন না পর্যন্ত একপক্ষ সর্বস্বান্ত হয়, আর অন্যপক্ষ কিন্তু তারচেয়ে খুব একটা ভালো অবস্থায় থাকে না; ভেবলেন এর ‘conspicuous consumption’ বা দৃষ্টিগ্রাহ্য বা লোকদেখানো ভোগ করার ধারনাটি আধুনিক গবেষনার দৃশ্যপটে অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষন করেছে; জাহাভীর অবদান, যা জীববিজ্ঞানীরা বহুবছর

ধরেই তেমন কোন গুরুত্ব দেননি অতিসাম্প্রতিক কাল অবধি যখন তার প্রস্তাবটির সত্যতা প্রমানিত হয়েছে তাত্ত্বিক অ্যালান গ্রাফেন এর অসাধারন গানিতীক মডেল এর মাধ্যমে, যা আমাদের potlatch idea র একটি বিবর্তনীয় সংস্করণ প্রদান করেছে। জাহাভীর গবেষনার বিষয় ছিল অ্যারাবিয়ান ব্যবলার, ছোট বাদামী পাখি যারা সমাজবদ্ধ গোষ্ঠী হিসাবে বসবাস করে এবং পারস্পরিক সহযোগিতা ও সমবায়ের মাধ্যমে প্রজনন, বংশবিস্তার ও প্রজন্ম প্রতিপালন করে; অন্য অনেক ছোট পাখিদের মতই ব্যাবলাররা বিপদের হুশিয়ারী সংকেত হিসাবে চিৎকার করে অন্যদের সতর্ক করে এবং তারা একে অন্যকে খাবারও দান করে; এ ধরনের পরার্থে বা পরোপকারিতার লক্ষ্যে করা কোন কাজকে একটি মানসম্পন্ন ডারউইনীয় নীরিক্ষা যদি পর্যালোচনা করতে হয়, তাহলে দেখা উচিৎ প্রথমত, পাখিদের মধ্যে পারস্পরিক আদান প্রদান ও জীনগত আত্মীয়তার সম্পর্কটিকে, যখন কোন ব্যাবলার তার সঙ্গীকে তার নিজের সংগ্রহ করা খাদ্য খাওয়ায়, তার কারনটি এই আশায় যে ভবিষ্যতে তাকেও কোনদিন একইভাবে এভাবে খাদ্য খাওয়ানো হবে? নাকি যারা এই সাহায্য পাচ্ছে তাদের সাথে সাহায্য দাতার আছে কোন নিকটবর্তী জীনগত সম্পর্ক? বা তারা জীনগত আত্মীয়? এবিষয়ে জাহাবীর ব্যাখ্যাটি ছিল ভীষন ভাবে অপ্রত্যাশিত; প্রধান বা প্রাধান্য বিস্তারকারী ব্যবলাররা সামাজিক অবস্থানে তাদের প্রাধান্যটাকে দৃঢ় করে তাদের অধীনস্থদের খাওয়ানোর মাধ্যমে, জাহাবীর প্রিয় 'মানুষের ভাষায়' এই্ আচরণকে নরাত্বরোপ করলে বলা যায়, প্রধান পাখিটি হয়তো সমতুল্য এধরনের কিছু বলে, দেখো, 'আমি তোমার চেয়ে কত শ্রেষ্ঠ, আমি তোমাকে খাওয়া দান করতে পারি' বা 'আমি তোমার চেয়ে কত শ্রেষ্ঠ, আমি উচু ডালে বনে বাজপাখীর সামনে নিজের জীবনের ঝুকি নিয়ে পাহারাদারের মতো মাটিতে খেতে থাকা তোমাদের দলকে সতর্ক করতে পারি'; জাহাবী ও তার সহকর্মীদের পর্যবেক্ষন প্রস্তাব করছে যে, ব্যবলাররা নিজেদের মধ্যে সক্রিয়ভাবে প্রতিযোগিতা করে, কে ঝুকিপুর্ণ এই পাহারাদারের কাজটি করবে; এবং যখনই কোন অধীনস্থ কেউ প্রাধান্য বিস্তারকারী কোন ব্যবলারকে খাদ্য দান করার চেষ্টা করে, আপাতদৃষ্টিতে তার এই দানশীলতাকে হিংস্রভাবে প্রত্যাখান করা হয়; জাহাভীর ধারনার মুল বিষয়টি হলো, শ্রেষ্ঠত্ব প্রমান বা প্রদর্শনের এই বিজ্ঞাপন সত্যায়িত হয় এর জন্য পরিশোধিত মুল্যে মাধ্যমে, শুধুমাত্র একজন সত্যিকারের শ্রেষ্ঠ সদস্যই পারে সেই সত্যের বিজ্ঞাপন করতে কোন মুল্যবান উপহার দান করার মাধ্যমে; প্রজাতির সদস্যরা সাফল্য কেনে, যেমন, প্রজনন সঙ্গী আকর্ষন করতে, শ্রেষ্ঠত্ব প্রমানের ব্যয়সাপেক্ষ প্রদর্শনীর মাধ্যমে, যার মধ্যে আছে সুস্পষ্টভাবে অতিমাত্রায় প্রদর্শন করা দানশীলতা এবং প্রকাশ্যে সবাইকে দেখিয়ে করে ঝুকি নেয়ার মাধ্যমে;

তাহলে আমাদের কাছে এখন চারটি জোরালো ডারউইনীয় কারন আছে, কেন প্রজাতির কোন সদস্য পরোপকারী, অন্যান্য সদস্যদের প্রতি দয়াশীল ও দানশীল হয় ও নৈতিক আচরণ প্রদর্শন করে, তা ব্যাখ্যা করার জন্য; প্রথম, জীনগত আত্মীয়তা বা কিনশীপের একটি বিশেষ ব্যাপারতো আছেই; দ্বিতীয়, রেসিপ্রোকেশন, বা কোন কিছু পাওয়ার বিনিময়ে কিছু দেয়া, পারস্পরিক আদার প্রদান: কোন উপকারের প্রতিদান দেয়া এবং ভবিষ্যতে প্রতিদান পাওয়ার সম্ভাবনার কথা মনে রেখেই উপকার করতে সচেষ্ট হওয়া; এখান থেকে শুরু করে আসছে তৃতীয় কারনটি: দয়াশীলতার ও দানশীলতার সুনাম অর্জন করার বিশেষ ডারউইনীয় সুবিধা, চতুর্থত, যদি জাহাভীর ধারনা সঠিক হয়, এই বিশেষ প্রদর্শন মুলক বা সবাইকে দেখানো দানশীলতা বা দয়াশীলতার বাড়তি সুবিধা হচ্ছে একেবারে খাটি অনুকরণযোগ্য নয় এমন বিজ্ঞাপন ক্রয় করা;

আমাদের প্রাগৈতিহাসিক সময়ের বিশাল একট অংশ জুড়ে, মানুষ এমন পরিস্থিতিতে বসবাস করেছে যা খুব দৃঢ়ভাবে এই চার ধরনেরই পরার্থবাদীতার বিবর্তনে সহায়তা করেছে; আমরা গ্রামে বসবাস করতাম বা তার আরো আগে বেবুনদের মত আলাদা আলাদা যাযাবর দল হিসাবে, যারা পার্শ্ববর্তী কোন দল বা গ্রাম থেকে আংশিকভাবে বিচ্ছিন্ন ছিল; তখন দলের সদস্যদের বেশীরভাগই হয়তো পরস্পরের নিকটাত্মীয়; পার্শ্ববর্তী কোন আলাদা দলের সদস্যদের চেয়ে, নিজ দলের সদস্যদের সাথে সেই দলের যে কোন সদস্য অবশ্যই বেশী ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত ছিল –আর এ ধরনের পরিস্থিতিতে কিন বা আত্মীয়দের প্রতি পরোপকারিতা বা পরার্থবাদীতা বিবর্তনের প্রচুর সুযোগও ছিল; এবং আত্মীয় হোক বা না হোক, সেই দলের যে কোন সদস্য দলের অন্য একজন সদস্যকে বার বার বহুবারই, সারাজীবন ধরেই সাক্ষাৎ করবেন – পারস্পরিক পরার্থবাদীতা বা রেসিপ্রকাল অ্যালট্রুইজিম বিবর্তন হবার জন্য যা

অত্যন্ত আদর্শ একটি পরিস্থিতি; এবং এই পরিস্থিতিগুলো অবশ্যই পরোপকারিতার সুনাম গড়ে তোলার জন্যও আদর্শ পরিস্থিতি; এবং এটা অবশ্যই একই ভাবে সেরকমই একটি আদর্শ পরিস্থিতি যেখানে সবার দৃষ্টি আকর্ষন করা বা প্রদর্শন করার মত দয়াশীলতা ও উদারতা বিজ্ঞাপন করার জন্য; এই চারটি উপায়ের যে কোন একটি কিংবা সবগুলো উপায়ে পরার্থবাদীতার প্রতি আদি মানুষের জীনগত প্রবনতা বিশেষ সহায়তা পেয়েছিল প্রাকৃতিক নির্বাচনের ছাকুনীতে; খুব সহজেই বোঝা যায়, কেন আমাদের প্রাগৈতিহাসিক পুর্বপুরুষরা তাদের নিজেদের গ্রুপের সদস্যদের প্রতি সদয় এবং উপকারী ছিল তাদের আচরনে কিন্তু প্রায় জেনোফোবিয়া (ভীনদেশীদের প্রতি অহেতুক ভয় বা সন্দেহ প্রবণতা) মতই ভিন্ন গ্রুপদের প্রতি অবিশ্বাস আর সন্দেহপুর্ণ ছিল তাদের আচরণ; কিন্তু কেন – এখন যখন আমরা বেশীর ভাগ মানুষ বড় শহরগুলোতে বাস করি, যেখানে চারপাশে আমরা আমাদের নিজেদের আত্মীয় দ্বারা আর পরিবেষ্টিত নেই, এবং যেখানে প্রতিদিন আমাদের বহু বিভিন্ন মানুষের সাথে দেখা হয়; যাদের সাথে আর কখনোই আমাদের আর দেখা হবে না; তাহলে কেন আমরা একে অপরের সাথে ভালো আচরণ করি, এমনকি কখনো এমন কারো সাথে যাকে ভাবা যেতে পারে আমাদের গ্রুপের বহিরাগত?

প্রাকৃতিক নির্বাচনের নাগাল সম্বন্ধে ভুল কথা না বলা খুব জরুরী; নির্বাচন আপনার জীনের জন্য কি ভালো সে বিষয়ে কগনিটিভ বা অবধারনগত সচেতনতা বিবর্তনে কোন সহায়তা করেনি; সেই সচেতনাকেকগনিটিভ পর্যায় পর্যন্ত পৌছাতে করতে হয়েছে অপেক্ষা বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত এবং এখনও পুরো বিষয়টি সম্বন্ধে জ্ঞান সীমাবদ্ধ আছে অল্প কিছু বৈজ্ঞানিক বিশেষজ্ঞদের কাছেই; প্রাকৃতিক নির্বাচন যেটিকে গড়ে উঠতে এবং টিকে থাকতে সহায়তা করে সেটি হলো একটি রুলস অব থাম্ব বা গড়পড়তা একটি নিয়ম, যা আসলে কাজ করে সেই সব জীনগুলোকে প্রোমোট করার মাধ্যমে যারা তাদের বা সেই নিয়মগুলোকেই তৈরী করে; কিন্তু তাদের বৈশিষ্টগত কারনেই এই সব ‘রুলস অব থাম্ব’ মাঝে মাঝে ভুল করে বসে; যেমন পাখিদের মস্তিষ্কে, সেই নিয়ম বা রুল অব থাম্ব, ”তোমার বাসায় চিৎকার করা ছোট ছোট জীবগুলোকে ভালো করে দেখা শুনা করতে হবে এবং তাদের হা করা লাল মুখের গর্তে খাওয়া ফেলতে হবে”, এটির বৈশিষ্টসুচকভাবে প্রভাব পড়ছে সেই সব জীনগুলোকে রক্ষা করার মাধ্যমে যারা এই রুলটি তৈরী করেছে, কারন কোন পুর্নবয়স্ক পাখির নীড়ে এই চিৎকার করতে থাকা ও হা করে থাকা লাল গর্তসহ জিনিসগুলো সাধারনত তার নিজের সন্তান, এই রুলটি মিসফায়ার বা ভুল করে বসে, যখন অন্য কোন পাখির বাচ্চা কোনভাবে এই নীড়ে ঢুকে পড়ে (যেমন ব্রুড প্যারাসাইট কিছু পাখির ক্ষেত্রে), এরকম একটি পরিস্থিতি তৈরী করে তাদের নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করে কোকিলরা; তাহলে আমাদের এই ভালো মানুষী পরোপকার করার প্রবণতাটি কি এরকমই কোন মিসফায়ারিং হতে পারে, যা রীড ওয়ার্বলার মাতাপিতাসুলভ সহজাত প্রবৃত্তির মিসফায়ারিং এর অনুরুপ, যখন এই প্রবৃত্তির তাড়নায় এই পাখিগুলো অমানুষিক প্ররিশ্রম করে না জেনেই কোকিলের বাচ্চাকে পেলে পুষে বড় করে? কিংবা আরো একটি নিকটবর্তী অনুরুপ দৃষ্টান্ত হতে পারে কোন শিশুকে দত্তক নেবার ব্যপারে মানুষদের নিজস্ব সেই তাড়নাটি; অতিসত্বর আমাকে অবশ্যই এখানে যোগ করতে হবে যে এই ‘মিসফায়ারিং’ বিষয়টির অবতারনার উদ্দেশ্য শুধুমাত্র ডারউইনীয় অর্থে; কোন নিন্দাসুচক অর্থে এটি ব্যবহার করা হচ্ছে না;

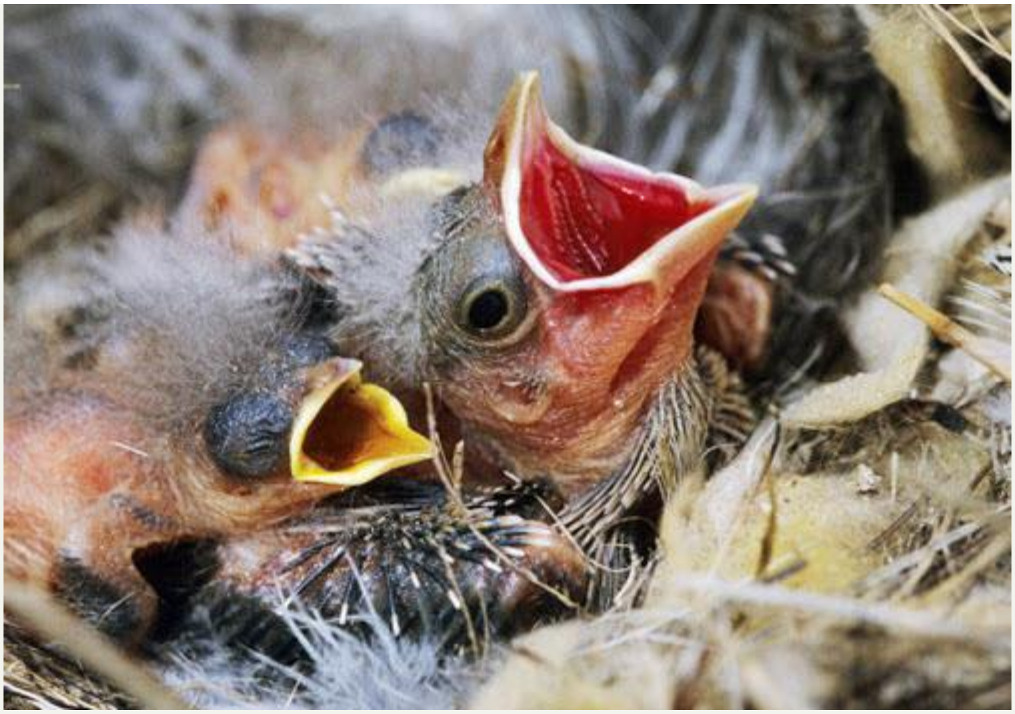

ছবি: কাউ বার্ডের ছানা (ডানে), বোঝাই যাচ্ছে পালক রেন পাখির ছানাদের এরা খাওয়া পাবার প্রতিযোগিতায় টিকতেই দেবে না (সূত্র: cowbird and wren nestlings© Rolf Nussbaumer/imagebroker.net/NOVA)

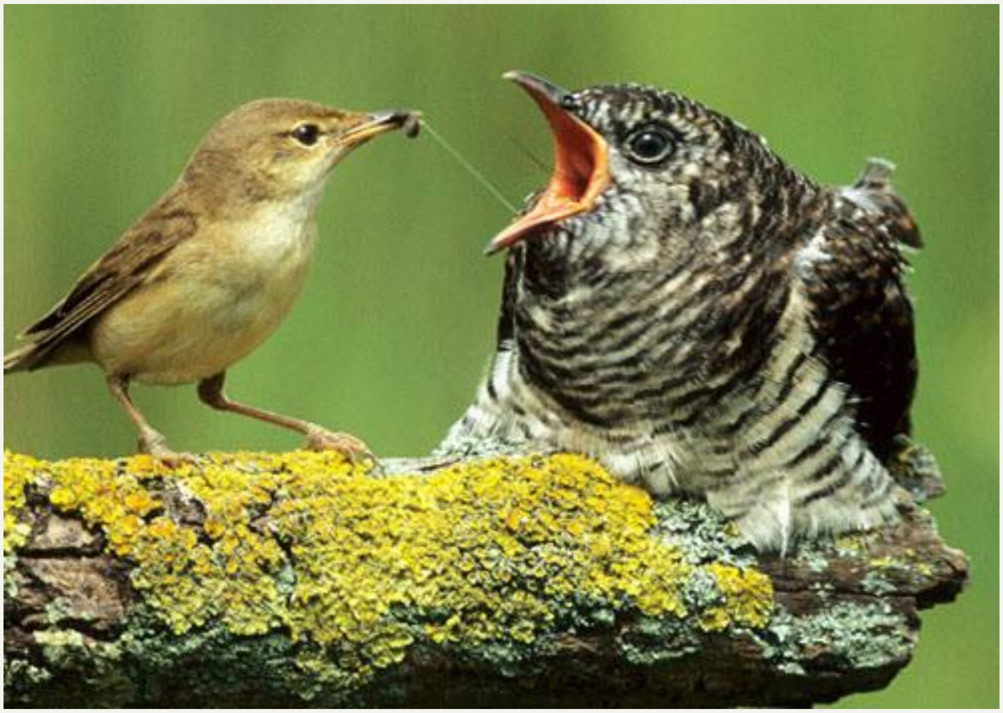

ছবি: সাইজ দেখে ভুল ভাববেন না, রেন (Wren) (বায়ে), ডান দিকে কোকিল ছানাটার কিন্তু পালক মা, দেখেন কেমন আদর করে খাওয়াচ্ছে (সূত্র : wren and cuckoo © Bildagentur/TIPS Italia/NOVA)

এই ’ভুল’ বা উপজাত বা ’বাইপ্রোডাক্ট’ ধারনা যা আমি সমর্থন করছি, এভাবেই কাজ করে; পুর্বসুরীদের সেই আদি কালে, যখন আমরা বেবুনদের মত ক্ষুদ্র কিন্তু স্থিতিশীল গ্রুপ বা গোষ্ঠী হিসাবে বসবাস করতাম, প্রাকৃতিক নির্বাচন আমাদের মস্তিষ্কে পরোপকারিতা বা পরার্থবাদীতার তাড়নাকে প্রোগ্রাম করেছিল, অন্যান্য আরো প্রয়োজনীয় তাড়নাদের সাথে, যেমন যৌন কামনা, ক্ষুধা, ভীনদেশীদের প্রতি সন্দেহপ্রবণতা ইত্যাদি সহ আরো অনেক তাড়না; একটি বুদ্ধিমান দম্পতি, তারা ডারউইন পড়তে থাকতে পারেন এবং তারা হয়তো জানেন, তাদের যৌনতাড়নার মুল কারনটি হচ্ছে পরবর্তী প্রজন্ম সৃষ্টি করা, তারা এটাও জানেন নারীটি গর্ভধারন করতে পারবে না কারন সে জন্মনিয়ন্ত্রন পিল খাচ্ছে, তারপরও তারা আবিষ্কার করেন তাদের যৌন ইচ্ছাগুলো সেটা জানার কারনে কোন অংশেই কমে যাচ্ছে না; যৌন কামনা হচ্ছে যৌন কামনা এবং এর শক্তি, কোন একটি ব্যক্তির মনস্তাত্ত্বিক স্তরে, সেই মুল ডারউইনীয় চাপ যা এটি পরিচালিত করে, তার থেকে স্বাধীন; এটি একটি তীব্র শক্তিশালী তাড়না যা তার মুল যৌক্তিক কারন ছাড়াই স্বাধীনভাবে অস্তিত্বশীল হতে পারে।

আমি প্রস্তাব করছি দয়াশীলতার তাড়না বা কারো প্রতি দয়াশীল হবার প্রবৃত্তিটাও একই ভাবে সত্য – পরার্থবাদীতা, বা পরোপকার করার তাড়না, উদারতা, সহমর্মিতা প্রকাশ করা, করুণা করা ইত্যাদিও; পুর্বসুরীদের সেই অতীতে, আমাদের সুযোগ ছিল শুধু কাছের আত্মীয় বা সম্ভাব্য যারা আমাদের দানের প্রতিদান দিতে পারবে শুধু তাদের প্রতি পরোপকারী মনোভাবাপন্ন হবার; কিন্তু পরবর্তীতে কিংবা এই বিধিনিষেধ আর নেই, তবে সেই গড়পড়তা নিয়মটি টিকে আছে; আর কেনইবা তা থাকবে না? এটিও ঠিক যৌন তাড়নার মতই, আমরা আমাদের অন্য লিঙ্গের সদস্যদের প্রতি যৌন কামনার উদ্রেক হওয়া থেকে যতটুকু নিজেদের রক্ষা করতে পারি (সে অনুর্বর বা বন্ধ্য হতে পারে, অথবা অন্য কোন কারনে প্রজননে অক্ষমও হতে পারে) , কোন ক্রন্দনরত দুর্ভাগার প্রতি করুনার উদ্রেক হওয়া থেকে তারচেয়ে বেশী কোনভাবে আমরা নিজেদের রক্ষা করতে পারিনা (যার সাথে আমাদের কোন সম্পর্কই নেই এবং আমাদের দানের প্রতিদান দেবার কোন সম্ভাবনাও নেই যখন তাদের) ; এই দুটোই মিসফায়ারিং; ডারউইনীয় ভুল: আশীর্বাদপুষ্ট, কাঙ্খিত মহামুল্যবান সেই ভ্রান্তি; একমুহুর্তের জন্য দয়া করে চিন্তা করবেন না এধরনের ডারউইনীয় বিবরণ বা ব্যাখ্যা সহমর্মিতা এবং উদারতার মত মহান অনুভুতি আর আবেগকে মর্যাদাহীন করছে বা লঘু করছে; যৌনকামনাকেও না; যৌনকামনা যখন ভাষাগত সংস্কৃতির মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়, সেটি প্রকাশ পায় অসাধারন কবিতা আর নাটকের মাধ্যমে, জন ডানের প্রেমের কবিতা, কিংবা রোমিও অ্যান্ড জুলিয়েট; এবং অবশ্যই একই ঘটনা করে মিসফায়ার হওয়া আত্মীয় প্রতি পরার্থবাদীতা বা দান প্রতিদান নির্ভর সহমর্মিতার ক্ষেত্রে; ঋনগ্রস্থ কারোর প্রতি দয়া, যখন মুল প্রাসঙ্গিকতার বাইরে দেখা হয়, অন্যকারো শিশু দত্তক নেবার মতই সেটাকেও অ–ডারউইনীয় মনে হয়; (দি মার্চেন্ট অব ভেনিস এ যেমন পোর্শিয়া উষ্চারণ করে)

The quality of mercy is not strained.
It droppeth as the gentle rain from heaven
Upon the place beneath.

(কিন্তু দয়ার গুনাবলী অক্ষুন্ন থাকে, শান্ত বৃষ্টির ধারার মতই এটি স্বর্গ থেকে মর্তে নেমে আসে;

যৌন কামনা মানবিক উষ্চাশা আর সংগ্রামের একটি সিংহভাগ অংশের চালিকা শক্তি এবং এর বেশীর ভাগ অংশই মুলত মিসফায়ারিং (যা জন্য এটি বিবর্তিত হয়নি) ; একই ভাবে উদার এবং সহমর্মি হতে চাইবার কামনার ক্ষেত্রে সত্যি না হবারও কোন কারনই নেই; যদি এটি আমাদের পুর্বসুরীদের গ্রামীন জীবনের মিসফায়ার থেকে সৃষ্ট ফলাফল হয়ে থাকে; আমাদের পুর্বসুরীদের সেই অতীতে এই দুই ধরনের কামনার তাড়না গড়ে তুলতে প্রাকৃতিক নির্বাচনের জন্য সবচেয়ে ভালো উপায় হচ্ছে আমাদের মস্তিষ্কের মধ্যে একটি ধরা বাধা নিয়ম বা রুল অব থাম্ব গেথে দেয়া, আর সেই নিয়মগুলো এখনও আমাদের প্রভাবিত করে চলছে, এমন কি যখন অবস্থা বা পরিস্থিতি তাদের মুল কাজগুলোর জন্য যখন অপ্রযোজ্য হয়ে গেছে;

এই সব রুল অব থাম্ব বা ধরা বাধা নিয়মগুলো এখনও আমাদের প্রভাবিত করছে; তবে ক্যালিভীনিয় ডিটারমিনিষ্টিক উপায়ে না, বরং সামাজিক প্রথা এবং সাহিত্যে, আইন এবং ঐতিহ্যগত নানা প্রথার সভ্যতা সৃষ্টিকারী প্রভাবের ছাকুনীর মধ্য দিয়ে – এবং অবশ্যই ধর্ম; ঠিক যেমন করে আদিম মস্তিষ্কের যৌন কামনার আইনটি সভ্যতার ছাকুনি দিয়ে অতিক্রম করে রোমিও ও জুলিয়েট এর ভালোবাসার দৃশ্যে আবির্ভুত হয়েছে, একই ভাবে আদিম মস্তিষ্কের সেই আমরা বনাম অন্যরা সংক্রান্ত ভেনদেত্তা বা পুর্বপুরুষদের প্রতিহিংসারও পুনরাবির্ভাব ঘটে ক্যাপুলেট ও মন্টেগুদের চলমান যুদ্ধ রুপে; যখন আদিম মস্তিষ্কের সেই পরার্থবাদীতা এবং সহমর্মিতার নিয়মের মিসফায়ার ঘটে,আমাদের তা আনন্দিত করে শেক্সপিয়ারের শেষ দৃশ্যে বিশুদ্ধ পুনমিত্রতা দেখে;

রিচার্ড ডকিন্স এর দি গড ডিলুশন : ষষ্ঠ অধ্যায় (দ্বিতীয় পর্ব)

By K M Hassan

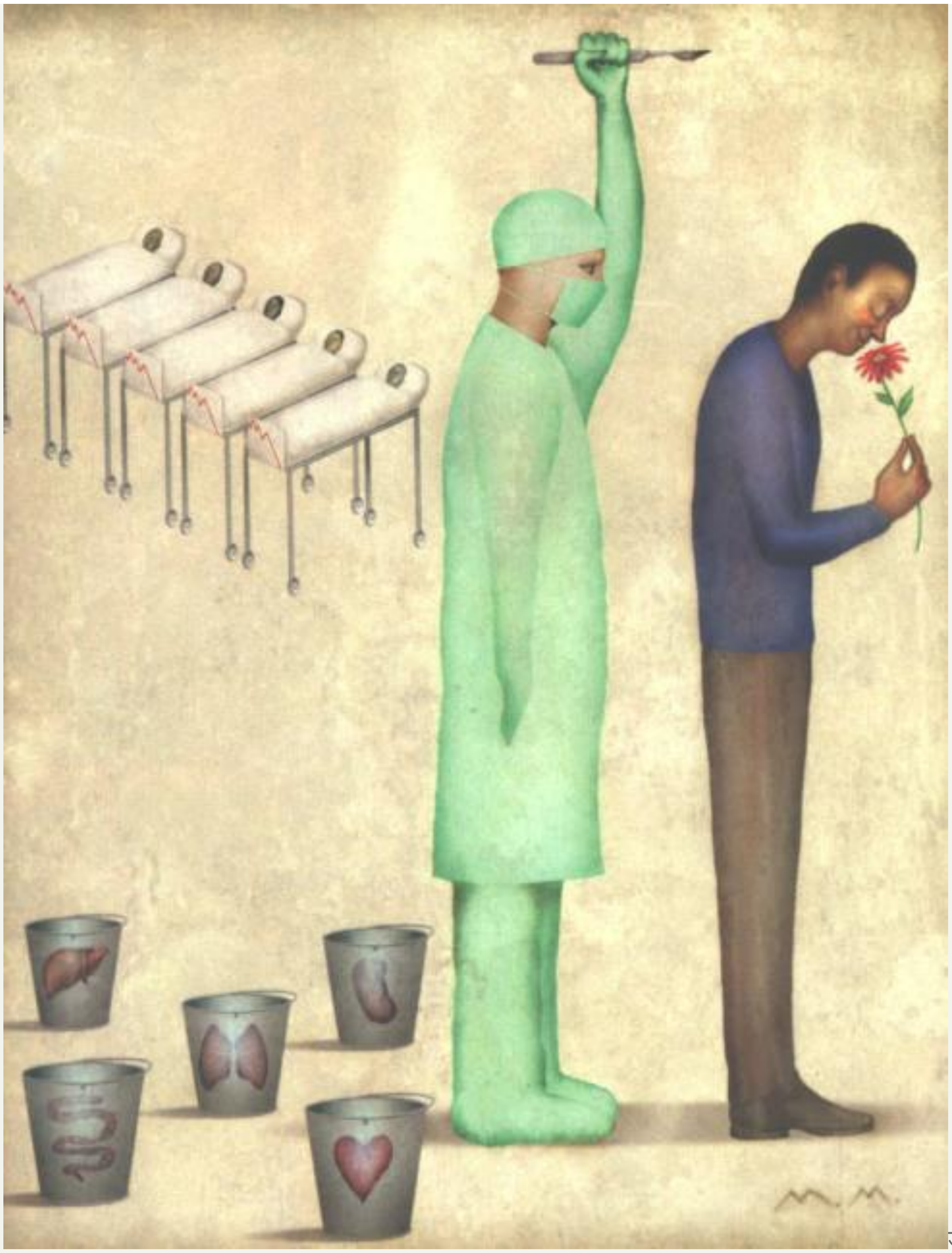

আপনি কি একটি মানুষকে খুন করবেন, যদি তার শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলো পাচ জন মুমূর্ষ রোগীর জীবন বাচায়? (ছবি: ম্যাট মাহুরিনের ইলাসট্রেশন, ডিসকভার, জুলাই/আগষ্ট ২০১১)

রিচার্ড ডকিন্স এর দি গড ডিল্যুশন : ষষ্ঠ অধ্যায় (দ্বিতীয় পর্ব)

(অনুবাদ প্রচেষ্টা: কাজী মাহবুব হাসান)
The God Delusion by Richard Dawkins

প্রথম অধ্যায়
দ্বিতীয় অধ্যায়

তৃতীয় অধ্যায়
চতুর্থ অধ্যায় (প্রথম পর্ব) , চতুর্থ অধ্যায় (দ্বিতীয় পর্ব) ,
চতুর্থ অধ্যায় (তৃতীয় পর্ব) , চতুর্থ অধ্যায় (চতুর্থ পর্ব) , চতুর্থ অধ্যায় (শেষ পর্ব)
পঞ্চম অধ্যায় (প্রথম পর্ব), পঞ্চম অধ্যায় (দ্বিতীয় পর্ব) , পঞ্চম অধ্যায় (তৃতীয় পর্ব)
পঞ্চম অধ্যায় (চতুর্থ পর্ব) , পঞ্চম অধ্যায় (পঞ্চম পর্ব) ,পঞ্চম অধ্যায় (ষষ্ঠ পর্ব)
ষষ্ঠ অধ্যায় (প্রথম পর্ব)

এই পর্বের সাথে একটি সম্পুরক লেখা পড়তে পারেন : নৈতিকতার স্নায়ুবৈজ্ঞানিক উৎসের সন্ধানে

নৈতিকতার শিকড়: কেন আমরা ভালো?

নৈতিকতার শিকড় সংক্রান্ত একটি কেস স্টাডি:

যদি আমাদের নৈতিকতাবোধ, যৌন কামনার মত, আসলেই আমাদের ডারউইনীয় অতীতের গভীরে প্রোথিত হয়ে থাকে, যা কিনা ধর্মের উৎপত্তিরও বহু আগে, যে মানুষের মনের উপর কোন গবেষনায় আমাদের তাহলে আশা করা উচিৎ যে এমন কিছু মোরাল ইউনিভার্সাল বা নৈতিকভাবে কিছু ধ্রুব বিষয়গুলো লক্ষ্য করা যাবে যা কিনা সকল ভৌগলিক ও সাংস্কৃতিক এবং গুরুত্বপুর্ণভাবে ধর্মীয় পরিমন্ডলেও স্থির থাকবে; হার্ভার্ড এর জীববিজ্ঞানী মার্ক হাউসার, তার বই Moral Minds: How Nature Designed our Universal Sense of Right and Wrong এ একটি গুরুত্বপুর্ণ চিন্তার সুত্রকে বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করেছেন, চিন্তার পরীক্ষা বা থট এক্সপেরিমেন্ট এর উপযোগী মাধ্যমে, যা মুলত প্রস্তাব করেছিলেন নৈতিকতাবাদের বা মোরাল দার্শনিকরা; হাউসারের গবেষনা আরো একটি বাড়তি উদ্দেশ্য পুরন করে, তাহলো মোরাল দার্শনিকরা কিভাবে চিন্তা করেন এটি সেটির একটি ভুমিকা দেয়; একটি কাল্পনিক বা হাইপোথেটিকালী নৈতিক দ্বন্দ বা উভয় সঙ্কটময় পরিস্থিতি উপস্থাপন করা হয় এবং সেই অবস্থার প্রশ্নগুলোর উত্তর দেবার ক্ষেত্রে আমরা যে সমস্যার সন্মুখীন হই, সেটি আমাদের ভালো মন্দ বোঝার বোধ সম্বন্ধে কিছু ধারনা দেয়; যেখানে হাউসার দার্শনিকদের থেকে আরো বেশ খানিকটা এগিয়ে যান, তিনি মানুষের নৈতিকতাবোধ পরীক্ষা করার জন্য আসলেই পরিসংখ্যানগত সার্ভে এবং মনস্তাত্বিক পরীক্ষা পরিচালনা করেন, যেমন, ইন্টারনেটে করা প্রশ্নের মাধ্যমে আসল মানুষের নৈতিকতা বোধ নিয়ে গবেষনা করেন; বর্তমান আলোচনার দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী, সবচেয়ে কৌতুহলোদ্দীপক ব্যপারটা হচ্ছে বেশীর ভাগ মানুষই একই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যখন এই সব উভয় সঙ্কটময় পরিস্থিতির মুখোমুখি তাদের করা হয়, এবং তারা তাদের নেয়া সিদ্ধান্তগুলোর মধ্যে সদৃশ্যতার সম্পর্ক তাদের সেই সিদ্ধান্তের পৌছানোর নেপথ্যে কারনগুলো ব্যাখ্যা করার ক্ষমতার অনেক বেশী শক্তিশালী এবং সেটাই আমরা আশা করতে পারি যদি আমাদের নৈতিকতা বোধ আমাদের মস্তিষ্কের ভিতর আগে থেকেই প্রোগ্রাম করা বা দৃঢ়ভাবে গাথা থাকে, যেমন আমাদের সহজাত যৌনপ্রবৃত্তি বা আমাদের উচ্চতা সংক্রান্ত ভীতি বা হাউসারর নিজে যেভাবে বলতে শ্রেয় মনে করেন, আমাদের ভাষা ব্যবহারে দক্ষতা (খুটিনাটি বিষয়গুলো সংস্কৃতি স্বাপেক্ষে ভিন্ন হতে পারে, কিন্তু এর গভীরে মুল ব্যকরনের সুত্রগুলো সর্বজনীন) ; আমরা পরে যা দেখবো, মানুষরা এই সব নৈতিক পরীক্ষাগুলোর যেভাবে প্রত্যুত্তর করে এবং সেই উত্তরের কারনকে ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে তাদের অক্ষমতা বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই তাদের ধর্মবিশ্বাস থাকা বা না থাকা উপর নির্ভরশীল নয় বলেই প্রতীয়মান হয়; হাউসার এর বই এর বার্তা তার নিজের শব্দে, যা আশা করতে পারি তা হোলো: আমাদের নৈতিকতা নির্ভর কোন কিছু বিচার করার ক্ষমতা হচ্ছে সর্বজনীন একটি নৈতিক ব্যকরনের মত, আমাদের মনের একটি ফ্যাকাল্টি বা ক্ষমতা যা বিবর্তিত হয়েছে মিলিয়ন বছর ধরে, যা একগুচ্ছ মুল নীতির উপর ভিত্তির উপর গড়ে তুলে সম্ভাব্য বেশ কিছু নৈতিক সিস্টেম এর রেন্জ; ভাষার মতই, মুলনীতিগুলো যা আমাদের নৈতিক ব্যকরনের মুলনীতিগুলোর ভিত্তি রচনা করে তা আমাদের সচেতনতার স্তরে ধরা পড়ে না;

গবেষনাটিতে হাউজার এর ব্যবহৃত বৈশিষ্টসুচক নৈতিক উভয় সঙ্কটময় পরিস্থিতিগুলো রেললাইনের উপর লাগামহীন ছুটে চলা (বা রানাওয়ে) ট্রাক বা ট্রলির দৃশ্যপটের যা বেশ কিছু মানুষের মৃত্যুর কারন হতে পারে এমন থীমেরই রকমফের; সবচেয়ে সরলতম কাহিনীটি কল্পনা করছে একজন ব্যক্তি, যার নাম ডেনিস, এমন কয়েকটি বিশেষ অবস্থানে দাড়িয়ে আছে, যে সে চাইলে জোরে ধেয়ে আসা ট্রলিটিকে ভিন্ন পার্শ্ববর্তী একটি ট্র্যাকে ঘুরিয়ে দিতে পারে, এবং তার মাধ্যমে মুল ট্র্যাক লাইনের উপর আটকে পড়া পাচ জন ব্যক্তির জীবন সে বাচাতে পারবে; কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে পাশের সেই লাইনের উপরও একজন মানুষ আটকে আছে, কিন্তু যেহেতু সে একা, মুল লাইনে আটকে থাকা বাকী পাচজন মানুষের সংখ্যাগরিষ্ঠতায় সে হেরে যায় এবং গবেষনায় অংশ নেয়া বেশীর ভাগ মানুষই মনে করেন ডেনিসের জন্য ট্রলীটির গতিপথ পরিবর্তন করার সুইচ নাড়ানো এবং পাশের লাইনে একজনের মৃত্যুর বদলে বাকী পাচ জনকে মৃত্যুর হাত থেকে বাচানো নৈতিকভাবে সমর্থনযোগ্য, যদিও কেউ মনে করেনটি কাজটি ডেনিস এর জন্য বাধ্যতামুলক; আমরা এখানে হাইপোথেটিক্যাল কিছু সম্ভাবনাকে উপেক্ষা করেছি, যেমন যে মানুষটা সেই সাইড রেললাইনে দাড়িয়ে আছে,তিনি হতে পারেন বীটহোভেন কিংবা ডেনিসেরই কোন ঘনিষ্ট একজন বন্ধু;

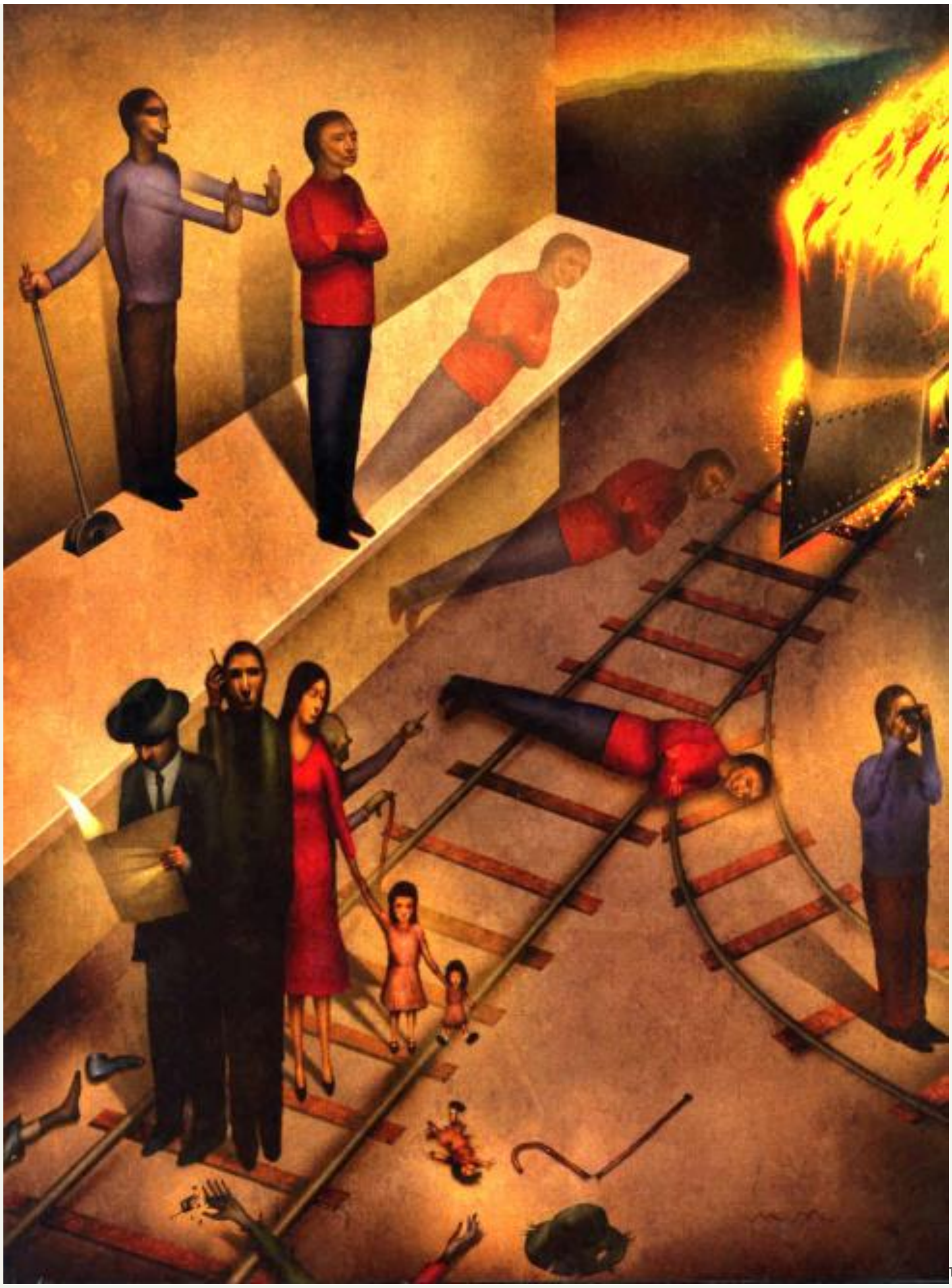

ছবি: একটি এথিক্যাল থট প্রবলেম যা ট্রলী প্রবলেম নামে পরিচিত। একটি ধেয়ে আসা বিকল ট্রলী থেকে কয়েকজন অচেনা মানুষের জীবন বাচাতে আপনি কি আর একজন অচেনা মানুষকে বিসর্জন দিতে পারবেন, (ছবি: ম্যাট মাহুরিনের ইলাসট্রেশন, ডিসকভার, জুলাই/আগষ্ট ২০১১)

চিন্তার এই এক্সপেরিমেন্টটির বিস্তারিত বিবরন ক্রমান্বয়ে ধারাবাহিকভাবে আমাদের আরো কঠিন নৈতিক উভয়সংকটময় পরিস্থিতিগুলো ও ধাধার মুখোমুখি করে; কি হতে পারে যদি, ধেয়ে আসা ট্রলিটাকে আমরা থামিয়ে দিতে পারি উপরের একটি ব্রীজ থেকে ভারী কোন বস্তু তার সামনে ফেলে? খুবই সহজ প্রশ্ন, অবশ্যই আমরা ভারী ওজনটা নীচে ফেলবো সেই কাজটি করার জন্য; কিন্তু কি হবে যদি ভারী ওজনদার কিছু বলতে ব্রীজের উপর বসে থাকা খুব মোটা একটা মানুষ ছাড়া আর কিছুই আমাদের কাছে না থাকে, যে মানুষটা সেখানে বসে সুর্যাস্তের

শোভা উপভোগ করছে? গবেষনায় প্রায় সবাই একমত হয়েছেন, মোটা এই মানুষটাকে ব্রীজের উপর থেকে ধাক্কা দিয়ে নীচে ফেলে দিয়ে ট্রলিটি থামানো অনৈতিক বা নৈতিকভাবে গ্রহনযোগ্য নয়; লক্ষ্য করে দেখুন, এমনকি একটি দৃষ্টিভঙ্গী থেকে এই উভয় সংকটটি কিন্তু একটু আগেই উল্লেখ করা ডেনিসের সংকটের মতই; যেখানে সে ট্র্যাক পরিবর্তনের সুইচ নামালে একজন হয়তো মারা যাবেন, তবে বাকী পাচ জনের জীবন বাচবে; উল্লেখযোগ্য বিষয়টি হচ্ছে, আমাদের বেশীরভাগ মানুষের মনে একটি শক্তিশালী সহজাত ধারনাগত অন্তর্দৃষ্টি বা ইনটুইশন আছে, সেটা হলো, এই দুটি কেস বা দৃশ্যপটের মধ্যে অবশ্যই কিছু মৌলিক গুরুত্বপুর্ণ পার্থক্য আছে, যদিও আমরা হয়তো স্পষ্ট করে বলতে পারবো না সেটা পার্থক্যটা আসলে কি।

ব্রীজের উপর থেকে মোটা মানুষটাকে নীচে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয়ার দৃশ্যপটটি হাউসারের প্রস্তাবিত অন্য একটি উভয় সঙ্কটের কথা মনে করিয়ে দেয়; এই দৃশ্যপটে আমরা দেখি পাচ জন রোগী যারা হাসপাতালে ভর্তি এবং যারা মরণাপন্ন, প্রত্যেকেরই ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ প্রয়োজন, যা নষ্ট হয়ে গেছে; প্রত্যেককে বাচানো যাবে যদি কোন দাতাকে খুজে পাওয়া যায় তাদের প্রত্যেকের প্রয়োজনীয় সেই নির্দিষ্ট অঙ্গটি দান করার জন্য, কিন্তু কাউকে পাওয়া যাচ্ছে না, কিন্তু হঠাৎ করে চিকিৎসক সার্জন লক্ষ্য করলেন, হাসপাতালের ওয়েটিং রুমে বসে আছেস একজন সুস্থ্য সবল মানুষ, যার মধ্যে এই পাচটি অঙ্গই ভালোভাবে কাজ করছে এবং সেগুলো প্রতিস্থাপন করার যোগ্য, এরকম একটি পরিস্থিতি সম্ভবত একজনকেও খুজে পাওয়া যাবে না, যারা বলবেন এই একজনকে মেরে বাকী পাচ জনকে বাচানো নৈতিক কোন কাজ হবে;

ব্রীজের উপর দাড়ানো মোটা মানুষটির দৃশ্যপটের সেই ক্ষেত্রের মতই যে সহজাত তাড়নাগত অন্তর্দৃষ্টি, যা আমরা সবাই অনুভব করি তা হলো, সেখানে উপস্থিত কোন নিরপরাধ কাউকে তার পুর্ব অনুমতি ছাড়া অন্যদের জন্য হঠাৎ করে কোন খারাপ পরিস্থিতিতে টেনে আনা উচিৎ না; ইমানুয়েল কান্ট বিখ্যাতভাবে এই মুলনীতিটাকে ব্যাখ্যা করেছিলেন এভাবে: কখনোই কোন পরিস্থিতিতেই যৌক্তিক বিচারবুদ্ধি সম্পন্ন কোন সত্বাকে, শুধুমাত্র সম্মতিহীন কোন একটি উপায় হিসাবে কোন উদ্দেশ্যপুরণের লক্ষ্যে ব্যবহার করা উচিৎ নয়, এমন কি অন্যদের উপকার করা স্বার্থেও না; এই বিষয়টি মনে হচ্ছে, তিনটি দৃশ্যপট, ব্রীজের উপর বসা মোটা মানুষ (বা হাসপাতালের ওয়েটিং রুমে বসা মানুষ) বা ডেনিসের ক্ষেত্রে সাইড লাইনে দাড়ানো মানুষের মধ্যে মুল পার্থক্যটা সৃষ্টি করছে; ব্রীজের উপর বসা মোটা মানুষটিকে সরাসরি ব্যবহার করা হচ্ছে বেপরোয়াভাবে ধেয়ে আসা ট্রলীটির গতিরোধ করতে, এটি সরাসরি কান্টিয় মুলনীতিকে অস্বীকার করছে; পাশের সাইড লাইনে দাড়ানো মানুষটি কিন্তু সরাসরি ব্যবহার করা হচ্ছে না পাচ জন মানুষের জীবন বাচানোর স্বার্থে এবং সেখানে শুধু পাশের লাইনটি ব্যবহার করা হচ্ছে ট্রলীর গতিপথ বদলে দেবার জন্য আর সেই লাইনে দাড়িয়ে থাকাটা তার জন্য দুর্ভাগ্য মাত্র; কিন্তু আপনি যখন এভাবে বিভেদ রেখাটা টানেন দুজনের মধ্যে, সেটা আসলে আমাদের কোন ইচ্ছাকে সন্তুষ্ট করছে? কান্টের জন্য এটি হচ্ছে একটি নৈতিক ধ্রুব বা মোরাল অ্যাবসলুট; আর হাউসারের মতে, এটি আমাদের ভিতর দৃঢ়ভাবে গেথে দিয়েছে আমাদের বিবর্তন প্রক্রিয়া;

বেপরোয়া ছুটে আসা ট্রলীর এই কাল্পনিক পরিস্থিতিটি ক্রমান্বয়ে আরো ব্যতিক্রমী জটিল রুপ ধারন করে এবং সেই সাথে সংশ্লিষ্ট নৈতিক উভয়সঙ্কটও আরো জটিলতর হয়ে উঠে, হাউসার দুজন কাল্পনিক ব্যাক্তি, নেড ও অস্কারের অনুভুত অর্ন্তদ্বন্দর পার্থক্যটা আমাদের প্রদর্শন করেন; ট্র্যাক বা রেলওয়ে লাইনের পাশে দাড়িয়ে আছে নেড, ডেনিসের মতো সে ধেয়ে আসা ট্রলীটাকে সম্পূর্ণ অন্য একটা পাশের লাইনে সরিয়ে দিতে পারে না ঠিকই তবে নেড এর সুইচ ট্রলীকে একটি সাইড লুপের দিকে সরিয়ে দেয় যা আবার কিছুটা দুরে মুল লাইনে ফিরে আসে ঠিক পাচ জন মানুষ যেখানে আটকে আছে তার আগে; সুতরাং এই বিন্দুতে শুধু মাত্র সুইচ দিয়ে কিছু হচ্ছে না, ট্রলী ঠিকই পাচ জনকে মাড়িয়ে চলে যাবে, যখন সেই বিকল্প লাইনটি আবার মেইন লাইনের সাথে যুক্ত হয়; তবে ঘটনাচক্রে সেই ডাইভারশন বা বিকল্প লাইনে একটি খুবই মোটা মানুষ দাড়িয়ে আছে যার ওজন ট্রলীটিকে থামানোর জন্য যথেষ্ট; এখানে নেড কি সুইচের পয়েন্টটা বদলাবে এবং ট্রেনটিকে বিকল্প পথের দিকে নিয়ে যাবে, বেশীরভাগ মানুষের

সহজাত ইনটুইশনই বলবে বলে সেটা করা উচিৎ হবে না নেড এর; কিন্তু নেড এর উভয় সংকট বা নৈতিক দ্বন্দর সাথে ডেনিস এর দ্বন্দটির কি পার্থক্য আছে ? ধারনা করা যেতে পারে, মানুষ তার প্রবৃত্তিগত ভাবে কান্টিয় মুলনীতি প্রয়োগ করছে এখানে ; ডেনিস ট্রলীটির গতিপথ অন্য দিকে সরিয়ে দেয় পাচজন মানুষকে বাচাতে, এবং এর দুর্ভাগ্যজনক পরিণতি হয় এর পাশের লাইনে দাড়ানো একজন, সেটি হচ্ছে কোল্যাটেরাল ক্ষতি, রামসফেল্ডীয় চটকদার শব্দ যদি ব্যবহার করা হয়, যে লোকটি চাপা পড়বে তাকে ডেনিস ইচ্ছা করে ব্যবহার করছে না, অন্যদের বাচানোর জন্য ; নেড আসলেই মোটা মানুষটাকে ব্যবহার করছে ট্রলীটাকে থামানোর জন্য এবং বেশীভাগ মানুষই (কোন চিন্তা ছাড়াই হয়ত), কান্টের (বিস্তারিত ভাবে যিনি তা ভেবেছেন) মতই এই দুটি ক্ষেত্রে একটি বড় পার্থক্য করছে;

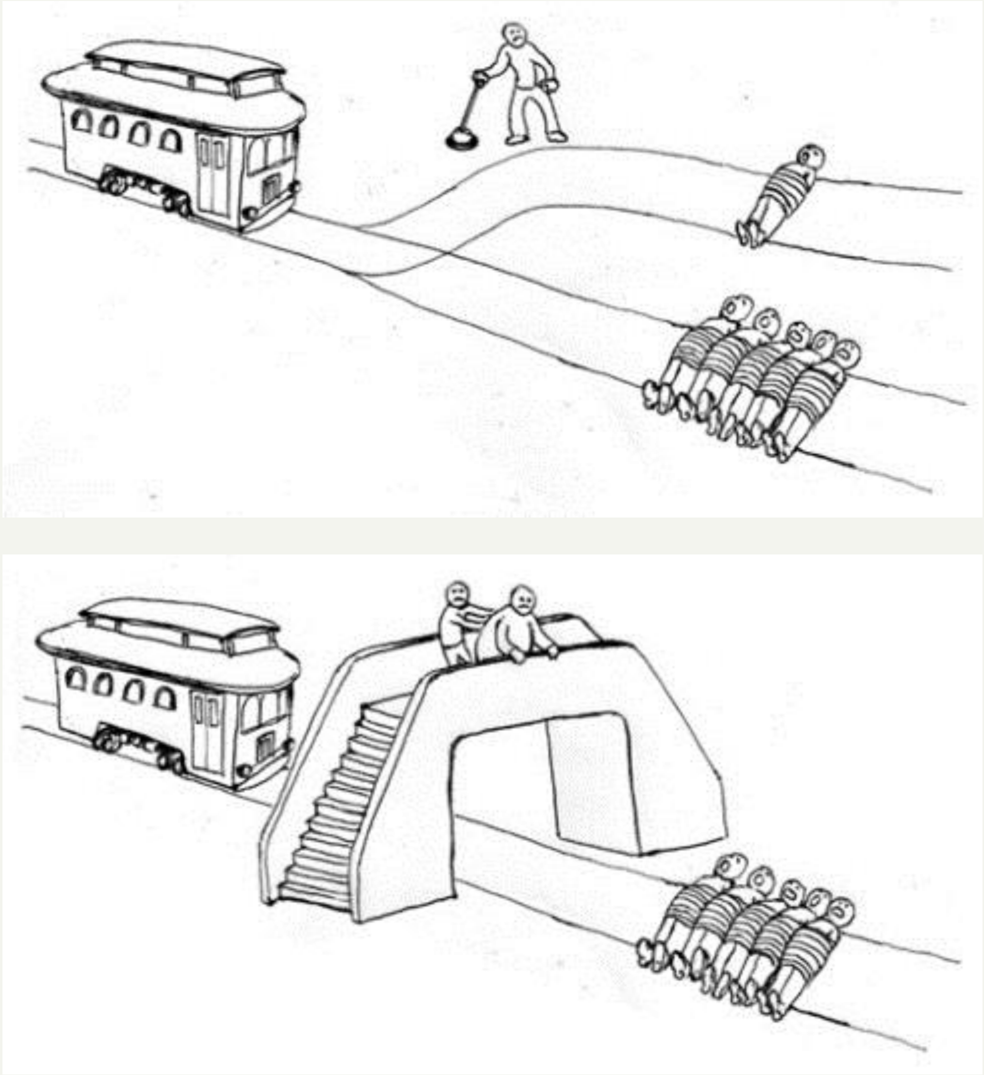

ছবি: উপরের দুটি দৃশ্যপটে কোন কাজটি আপনি নৈতিক ভাবে সমর্থনযোগ্য মনে করেন?

এই পার্থক্যটা আবার দেখা যায় অস্কারের উভয় সংকটে; অস্কারের পরিস্থিতিটা নেডের মতই একই রকম, শুধু সেখানে ডাইভারশন লুপের সেই লাইনে পাথরের একটি ভারী জিনিস আছে যা ট্রলীটাকে থামাতে পারবে, স্পষ্টতই অস্কারের কোন সমস্যা হবার কথা না, সুইচ টেনে ট্রলীটাকে বিকল্প পথের দিকে নিয়ে যাওয়া, শুধুমাত্র ঘটনাচক্রে সেখানে একজন পথচারী সেই লোহার ওজনের ভারটির সামনে হেটে এসে পড়ে, সে অবশ্য মারা পড়বে যদি অস্কার

সুইচটা টানে, যেমন নেড এর ক্ষেত্রে মোটা মানুষটার মত, পার্থক্যটা হচ্ছে অস্কার এই পথচারীকে উদ্দেশ্যমুলকভাবে ব্যবহার করছে না ট্রলীটিকে থামানোর জন্য, সে হচ্ছে এই পরিস্থিতির কোল্যাটেরাল ক্ষতি, ডেনিসের দ্বন্দের মত; হাউসার ও তার গবেষনায় বেশীভাগ অংশগ্রহন কারীদের মত, আমিও মনে করি অস্কারকে অনুমতি দেয়া যায় সুইচ দেবার জন্য, কিন্তু নেডকে না; কিন্তু এই সহজাত চিন্তা বা ইনটুইশনকে ব্যাখ্যা করাও আমার জন্য কঠিন, হাউসারের বক্তব্য হচ্ছে, এধরনের নৈতিক অন্তর্দৃষ্টি প্রায়শই খুব ভালো করে করা কোন চিন্তার বহিপ্রকাশ না ঠিকই কিন্তু সেগুলো আমরা খুবই দৃঢ়ভাবে অনুভব করতে পারি, আমাদের বিবর্তনীয় ঐতিহ্যের কারনে;

নৃতত্ত্ববিদ্যা ক্ষেত্রে এই গবেষনাটি নিয়ে একটি কৌতুহলোদ্দীপক উদ্যোগ গ্রহন করেন হাউসার ও তার সহকর্মীরা; নৈতিকতার এই পরীক্ষাগুলো তারা উপযোগী করে প্রয়োগ করেন কুনা আদীবাসীদের উপর; কুনা একটি মধ্য আমেরিকার ক্ষুদ্র একটি নৃগোষ্ঠী, যারা প্রাতিষ্ঠানিক কোন ধর্ম এবং পশ্চিমাদের সংস্পর্শে খুব একটা আসেনি কখনো। গবেষকরা লাইনের উপর দিয়ে ধেয়ে আসা ট্রলী বদলে স্থানীয়ভাবে বোধগম্য বিকল্প রুপক ব্যবহার করেন, যেমন নৌকার দিকে সাতার কেটে এগিয়ে আসা কুমীর; সংশিষ্ট কিছু সামান্য পার্থক্য ছাড়া, কুনা আদীবাসীরাও আমাদের মতই একই নৈতিক বিচার বিবেচনার প্রমান দেয় তাদের গবেষনায়;

সবচেয়ে বিশেষভাবে যে বিষয়টি চিন্তার উদ্রেক করে এই বইটিতে, তা হলো হাউসার এর একটি ভাবনা; তাহলো ধর্মবাদী মানুষরা কি তাদের নৈতিক অন্তর্দৃষ্টির দিক থেকে নীরিশ্বরবাদীদের থেকে ভিন্ন কিনা; নিশ্চয়ই, যদি আমরা আমাদের নৈতিকতাবোধ পাই ধর্ম থেকে, তাহলে তো তাদের মধ্যে পার্থক্যটা থাকাই উচিৎ; কিন্তু যা দেখা গেল তা হলো, তাদের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই; নৈতিক দার্শনিক পিটার সিংগারকে নিয়ে হাউসার তিনটি হাইপোথেটিকাল উভয় সংকটের উপর দৃষ্টি দেন এবং এই তিনটি পরিস্থিতিতে নীরিশ্বরবাদীদের রায়ের সাথে ধর্মবাদীদের রায়ের একটি তুলনামুলক পর্যালোচনা করেন; প্রত্যেক ক্ষেত্রে অংশগ্রহনকারীদের জিজ্ঞাসা করা হয়, কোন একটি কাল্পনিক সিদ্ধান্ত বা কাজ নৈতিকভাবে ‘আবশ্যিক’, ’অনুমতিযোগ্য’ বা ’নিষিদ্ধ’ কিনা তা চিহ্নিত করা; তিনটি ডাইলেমা বা উভয় সঙ্কট ময় কাল্পনিক পরিস্তিতি গুলো হোলো:

(১) ডেনিসের ডাইলেমা বা দ্বন্দ: নব্বই শতাংশ মানুষ বলেছে ট্রলিটিকে বিকল্প পথে ঘুরিয়ে দেয়া অনুমতিযোগ্য, পাচ জনকে মৃত্যুর হাত থেকে বাচাতে এক জনকে মারা যেতে পারে;

(২) আপনি একজন বাচ্চাকে পুকুরে ডুবতে দেখছেন এবং আশে পাশে কেউ নেই যে তাকে বাচাতে পারে একমাত্র আপনি ছাড়া; আপনি বাচ্চাটাকে বাচাতে পারবেন, কিন্তু আপনার প্যান্টটি পুরোপুরি নষ্ট হয়ে যাবে; ৯৭ শতাংশ মানুষই মনে করেন আপনার বাচ্চাকে উদ্ধার করা উচিৎ (আশ্চর্যজনকভাবে ৩ শতাংশ মানুষ মনে করে তাদের জন্য প্যান্ট বাচানোটা শ্রেয়তর!!);

(৩) অঙ্গ প্রতিস্থাপনের দৃশ্যপটটা যা উপরে বর্ণনা করা হয়েছে : ৯৭ শতাংশ মানুষই মনে করেন ওয়েটিং রুমে বসা একটা সুস্থ মানুষকে হত্যা করে তার শরীরের অঙ্গগুলো সংগ্রহ করা অবশ্যই নৈতিকভাবে নিষিদ্ধ একটি কাজ; যা এমনকি আরো পাচ জনের জীবন বাচাতে পারবে;

হাউসার এবং সিঙ্গার এর গবেষনাটির মুল উপসংহার হলো, পরিসংখ্যানগত দিক থেকে ধর্মবাদী এবং নীরিশ্বরবাদীদের এই বিষয়গুলো নিয়ে মতামত বা নৈতিক বিচারের মধ্যে কোন উল্লেখযোগ্য পার্থক্য নেই; ব্যাপারটা কিন্তু সেই দৃষ্টিভঙ্গীর সাথে সামন্জষ্যপুর্ণ, যা আমি সহ আরো অনেকের দৃষ্টিভঙ্গী, যে ভালো কিংবা খারাপ বা অশুভ হবার জন্য আমাদের ঈশ্বরের প্রয়োজন নেই;

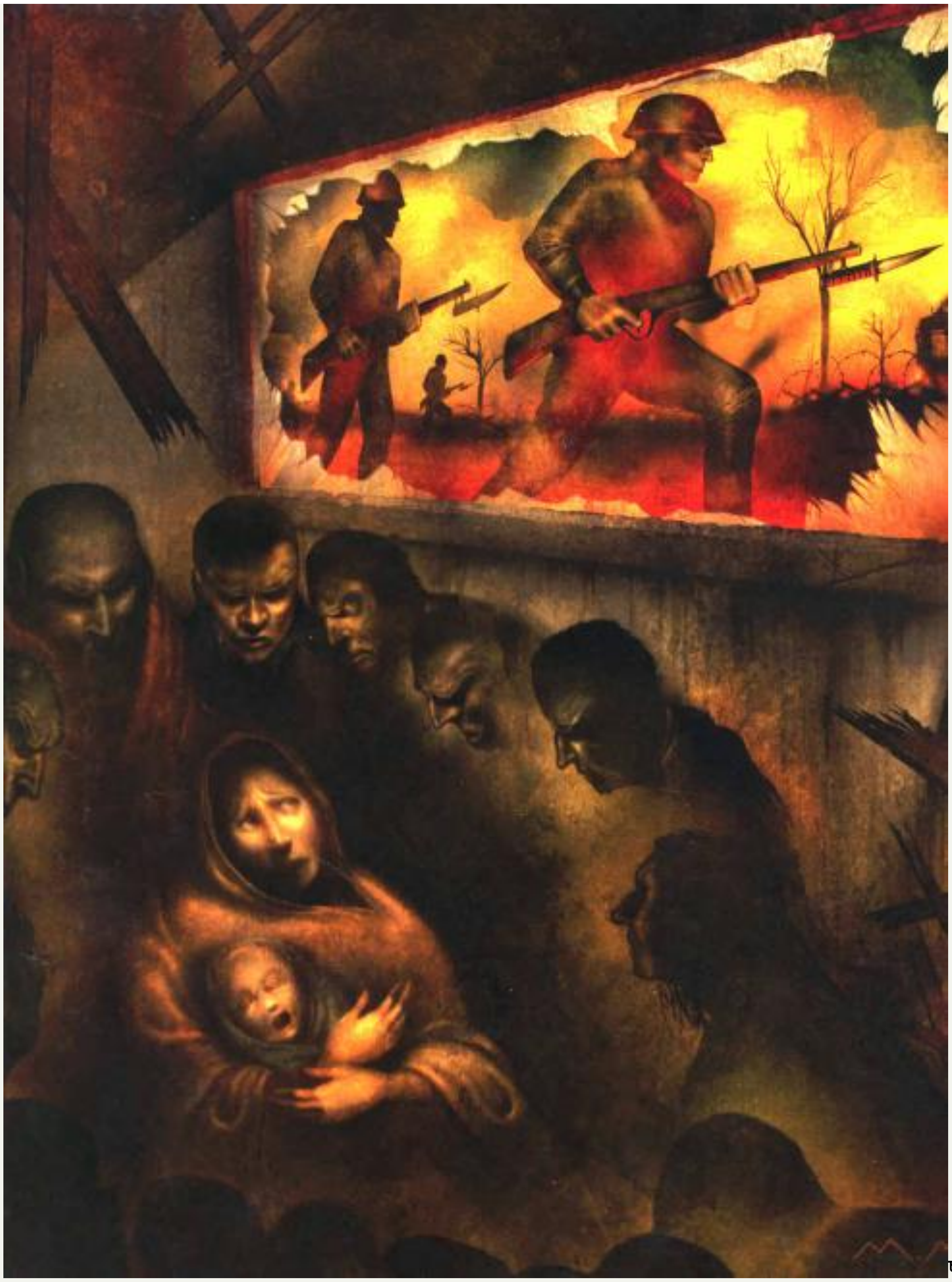

ছবি: আপনি কি আপনার ক্রন্দনরত শিশুকে হত্যা করতে পারবেন আপনাকে সহ সবাইকে বাইরের শত্রু সেনা থেকে রক্ষা করতে? (ছবি: ম্যাট মাহুরিনের ইলাসট্রেশন, ডিসকভার, জুলাই/আগষ্ট ২০১১)

রিচার্ড ডকিন্স এর দি গড ডিল্যুশন : ষষ্ঠ অধ্যায় (শেষ পর্ব)

By K M Hassan

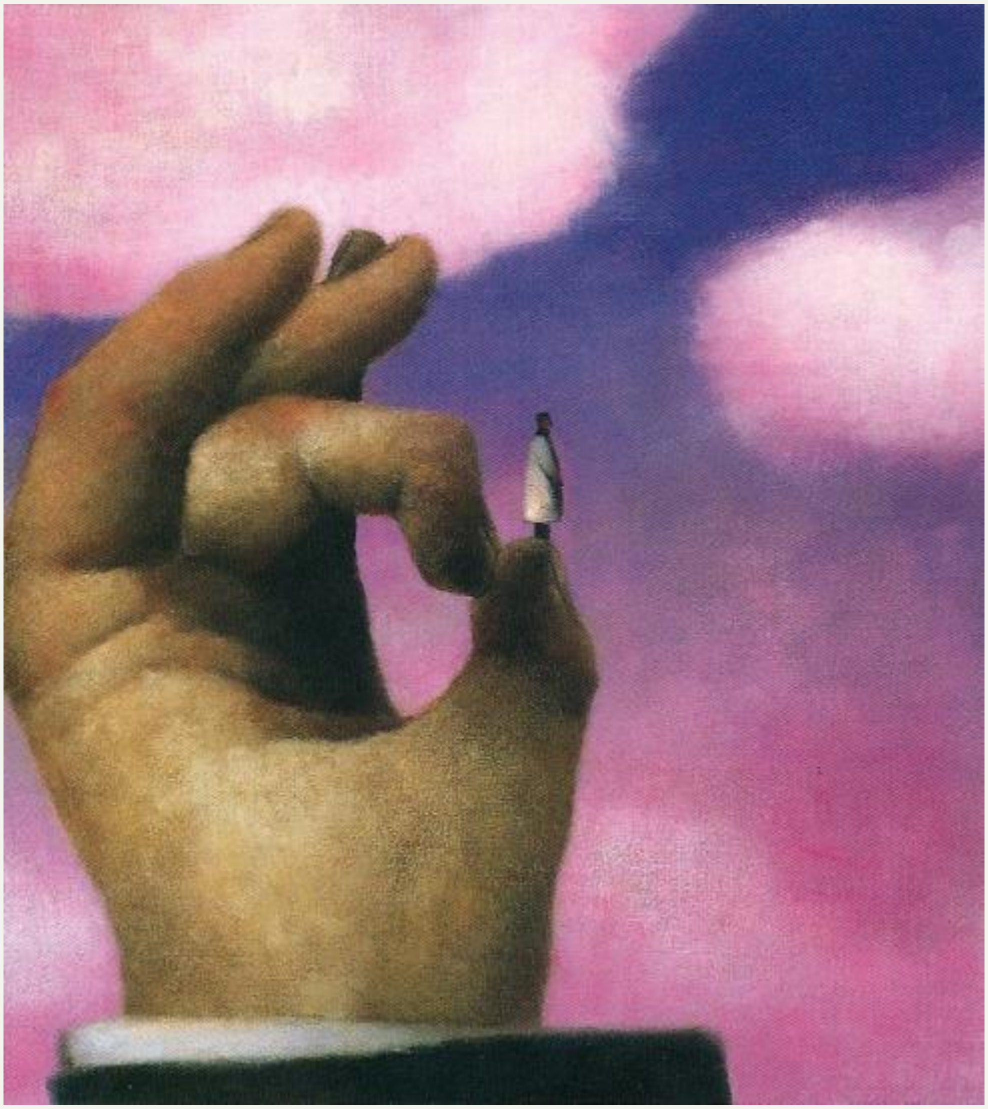

ব্র্যাড হল্যান্ড এর একটি ইলাসট্রেশন

রিচার্ড ডকিন্স এর দি গড ডিল্যুশন : ষষ্ঠ অধ্যায় (শেষ পর্ব)
(অনুবাদ প্রচেষ্টা: কাজী মাহবুব হাসান)
The God Delusion by Richard Dawkins

প্রথম অধ্যায়
দ্বিতীয় অধ্যায়
তৃতীয় অধ্যায়
চতুর্থ অধ্যায় (প্রথম পর্ব) , চতুর্থ অধ্যায় (দ্বিতীয় পর্ব) ,
চতুর্থ অধ্যায় (তৃতীয় পর্ব) , চতুর্থ অধ্যায় (চতুর্থ পর্ব) , চতুর্থ অধ্যায় (শেষ পর্ব)
পঞ্চম অধ্যায় (প্রথম পর্ব), পঞ্চম অধ্যায় (দ্বিতীয় পর্ব) , পঞ্চম অধ্যায় (তৃতীয় পর্ব)
পঞ্চম অধ্যায় (চতুর্থ পর্ব) , পঞ্চম অধ্যায় (পঞ্চম পর্ব) ,পঞ্চম অধ্যায় (ষষ্ঠ পর্ব)
ষষ্ঠ অধ্যায় (প্রথম পর্ব) ; ষষ্ঠ অধ্যায় (দ্বিতীয় পর্ব)

নৈতিকতার শিকড়: কেন আমরা ভালো?

People say we need religion when what they really mean is we need police.*H.L. Mencken*

যদি ঈশ্বরই না থাকে, তাহলে আমরাই বা কেন ভালো হবো?

এভাবে যদি উপস্থাপন করা হয়, উপরের এই প্রশ্নটা নিঃসন্দেহে আর মহান বা সন্মানজনক শোনায় না; যখন কোন ধর্মীয় ব্যক্তি আমার কাছে এভাবে প্রশ্নটি উথাপন করেন (এবং অনেকেই তাই করেন), আমার তাৎক্ষনিক প্রতিক্রিয়া হয় নীচের এই চ্যালেন্জ্ঞটি ছুড়ে দেবার জন্য : আপনি কি আসলেই আমাকে বলতে চাইছেন, আপনার ভালো হবার প্রচেষ্টার একমাত্র কারন ঈশ্বরের কৃপা আর পুরষ্কার অর্জন করা বা তার রোষানল বা শাস্তি এড়াতে? কিন্তু সেটা নৈতিকতা না, এটা পদলেহন করা, চাটুকারীতা করা, আকাশের মহান সার্ভেইলেন্স ক্যামেরার দিকে বার বার ঘাড় ফিরিয়ে দেখা , এখনও আপনার মাথার মধ্যে ছোট একটি আড়ি পাতা আছে , যা আপনার সমস্ত কর্মকান্ডকে পর্যবেক্ষন করছে, আপানার সকল খারাপ চিন্তা সম্বন্ধে তিনি সর্বজ্ঞ; আইনস্টাইন যেমন বলেছিলেন, ’যদি মানুষ শুধুমাত্র ভালো হয় কারন তারা শাস্তি ভয় পায় এবং পুরষ্কারেরআশা করে, তাহলে সত্যি আমরা বড়ই হতভাগ্য; মাইকেল শেরমার তার The Science of Good and Evil বইটিকে এই বিষয়টি উল্লেখ করেছিলেন বিতর্ক সমাপনকারী যুক্তি হিসাবে; ”আপনি যদি একমত হন যে, ঈশ্বরের অনুপস্থিতিতে আপনি ডাকাতি, ধর্ষন আর খুন করতে পারবেন, আপনি তাহলে নিজেকে একজন অনৈতিক ব্যক্তি হিসাবে চিহ্নিত করলেন এবং আপনার থেকে যত দুরে থাকা সম্ভব ততদুরে থাকা উচিৎ এই উপদেশটি আমাদের অবশ্যই মেনে চলা প্রয়োজন, আবার অন্যদিকে যদি ঐশ্বরিক নিবিড় পর্যবেক্ষন আর নজরদারি ছাড়াও আপনি সত্যি ভালো মানুষ হয়ে থাকেন, তাহলে আপনি নিজেই ’আমাদের ভালো মানুষ হবার জন্য ঈশ্বর অবশ্য প্রয়োজনীয়’ এমন দাবীটিকে চুড়ান্তভাবে অবমুল্যায়ন করলেন‘; আমার সন্দেহ একটি বিশাল সংখ্যক ধার্মিক ব্যক্তিরা মনে করেন যে, তাদের ভালোমানুষ হবার জন্য ধর্মই মুল প্রণোদনাকারীর দায়িত্ব পালন করে, বিশেষ করে তারা যদি সেই সব বিশেষ ধর্মবিশ্বাসের অনুসারী হয়ে থাকেন যে ধর্মগুলো পদ্ধতিগতভাবে ব্যক্তিগত অপরাধবোধকে উদ্দেশ্যমুলকভাবেই অপব্যবহার করে থাকে তাদের নিজেদের স্বার্থে;

আমার মনে হয়, বেশ অনেকটুকু পরিমান নীচু আত্মসন্মানবোধ এর প্রয়োজন আছে এমন কিছু ভাবতে পারার জন্য যে, যদি পৃথিবী থেকে হঠাৎ করেই ঈশ্বর বিশ্বাস সম্পুর্ণ উড়ে যায় আমরা সবাই উদাসীন, দয়ামায়াহীন, অনুদার স্বার্থপর ভোগবাদীতে রুপান্তরিত হবো, ভালো বা শুভ গনাবলীর কোন লেশ মাত্র থাকবে না; প্রচলিত ধারনা মতে দস্তয়েভস্কী এই ধরনের মতামত ধারন করতেন, সম্ভবত যার কারন তার সৃষ্ট চরিত্র ইভান কারামাজভ এর মুখে উষ্চারিত কিছু বাক্য:

(ইভান) গভীরভাবে পর্যবেক্ষন করে উপলব্ধি করেন যে, প্রকৃতিতে এমন কোন আইন নেই যা মানুষকে মানবতাকে ভালোবাসতে উদ্বুদ্ধ করে এবং সেই ভালোবাসাটার যদি অস্তিত্ব থাকে, বা আজ অবধি পৃথিবীতে তার অস্তিত্ব থেকে থাকে, তাহলে এটি অবশ্যই কোন প্রাকৃতিক কারনে নয়, এর কারন সম্পুর্ণভাবে নিজেদের অমরত্বের প্রতি মানুষের ধারনকৃত বিশ্বাস; এর পাশাপাশি তিনি যোগ করেন যে, ঠিক সেই জিনিসটাই যা প্রাকৃতিক আইন গঠন করে, যেমন, নিজের অমরত্বের প্রতি মানুষের বিশ্বাস যখন ধ্বংস হয়ে যাবে, শুধুমাত্র তার ভালোবাসার ক্ষমতাই নিঃশ্বেষ হবে না এই পৃথিবীতে জীবনকে টিকিয়ে রাখার মুল প্রেরণাদায়ক শক্তিটিও নিঃশ্বেষ হয়ে যাবে; এবং উপরন্ত তখন কিছুই আর অনৈতিক বলে বিবেচিত হবে না, সবকিছুরই অনুমতি থাকবে এমন কি নর মাংস ভক্ষনও; এবং পরিশেষে, এটুকুই যেন যথেষ্ট না, তিনি ঘোষনা দেন, প্রতিটি মানুষ, যেমন আপনি এবং আমি, যেমন যারা ঈশ্বর বা তার নিজের অমরত্বে বিশ্বাস করেন না, প্রাকৃতিক নিয়মাবলী তাৎক্ষনিকভাবে ধর্ম ভিত্তিক আইন যার এর আগে ছিল তার সম্পুর্ণ বীপরিত হতে বাধ্য এবং এই ইগোইজম এমনকি সম্প্রসারিত হয় নানা অপরাধ ঘটানোর প্রেরণাদায়ক হিসাবে, তা শুধু অনুমতিই পাবে না, বরং চিহ্নিত হবে অবশ্য প্রয়োজনীয় হিসাবে, সবচেয়ে যৌক্তিক, এমনকি মানুষের অবস্থার অস্তিত্বের সবচেয়ে মহত্বতম কারন হিসাবে;

হয়তো অবুঝভাবেই, ইভান কারামাজভের চেয়ে আমি মানব প্রকৃতি সম্বন্ধে অপেক্ষাকৃত কম নৈরাশ্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গী পোষন করি; আমাদের কি সত্যি সত্যি নজরদারীর প্রয়োজন আছে, ঈশ্বরের কিংবা একে অপরের – যা আমাদের স্বার্থপর এবং অপরাধী সুলভ আচরণ থেকে বিরত রাখতে ? আমি তীব্রভাবে বিশ্বাস করতে চাই যে আমার জন্য এ ধরনের কোন নজরদারী প্রয়োজন নেই; এবং প্রিয় পাঠকরা, আপনাদেরও প্রয়োজন নেই; আবার অন্যদিকে, আমাদের আত্মবিশ্বাসে খানিকটা ফাটল ধরিয়ে দুর্বল করতে, স্টিফেন পিংকারের মন্ট্রিয়লে পুলিশ ধর্মঘটের মোহমুক্তির অভিজ্ঞতা যা তিনি তার The Blank Slate বইটিতে বর্ণনা করেছিলেন:

গর্বিতভাবে শান্তিপ্রিয় কানাডায় রোমান্টিক ৬০ এর দশকে অল্পবয়সী কিশোর হিসাবে আমি বাকুনিন এর অ্যানর্কিজমের একনিষ্ট বিশ্বাসী ছিলাম; আমি আমার বাবা মার যুক্তি, যদি সরকার কোনদিন তার অস্ত্র সমর্পন করে তাহলে ভয়াবহ নৈরাজ্য সৃষ্টি হবে, হেসে উড়িয়ে দিয়েছিলাম; আমাদের প্রতিদ্বন্দী ভবিষ্যদ্বানী দুটির পরীক্ষার সন্মুখীন হয় ১৯৬৯ সালের ১৭ অক্টোবর সকাল ৮ টায়, যখন মন্ট্রিয়লের পুলিশ বাহিনী ধর্মঘট শুরু করে; ১১;২০ মিনিটে, প্রথম ব্যাঙ্ক ডাকাতিটি হয়, দুপুরের মধ্যে শহরের সব দোকান পাট বন্ধ হয়ে যায় বেপরোয়া লুটতরাজের ভয়ে; আর কয়েক ঘন্টার মধ্যে ট্যাক্সি ড্রাইভাররা একটি লিমোজিন সার্ভিসের গ্যারেজে আগুন জালিয়ে দেয়, যারা তাদের সাথে বিমান বন্দরের খদ্দের নিয়ে দ্বন্দরত ছিল; ছাদের উপরে লুকিয়ে থাকা এক বন্দুকধারী একজন পুলিশ অফিসারকে খুন করে, দাঙ্গাবাজরা বেশ কিছু হোটেল আর রেস্টুরেন্ট ভাঙ্গচুর করে, উপশহরে নিজের বাসায় অনুপ্রবেশ করা এক আগান্তককে গুলি করে হত্যা করে একজন ডাক্তার; দিনের শেষে দেখা যায় মোট ছয়টি ব্যাঙ্ক লুন্ঠন করা হয়েছে, শতাধিক দোকানে লুট করা হয়েছে, বারোটি জায়গায় আগুন ধরানো হয়েছে, চল্লিশটি গাড়ি ভর্তি দোকানের সামনের কাচ ভাঙ্গা হয়েছে, সম্পদ ধ্বংশের হিসাবের পরিমান প্রায় ৩ মিলিয়ন ডলার ছুয়েছে, নগর কর্মকর্তাদের পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনের জন্য আর্মি এবং অবশ্যই কেন্দ্রীয় পুলিশকে তলব করার আগে, এবং তারা যথারীতি পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনে আনে; এই সুস্পষ্ট চাক্ষুষ পরীক্ষা আমার রাজনৈতিক চিন্তাধারনাকে এলোমেলো করে দিয়েছিল.......

হয়তো আমিও , একজন পলিয়ানা, ঈশ্বরের পর্যবেক্ষন আর নজরদারী নিয়ন্ত্রন ছাড়া মানুষ ভালো থাকতে পারবে এমনটাই বিশ্বাস করে যে; কিন্তু অন্যদিকে মন্ট্রিয়লের বেশীর ভাগ জনগোষ্ঠী মুলত ধর্মবিশ্বাসী, তাহলে ঈশ্বর ভয় কেন তাদেরকে এসব কাজ করা থেকে বিরত রাখতে পারেনি, যখন পৃথিবী মানুষ পুলিশরা সাময়িকভাবে দৃশ্য থেকে বিদায় নিয়েছিল? মন্ট্রিয়লের এই পুলিশ ধর্মঘট কি খুব ভালো একটি প্রাকৃতিক পরীক্ষা ছিলনা, যা আমাদের ঈশ্বর বিশ্বাস আমাদের ভালো মানুষ বানায় এমন হাইপোথিসিসটি টেস্ট করার সুযোগ করে দেয়? বা নৈরাশ্যবাদী এইচ এল মেনকেন ঠিক বলেছিলেন, যখন তিনি তার তীর্যক পর্যবেক্ষন করেছিলেন, ’মানুষ বলে আমাদের ধর্ম প্রয়োজন যখন তারা আসলে বোঝাতে চায় আমাদের প্রয়োজন আসলে পুলিশের’;

স্পষ্টতই মন্ট্রিয়লের সবাই কিন্তু সেদিন খারাপ ভাবে আচরণ করেননি যখনই দৃশ্য থেকে পুলিশ চলে যায়; একটি বিষয় জানা খুব কৌতুহলোদ্দীপক হবে যদি দেখা সম্ভব হয়– সেখানে কোন ধরনের পরিসংখ্যানগত প্রবণতা আছে কিনা– তা যত সামান্য হোক না কেন–অবিশ্বাসীদের ধর্মবিশ্বাসীওদর তুলনায় বেশী লুটপাট এবং ধ্বংশযজ্ঞ চালিয়েছিল কিন?; তবে এ বিষয়ে আমার তথ্যপুষ্টহীন ভবিষ্যদ্বানী হচ্ছে, ঠিক এর বীপরিতটাই ঘটেছে; নৈরাশ্যবাদী সুরে প্রায়ই বলা হয়ে থাকে যে ফক্সহোলে কোন নীরিশ্বরবাদী নেই (এটি একটি প্রচলিত প্রবাদ,There are no atheists in foxholes, যা প্রায়শই যুক্তি হিসাবে ব্যবহার করা হয় এই বলে যে, প্রচন্ড বিপদের মুখে, বা চাপে, যেমন বিশেষ করে যুদ্ধক্ষেত্রে, প্রত্যেকেই কোন না কোন স্বর্গীয় শক্তিতে বিশ্বাস করে বা আশা করে এমন কোন শক্তির উপস্থিতি আছে) ; তবে আমি সন্দেহ করতে ইচ্ছা পোষন করছি (কিছুটা প্রমান সহ, যদিও সেখান থেকে উপসংহার টানা বেশী সরলীকরণ হয়ে যাবে) জেলখানায় খুব কমই নাস্তিক আছেন; আমি অবশ্যই দাবী করছিনা নিরীশ্বরবাদিতা নৈতিকতা বৃদ্ধি করে, যদিও হিউম্যানিজম বা মানবতাবাদ – যে এথিকাল বা নীতিগত দর্শনটি নীরিশ্বরবাদীদের সাথে প্রায়ই যুগপৎ অবস্থান করে – সম্ভবত সেই কাজটি করে; আরেকটি ভালো সম্ভাবনা হতে পারে যে নীরিশ্ববাদীতা আরো একটি তৃতীয় নিয়ামকের সাথে সম্পর্কযুক্ত, যেমন, উচ্চ শিক্ষা, বুদ্ধিমত্তা এবং কোন বিষয় নিয়ে চিন্তা করার প্রবণতা, যা অপরাধ করার প্রবণতাকে প্রতিরোধ করতে পারে; এই ধরনের গবেষনাগত প্রমান যতটুকু আছে, সেগুলো অবশ্যই ধর্মীয় বিশ্বাস এর সাথে নৈতিকতার কোন ইতিবাচক বা ধনাত্মক সম্পর্ক আছে এমনস কোন সাধারন ধারনাকে সমর্থন করেনা; কোরিলেশন বা পারস্পরিক সম্পর্কের প্রমান কখনই চুড়ান্ত নয় ঠিকই তবে নীচের উপাত্তগুলো, যা স্যাম হ্যারিস তার Letter to a Christian Nation এ বর্ণনা দিয়েছিলেন সেগুলো নি:সন্দেহে নজরকাড়া;

যদিও যুক্তরাষ্ট্রে রাজনৈতিক মতাদর্শ কিংবা সংশ্লিষ্টতা ধর্মীয় মানসিকতার একেবারে নির্ভুল সুচক হিসাবে গ্রহন করা যাবে না, তবে বিষয়টি আদৌ গোপন না যে, লাল বা রেড (রিপাবলিকান) অঙ্গরাজ্যগুলো প্রধানত রেড কারন বিশেষভাবে রক্ষনশীল খৃষ্টানদের সংখ্যাগরিষ্ট রাজনৈতিক প্রভাবের জন্য; যদি খৃষ্টীয় রক্ষনশীলতা ও সামাজিক স্বাস্থ্য সুচকগুলোর মধ্যে কোন শক্তিশালী সম্পর্ক থাকতো, তবে রেড–স্টেট যুক্তরাষ্ট্রে তার নির্দশন আমাদের দেখতে পারার কথা; যা আমরা কিন্তু দেখি না; যে ২৫ টি শহর, যেখানে ভয়ঙ্কর অপরাধের হার সর্বনিম্ন, তার শতকরা ৬২ শতাংশ অবস্থিত নীল (ডেমোক্র্যাটিক প্রধান) আর ৩৮ শতাংশ লাল (রিপাবিলিকান প্রধান) অঙ্গরাজ্যগুলোতে; আর যে পচিশটি শহর যেখানে ভয়ঙ্কর অপরাধের হার সবচেয়ে বেশী, সেই তালিকার শহরগুলোর ৭৬ শতাংশ লাল ও ২৪ শতাংশ নীল অঙ্গরাজ্যগুলোতে অবস্থিত; বাস্তবিকভাবেই যুক্তরাষ্ট্রের পাচটি সবচেয়ে অপরাধ প্রবণ শহরের তিনটি অবস্থিত বিশেষভাবে ধার্মিক অঙ্গরাজ্য টেক্সাসে; গৃহ অনুপ্রবেশ ও চুরির হার বেশী এমন শীর্ষ বারোটি অঙ্গরাজ্যে লা বা রিপাবলিকান প্রধান; এছাড়া চুরির হার বেশী এমন ২৯ টি রাজ্যের ২৪টি লাল; খুনের হারের দিক থেকে শীর্ষে থাকা মোট ২২ টি রাজ্যের মধ্যে ১৭টি লাল ((লক্ষ্য করুন এই লাল আর নীল রঙ এর বন্টন যা অ্যামেরিকায় আমরা দেখি, ব্রিটেন এ কিন্তু তা ঠিক এর বীপরিত, যেখানে নীল হচ্ছে কনজারভেটিভ পার্টির রঙ, এবং লাল, সারা পৃথিবীর মতই ঐতিহ্যগত ভাবে রাজনৈতিক বাম মতাদর্শদের সাথে সম্পর্কযুক্ত));

পদ্ধতিগত গবেষনা যদি কিছু থাকে সেটাও এই সম্পর্কগুলোকে সমর্থন করারই প্রবনতা প্রদর্শন করে; গ্রেগরী এন পল, জার্ণাল অব রেলিজিয়ন অ্যান্ড সোসাইটি (২০০৫) এ তার প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে ১৭ টি অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ রাষ্ট্রের মধ্যে একটি তুলনামুলক আলোচনা করেন এবং ধর্মীয় দাবীকে পুরোপুরি ধ্বংশ করে দেবার মত একটি উপসংহারে উপনীত হন: উন্নত গণতন্ত্রর দেশগুলোতে সৃষ্টিকর্তার প্রতি বিশ্বাসের এবং উপাসনার উচ্চ হার মানব হত্যা, শিশু, কিশোর এবং অল্প বয়সে মৃত্যুর উচ্চ হার, যৌনরোগের প্রাদুর্ভাবে উচ্চ হার, অল্পবয়সে গর্ভধারন, গর্ভপাতে উচ্চ হার এর সাথে সরাসরি সম্পর্কযুক্ত; ড্যান ডেনেট, তার Breaking the Spell, এ বিষয়ে বিদ্রুপাত্মক মন্তব্য করেছিলেন, যদিও স্যাম হ্যারিসের এর নির্দিষ্ট এই বইটির প্রতি নয়, সাধারনভাবে এ ধরনের গবেষনা নিয়ে;

মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন যে, এই ফলাফলগুলো, ধর্ম মনাদের মধ্যে নৈতিকতাবোধ অপেক্ষাকৃত বেশী এ ধরনের প্রচলিত দাবীকে এত দৃঢ়ভাবে আঘাত করেছিল যে, পরবর্তীতে উল্লেখযোগ্যসংখ্যক গবেষনা হাতে নেয় ধর্মীয় সংস্থাগুলো এই উপসংহার খন্ডনের জন্য……একটা বিষয়ে আমরা নিশ্চিৎ হতে পারি যে, ’যদি’ নৈতিক আচরণ ও ধর্মীয় সংশ্লিষ্টতা, বিশ্বাস ও আচরণের মধ্যে গুরুত্বপর্ণ কোন সম্পর্ক থেকে থাকে খুব শীঘ্রই তা জানা যাবে; বিশেষ করে যখন অসংখ্য ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান উৎসাহের সাথে তাদের এই প্রথাগত বিশ্বাসকে বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমান করার চেষ্টা করছেন (তারা সাধারণত বিজ্ঞানের সত্য সন্ধানের প্রক্রিয়াটি দেখে বেশ মুগ্ধ হন, যখন তারা যা ইতিমধ্যে বিশ্বাস করেন, সেটিকে বিজ্ঞান সমর্থন করে); প্রতিটি মাস যা অতিক্রান্ত হচ্ছে যখন এ ধরনের কিছু প্রমান উপস্থাপন ছাড়া, আসলে এই বিষয়টি সেই সন্দেহর দিকে ইঙ্গিত দিচ্ছে, আদৌ সে রকম কিছু হবে না;

চিন্তাক্ষম বেশীর ভাগ মানুষই স্বীকার করবেন, কোন ধরনের পুলিশের মত নজরদারী ছাড়া বিদ্যমান যে নৈতিকতাবোধ কোন না কোন ভাবে আসলেই সত্যিকারের নৈতিকতাবোধ, সেই মিথ্যা নৈতিকতাবোধের তুলনায় অনেক শ্রেয়, যে মিথ্যা নৈতিকতাবোধ উধাও হয়ে যায় যে মুহূর্তে পুলিশরা ধর্মঘটে যায় বা লুকানো গোপন ক্যামেরা বন্ধ হয়; সেই স্পাই ক্যামেরা সত্যিকারের হোক, যা কিনা পুলিশ নজর রাখে কিংবা স্বর্গে থাকা কোন কাল্পনিক ক্যামেরাই হোক না কেন; কিন্তু হয়তো এটা পক্ষপাতমুক্ত না, নৈরাশ্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে, যদি ঈশ্বর না থাকে তাহলে ভালো হবার কি প্রয়োজন এই প্রশ্নটি ব্যবচ্ছেদ করা ((এইচ এল মেনকেন, আবারও তার বৈশিষ্টসুচক নৈরাশ্যবাদীতায় বিবেককে সংজ্ঞায়িত করেছিলেন, ভিতরের সেই কন্ঠস্বরকে যা আমাদের সাবধান করে দেয় কেউ হয়তো আপনাকে দেখছে))); কোন ধর্মীয় চিন্তাবিদ হয়তো আরো আন্তরিক কোন নৈতিকতা পুর্ণ ব্যাখ্যা দিতে পারবেন কাল্পনিক কোন ধর্মের পক্ষে সাফাই গাওয়া কোন অ্যাপোলজিষ্টের নীচের বক্তব্যের আদলে.. “আপনি যদি ঈশ্বরে বিশ্বাস না করেন, তাহলে আপনি নৈতিকতার কোন চুড়ান্ত মানদন্ডে বিশ্বাস করেন না; পৃথিবী সবচেয়ে শ্রেষ্ঠতম সদিচ্ছা নিয়ে আমি হয়তো ভালো মানুষ হবার চেষ্টা করবেন, কিন্তু আপনি কিভাবে সিদ্ধান্ত নেবেন কোনটা ভালো আর কোনটা খারাপ? শুধু ধর্মই পারে আপনাকে সেই ভালো আর মন্দর চুড়ান্ত মানদন্ডটি দিতে; ধর্ম অনুপস্থিতিতে এটি আপনাকে প্রয়োজন মাফিক বানিয়ে নিতে হবে; সেই নৈতিকতা হবে কোন নিয়ম গ্রন্থহীন; যখন প্রয়োজন তখন তৈরী করা নৈতিকতা; যদি নৈতিকতা শুধু মাত্র পছন্দ অপছন্দের ব্যপার হয়, তাহলে হিটলারও নিজেকে নৈতিক বলেই দাবী করতে পারে তার নিজস্ব ভ্রান্ত জীনগত বিশুদ্ধতা ধারনাপুষ্ট চিন্তাধারার ধারা অনুপ্রানিত হয়ে; এবং সব নাস্তিকরা যা করতে পারে তা হলো একটি ব্যক্তিগত পছন্দ বেছে নিতে যা দিয়ে তারা ভিন্নভাবে জীবনযাপন করবে; খৃষ্টার, ইহুদী বা মুসলিমরা এর ব্যতিক্রম, তারা অশুভ কোন কিছুর একটি চুড়ান্ত অর্থ দিতে পারে, যা স্থান কাল পাত্র ভেদে অভিন্ন এবং সেটি অনুযায়ী হিটলার চুড়ান্তভাবে অশুভ একটি চরিত্র‘;

ছবি: ব্রাড হল্যান্ড এর আরেকটি ইলাসট্রেশন

এমন কি যদি সত্যিও হয়, আমাদের নৈতিকতা সম্পন্ন হতে ঈশ্বরের প্রয়োজন আছে, সেটা অবশ্যই ঈশ্বরের অস্তিত্বর সম্ভাবনাকে বাড়িয়ে দেয় না, শুধু তার অস্তিত্বকে বেশী কাঙ্খিত করে তোলে (বেশীর ভাগ মানুষই এই দুটির মধ্যে পার্থক্য করতে পারেনা), কিন্তু সেটা বিবেচ্য বিষয় না এখানে; আমার কাল্পনিক ধর্ম সমর্থনকারী ব্যক্তিটির কোন প্রয়োজন নেই স্বীকার করার যে, ঈশ্বরের তোষামদ করা হচ্ছে তার জন্য ভালো কাজ করার জন্য ধর্মীয় প্রনোদনা; বরং তিনি দাবী করছেন যে ভালো কিছু করার 'উদ্দেশ্য'যেখান থেকেই আসুক না কেন, ঈশ্বর ছাড়া কোন মানদন্ডই বা সিদ্ধান্তকারক নেই যা দিয়ে আমরা নির্ধারন করতে পারি কোনটি ভালো; আমরা প্রত্যেকেই ভালোর একটি নিজস্ব সংজ্ঞা তৈরী করে নিতে পারি এবং সেভাবে আচরন করতে পারি; শুধু ধর্মের উপর ভিত্তি করে থাকা নৈতিক মুলনীতি (এর বীপরিতে ধরুন গোল্ডেন রুল, যা ধর্মের সাথে সংশ্লিষ্ট করা হচ্ছে অহরহ কিন্তু তাদের উৎপত্তি হতে পারে অন্য কোথাও) কে বলা যেতে পারে অ্যাবসল্যুটিষ্ট বা চুড়ান্তবাদী ; ভালো হচ্ছে ভালো আর খারাপ হচ্ছে খারাপ এবং আমরা কোন বিশেষ ক্ষেত্রে কি হবে যেমন কেউ কষ্ট সহ্য করছে, তা নিয়ে মাথা ঘামাই না, আমার ধর্মীয় সমর্থনকারী দাবী করবে যে শুধু ধর্মই পারে কোনটা ভালো তার সিদ্ধান্ত নেবার ভিত্তি রচনা করতে,

বেশ কয়েকজন দার্শনিক, উল্লেখযোগ্যভাবে কান্ট (Kant), চুড়ান্ত বা অ্যাবসোল্যুট নৈতিকতার উৎস খোজার চেষ্টা করেছিলেন ধর্মীয় পরিমন্ডলের বাইরে; যদিও নিজে একজন ধার্মিক মানুষ ছিলেন, তার সময়ে যা অবশ্যম্ভাবী ছিল (((এটি কান্টের দৃষ্টিভঙ্গীগুলোর একটি মানসম্পন্ন ব্যাখ্যা; তবে বিখ্যাত দার্শনিক এ সি গ্রেলিং ব্যাখ্যা সহ যুক্তি দিয়েছিলেন (নিউ হিউম্যানিষ্ট জুলাই-আগষ্ট ২০০৬)) যে, যদি কান্ট বাহ্যিকভাবে তার সময়ে ধর্মীয় প্রধান সব আচার অনুষ্ঠানই মেনে চলতেন তবে তিনি আসলে সত্যি একজন নাস্তিক ছিলেন))); কান্ট নৈতিকতাকে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেন তার ঈশ্বরের উপর নয় বরং কর্তব্যর খাতিরে কর্তব্য সম্পাদনের উপর; তার বিখ্যাত ক্যাটেগরিক্যাল ইম্পেরাটিভ (((কান্টের নৈতিক দর্শনে কেন্দ্রে আছে ক্যাটেগরিক্যাল ইম্পেরাটিভ বা Categorical imperative, যা মুলত কোন কাজের উদ্দেশ্য বা মোটিভেশনকে মুল্যায়ন করার জন্য ব্যবহৃত হয়; তার ভাষায় ইম্পেরাটিভ হচ্ছে যে কোন একটি প্রস্তাব যা কোন কাজকে চিহ্নিত করে আবশ্যিক হিসাবে; দুই ধরনে ইম্পেরাটিভ এর প্রস্তাব করেছিলেন তিনি, Hypothetical imperatives যার প্রযোজ্য হয় যখন কেউ সেই কাজের উপর নির্ভর করে কোন একটি নির্দিষ্ট ফলাফল অর্জন করতে; যেমন আমি যদি আমার তৃষ্ণা পায়, আমাকে পান করতে হবে কিছু; কিন্তু ক্যাটেগরিক্যাল ইম্পেরাটিভ হচ্ছে কোন চুড়ান্ত বা অ্যাবসোল্যুট, নি:শর্ত প্রয়োজন যা যে কোন পরিস্থিতিতে যে কারো জন্য প্রযোজ্য, যা প্রয়োজনীয় এবং এর মুল উদ্দেশ্যও সেই কাজটির মধ্যে নিহিত; যে দাবীটির যৌক্তিকতা কোন উদ্দেশ্য বা ফলাফল দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়; যেমন চুরি করা যাবে না, একটি ক্যাটেগরিকাল ইম্পেরাটিভ, যা Hypothetical imperative থেকে আলাদা, যেমন যদি জনপ্রিয় হতে চাও তাহলে চুরি করো না কান্টের সবচেয়ে বিখ্যাত Categorical imperative টি হলো Act only according to that maxim whereby you can, at the same time, will that it should become a universal law))) আমাদের নির্দেশ দেয়, শুধু মাত্র এমন বিধি অনুযায়ী আচরণ করো যেখানে আপনি একই সাথে পারবেন এবং ইচ্ছা করতে পারবেন যে সেটা সর্বজনীন আইনে রুপান্তরিত হয়; এটা বেশ ভালোভাবেই কাজ করে মিথ্যা কথা বলার উদহারনের সাথে;এমন একটি পৃথিবীর কথা কল্পনা করুন, যেখানে মানুষ নীতিগত কারনে মিথ্যা কথা বলে, যেখানে মিথ্যা বলার কাজটিকে একটি ভালো এবং নৈতিক গুন হিসাবে বিচার করা হয়, এই ধরনের পৃথিবীতে, মিথ্যা কথা বলার ব্যপারটারই কোন অর্থ থাকবে না একসময়; কারন মিথ্যা জন্য প্রয়োজন ‘সত্য‘ সম্বন্ধে পুর্বধারনার উপস্থিতি তার একেবারে সংজ্ঞার জন্য; যদি কোন নৈতিক মুলনীতি হচ্ছে এমন কিছু যা কিনা সবাই অনুসরণ করবে বলে আমরা ইচ্ছা পোষন করে থাকি, তাহলে মিথ্যা কথা বলা কখনোই নৈতিক মুলনীতি হতে পারবে না কারন এই মুলনীতিটি নিজেই এর অর্থহীনতার কারনে অকেজো হয়ে পড়বে; মিথ্যা কথা বলা, জীবনের একট আইন হিসাবে, অন্তর্গত ভাবেই অস্থিতিশীল; আরো সাধারন অর্থে, স্বার্থপরতা বা ফ্রি-রাইডিং বা বিনাশ্রমে আরেকজনের সদিচ্ছার উপর ভর করে নিজের উপকার আদায় করে নেয়া বা পরজীবিতা হয়তো আমার জন্য একা্র জন্য কাজ করবে, একজন একাকী স্বার্থপর ব্যক্তির হিসাবে এবং আমার নিজেকে ব্যাক্তিগত সন্তুষ্টি দেবে; কিন্তু নিশ্চয়ই আমি আশা করতে পারিনা যে নৈতিক মুলনীতি হিসাবে সবাই স্বার্থপর পরজীবিতার নীতি অনুসরণ করবে, এর কারন শুধুমাত্র একটি হলেও তাহলো, কারো উপর তাহলে আমি আমার পরজীবিতার জীবন চাপিয়ে দিতে পারবো না;

কান্টীয় ইম্পেরাটিভগুলো আপাতদৃষ্টিতে কাজ করে, সত্যি কথা বলা এবং অন্যান্য কিছু ক্ষেত্রে; খুব সহজ নয় এটা বোঝা যে এই ধারনাটিকে কিভাবে সামগ্রিকভাবে সাধারন নৈতিকতার ক্ষেত্রেও সম্প্রসারণ করা যায়; কান্ট সত্ত্বেও, আমার সেই কাল্পনিক ধর্মীয় অ্যাপোলজিষ্ট এর সাথে একমত হবার প্রতি একটি প্রলোভন কাজ করে তা হলো চরম বা অ্যাবসল্যুটিষ্ট নৈতিকতার বিষয়গুলো সাধারনত পরিচালনা করে থাকে ধর্ম; কোন অনারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত মুমুর্ষ রোগীর নিজের অনুরোধের উপর ভিত্তি করে তাকে যন্ত্রনা থেকে মুক্তি দেয়াটা কি আসলেই সবসময় ভুল হবে? আপনার নিজের লিঙ্গর কারো সাথে সঙ্গমে লিপ্ত হওয়াটি আসলেই কি সবসময় ভুল হবে? কোন একটি ভ্রুণকে হত্যা করা কি আসলেই সবসময় ভুল? অবশ্য এমন মানুষ আছেন যারা ঠিক তাই বিশ্বাস করেন এবং তারা এর বিরুদ্ধে কোন তর্ক বা যুক্তির জায়গা রাখেন না; তারা মনে করে, যারা এ বিষয়ে দ্বিমত পোষন করবেন তাদেরকে গুলি করে হত্যা করা যেতে পারে: অবশ্যই রুপকার্থে, আক্ষরিক অর্থে না– শুধু মাত্র আমেরিকার অ্যাবরশন ক্লিনিকের কিছু চিকিৎসক ছাড়া (পরবর্তী অধ্যায় দেখুন); সৌভাগ্যজনকভাবে যদিও নৈতিকতার কোন বিষয়কে যে চুড়ান্তই হতে হবে এমন কোন কারণ নেই;

মোরাল দার্শনিক হচ্ছে মুলত: পেশাজীবি, যারা কোন ভালো আর কোনটা খারাপ সে বিষয়ে চিন্তাভাবনা করেন; রবার্ট হিন্ড চমৎকারভাবে যা বলেছিলেন, ’তারা একমত যে, নৈতিক ধারনা, দৃষ্টিভঙ্গীগুলোর যুক্তি দ্বারা তৈরী হতে হবে এমন বাধ্যবাধকতা নেই, তবে তা যুক্তি দিয়ে রক্ষা করতে পারার মত অবশ্যই হতে হবে‘;মোরাল দার্শনিকরা নিজেদেরকে নানাভাবে শ্রেনীবিভাগ করে থাকেন, তবে আধুনিক শব্দমালায় মুল বিভাজনটি হচ্ছে: ‘deontologists’ বা ডিওন্টোলজিষ্ট (যেমন কান্ট) এবং ‘consequentialists’ বা কনসিকোয়েন্সালিষ্ট (যেমন উটিলিটারিয়ান, জেরেমি

বেনথাম, ১৭৪৮ –১৮৩২); ডিওন্টোলজী হচ্ছে সেই বিশ্বাসের একটি পোষাকী নাম, যা দাবী করে নৈতিকতা মুলত: বিধি বা নিয়ম মেনে চলা, আক্ষরিক অর্থে এটি কর্তব্যর বিজ্ঞান, শব্দটির গ্রীক অর্থ যা কিছুর শর্ত দেয়া আছে; ডিওন্টোলজী কিন্তু নৈতিক অ্যাবসল্যুটিজম মত একই জিনিস নয়, কিন্তু বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই ধর্ম বিষয়ক কোন বইয়ে এই দুটির পার্থক্য নিয়ে সময় নষ্ট করার কোন প্রয়োজন নেই; অ্যাবসল্যুটিষ্টরা বিশ্বাস করেন, সঠিক এবং ভুলের একটি নিরঙ্কুশ বা চুড়ান্ত একটি অবস্থান আছে; যে অবশ্যকর্তব্য বা ইম্পেরাটিভগুলো যাদের দৃঢ় আঁটসাঁট বাধুনী তাদের ফলাফল বা পরিণতি সম্পর্কে কোন ধরনের তথ্য দেয় না; পরিনতিবাদী বা কনসিকোয়েন্সশিয়ালিষ্টরা আরো প্রাগম্যাটিক বা প্রয়োগবাদী মানসিকতায় বিশ্বাস করে যে, কোন একটি কাজের নৈতিকতাকে বিচার করা যাবে তার পরিণতি বা ফলাফল বিচার করার মাধ্যমে; কনসিকোয়েন্সশিয়ালিষ্টদের একটি সংস্করণ হচ্ছে উপযোগিতাবাদ বা ইউটিলিটারিয়ানিজম, বেনথাম ও তার বন্ধু জেমস মিল (১৭৭৩–১৮৩৬) এর মিলস এর ছেলে জন স্টুয়ার্ট মিলস (১৮০৬–১৮৭৩) সাথে যে দর্শন সংশ্লিষ্ট। উপযোগিতাবাদের এর সারাংশটি দুর্ভাগ্যজনকভাবে প্রায়শই বেনথামের খানিকটা অসঠিক মন্তব্য দিয়ে প্রকাশ করা হয়: greatest happiness of the greatest number is the foundation of morals and legislation' বা সবেচেয়ে বেশী সংখ্যক মানুষের জন্য সবেচেয়ে বেশী সুখ হচ্ছে নৈতিকতা এবং আইনের মুল ভিত্তি ;

সব চুড়ান্তবাদ কিন্তু ধর্ম থেকে আসেনি; তাসত্বেও, চরমবাদীদের নৈতিকতাকে ধর্মীয় দৃষ্টিকোন ছাড়া অন্য কোন প্রেক্ষাপটে বিচার করাটা খুব কঠিন;একটি প্রতিদ্বন্দী যা আমি চিন্তা করতে পারি তা হলো দেশপ্রেম, বিশেষ করে যুদ্ধের সময়; বিখ্যাত স্পেনীয় চিত্রপরিচালক লুইস বুনুয়েল বলেছিলেন, 'ঈশ্বর এবং দেশ হচ্ছে অপরাজিত একটি টিম; তারা নিপীড়ন এবং রক্তপাতের সকল রেকর্ড ভঙ্গকারী'; সেনাবাহিনীর নিয়োগকর্তারা বিশেষভাবে নির্ভর করেন তাদের শিকারদের দেশপ্রেমের উপর; প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় নারীরা যে সমস্ত তরুণরা সামরিক বাহিনীতে যোগ দেয়নি তাদের সাদা পালক বিতরণ করতো এই বলে যে:

> ওহ, আমরা তোমাদের হারাতে চাইনা, কিন্তু আমরা মনে করি তোমাদের যুদ্ধে যাওয়া উচিৎ, কারন রাজা এবং দেশ উভয়েরই প্রয়োজন আছে তোমরা যেন সেভাবে দ্বায়িত্ব নাও;

যারা কনসায়েনশাস অবজেক্টর বা বিবেকের তাড়নায় যুদ্ধে অংশগ্রহন করেনি, তাদের মানুষ ঘৃণা করেছিল, এমন কি যারা দেশের শত্রু তাদের ক্ষেত্রেও ; কারণ দেশপ্রেমকে চুড়ান্ত বা অ্যাবসল্যুট গুন হিসাবে মনে করা হয়, কোন পেশাগত সৈন্যর বিশ্বাস করা 'সঠিক কিংবা ভুল হোক আমার দেশ' এর চেয়ে চুড়ান্ত কিছু খুজে পাওয়া কঠিন; কারন এই শ্লোগান আপনাকে বাধ্য করবে যে কাউকে হত্যা করার জন্য, যাকে ভবিষ্যতে কোন রাজনীতিবিদরা হয়তো শত্রু হিসাবে চিহ্নিত করবে; পরিনতিবাদী যুক্তিতর্ক হয়তো যুদ্ধে যাবার রাজনৈতিক সিদ্ধান্তটিকে প্রভাবিত করতে পারে কিন্তু একবার যখন যুদ্ধ ঘোষনা হয়, চুড়ান্ত দেশপ্রেম তার দৃঢ় শক্তি দিয়ে সব কিছু অধিগ্রহন করে, যে ধরনের শক্তি সাধারনত ধর্মের বাইরে দেখা যায় না; একজন সৈন্য যে তার নিজস্ব পরিনতিবাদী চিন্তাকে অনুমতি দেয় বেশী বাড়াবাড়ি না করতে, তার নিজেকে কোর্ট মার্শালের মুখোমুখি দেখবার ও এমনকি মৃত্যুদন্ডে প্রান হারাবার সম্ভবনা বেশী;

নৈতিক দর্শন নিয়ে এই আলোচনার সুত্র ছিল ধর্মবাদীদের একটি হাইপোথেটিক্যাল দাবী যে, ঈশ্বর ছাড়া, নৈতিকতা হচ্ছে আপেক্ষিক এবং কাল্পনিক; কান্ট এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠিত মোরাল দার্শনিকরা বাদে এবং দেশপ্রেমের অনুভুতির তীব্রতার প্রতি যথাযোগ্য নজর সহ, অ্যাবসল্যুট মোরালিটির শ্রেয়তর উৎস হচ্ছে সাধারণত কোন না কোন একটি পবিত্র ধর্ম গ্রন্থ, যাদের ব্যাখ্যা করা হয় এমন কর্তৃত্বশালী হিসাবে যার কর্তৃত্ব ইতিহাসের যৌক্তিকতা প্রমানের তোয়াক্কা করে না; আসলেই ধর্মগ্রন্থের কর্তৃত্বের অনুসারীরা হতাশাজনকভাবে খুব সামান্যই কৌতুহল প্রদর্শন করে তাদের ধর্মগ্রন্থের ঐতিহাসিক উৎপত্তি সম্বন্ধে (সাধরণত যা খুবই সন্দেহজনক);

পরবর্তী অধ্যায়ে যে বিষয়টি প্রদর্শন করবে তাহলো যে কোন ক্ষেত্রেই হোক না কেন, যে মানুষগুলো দাবী করে তাদের নৈতিকতাবোধগুলো তারা পেয়েছে ধর্মগ্রন্থ থেকে, তারা আসলে প্রায়োগিক ক্ষেত্রে তা কিন্তু ব্যবহার করছে না; এবং সেটি অবশ্যই ভালো, যা তারা নিজেদেরও, বিষয়টি নিয়ে কিছুটা ভাবলে সত্যটি স্বীকার করে নেয়া উচিৎ;

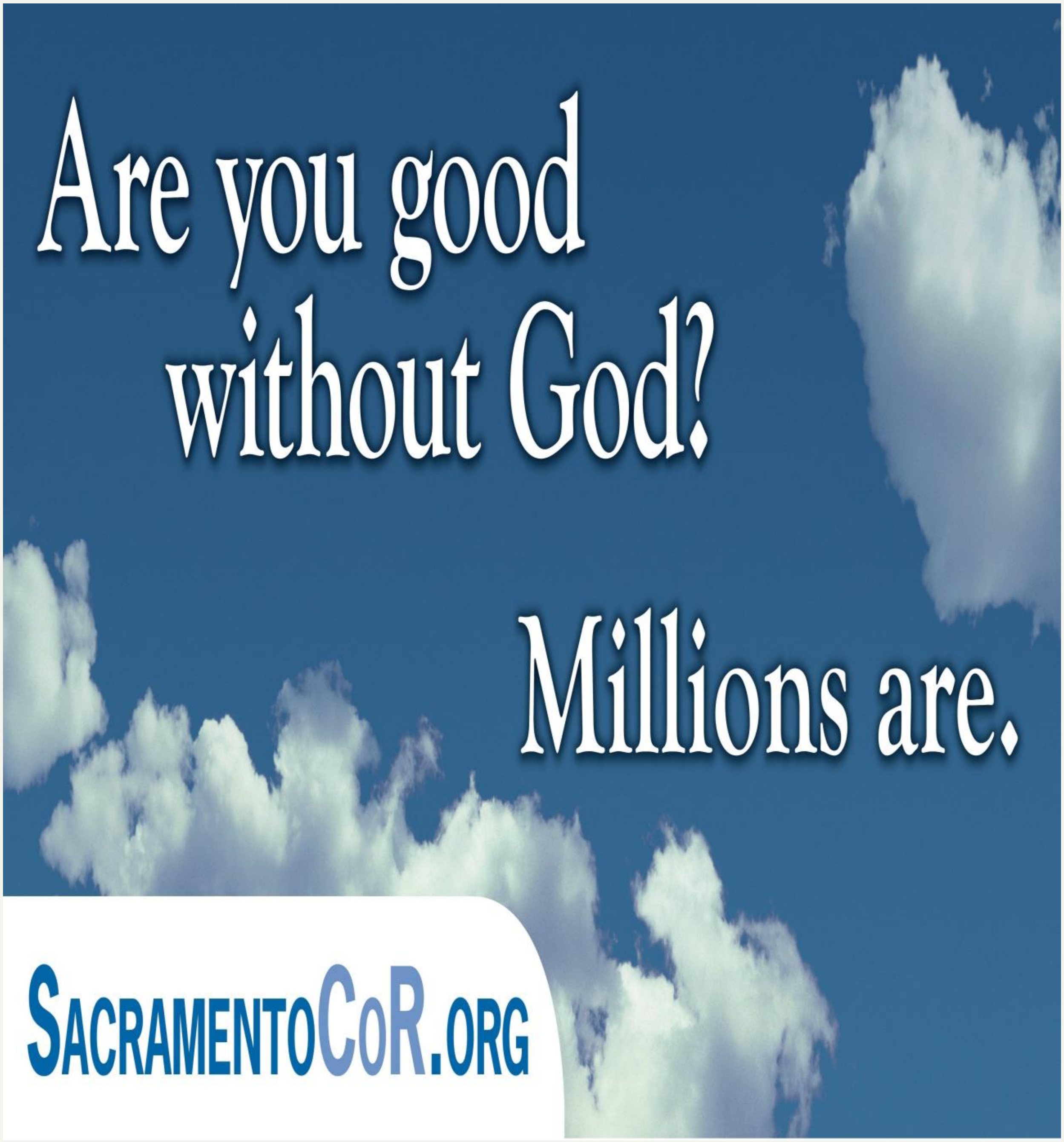
Are you good without God?
Millions are.
SACRAMENTOCoR.ORG

ষষ্ঠ অধ্যায় (শেষ পর্ব) সমাপ্ত

রিচার্ড ডকিন্স এর দি গড ডিল্যুশন : সপ্তম অধ্যায় (প্রথম পর্ব)

By K M Hassan

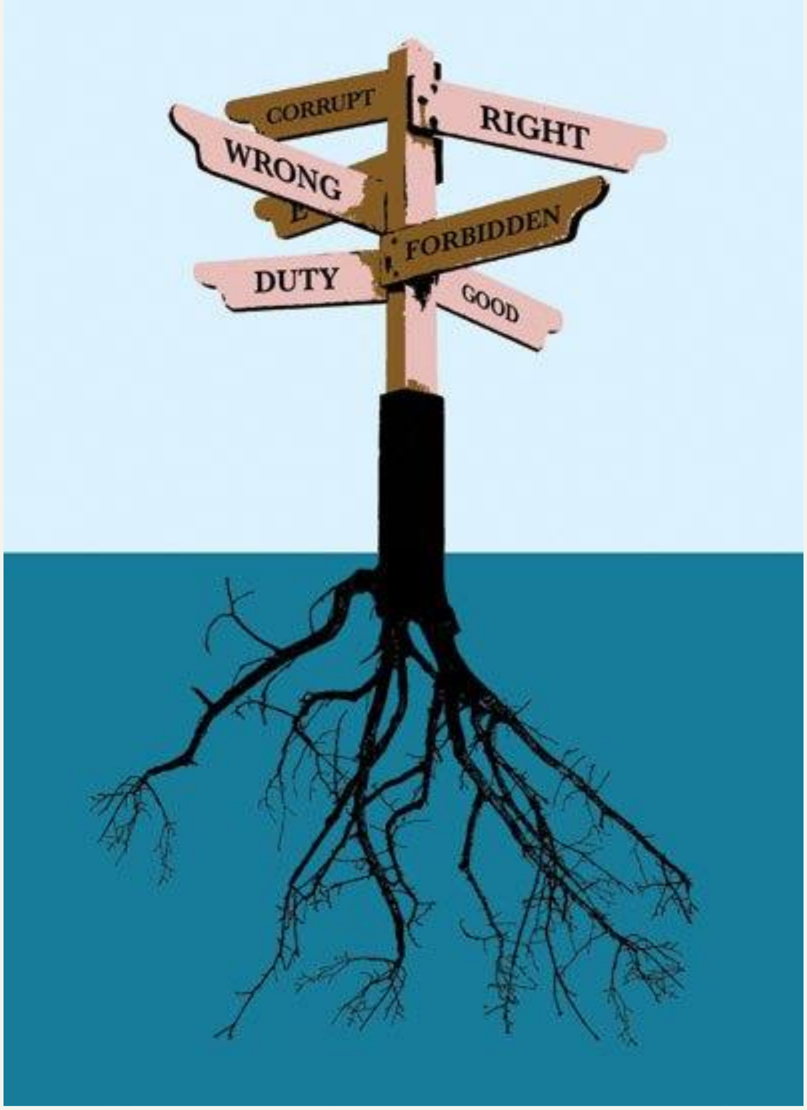
CORRUPT
RIGHT
WRONG
FORBIDDEN
DUTY
GOOD

ছবি: ইন্টারনেট

রিচার্ড ডকিন্স এর দি গড ডিল্যুশন : সপ্তম অধ্যায় (প্রথম পর্ব)
(অনুবাদ প্রচেষ্টা: কাজী মাহবুব হাসান)

The God Delusion by Richard Dawkins

প্রথম অধ্যায়
দ্বিতীয় অধ্যায়
তৃতীয় অধ্যায়
চতুর্থ অধ্যায় (প্রথম পর্ব), চতুর্থ অধ্যায় (দ্বিতীয় পর্ব),
চতুর্থ অধ্যায় (তৃতীয় পর্ব), চতুর্থ অধ্যায় (চতুর্থ পর্ব), চতুর্থ অধ্যায় (শেষ পর্ব)
পঞ্চম অধ্যায় (প্রথম পর্ব), পঞ্চম অধ্যায় (দ্বিতীয় পর্ব), পঞ্চম অধ্যায় (তৃতীয় পর্ব)
পঞ্চম অধ্যায় (চতুর্থ পর্ব), পঞ্চম অধ্যায় (পঞ্চম পর্ব), পঞ্চম অধ্যায় (ষষ্ঠ পর্ব)
ষষ্ঠ অধ্যায় (প্রথম পর্ব); ষষ্ঠ অধ্যায় (দ্বিতীয় পর্ব); ষষ্ঠ অধ্যায় (শেষ পর্ব)

‘পবিত্র’ গ্রন্থ এবং যুগের সাথে বদলে যাওয়া নৈতিকতার জাইটগাইষ্ট বা যুগধর্ম

Politics has slain its thousands, but religion has slain its tens of thousands.
Sean O’ Casey

দুটো উপায়ে ধর্মগ্রন্থ বা স্ক্রিপচার নৈতিকতা আর জীবন যাপন করার প্রয়োজনীয় বিধির উৎস হতে পারে; একটি হচ্ছে সরাসরি নির্দেশনা প্রদানের মাধ্যমে, যেমন, টেন কম্যান্ডমেন্টস (Ten commandments) এর মাধ্যমে, যা যুক্তরাষ্ট্রের বুনডকস বা অনগ্রসর গ্রামাঞ্চলে সাংস্কৃতিক যুদ্ধের তীব্র তর্ক বিতর্কের একটি অত্যন্ত তিক্ত বিষয়। অন্য উপায়টি হচ্ছে উদহারনের মাধ্যমে: যেমন ঈশ্বর বা বাইবেলের অন্য কোন চরিত্র হয়তো – যাকে আধুনিক ভাষায় বলা যায় – রোল মডেল– সেই দ্বায়িত্ব পালন করে; দুটোই ধর্মগ্রন্থ মোতাবেক নৈতিকতা শিক্ষা দানের পন্থা, যদি খুব ধার্মিকভাবে (এই ক্রিয়াগুনটি ব্যবহার করা হয়েছে রুপাকার্থে তবে এর উৎসর প্রতি নজর রেখে) মেনে চলা যায়, সেটি এমন একটি নৈতিক সিস্টেমকে উৎসাহিত করে যা যে কোন সভ্য আধুনিক মানুষই , সে ধার্মিক হোক বা না হোক, মনে করতে পারেন, অত্যন্ত জঘন্য, আমি এর চেয়ে মৃদুভাবে বিষয়টি বলতে অক্ষম।

নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বললে বাইবেল এর বেশীর ভাগ অংশ কিন্তু পদ্ধতিগতভাবে অশুভ নয় বরং বলা যায় স্পষ্টতই খুব অদ্ভুত, যেমনটা প্রত্যাশিত আসলে এধরনের কোন এলোমেলোভাবে জোড়া লাগানো পরস্পর বৈসাদৃশ্য কতগুলো ডকুমেন্ট এর একটি সংগ্রহর কাছে; প্রায় নয় শতাব্দী জুড়ে যা রচিত, সংযোজিত, পুণসংশোধিত, সম্পাদিত, অনুদিত, বিকৃত এবং ‘উৎকর্ষ সাধিত হয়েছে শত শত নামহীন লেখক, সম্পাদক,অনুলিপিকারীদের দ্বারা, যারা আমাদের কাছে যেমন, তেমনি পরস্পরের কাছেও অচেনা; বাইবেল এর খুব বেশী অদ্ভুত ব্যাপারগুলো ব্যাখা হয়তো দিতে পারে এই ব্যপারটি। কিন্তু দু:খজনকভাবে এই একই অদ্ভুত বইটা ধার্মিক অতিউৎসাহীরা ব্যবহার করে আমাদের নৈতিকতার এবং জীবন যাপনের প্রয়োজনীয় বিধির কখনোই ভুল হতে পারে না এমন কোন উৎস হিসাবে। যারা তাদের নৈতিকতাকে আক্ষরিক অর্থে বাইবেল ভিত্তিক করে তোলার ইচ্ছা পোষন করেন, তারা হয় বাইবেল পড়েননি বা তা আদৌ বোঝেননি, যেমন বিশপ জন শেলবী স্পঙ (John Shelby Spong) তার The Sins of Scripture সঠিকভাবে পর্যবেক্ষন করেছিলেন, প্রসঙ্গক্রমে বলে রাখি বিশপ স্পঙ, উদারপন্থী বিশপদের মধ্যে একটি চমৎকার উদহারন, যার বিশ্বাস যথেষ্ট পরিমান অগ্রসর এবং তা সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ যারা নিজেদের খৃষ্টান বলেন তাদের থেকে প্রায় সম্পুর্ণ ভিন্ন; তার বৃটিশ সমতুল্য হচ্ছেন রিচার্ড হলোওয়ে, এডিনবরা বিশপের দ্বায়িত্ব থেকে যিনি সম্প্রতি অবসর গ্রহন করেছেন। বিশপ হলওয়ে এমনকি নিজেকে বর্ণনা করেছেন আরোগ্য লাভের পথে একজন এক খৃষ্টান হিসাবে। তার সাথে একটি উন্মুক্ত আলোচনা করার সুযোগ হয়েছিল এডিনবরায়, যা অন্যতম একটি কৌতুলোদ্দীপক সাক্ষাৎকার ছিল আমার জন্য।

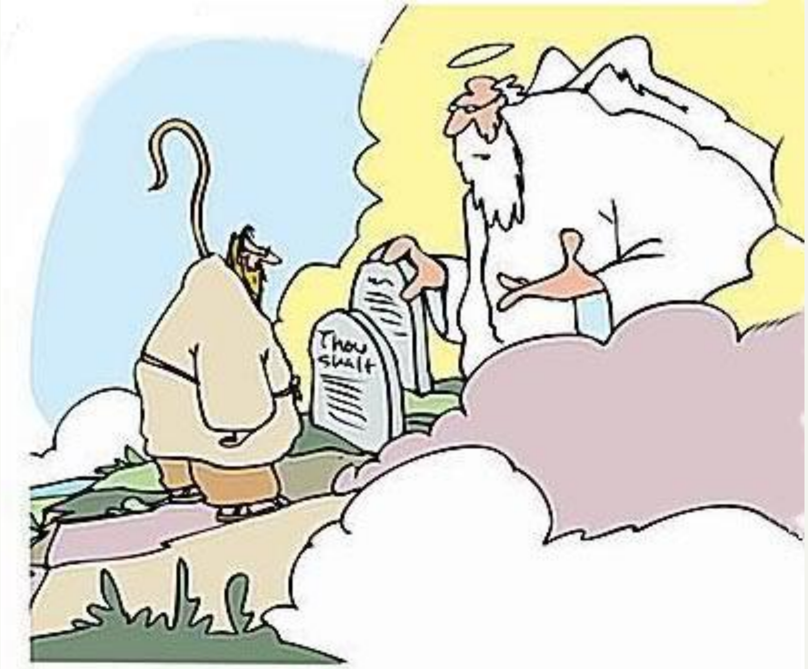

"Then, each month, you'll receive a new set of commandments. Cancel anytime and keep the first set, absolutely free."

ওল্ড টেষ্টামেন্ট:

জেনেসিস বা সৃষ্টির কাহিনী দিয়ে শুরু হওয়া, নোয়া'র অত্যন্ত লোকপ্রিয় গল্প সহ, যার মুল উৎস ব্যাবিলনীয় উটা–নাপিসথিম (Uta-Napisthim) এর পুরাণ কাহিনী এবং বেশ কয়েকটি সংস্কৃতির প্রাচীন পুরাণেও যা পরিচিত; জোড় বেধে সব প্রানীদের নোয়ার আর্ক বা নৌকায় ওঠার পুরাণ কাহিনী বেশ আবেদনময় আর সুন্দর,তবে নোয়ার এই গল্পের নৈতিক শিক্ষাটা কিন্তু ভয়ঙ্কর; মানুষ সম্পর্কে ঈশ্বর নেতিবাচক ধারনা পোষন করেন, সুতরাং তিনি (একটি মাত্র পরিবার ছাড়া) বাকীদের সবাইকে পানিতে ডুবিয়ে হত্যা করেন, যাদের মধ্যে শিশুরাও ছিল, এবং সেই সাথে আর্কের মধ্যে আশ্রয় নেয়া প্রানীরা ছাড়া, বাকী সব প্রানীকেও হত্যা করেন(যারা স্পষ্টতই নির্দোষ)।

অবশ্য বিরক্ত ধর্মতত্ত্ববিদরা প্রতিবাদ করতে পারেন যে আমরা এখন আর জেনেসিসের বইটাকে আদৌ আক্ষরিকভাবে গ্রহন করিনা। আর সেটাই আমার মুল বক্তব্য; আমরা ধর্মগ্রন্থ থেকে বেছে বেছে ঠিক করি কোন অংশটা বিশ্বাস করবো আর কোন অংশটা প্রতীকি বা রুপক বলে চিহ্নিত করবো; এ ধরনের যাচাই বাছাই করার বিষয়টি ব্যক্তিগত সিদ্ধান্তের ব্যপার, যেমন কম বেশী নীরিশ্বরবাদীদের এই নৈতিক নির্দেশনা মান্য করার ক্ষেত্রে তাদের নেয়া সিদ্ধান্তর মত বা সেটা একটি ব্যাক্তিগত সিদ্ধান্ত চুড়ান্ত কোন ভিত্তি ছাড়া; যদি এর মধ্যে কোনটি " যখন যা প্রয়োজন সেই অনুযায়ী নৈতিকতা" হয়ে থাকে, তাহলে অন্যটিও তাই;

শিক্ষিত ধর্মতাত্বিকদেন ভালো উদ্দেশ্য থাকা সত্বেও, ভয়ঙ্কর রকম একটি বিশাল অংশের মানুষ নোয়ার গল্প সহ তাদের ধর্মগ্রন্থ আক্ষরিকভাবে মাণ্য করেন; গ্যালাপ পোল বলছে, যুক্তরাষ্ট্রের ইলেক্টরেটদের মধ্যে তাদের সংখ্যা প্রায় ৫০ শতাংশ; এছাড়া কোন সন্দেহ নেই বহু এশিয়ার সাধু সন্তরা যাদের অনেকেই ২০০৪ সালের ভয়াবহ সুনামির কারন হিসাবে চিহ্নিত করেছে, প্লেট টেকটোনিক এর নাড়াচড়া না বরং মানুষের পাপকর্ম যেমন মদ্যপান থেকে

শুরু করে, মদ্যশালায় নাচ থেকে সাবাথ (জেনেসিস এ বর্ণিত সপ্তাহের বিশ্রামের দিন) এর কোন ছোটখাট বিধি না মানার পাপ ইত্যাদী; নোয়ার গল্পে আকন্ঠ নিমজ্জিতপুর্ণ, বাইবেল এর শিক্ষা ছাড়া আর সবকিছু সম্বন্ধে অজ্ঞ, এইসব মানুষদের কে দোষ দিতে পারে? তাদের পুরো শিক্ষাই তাদের শিখিয়েছে প্রাকৃতিক দুর্যোগ মানুষের কর্মকান্ডের সাথেই যুক্ত, মানুষের পাপের ফলাফল, কখনোই প্লেট টেকটোনিক এর মত নৈর্ব্যাক্তিক কোন কিছুর কারনে হবার মত কিছু নয়। এছাড়া লক্ষনীয় যে কি পরিমান অহংকারী অন্ধ আত্মকেন্দ্রিকতা থাকলে বিশ্বাস করা সম্ভব যে, পৃথিবী কাপানো ঘটনাগুলো, যে মাত্রায় সাধারনত একজন ঈশ্বর (বা একটি টেকটোনিক প্লেট) কাজ করতে পারে, তার সাথে অবশ্যই আমরা মানুষদের কোন সংযোগ আছে; কেনই বা একজন স্বর্গীয় সত্বা, যিনি ব্যস্ত সৃষ্টি আর অনন্তকাল নিয়ে, মানুষের অপকর্মগুলো নিয়ে কেন মাথা ঘামাবেন? আমরা মানুষরাই আমাদের এই প্রবোধ দেই, নিজেদের তুচ্ছ ছোটখাট ’পাপগুলো’ এমনকি মহাজাগতিক বা কসমিক পর্যায়ে বিশাল, মহাগুরুত্বপুর্ণ করে তুলি একেবারে?

টেলিভিশনের জন্য আমি যখন রেভারেন্ড মাইকেল ব্রে, যুক্তরাষ্টেরএকজন সুপরিচিত গর্ভপাত বিরোধী আন্দোলনের নেতার সাক্ষাৎকার নিয়েছিলাম, আমি তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, কেন ইভানেজেলিকাল খৃষ্টানরা একজন মানুষের ব্যক্তিগত যৌন পছন্দ, যেমন সমকামীতা নিয়ে কেন এত মোহাবিষ্ট থাকে, যা অন্য কারো জীবনে কোন সমস্যা করছে না; তার উত্তর ছিল খানিকটা আত্মপক্ষ সমর্থন; ঈশ্বর যখন কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগের আঘাত হানেন কোন শহরের উপর, কারণ যেখানে পাপীদের বসবাস, তার প্বার্শ প্রতিক্রিয়া আর অনিচ্ছাকৃত ক্ষতির শিকার হয় নিষ্পাপ অবুঝ নাগরিকরাও; ২০০৫ সালে চমৎকার শহর নিউ অর্লিয়ন্স* হারিকেন কাতরিনা পরবর্তী ভয়ঙ্কর বন্যার কবলে আক্রান্ত হয়, রেভারেন্ড প্যাট রবার্ট, যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে সুপরিচিত টেলিভ্যানজেলিষ্ট এবং একজন প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী, এই হারিকেন এর জন্য ঘটনাচক্রে নিউ অর্লিয়ন্স শহরে বসবাসকারী একজন লেসবিয়ান কমেডিয়ানকে দায়ী করে মন্তব্য করেছিলেন, আপনি ভাবতেই পারেন মহাক্ষমতাধর ঈশ্বর পাপীদের শায়েস্তা করতে খানিকটা সুনির্দিষ্ট নিশানা মাফিক কোন পথ বেছে নিতে পারতেন যেমন সময় মত হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যাওয়ার ঘটনা হয়তো বেছে নিতে পারতেন সমস্ত শহরকে নির্বিচারে ধ্বংশ করার বদলে, কারন সেই শহর ঘটনাচক্রে একজন লেসবিয়ান কমেডিয়ানের বাসস্থান;

নভেম্বর ২০০৫ এ, পেনসিলভেনিয়ার ডোভারের নাগরিকরা পুরো স্থানীয় স্কুল বোর্ডকে ভোট দিয়ে বাদ দিয়ে দেন, পুরো মৌলবাদীদের পুরো একটি গ্রুপ যারা শহরটিকে কুখ্যাতি এনে দিয়েছিল, হাস্যকর না হয় বাদই দিলাম, স্কুলে জোর করে ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইন পড়ানোর প্রচেষ্টা করেছিলেন, যখন প্যাট রবার্টসন জানতে পারেন যে মৌলবাদীরা গণতান্ত্রিক উপারে ভোটে পরাজিত হয়েছে ব্যালট বক্সে, তিনি ডোভারের প্রতি কঠিন একটি হুশিয়ারী বার্তা শোনান:

> আমি ডোভারের সকল সুনাগরিকদের বলছি, যদি আপনাদের এলাকায় কোন মহাদুর্যোগ হয়, ঈশ্বরের কাছে অনুগ্রহ প্রার্থনা করবেন না, আপনারা তাকে আপনাদের শহর থেকে বহিষ্কার করেছেন এইমাত্র এবং ভাববেন না যে কেন যখন বিপদ শুরু হলে, কেন তিনি আপনাদের সাহায্য করেননি। আমি বলছি না সেরকম কিছু হবে, কিন্তু যদি হয়, মনে রাখবেন, আপনারা ভোট দিয়ে তাকে শহর ছাড়া করেছেন মাত্র; সেক্ষেত্রে তাহলে তার সাহায্যর জন্য কোন প্রার্থনা করবেন না, কারন তিনি সেখানে নাও থাকতে পারেন;

প্যাট রবার্টসন নির্মল হাস্যরসের বিষয়বস্তু হতে পারতো, যদি না তিনি আজ যুক্তরাষ্ট্রে যারা ক্ষমতা আর প্রভাবের কেন্দ্রে অবস্থান করেন তাদের চেয়ে খানিকটা ভিন্ন হতেন;

ঈশ্বরের সডোম আর গমোরাহর ধ্বংশের সময়, নোয়ার সমতুল্য একজনকে তার পরিবারসহ বেছে নেন সেই মহা ধ্বংশযজ্ঞ থেকে রক্ষা করার জন্য কারন, কারন একমাত্র তিনি ছিলেন সেখানে বসবাসকারী একজন অন্যন্যতম সৎ ন্যায়নিষ্ঠ ব্যক্তি, আত্মীয়তার সুত্রে আব্রাহামের ভাইপো ছিলেন লট (Lot); দুজন পুরুষ ফেরেশতাকে সডোম এ লটের কাছে প্রেরণ করা হয় তাকে সতর্ক করে দিতে, সে যেন দ্রুত শহর তার পরিবার সহ চলে চায়, কারন শহরের উপর ঈশ্বরের শাস্তির স্বরুপ আগুনের পাথর বা বিব্লিকাল ব্রিমস্টোন নেমে আসছে; লট আথিতেয়তার সাথে

ফেরেশতাদের তার বাসায় স্বাগত জানান; খবর পেয়ে সডোমের অন্য পুরুষরা একসাথে জড়ো হয়ে সেখানে এসে লটের কাছে দাবী করে, ফেরেশতা দুজনকে যেন তাদের হাতে তুলে দেয়া হয়, যেন তারা তাদের পায়ু ধর্ষন করতে পারে (....আর কি?): আজ রাতে আপনার বাসায় যে মানুষ দুজন এসেছে তারা কোথায়? আমাদের সামনে তাদের নিয়ে আসুন, যেন আমরা তাদের জানতে পারি (জেনেসিস ১৯:৫) ; হ্যা, এই 'জানা" শব্দটি বাইবেল এর প্রামান্য স্বীকৃত সব সংস্করনে একটি প্রচলিত সুভাষন; যা এই প্রসঙ্গে খুবই হাস্যকর;শহরবাসীদের দাবীকে অস্বীকার করার মধ্যে লটের সাহসিকতা প্রথমে মনে হতে পারে, হয়তো ঈশ্বর ঠিকই কোনেএকিটি ব্যাপার ধরতে পেরেছেন লটের মধ্যে, যখন তিনি তাকে আলাদা করেছিলের সডোমের একমাত্র ভালো মানুষ হিসাবে, কিন্তু লটের এই ভালোত্ব কলঙ্কময় হয়ে যা তার সেই অস্বীকার করার শর্তাবলীর দ্বারা: আমি আপনাদের কাছে প্রার্থনা করছি, আমার শহরবাসী ভাইগন, অশুভ কোন আচরন করা থেকে বিরত থাকুন; এখন দেখুন, আমার দুটি কন্যা আছে যারা কোন পুরুষকে কখনো জানেনি; আপনাদের কাছ মিনতি করছি, আমাকে তাদের আপনাদের সামনে উপস্থিত করার অনুমতি দিন,আপনারা যা কিছু করতে চান তাদের সাথে করুন, এই দুইজনের সাথে কিছু করবেন না, কারন তারা আমার ছাদের ছায়ার নীচে আশ্রয় নিয়েছে (জেনেসিস ১৯;৭-৮) ;

এই আজব গল্পের যে অর্থই থাকুক না কেন, এটি নি:সন্দেহে তীব্রভাবে ধর্মীয় সংস্কৃতিগুলোয় নারীদের প্রতি যে ধরনের সন্মান প্রদর্শন করা হয় সে সম্বন্ধে একটি ধারনা দেয়; গল্পটি কিছুটা আগালেই দেখা যায়, নিজের মেয়েদের কুমারীত্বকে বিলিয়ে দেবার লটের এই প্রস্তাবের কোন প্রয়োজনীয়তা ছিল না, কারন ফেরেশতারা সফল হয়েছিল আক্রমনরত জনতাকে ঠেকিয়ে দিতে ,অতিপ্রাকৃত উপায়ে শহরবাসী পুরুষদের অন্ধ করে দেবার মাধ্যমে; তারপর তারা লটকে দ্রুত তার পরিবার ও তার পোষা প্রানীদের নিয়ে শহর ছেড়ে যাবার জন্য তাড়া দেয়, কারন পুরো শহরটা কিছুক্ষনের মধ্যে ধ্বংশ হতে যাচ্ছে; লটের পুরো পরিবার পালাতে সক্ষম হয়, শুধু মাত্র লটের হতভাগ্য স্ত্রী ছাড়া, যাকে ঈশ্বর লবনের একটি স্তম্ভতে রুপান্তরিত করেন কারন তিনি একটি অপরাধ করেছিলেন – চিন্তা করলে দেখছে যা তুলনামুলকভাবে খুবই সামান্য – পেছন ফিলে তিনি সডম এর ধ্বংশলীলা বা ঈশ্বরের ফায়ার ওয়ার্ক দেখেছিলেন;

লটের দুই কন্যা সংক্ষিপ্তভাবে আবার গল্পে ফিরে আসে; তাদের মা লবনের পিলারে পরিনত হবার পর, তারা তাদের পিতার সাথে একটি গুহায় বসবাস করতো, পুরষসঙ্গ বঞ্চিত দুই বোন সিদ্ধান্ত নেয় তারা তাদের পিতাকে নেশাগ্রস্থ করে তার সাথে সঙ্গমে লিপ্ত হবে, লট মাতাল অবস্থায় লক্ষ্যই করতে পারেননি যে তার বড় মেয়ে তার শয্যায় এসেছে বা কখন সে তার শয্যা ছেড়ে গেছে... কিন্তু স্পষ্টতই তিনি যথেষ্ট মাতাল ছিলেন না তার কন্যাকে অন্তসত্বা করার জন্য, সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এরপরের রাতে ছিল ছোট বোনের পালা, আবারো লট নাকি এমনই মাতাল যে লক্ষ্য করতে পারলেন না কি হয়েছে, এবং তাকেও অন্তসত্বা করে ফেললেন (জেনেসিস ১৯:৩১-৬) ; এই অদ্ভুত সমস্যাপুর্ণ পরিবার যদি সডমের সেরা পরিবার হয় নৈতিকতার শিক্ষা দেবার জন্য, ঈশ্বর এবং তার বিচারের অস্ত্র ব্রিমস্টোন বা পাথরের আগুন দিয়ে পোড়ানোর শাস্তি ব্যপারে যে কেউই নির্দিষ্টভাবে খানিকটা সমবেদনা অনুভব করতে পারবেন;

লট এবং সডমবাসীদের গল্প বিস্ময়কর ভাবে ওল্ড টেষ্টামেন্ট এর ১৯ তম অধ্যায়, বুক অব জাজেস (Book of Judges) এ খানিকটা ভিন্নভাবে পুনরাবৃত্তি ঘটে, যেখানে একজন নামহীন লেভাইট (যাজক) তার উপপত্নী নিয়ে গিবিয়াহ তে ভ্রমন করছিলেন, যাত্রার সময় তারা একজন সদয় অতিথিবৎসল বৃদ্ধের বাড়িতে একটি রাত কাটান; যখন তারা রাতের খাবার খাচ্ছিলেন, শহরের পুরুষরা জড়ো হয়ে সেই বাসার দরজায় কড়া নাড়ে, তারা বৃদ্ধের কাছে দাবী জানান, তার পুরুষ অতিথিকে তাদের হাতে তুলে দেবার জন্য, 'যেন আমরা তাকে 'জানতে'পারি;' প্রায় লটের সেই বাক্য ব্যবহার করে বৃদ্ধ গৃহকর্তা বলেন, 'না, আমার ভাইরা, না, আপনাদের কাছে আমি প্রার্থনা করি, এতটা খারাপ আচরন করবেন না, এই মানুষটা আমার বাসায় এসেছে দেখে এই আচরন করবেন না, দেখুন আমার কন্য একজন কুমারী এবং তার উপপত্নী এখানে আছে, তাদের আমি নিয়ে আসছি, তাদেরকে আপনারা আপনাদের

অনুগত করে নেন ...তাদের সাথে যা খুশি করুন..যেটা করতে ভালো লাগে আপনাদের, কিন্তু এই মানুষটার সাথে কোন খারাপ কিছু দয়া করে করবেন না (জাজেস ১৯:২৩-৪)‘; আবারো নারীবিদ্বেষী নৈতিকতার স্বরুপ দেখা গেল..সুস্পষ্টভাবে; বিশেষ করে এই বাক্যটা ‘humble ye them’ পড়লে আমি শিউরে উঠি; আমার মেয়ে আর যাজকের উপপত্নীকে নিয়ে ইচ্ছামত অপমান আর ধর্ষন করে আপনারা আনন্দ করুন, কিন্তু আমার অতিথির প্রতি যথাযথ সন্মান প্রদান করুন, কারন আর যাই হোক তিনি পুরুষ মানুষ; দুটো গল্পের মধ্যে সদৃশ থাকা সত্ত্বেও এখানে ঘটনার প্লটটি লটের কন্যাদের ভাগ্যে ঘটা ঘটনার চেয়ে অপেক্ষাকৃত কম সুখকর লেভাইট এর উপপত্নীর জন্য;

কাহিনীতে দেখা যা লেভাইট তার উপপত্নীকে উত্তেজিত জনতার হাতে তুলে দেয়, যাকে সারারাত ধরে গণধর্ষন করা হয়: “তারা তাকে ‘জানে’ এবং সারারাত ধরে অত্যাচার করে সকাল অবধি, এবং যখন ভোরের আলো ফুটতে থাকে, তারা তাকে ছেড়ে দেয়; এরপর রমনীটি খুব ভোরে সেই মানুষটির ঘরের দরজার সামনে এসে শুয়ে পড়ে, যেখানে তার স্বামী অধিপতি অবস্থান করছেন, পুরোপুরি সকাল হবার আগে; (জাজেস ১৯: ২৫-৬);” সকালে ঘুম থেকে উঠে লেভাইট তার উপপত্নীকে দরজার সামনে শুয়ে থাকতে দেখেন এবং বলেন – যা আজ যে কোন কারো কাছে মনে হতে পারে চুড়ান্ত অসংবেদনশীল – ‘ওঠো, আমাদের এখুনি বেরিয়ে পড়তে হবে, কিন্তু তার উপপত্নী অনড়, কারন তার মৃত্যু হয়েছে, সুতরাং লেভাইট একটি ধারালো ছুরি দিয়ে, তার তার উপপত্মীকে কেটে টুকরো টুকরো করে, তার হাড় সহ মোট ১২টি ভাগ করে টুকরোগুলো ইসরায়েল এর বিভিন্ন প্রান্তে প্রেরণ করে;‘ হ্যা আপনি ঠিকই পড়েছেন, জাজেস ১৯:২৯ দেখুন; খানিকটা করুনার সাথে এটিকে বাইবেলের সর্বব্যাপী উদ্ভট কিছু বিষয়ের একটি মনে করে নেই; এই গল্প আগে উল্লেখিত লটের গল্পর সাথে এতই মিল যে মনে হতে পারে,ভুল করে মুল পান্ডুলিপির কিছু পাতা প্রাচীন কোন স্ক্রিপটোরিয়াম বা পান্ডুলিপি রচনার ঘরে ওলটপালট হয়ে গেছে; পবিত্র টেক্সট এর অসামন্জষ্যপুর্ণ সব উৎপত্তির একটি উদহারণ।

লটের চাচা আব্রাহাম ছিলেন তিনটি প্রধান ও তথাকথিত ’মহান‘ একেশ্বরবাদী ধর্মের প্রত্যেকটিরও প্রতিষ্ঠাতা পিতা; তার পৈতৃক অবস্থান তাকে ঈশ্বরের চেয়ে সামান্য খানিক নীচে রোল মডেল হিসাবে উপস্থাপন করেছে তার অনুসারীদের কাছে; কিন্তু আধুনিক যুগের কোন নীতিবান মানুষ কি আসলেই তাকে অনুসরন করার ইচ্ছা পোষন করেন? তার সুদীর্ঘ জীবনের শুরুর দিকে, আব্রাহাম মিসরে গিয়েছিলেন তার স্ত্রী সারাহকে নিয়ে দুর্ভিক্ষ ভয়াবহতা থেকে বাচতে; কিন্তু তিনি অনুধাবন করতে পেরেছিলেন এমন সুন্দরী একজন সহচরী রমনী নিশ্চয়ই মিশরীয়দের কাছে কাঙ্খিত হবে, সুতরাং তার স্বামী হিসাবে তার নিজের জীবনটাও সারাক্ষন ঝুকির মধ্যে থাকতে পারে, সুতরাং তিনি তার স্ত্রীকে নিজের বোন হিসাবে পরিচয় দেন, আর সেই পরিচিতিতেই সারাহে ফারাও দের হারেম এ জায়গা দেয়া হয় এবং আব্রাহামও ফলাফলে ফারাওদের অনুগ্রহে বিপুল অর্থবিত্তের মালিক হন, ঈশ্বর আব্রাহামের এই সুবিধাবাদী ব্যবস্থা পছন্দ করেননি সুতরাং তিনি ফারাও এর প্রাসাদে প্লেগ পাঠালেন (মজার বিষয় হচ্ছে আব্রাহামের উপর না কেন), যথাযোগ্যকারনে ক্রুদ্ধ ফারাও আব্রাহামের কাছ জানতে চান কেন সে তাকে জানায়নি সারাহ তার স্ত্রী, এরপর তিনি সারাহকে আব্রাহামের কাছে ফিরিয়ে দেন এবং দুজনকে দেশ থেকে বের করে দেন (জেনেসিস ১২: ১৮-১৯); অদ্ভুতভাবে, এই দম্পতি সেই একই চালাকীর আশ্রয় নেবার চেষ্টা করে আবারো, এবার জেরার (Gerar) এর রাজা আবিমেলেখ এর কাছে, আব্রাহামের প্ররোচনায় তিনিও সারাহকে বিয়ে করার চেষ্টা করেন, কারন সারাহ তার বোন, স্ত্রী নয়, এমন একটি ধারনাই দিয়েছিল আব্রাহাম তাকে (জেনেসিস ২০:২-৫); পুরো ব্যাপারটা জানার পর তিনি তার তিনিও নিন্দা জানিয়েছেন, ফারাও এর মত সেই ঠিকই একই শব্দাবলী ব্যবহার করে; উভয় ক্ষেত্রেই এই দুটি নৃপতির জন্য সমবেদনা অনুভব করাটাই স্বাভাবিক; এই সদৃশ্যতা বাইবেলের তথ্যগত বিচ্যুতির আরেকটি ইঙ্গিত?

আব্রাহামের গল্পের এই সব অপ্রীতিকর ঘটনাগুলো খুব মামুলী অপরাধ মনে হবে যদি তার পুত্র আইজাককে বিসর্জন দেবার সেই কুখ্যাত কাহিনীর সাথে তুলনা করা হয় (মসুলমানদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থে আব্রাহামের অন্য পুত্র ইসমায়েলকে নিয়ে একই ঘটনার বিবরণ আছে); ঈশ্বর আব্রাহামকে একটি চুড়ান্ত আত্মত্যাগের পরীক্ষা হিসাবে তাকে

তার বহুকাঙ্খিত পুত্রকে বিসর্জন করার নির্দেশ দেন, আব্রাহাম ঈশ্বরের নির্দেশ মোতাবেক বিসর্জনের বেদী তৈরী করেন, তার উপর জ্বালানী কাঠ সাজিয়ে আইজাককে শুইয়ে দেন; জবাই করার জন্য প্রস্তুত ছুরি হাতে ঠিক তখুনি নাটকীয়ভাবে একজন ফেরেশতা সেখানে আবির্ভুত হন, এবং শেষ মুহূর্তে ঈশ্বরের পরিকল্পনার কিছু পরিবর্তন হয়েছে সেটি তাকে জানান: ঈশ্বর তাহলে আসলেই ঠাট্টা করছিলেন, আব্রাহামকে প্ররোচনা দিচ্ছিলেন তার বিশ্বাস কতটা মজবুত তা পরীক্ষা করার জন্য। একজন আধুনিক নৈতিকতাবাদী কেউ বিষয়টি না ভেবে পারেন না যে, কোনদিনও কি এই শিশুটি এধরনের মনস্তাত্বিক আঘাত থেকে নিজেকে নিরাময় করতে পারবে। আধুনিক নৈতিকতার মানদন্ড অনুযায়ী, এই ন্যাক্কারজনক গল্পের একই সাথে শিশু নির্যাতন এবং দুটি অসম শক্তির সম্পর্কের একপক্ষের বিশেষ জোর খাটানোর উদহারন আছে এবং এটি প্রথম বারের মত লিপিবদ্ধ হয়েছে নুরেমবার্গ ডিফেন্স এর ব্যবহার এর উদহারন.... ’আমি শুধু নির্দেশ অনুসরন করেছি’; তারপরও লিজেন্ড বা কিংবদন্তীর কাহিনী তিনটি একেশ্বরবাদী ধর্মের প্রত্যেকটির সেই পুরাণ বা মিথ যা ভিত্তি রচনা করেছে;

আবারো আধুনিক ধর্মতত্ববিদরা প্রতিবাদ করবেন এই বলে যে আব্রাহামের আইজাককে প্রায় বিসর্জন দেবার কাহিনী আক্ষরিকভাবে নেয়া উচিৎ হবে না। এবং আবারো এর উপযুক্ত প্রত্যুত্তর দুইটি, প্রথমত এমনকি আজ অবধি বহু মানুষ পুরো ধর্মগ্রন্থ আক্ষরিকভাবে সত্য বলে মনে করেন এবং তাদের যথেষ্ট পরিমান রাজনৈতিক শক্তি আছে আমাদের বাকী সকলে উপর, বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্র এবং ইসলামী বিশ্বে; দ্বিতীয়ত যদি আক্ষরিক সত্য হিসাবে গ্রহন না করি, তাহলে এই গল্পগুলো আমাদের কিভাবে নেয়া উচিৎ, রুপকার্থে? তাহলে কিসের রুপকার্থে? নিশ্চয়ই প্রশংসা যোগ্য কিছু নয়, নৈতিক শিক্ষা হিসাবে? এই ধরনের ভয়ঙ্কর গল্প থেকে কোন ধরনের নীতিবোধ এর শিক্ষা আমরা গ্রহন করতে পারি? পাঠকরা মনে রাখবেন, আমি মুহূর্তে যা চেষ্ঠা করছি তা হচ্ছে, আমরা আসলে আমাদের নীতিবোধ ধর্মগ্রন্থ থেকে গ্রহন করি না। অথবা যদি আমরা তা করি, আমরা ধর্মগ্রন্থ যাচাই বাছাই করে ভালো অংশগুলো খুজে বের করি আর খারাপ নোংরা অংশগুলো বর্জন করি, কিন্তু তারপর আমাদের অবশ্যই কোন না কোন স্বাধীন কিছু বৈশিষ্ট বা গুনাবলীর মানদন্ড থাকা উচিৎ কোনটি নৈতিক অংশ সেটি নির্ধারন করার জন্য, যে মানদন্ডটি আর যেখান থেকে তা আসুক না কেন, ধর্মগ্রন্থ থেকে আসবে না, এবং অবশ্যই যা আমাদের সবার কাছে স্পষ্টতই উন্মুক্ত গ্রহনযোগ্য হবে, আমরা ধর্ম মানি বা না মানি।

ধর্মীয় অ্যাপোলজিষ্ট বা সমর্থনকারীরা এমন কি এই নিন্দনীয় কাহিনীতে ঈশ্বর চরিত্রটির খানিকটা শ্লীলতা রক্ষা করার চেষ্টা করে থাকেন, শেষ মুহূর্তে আইজাকের জীবন বাচিয়ে ঈশ্বর কি ভালো করেননি? এধরনের বিশেষ অশ্লীল অনুরোধের দ্বারা আমার কোন পাঠক প্ররোচিত হতে পারেন এমন কোন অসম্ভাব্য পরিস্থিতিতে আমি তাদের ওল্ড টেষ্টামেন্ট এ আরেকটি মানব বিসর্জনের কাহিনী সম্বন্ধে অবহিত করতে চাই, যার পরিণতি ছিল এরকম সুখকর ছিল না; জাজেস এ অধ্যায় ১১, সামরিক নেতা জেফথাহ (Jephthah), ঈশ্বরের সাথে একটি চুক্তি করেন, যদি ঈশ্বর অ্যামোনাইটদের (Ammonites) বিরুদ্ধে তাকে জয়যুক্ত করে, তাহলে জেফতাহ, অবশ্যই একটি চুড়ান্ত বিসর্জন দেবেন....”আমি যখন ফিরবো, আমার ঘরের দরজা দিয়ে প্রথম যে বেরিয়ে আসবে আমার সাথে দেখা করতে..“; যথারীতি জেফতাহ সত্যি সত্যি অ্যামোমাইটদের হারায় (অসংখ্য হত্যার পর, বুক অব জাজের অন্য ঘটনার সাথে সমতুল্য হারে) এবং বিজয়ীর বেশে ঘরে ফেরেন, এবং আদৌ বিস্ময়কর না, তার কন্যা, একমাত্র সন্তান বাড়ীর বাইরে তাকে স্বাগত জানায় (টিমব্রেল বাজিয়ে এবং নেচে); এবং হায় দুর্ভাগ্যজনকভাবে .. সেই প্রথম দেখা করতে আসা জীবিত প্রানী, তার প্রিয় সন্তান – বোধগাম্য কারনে তীব্র দু:খ আর হতাশায় জেফতাহ তার কাপড় ছিড়েছে, কিন্তু তার কিছুই করার ছিল না; ঈশ্বর নিশ্চয়ই অধীর আগ্রহে ছিলেন তার প্রতিজ্ঞা করা বিসর্জন এর এই উপঢৌকনের, এবং এই পরিস্থিতিতে তার কন্যা কোন প্রতিবাদ না করেই রাজী হয় আত্মবিসর্জনে, তার একটাই দাবী ছিল তাকে যেন দুইমাসের জন্য পাহাড়ে যেতে দেয়া হয় যেন সে তার কুমারীত্বর জন্য শোক করতে পারে, দুই মাস পরে সে যথারীতি ফিরে আসে, এবং তার বাবা ঈশ্বরকে দেয়া তার প্রতিজ্ঞামত আগুনে পুড়িয়ে বিসর্জন দেন; এখানে কিন্তু ঈশ্বর আদৌ সঙ্গত মনে করেননি হস্তক্ষেপ করার জন্য।

যখনই তার বাছাইকৃত জনগোষ্ঠী প্রতিদ্বন্দী কোন ঈশ্বর বা দেবদেবীদের নিয়ে কৌতুহল দেখায়, ঈশ্বরের অতি তীব্রতম ক্রোধ যৌনঈর্ষার সবচেয়ে কুৎসিততম রুপের সদৃশ মনে হতে পারে; এবং আবারো কোন আধুনিক নৈতিকতাবাদীর কাছে সেটা কোন রোল মডেল এর রুপ হতে পারেনা; যৌন অবিশ্বস্ততার প্রলোভন খুব সহজে বোঝা সম্ভব এমনকি যারা এ ধরনের প্রলোভনে আক্রান্ত হন না তাদের পক্ষেও এবং নানা কাহিনী এবং নাটকের এটি মুল বিষয় ,শেক্সপিয়ার থেকে শুরু করে শয়নকক্ষের প্রহসনেও; কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে ভীনদেশী কোন দেবদেবীর নিবেদনে বেশ্যাবৃত্তি করার অপ্রতিরোধ্য প্রলোভন কখনো কখনো আমাদের আধুনিক মনে কোন সহমর্মিতার জায়গা করে নেয় না। আমার অবুঝ চোখে ’আমাকে ছাড়া তোমরা আর কোন ঈশ্বরের উপাসনা করবে না,’ মনে হতে পারে পালন করার জন্য খুব সহজ একটা নির্দেশ: ছেলেখেলা মাত্র, যে কেউ তা ভাবতে পারেন, যদি তুলনা হয় অন্য আদেশগুলোর সাথে, যেমন, তোমরা কেউই প্রতিবেশীর স্ত্রীকে বা তার গাধা বা ষাঢ় কামনা করবে না ; তারপরও ওল্ড টেষ্টামেন্ট এ সেই একই নিশ্চয়তার সাথে নিয়মিত ভাবে যেমনটা শয়নকক্ষের প্রহসনের ক্ষেত্রে হয়, ঈশ্বর শুধু অন্য দিকে তাকালেই হয় কয়েক মুহুর্তের জন্য এবং ইজরায়েলের সন্তানরা সব ভুলে বাল কিংবা অন্য কোন মুর্তি পুজায় লিপ্ত হয় বা একটি ভয়াবহ ঘটনায় যেমন সোনার তৈরী বাছুর ...

মোজেস, যিনি আব্রাহামের চেয়ে আরো বেশী গ্রহন যোগ্য রোল মডেল তিনটি একেশ্বরবাদী ধর্মের অনুসারীদের কাছে; আব্রাহাম হতে পারেন আদি পিতা, যদি কাউকে চিহ্নিত করা হয় জুডাইজম এর থেকে উদ্ভুত ধর্মগুলোর মুল মতবাদের প্রবক্তা হিসাবে, তবে নিশ্চয়ই সে হবে মোজেস; সোনালী বাছুরের সেই ঘটনাটির সময়, মোজেস বেশ নিরাপদ দুরত্বে মাউন্ট সাইনাই এর উপরে ছিলেন, ঈশ্বরের সাথে যোগাযোগ এবং তার আদেশ সম্বলিত খোদাইকরা পাথরের ট্যাবলেটগুলো সংগ্রহ করছিলেন; পাহাড়ের নীচে (যারা সেই পাহাড় ছোয়া পর্যন্ত নিষিদ্ধ ছিল, কারন সেটি মৃত্যু যন্ত্রনার কারন হবে) তার অনুসারীরা কোন সময় নষ্ট করেননি:

যখন তারা দেখলো মোজেস এর দেরী হচ্ছে পাহাড় থেকে নীচে নেমে আসার জন্য, তারা সবাই মোজেস এর ভাই অ্যারন এর কাছে এসে তাকে বলেন, তাড়াতাড়ি আমাদের দেব দেবীর কোন মুর্তি বানিয়ে দাও, যা আমরা অনুসরণ করতে পারবো থাকবে উপাসনার জন্য, আর মোজেস এর ব্যাপারে, যে মানুষটা আমাদের মিসর থেকে আমাদের এখানে নিয়ে এসেছে, আমরা জানিনা তার কি পরিণতি হয়েছে (এক্সোডাস ৩২:১);

অ্যারন সবার কাছ থেকে সোনা সংগ্রহ করে, তা গলিয়ে একটি সোনার বাছুর তৈরী করে দেয়, যার জন্য তিনি একটি উপাসনার বেদী তৈরী করেন, যেখানে সবাই তাদের পুজা এবং বিসর্জনের উপঢৌকন রাখা শুরু করে।

বেশ, তাদের ভালো করেই জানার কথা ছিল, ঈশ্বরের পেছনে এধরনের কাজ করা তাদের উচিৎ হচ্ছে না, তিনি হয়তো পাহাড়ের উপর থাকতে পারেন, কিন্তু সর্বোপরি তিনি তো সর্বজ্ঞ অন্তর্যামী, এবং দেরী করলেন না তিনি, দুত মোজেসকে দ্রুত সেখানে প্রেরণ করে তার আজ্ঞা পালন করতে, মোজেস দ্রুত বেগে পর্বত থেকে নীচে নেমে আসেন পাথরের ট্যাবলেটগুলো নিয়ে, যার উপর ঈশ্বর তার দশটি নির্দেশ বা টেন কম্যান্ডমেন্টস খোদাই করে দিয়েছিলেন; পৌছে যখন মোজেস দেখলেন, তার অনুসারীরা সোনালী বাছুরকে পুজা করছে, তিনি এত রেগে গেলেন যে সব ট্যাবলেট মাটিতে ফেলে দিয়ে ভেঙ্গে ফেললেন (ঈশ্বর অবশ্য তাকে আরেক সেট পাঠিয়েছিলেন পরে), এরপর সোনালী বাছুর টিকে পুড়িয়ে,এরপর ভালো করে পিষে পাউডারের মত করে পানিতে মিশিয়ে সবাই বাধ্য করলেন গিলে খেতে, তারপর তিনি একটি যাজক গোত্র লিভাই দের বললেন তলোয়ার হাতে নিয়ে যে কয়জনকে হত্যা করা যায়, তাদের হত্যা করতে, যার ফলাফলে প্রায় ৩০০০ জনের মৃত্যু হলো; যা, অনেকে হয়তো ভাবতে পারেন ঈশ্বরের অন্য দেবতাদের সাথে উগ্র ঈর্ষাকে শান্ত করার জন্য যথেষ্ট একটি সংখ্যা, কিন্তু না, ঈশ্বরের ক্রোধ শেষ হয়নি তখনও; এই ভয়ঙ্কর অধ্যায়ের শেষ অনুচ্ছেদে তার শেষ আঘাত দেখা যায়, যে কয়জন বেচে ছিল তাদের উপর কঠিন অসুখ ছড়িয়ে দেয়া, কারন ’তারা বাছুরকে দেবতা বানিয়েছে যা অ্যারন বানিয়ে দিয়েছিল;’

বুক অব নাম্বার (Book of Numbers) বলছে কিভাবে ঈশ্বর মোজেসকে উস্কে দেন মিডিয়ানাইটদের (Midianites) আক্রমন করতে; তার সৈন্যরা খুব সহজে মিডিয়ানাইটদের সব পুরুষদের হত্যা করে এবং তাদের সকল শহর পুড়িয়ে দেয় কিন্তু তারা নারী ও শিশুদের তখনও হত্যা করেনি, তার সৈন্যদের এই দয়াশীল আচরন মোজেসকে ক্ষুদ্ধ করে তোলে এবং তিনি আদেশ দেন সব ছেলে শিশুকে সব নারীকেও যারা কুমারী নয় হত্যা করতে হবে, কিন্তু সব নারী ও মেয়ে শিশু যারা এখন কোন পুরুষের শয্যাসঙ্গী হয়নি তাদের বাচিয়ে রাখো তোমাদের ভোগের জন্য (নাম্বারস ৩১:১৮); নাহ, আধুনিক কোন নৈতিকতাবাদীর কাছে মোজেস কোন আদর্শ অনুকরণীয় চরিত্র হতে পারেনা।

আধুনিক ধর্মীয় লেখকরা যা আপাতত মিডিয়ানাইটদের গনহত্যার ব্যাপারে কোন ধরনের রুপক অর্থ যুক্ত করেছেন, সেই রুপক অর্থটি সংযুক্ত হয়েছে ভিন্ন দিক বরাবর; দুর্ভাগা মিডিয়ানাইটরা, বাইবেল এর কাহিনী অনুযায়ী যতটুকু বলা যায়, নিজের দেশেই গনহত্যার শিকার; তারপরও তাদের নাম খৃষ্টীয় রুপকথায় টিকে আছে একটি জনপ্রিয় হিম বা স্তব সঙ্গীতে (যা আমি এখনও গাইতে পারবো আমার স্মৃতি থেকে প্রায় ৫০ বছর পরে, দুটি ভিন্ন সুরে যা প্রত্যেকে নীচের স্কেলে বেশ গম্ভীর ভারী সুরে)

Christian, dost thou see them
On the holy ground?
How the troops of Midian
Prowl and prowl around?

Christian, up and smite them,
Counting gain but loss;them by the merit
Of the holy cross.

হায়, হতভাগা অকারনে মিথ্যাভাবে কলঙ্ককৃত, হত্যাকৃত মিডিয়ানাইটদের শুধুমাত্র স্মরণ করা হবে ভিক্টোরিয়া যুগের একটি স্তবসঙ্গীতে কাব্যিক রুপক হিসাবে;

প্রতিদ্বন্দী দেবতা বা'ল সম্ভবত ছিলেন সবচেয়ে জনপ্রিয় এধরনের বিকল্প ঈশ্বর বিরোধী উপাসনার জন্য; নাম্বারস এ অধ্যায় ২৫ বলছে, বহু ইসরায়েলাইটদের মোবাইট রমনীরা প্রলুব্ধ করেছিল তাদের দেবতা বা'ল এর প্রতি বিসর্জন দেবার জন্য; এই ঘটনায় ঈশ্বর তার স্বভাবসুলভ ক্রোধ প্রদর্শন করার মাধ্যমে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন।তিনি মোজেস কে নির্দেশ দেন, এই সব মানুষেদের মস্তক কর্তন করে তাদের ঈশ্বরের সন্মুখে সুর্যের মুখোমুখি ঝুলিয়ে রাখো, যেন ঈশ্বরের ভয়ঙ্কর ক্রোধ ইসরায়েলকে স্পর্শ না করে; আবারো বিস্মিত না হবার কোন কারন নেই কেন প্রতিদ্বন্দী কোন দেবতাকে পুজা করার পাপের ব্যাপারে ঈশ্বর কেন এই ধরনের অস্বাভাবিক কঠোর দৃষ্টিভঙ্গী পোষন করেন; মুল্যবোধ আর ন্যায় বিচার সংক্রান্ত আমাদের আধুনিক বোধে মনে হতে খুব সামান্য একটি পাপ, নিজের কন্যাদের গণধর্ষনের জন্য নিবেদন করার সাথে যদি তুলনা করা হয়। এটি আরো একটি উদহারন ধর্মীয় গ্রন্থের আর আধুনিক (যদি কেউ নিজেকে সভ্য বলে দাবী করেন) নৈতিকতার মধ্যকার বিশাল পার্থক্যগুলোর।অবশ্যই এটি যথেষ্ট সহজে বোঝা সম্ভব মিম থিওরীর আলোকে এবং কোন ঐশ্বরিক সত্বার কি প্রকৃতির হতে হবে মিম পুলে টিকে থাকার জন্য;

বিকল্প দেবতাদের প্রতি ঈশ্বরের উন্মত্ত তীব্র প্রতিশোধ পরায়ন হিংসার ট্র্যাজিক প্রহসনের বার বার পুণরাবৃত্তি ঘটেছে ওল্ড টেষ্টামেন্ট এ; যা টেন কম্যান্ডমেন্ট বা ঈশ্বরের দশ নির্দেশিকার প্রথম নির্দেশটির প্রেরণা (যা পাথরের উপর খোদাই করা ছিল, এবং মোজেস যা ভেঙ্গে ফেলেছিলেন, এক্সোডাস ২০, ডিউটেরোনমি ৫), এবং এটি আরো বেশী স্পষ্ট অন্য নির্দেশগুলোতে (আপাতদৃষ্টে যদিও ভিন্ন), প্রতিস্থাপিত যে পাথরে নির্দেশগুলো যা ঈশ্বর মোজেস

কে দিয়েছিলেন ভেঙ্গে যাওয়া পাথরের ট্যাবলেটগুলোর বদলে (এক্সোডাস ৩৪); তাদের জন্মভুমি থেকে হতভাগা আমোরাইটস, কানানাইট, হিটাইট, পেরিজজাইট, হিভাইট এবং জেবুসাইট দের উৎখাত করার প্রতিজ্ঞা করার পর ঈশ্বর মুল বিষয়টাতে আসেন, যা তার কাছে গুরুত্বপুর্ণ: প্রতিদ্বন্দী দেবতারা....

তোমরা তাদের পুজার বেদী ধ্বংস করবে, তাদের মুর্তি আর প্রতিকৃতি ভাঙ্গবে, তাদের বোনা বাগান উৎপাটন করবে; কারন তোমরা আর কোন ঈশ্বরকে পুজা করবে না: কারন মহান ঈশ্বর... যার নাম হচ্ছে ঈর্ষা, এবং ঈর্ষান্বিত একজন ঈশ্বর। যদি তোমরা স্থানীয় অধিবাসীদের সাথে চুক্তিতে আসো, এবং তারা তাদের দেবতাদের বেশ্যাবৃত্তি করে এবং অন্য দেবতাদের জন্য উৎসর্গ করে এবং তোমাদের আহবান করে, তোমরা তাদের বিসর্জন ভক্ষন করো এবং তোমরা তাদের কন্যাদের তোমার পুত্রদের সাথে বিবাহ দাও, এবং তাদের কন্যারা তাদের দেবতার বেশ্যাবৃত্তি অব্যাহত রাখে এবং তোমাদের পুত্রদেরও সেই দেবতারই বেশ্যাবৃত্তি করাবে, তোমরা তোমাদের জন্য কোন গলিত ধাতুর দেবতা সৃষ্টি করবে না (এক্সোডাস ৩৪: ১৪-১৭);

আমি জানি হ্যা অবশ্যই অবশ্যই সময় বদলেছে আজকের দিনে কোন ধর্মীয় নেতা (তালিবান বা তাদের সমতুল্য যুক্তরাষ্ট্রের খৃষ্টানরা ছাড়া) মোজেস এর মত চিন্তা করেন না; আর সেটাই আমার মুল বক্তব্য, আমি যেটা প্রতিষ্ঠা করতে চেষ্টা করছি যে, আধুনিক নৈতিকতা যেখান থেকেই আসুক না কেন বাইবেল থেকে সেটা আসেনি; ধর্মীয় তোষনবাদীদের দাবী যে ধর্ম তাদের অন্তর্গত একটি ধারনা দিয়েছে ভালো আর মন্দ র মধ্যে পার্থক্য করার জন্য .....যে বিশেষ সুবিধাজনক উৎসর প্রতি নীরিশ্বরবাদীদের কোন দাবী নেই... বলে নিস্তার পেতে পারেন না, এমনকি যদি যখন তারা তাদের পছন্দের ছলাকলাও ব্যবহার করেন নির্দিষ্ট নির্বাচিত ধর্মগ্রন্থ আক্ষরিক না বলে রুপকার্থে ব্যাখ্যা করার জন্য; কিন্ত কি মানদন্ডের উপর ভিত্তি করে আপনারা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন কোন অংশটি প্রতীকি কোনটা আক্ষরিক?

যে জাতিগত বিশোধন শুরু হয়েছিল মোজেস এর সময় থেকে তা রক্তাক্ত পরিনতির দিকে পৌছায় বুক অব জোশুয়ায় (Book of Joshua), যে বইটি বিখ্যাত রক্তপিপাসু গনহত্যার লিপিবদ্ধ ইতিহাস এবং বর্ণবাদী জাতিগত ঘৃনার জোশে পরিপুর্ণ যা এই সব রক্তাক্ত গণহত্যার কারন; যেমন একটি পুরোনো গান প্রশংসার সাথে যার আভাস দিয়েছে; জশুয়া জেরিকোর যুদ্ধে জয় হয় এবং সব দেয়াল ধ্বংশ হয়. সেই পুরোনো জশুয়ার মত আর কেউ নেই, জেরিকোর যুদ্ধে; প্রাচীন মহৎ জশুয়া বিশ্রাম নেননি যতক্ষন না পর্যন্ত তার সৈন্যরা শহরে যা আছে তা পুরোপুরি ধ্বংশ না করেছে, পুরুষ নারী উভয়ে বৃদ্ধ এবং শিশু, ষাড় এবং ভেড়া এবং গাধা তলোয়ারের ধারালো প্রান্ত দিয়ে; (জশুয়া ৬:২১);

আবারো ধর্মতত্ত্ববিদরা প্রতিবাদ করবেন, এমন কিছু ঘটেনি, বেশ কোন গল্পই বলে না, দেয়াল ভেঙ্গে পরে শুধু মানুষের চিৎকার আর শিঙ্গার আওয়াজে, সুতরাং আসলেই এটা ঘটেনি কিন্তু সেটা বিষয় না, বিষয়টি হলো সত্য হোক বা না হোক, বাইবেল এটিকে আমাদের সামনে উপস্থাপন করছে আমাদের নৈতিকতার উৎস হিসাবে এবং জশুয়ার জেরিকোর ধ্বংশর বাইবেল এর কাহিনী এবং প্রতিশ্রুত ভুমিতে আগ্রাসন এর সাথে সাধারনভাবে নৈতিকভাবে হিটলারের পোল্যান্ড আগ্রাসনের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই বা সাদ্দাম হোসেন এর কুর্দ এবং মার্শ আরবদের গনহত্যার সাথে; বাইবেল হতে পারে আকর্ষনী এবং কাব্যিক কাহিনীর কোন নমুনা, তবে কখনোই এই বই আপনি আপনার সন্তানদের হাত তুলে দেবেন না নৈতিকতার শিক্ষা নেবার জন্য; ঘটনাচক্রে কিন্তু জশুয়ার জেরিকো অভিযান শিশু নৈতিকতার বিষয়ে একটি মজার পরীক্ষা হতে পারে, যে বিষয়টি এই অধ্যায়ের পরবর্তীতে বিস্তারিত আলোচনায় আসবে;

যাই হোক, আপনি কি মনে করেন ,এই গল্পে ঈশ্বর চরিত্রটির মধ্যে প্রতিশ্রুত ভুমি অধিকারের জন্য যেকোন হত্যা কিংবা গনহত্যার আবশ্যিকতা সম্বন্ধে সামান্যতম সন্দেহ বা দ্বন্দ পোষন করেন? বরং এর বীপরিত, তার নির্দেশগুলো যেমন ডিউটেরোনোমী ২০ এ নিষ্টুরভাবে স্পষ্ট; তিনি সুস্পষ্টভাবে বিভাজন করেছেন, যে মানুষগুলো সেই দেশে বাস

করে যা তার প্রয়োজন এবং সেই মানুষগুলো যারা বহু দুরে বসবাস করে সেই দেশ থেকে; তার প্রয়োজনীয় ভুমিতে বসবাস কারীদের আমন্ত্রণ জানাতে হবে প্রথমে শান্তিপুর্ণ আত্মসমর্পনের জন্য, তারা যদি অস্বীকার করে, সব পুরুষদের তাহলে হত্যা করতে হবে এবং তাদের নারীদের বন্দী করা হবে প্রজননের কাজে ব্যবহার করার জন্য; এই আপেক্ষিক মানবিক আচরনের বীপরিত দেখুন কি ভাগ্যে আছে সেই সব হতভাগ্য গোত্রদের যারা দুর্ভাগ্যজনকভাবে নেই প্রতিশ্রুত ’লেবেনসরম’ (Lebensraum : নাৎসী জার্মানীর সেই প্রতিশ্রুত গনহত্যা মুলক রাজনৈতিক উদ্দেশ্য, যার অর্থ জার্মান জনসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য আরো জায়গা সম্প্রাসারন) এত দিন বসবাস করে আসছিল: ’কিন্তু সেই সব গোত্রের মানুষদের শহরগুলো, যা তোমাদের প্রভু তোমাদের ঈশ্বর তোমাদের উত্তরাধিকার সুত্রে প্রদান করেছে, তোমরা এমন কিছুই বাচিয়ে রাখবে যা কিছু শ্বাস নেয়, তোমরা অবশ্যই তাদের সম্পুর্ণভাবে ধ্বংশ করবে, যেমন হিটাইট আর অ্যামোরাইট, ক্যানানাইট এবং পেরিজজাইট. হিভাইট এবং জেবুসাইটদের, যেমন তোমাদের প্রভু তোমাদের ঈশ্বর তোমাদের নির্দেশ দিয়েছেন’ ;

যে মানুষগুলো বাইবেল হাতে নিয়ে দাবী করে যে তাদের নৈতিক দৃঢ়তার অনুপ্রেরণা হচ্ছে সেই বই, তাদের কি সামান্যতম ধারনা আছে আসলে কি লেখা আছে সেখানে?’ নিম্নলিখিত অপরাধের শাস্তি মৃত্যুদন্ড হবার দাবী রাখে, লেভিটিকাস ২০ মোতাবেক: পিতামাতাকে গালি দেয়া,ব্যভিচার করা,সৎমা এবং পুত্রবধুর সাথে সঙ্গমে লিপ্ত হওয়া, সমকামীতা, কোন নারী এবং তার কন্যাকে একই সাথে বিবাহ করা, পশুর সাথে সঙ্গমে লিপ্ত হওয়া (এবং এখানে আবার সেই দুর্ভাগা পশুটিকে মেরে ফেলতে হবে) ; এছাড়াও মৃত্যুদন্ড দেয়া হতে পারে, সাবাথ বা সাপ্তাহিক ছুটির দিনে কাজ করলে: এই বিষয়টি বার বার উল্লেখ করা হয়েছে ওল্ড টেষ্টামেন্ট এর জুড়ে; নাম্বার ১৫ তে, ইসরায়েলের শিশুরা জঙ্গলের মধ্যে একটি মানুষকে দেখতে পায় কাঠ কুড়াচ্ছে সেই কাজ করার জন্য নিষিদ্ধ দিনে, তারা তাকে আটক করে, তারপর ঈশ্বরকে জিজ্ঞাসা করে কি করা যেতে তার শাস্তি হিসাবে; স্পষ্টতই ঈশ্বর সেদিন কোন কাজ হালকা ভাবে করার মেজাজে ছিলেন না; এবং প্রভু মোজেসকে বললেন, নিশ্চয়ই মানুষটিকে মৃত্যুদন্ড দেয়া যেতে পারে; উপস্থিত সবাই তাকে পাথর ছুড়ে আঘাত করবে নির্বিচারে এবং সবাই তাকে খোলা জায়গায় নিয়ে এসে পাথরের ছুড়ে মারতে লাগলো এবং সে মারা যায়; এই নীরিহ কাঠ কুড়ানো মানুষটার কি কোন স্ত্রী বা সন্তান ছিল, যারা তার জন্য শোক করবে? সেকি ভয়ে কুকড়ে উঠেছিল যখন প্রথম পাথরটি সে উড়ে আসতে দেখেছিল বা যন্ত্রনায় চিৎকার করেছিল যখন পাথরগুলো তার গায়ে এসে আঘাত করতে থাকে? আমাকে আজ বিষয়টি হতবাক করে এধরনের গল্পগুলোয় তা কিন্তু ঘটনাটি আদৌ ঘটেছিল কিনা তা নয়, হয়তো তা ঘটেনি, আমাকে যেটা বিস্মিত করে তাহলো আজকের যুগে মানুষ তাদের জীবন ভিত্তি হিসাবে বেছে নিয়েছে এধরনের ভয়ঙ্কর একজন রোল মডেল ইয়াওয়ে কে – এবং আরো জঘন্য, তারা গায়ের জোরে সেই একটি অশুভ বর্বর দৈত্যটাকে (সত্য হোক বা কাহিনী হোক) আমাদের বাকী সবার উপর চাপিয়ে দিচ্ছে;

যুক্তরাষ্ট্রের টেন কম্যান্ডমেন্ট ট্যাবলেট ধারকদের রাজনৈতিক শক্তির ক্ষমতার প্রাবল্য আসলেই হতাশাজনক বিশেষ করে যে মহান প্রজাতন্ত্রের সংবিধান লিখেছিলেন প্রগতিশীল জ্ঞানালোকপ্রাপ্ত মানুষরা সুস্পষ্টভাবে ধর্মনিরপেক্ষ মতাদর্শে; আমরা যদি টেন কম্যান্ডমেন্টস গুরুত্বের সাথে নিতাম, তাহলে আমরা ভুল ঈশ্বরদের উপাসনা করা এবং তেমন কোন উপসনার জন্য ছবি বা মুর্তি বানানোটাকে সব পাপের মধ্যে প্রথম এবং দ্বিতীয় পাপের পর্যায়ে বিবেচনা করতে হলো; আফগানিস্থানের পর্বতে ১৫০ ফুট উচু বামিয়ানের বুদ্ধমুর্তি ডিনামিইট দিয়ে ধ্বংশ করার তালিবানদের জঘন্য, অকথ্য বর্বরতাকে ধিক্কার জানাবার বদলে আমাদের তাদের সত্যিকারের ন্যায়ের ধর্মপ্রেমকে প্রশংসা করতাম; আমরা তাদের এই ধ্বংশলীলা কে ভাবতাম আন্তরিক ধর্মীয় উদ্দীপনার চিহ্ন হিসাবে; এ বিষয়টিকে উজ্জ্বলভাবে সত্যায়িত করেছে একটি সত্যি খুব অদ্ভুত কাহিনী, যা ২০০৫ সালের আগষ্ট মাসে লন্ডনের ইন্ডিপেন্ডেন্ট পত্রিকার শীর্ষ সংবাদ ছিল; প্রথম পৃষ্ঠার শিরোনাম ‘The destruction of Mecca’ এর নীচে পত্রিকাটি রিপোর্ট করে:

> ঐতিহাসিক মক্কা, ইসলাম ধর্মের সুতিকাগার, ধর্মীয় অতিউৎসাহীদের অপ্রত্যাশিত আক্রমনে এই পবিত্র শহরের সমৃদ্ধ ও বহুস্তর বিশিষ্ট ইতিহাসের প্রায় সবটাই বিনষ্ট হয়েছে..; এবং এখন নবী মোহাম্মদের সত্যিকারের জন্মস্থান এখন

বুলডোজারের সামনে, সৌদী ধর্মীয় কর্তৃপক্ষদের যোগসংযোগে, যাদের ইসলামের কঠোর রুপী ব্যাখ্যা তাদের বাধ্য করেছে নিজেদের ঐতিহ্যকে মুছে ফেলতে. এই ধ্বংশ লীলার প্রেরণা হচ্ছে ওয়াহাবীবাদীদের উগ্র গোড়া ভয়, এ ধরনের নানা ঐতিহাসিক ও ধর্মীয় গুরুত্বপুর্ণ জায়গাগুলো মুর্তিপুজা বা বহুঈশ্বরবাদের জন্ম দিতে পারে, যেখানে বহু এবং সম্ভাব্য সমক্ষমতা সম্পন্ন দেবতাদের পুজা করা হবে; সৌদি আরবে মুর্তিপুজোর শাস্তি এখনও নীতিগতভাবে মস্তিষ্ক কর্তন;

আমি বিশ্বাস করিনা, এমন কোন নীরিশ্বরবাদী আছেন পৃথিবীতে যারা মক্কা বা শাত্রের (Chartres) ক্যাথিড্রাল, ইয়র্ক মিনিষ্টার বা নটর দাম বা শেউই ড্রাগন, কিয়োটোর মন্দির এবং অবশ্যই বামিয়ানের বুদ্ধমুর্তি ধ্বংশ করতে চাইবেন; যেমনটি যুক্তরাষ্টের নোবেল জয়ী পদার্থ বিজ্ঞানী স্টিভেন ওয়াইনবার্গ বলেছিলেন, মানুষের সন্মানের উপর ধর্ম হচ্ছে একটি অপমান, এটি সহ বা ছাড়া, আপনি দেখবেন ভালো মানুষরা ভালো কাজই করছে এবং খারাপ মানুষ খারাপ কাজ করছে কিন্তু কোন ভালো মানুষকে দিয়ে যদি খারাপ কাজ করাতে চান তাহলে আপনার প্রয়োজন ধর্ম; ব্লেইস পাসকাল (যিনি বিখ্যাত বাজী রেখেছিলেন) একই রকম মন্তব্য করেছিলেন, মানুষ কখনোই কোন চুড়ান্তভাবে কোন খারাপ কাজ আনন্দের সাথে করেনা শুধুমাত্র যখন তারা কাজটি করে ধর্মীয় বিশ্বাস থেকে;

এখানে আমার মুল উদ্দেশ্য হচ্ছে সেটা দেখানো না যে ধর্মগ্রন্থ থেকে আমাদের নৈতিকতা শিক্ষা নেয়া উচিৎ না (যদিও সেটা আমার মতামত); আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে দেখানো যে আমরা (এবং এর মধ্যে বেশীর ভাগ ধর্মীয় মানুষরাও আছেন), সত্যিকারভাবে আমাদের নৈতিকতা কিন্তু ধর্মগ্রন্থ থেকে পাইনা; আমরা যদি তাই করতাম, আহলে কঠোরভাবে সাবাথ মানতাম এবং ভাবতাম যারা সাবাথের নিয়ম ভাঙ্গছে তাদেরকে মৃত্যুদন্ড দন্ডিত করাই সঠিক এবং ন্যায়সঙ্গত; আমরা যে কোন নবপরিনীতাকে পাথর ছুড়ে হত্যা করতাম যে তার কুমারীত্ব প্রমান করতে ব্যর্থ হয়, যদি তার স্বামী নিজে ঘোষনা দেয় সে সন্তুষ্ট হয়নি, বা আমরা অবাধ্য সন্তানদের হত্যা করতাম.. এবং আমরা হয়তো .... কিন্তু একটু অপেক্ষা করুন, হয়তো আমি নিরপেক্ষ আচরণ করছি না; ভালো খৃষ্টান রা এই পুরো অনুচ্ছেদ জুড়ে প্রতিবাদ করবেন হয়তো : সবাই জানে ওল্ড টেষ্টামেন্ট স্পষ্টতই বেশ অপ্রীতিকর; জীসাসের নিউ টেষ্টামেন্টতো এর ক্ষতিকর দিকগুলো খানিকটা সামাল দিয়েছে, এটিকে গ্রহনযোগ্য করেছে, তাই না?

((((ব্যাপারটা স্পষ্ট নয় সেই কাহিনীটা, যার উৎসhttp://datelinehollywood.com/archives/2005/09/05/robertson-blames-hurricane-on-choice-of-ellen-deneres-to-hostemmys/, আসলেই সত্য কিনা, তবে সত্য বা মিথ্যা যাই হোক, ব্যপকভাবে এটি বিশ্বাসযোগ্যতা পেয়েছে, সন্দেহ নেই কারন এটি ইভানজেলিকাল ধর্মযাজকদের স্বভাবজাত বক্তব্যর মত, যাদের মধ্যে রবার্টসনও আছেন, যারা নানা দুর্যোগ যেমন কাটরিনা সম্বন্ধে এ ধরনের সাধারণত মন্তব্য করেন; উদহারন হিসাবে দেখুন:http://www.emediawire.com/releases/ 2005/9/emw281940.htm, যে ওয়েবসাইটটি বলছে কাটরিনা সংক্রান্ত এই গল্পটি মিথ্যা সেখানে রবার্টসনের আরো একটি উদ্ধৃতি আছে, একটি ওরলান্ডো, ফ্লোরিডায় একটি পুরোনো গে প্রাইড মার্চ সংক্রান্ত : আমি হুশিয়ার করে দিতে চাই ওরল্যান্ডোকে, যে আপনারা সরাসরি কোন একটি ভংঙ্কর হারিকেন এর আক্রান্ত হবার পথে আছেন, আমি মনে করিনা যদি আমি আপনাদের জায়গায় থাকতাম ঈশ্বরের মুখের সামনে ঐ সব ফ্লাগ দেখাতাম)))

রিচার্ড ডকিন্স এর দি গড ডিলুশন : সপ্তম অধ্যায় (দ্বিতীয় পর্ব)

By K M Hassan

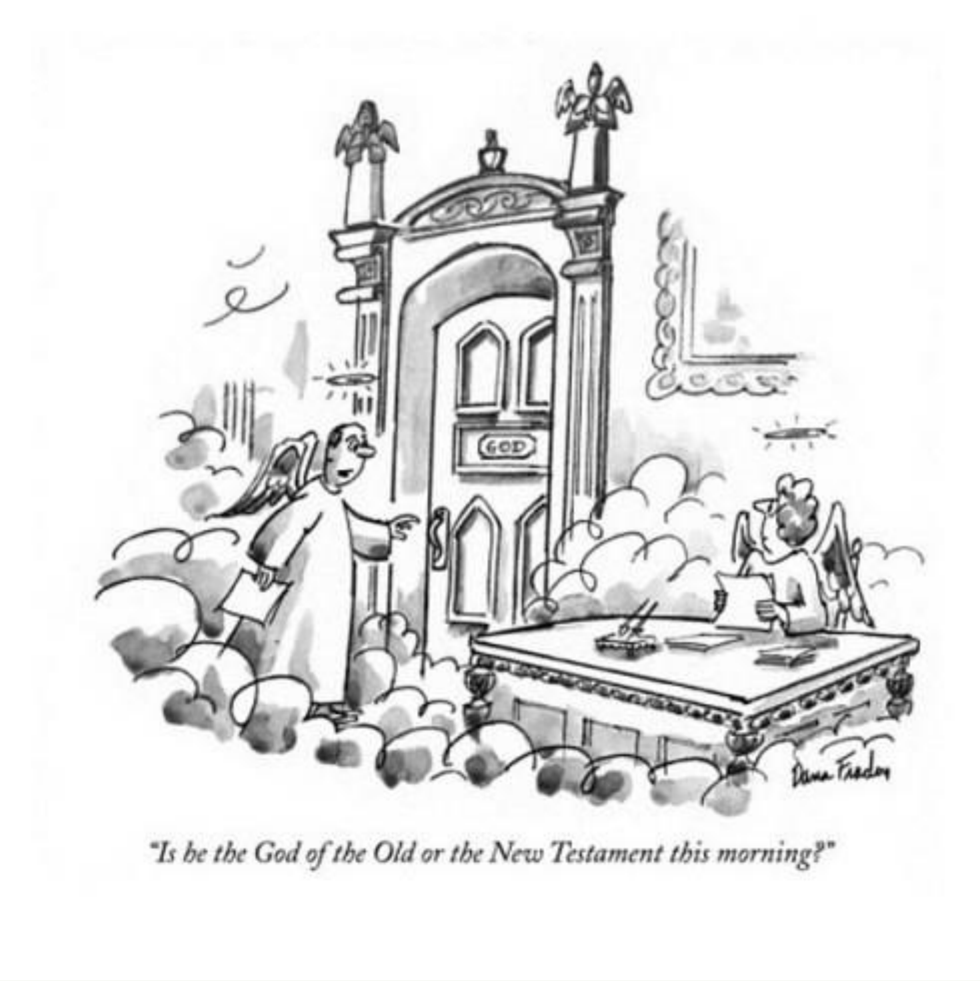

"Is he the God of the Old or the New Testament this morning?"

কার্টুন সূত্র

রিচার্ড ডকিন্স এর দি গড ডিলুশন : সপ্তম অধ্যায় (দ্বিতীয় পর্ব)
(অনুবাদ প্রচেষ্টা: কাজী মাহবুব হাসান)

The God Delusion by Richard Dawkins

প্রথম অধ্যায়
দ্বিতীয় অধ্যায়
তৃতীয় অধ্যায়
চতুর্থ অধ্যায় (প্রথম পর্ব) , চতুর্থ অধ্যায় (দ্বিতীয় পর্ব) ,

চতুর্থ অধ্যায় (তৃতীয় পর্ব) , চতুর্থ অধ্যায় (চতুর্থ পর্ব) , চতুর্থ অধ্যায় (শেষ পর্ব)
পঞ্চম অধ্যায় (প্রথম পর্ব), পঞ্চম অধ্যায় (দ্বিতীয় পর্ব) , পঞ্চম অধ্যায় (তৃতীয় পর্ব)
পঞ্চম অধ্যায় (চতুর্থ পর্ব) , পঞ্চম অধ্যায় (পঞ্চম পর্ব) ,পঞ্চম অধ্যায় (ষষ্ঠ পর্ব)
ষষ্ঠ অধ্যায় (প্রথম পর্ব) ; ষষ্ঠ অধ্যায় (দ্বিতীয় পর্ব); ষষ্ঠ অধ্যায় (শেষ পর্ব)
সপ্তম অধ্যায় (প্রথম পর্ব)

‘পবিত্র’ গ্রন্থ এবং যুগের সাথে বদলে যাওয়া নৈতিকতার জাইটগাইষ্ট বা যুগধর্ম

নিউ টেষ্টামেন্ট ওল্ড টেষ্টামেন্ট এর চেয়ে আদৌ কি ভালো কিছু?

বেশ, অস্বীকার করার উপায় নেই, নৈতিকতার দৃষ্টিভঙ্গী থেকে, ওল্ড টেষ্টামেন্ট এর নিষ্ঠুর মানবরুপী দৈত্যর তুলনায় জীসাস বিশাল বড় উন্নতি; আসলেই জীসাস, যদি তার অস্তিত্ব থেকে থাকে (বা যিনি তার গ্রন্থ রচনা করেছে, তিনি যদি তা না করে থাকেন) নিশ্চয়ই ইতিহাসের অনত্যম সেরা নৈতিকতার সংস্কারক ; তার সারমন অব দি মাউন্ট স্পষ্টতই সময়ের চেয়ে অনেক অগ্রসর, তার ’এক গালে মারলে আরেক গাল বাড়িয়ে দেয় ‘ মতবাদ এসেছে গান্ধী এবং মার্টিন লুথার কিং এর সেই মতবাদ গ্রহন করার দুই হাজার বছর আগে; কোন কারন ছাড়াই আমি কিন্তু সেই ‘Atheists for Jesus’ আর্টিকেলটি লিখিনি, (এবং পরে বেশ আনন্দ পেয়েছিলাম, পরবর্তীতে এটি লেখা একটি টি শার্ট উপহার পেয়ে) ;

কিন্তু ঠিক জিসাসে নৈতিক শ্রেষ্ঠতাই আমার বক্তব্যটাকে অর্থবহ করে তোলে, তার প্রতিপালনের সময় শেখানো ধর্মগ্রন্থ থেকে জীসাস তার নৈতিকতার শিক্ষা গ্রহন করে সন্তুষ্ট ছিলেন না, তিনি প্রকাশ্যে সেখান থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়েছিলেন, যেমন যখন তিনি সাবাথের নিয়ম ভাঙ্গার কঠোর সর্তকতাকে গুরুত্বহীন করে দিয়েছিলেন: ‘মানুষের জন্য সাবাথ তৈরী হয়েছে, সাবাথের জন্য মানুষ নয়’ একটি জ্ঞানগম্ভীর প্রবাদ হিসাবে নানা ক্ষেত্রেই সাধারনীকৃত হয়ে ব্যবহৃত হয়েছে, যেহেতু এই অধ্যায়ে মুল বিষয়টি হচ্ছে ধর্মগ্রন্থ থেকে আমরা নৈতিকতা গ্রহন করি না এবং করা উচিৎও না, আর এই মুল থিসিসটির বিষয়ে কাজটি করে দেখানো জন্য জীসাস একটি মডেল হিসাবে সন্মানিত হতে পারেন।

জীসাসের পারিবারিক মুল্যবোধ, স্বীকার করতেই হবে যে, এমন কিছু ছিল না যে, কেউ সেটা গুরুত্ব দেবার ইচ্ছা পোষন করতে পারেন; তার মায়ের সাথে তার আচরনে ঘাটতি ছিল, প্রায় রুঢ় বলা যেতে পারে সে আচরণ, তিনি তার শিষ্যদের উৎসাহিত করেছিলেন তাদের পরিবার পরিজন পরিত্যাগ করে তাকে অনুসরণ করার জন্য: ‘যদি কেউ আমার কাছে আসে এবং সে তারা বাবা এবং মা, এবং স্ত্রী এবং সন্তান এবং ভাই এবং বোনদের, হ্যা, তার নিজের জীবনকেও ঘৃণা না করতে পারে, সে আমার শিষ্য হতে পারেনা;’ যুক্তরাষ্ট্রের কমেডিয়ান জুলিয়া সুইনী তার বিস্ময় প্রকাশ করেছিলেন তার Letting Go of God স্টেজ শোতে: ‘এমন কাজই কি কাল্টগুলো করে না? আপনাকে দিয়ে আপনার পরিবারকে পরিত্যাগ করায়, যেন তাদের দীক্ষা আপনাদের আরো ভিতরে দৃঢ়ভাবে ঢোকানো যায়?’

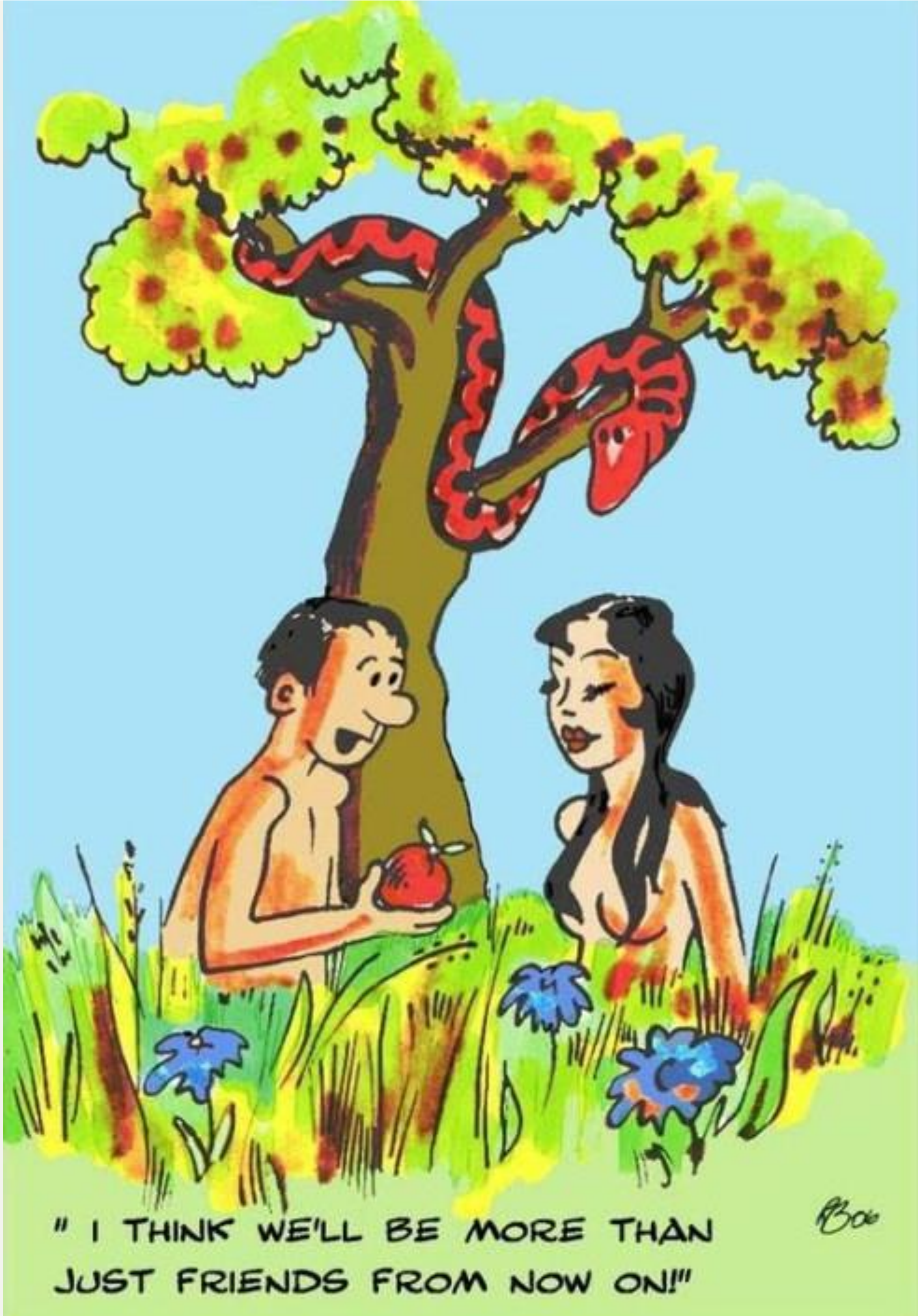
" I THINK WE'LL BE MORE THAN JUST FRIENDS FROM NOW ON!"

কার্টুন সূত্র

তার এই খানিকটা ঘোলাটে পারিবারিক মুল্যবোধ গুলো সত্ত্বেও জীসাসের নৈতিকতার শিক্ষা – যদি ওল্ড টেষ্টামেন্টের ভয়ঙ্কর নৈতিকতার বিপর্যস্ত অংশগুলোর সাথে তুলনা করা হয় – তাহলে প্রশংসার দাবীদার; কিন্তু নিউ টেষ্টামেন্টে আরো শিক্ষা আছে যা কোন ভালো মানুষের পক্ষে সমর্থন করা উচিৎ হবেনা। আমি এখানে বিশেষভাবে ইঙ্গিত করতে চাইছি খৃষ্টধর্মের একটি মুল মতবাদ বা ডকট্রিনের দিকে: সেটা হলো আদি বা অরিজিনাল পাপ (Original sin) এর প্রায়শ্চিত্ত; এই শিক্ষাটাই নিউ টেষ্টামেন্টের ধর্মতত্ত্বের ঠিক কেন্দ্রে অবস্থান করছে; এবং এটিও আব্রাহামের

আইজাককে পুড়িয়ে মারতে যাবার ঘটনাটির মত নৈতিকভাবেই অসহ্যরকম আপত্তিকর, যার সাথে ঘটনাটির সাদৃশ্যও আছে এবং সেটা আকস্মিক না, যেমন গেজা ভেরমেস (Geza Vermes) তার The Changing Faces of Jesus বইটি স্পষ্ট ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন; অরিজিনাল সিন বা আদি পাপের ধারনাটি সরাসরি এসেছে অ্যাডাম এবং ইভ (আদম ও হাওয়া) এর ওল্ড টেষ্টামেন্টের সেই পুরাণ কাহিনী থেকে; তাদের পাপ – নিষিদ্ধ বৃক্ষ থেকে ফল খাওয়া, যথেষ্ট সামান্য একটা অপরাধ যার জন্য খানিকটা গালমন্দই এবং সতর্ক করে দেয়াই যথেষ্ট ছিল; কিন্তু ফলটি প্রতিকী রুপ (ভালো মন্দ পার্থক্য করার মত জ্ঞ্যান, তবে সেই ব্যবহারিক ক্ষেত্রে যা শুধুমাত্র সে জ্ঞানটিকেই ইঙ্গিত করেছিল যে, তারা দুজনেই নগ্ন) যথেষ্ট ছিল তাদের এই নিষিদ্ধ ফলের বাগানে ফল চুরি করার অভিযানটিকে সকল পাপের জনক জননীতে রুপান্তরিত করার জন্য*; তারা দুজন এবং তাদের অনাগত সকল বংশধর স্বর্গের উদ্যান বা ইডেন থেকে চিরতরে বহিষ্কৃত হয়, চিরন্তন জীবনের আশীর্বাদ থেকে বঞ্চিত হয়ে তাদের, আদম ও হাওয়ার শাস্তি হয় কষ্টকর পরিশ্রমের জীবনের, যথাক্রমে, ফসলের মাঠে এবং সন্তান প্রসবের সময়;

এপর্যন্ত, এতটাই প্রতিশোধপরায়ন, যা ওল্ড টেষ্টামেন্টর মতই চলছিল, তবে নিউ টেষ্টামেন্টে ধর্মতত্ব আরেকটি অবিচার নির্বিকারভাবে যুক্ত করে, যার উপরে চেপে বসে একটি নতুন ধর্ষমর্ষকামীতা, যার হিংস্র ভয়াবহতা এমনকি ওল্ড টেষ্টামেন্টও কোনমতে অতিক্রম করেছে; যখন আপনি ভাববেন, বিষয়টা লক্ষ্য করার মত যে, একটি ধর্ম নীপিড়নের আর হত্যার একটি উপকরণকে এর পবিত্রতার রুপক হিসাবে গ্রহন করা উচিৎ মনে করে, প্রায়ই যা গলায় ঝুলিয়ে রাখা হয়; লেনী ব্রুস সঠিকভাবেই মন্তব্য করেছিলেন, ”যদি জীসাসকে বিশ বছর আগে হত্যা করা হতো, তাহলে ক্যাথলিক স্কুলের ছেলে মেয়েরা গলায় ক্রসের বদলে ইলেক্ট্রিক চেয়ার ঝুলিয়ে রাখতো;” কিন্তু এর পেছনে ধর্মতত্ব এবং শাস্তির তত্বটি আরো খারাপ; আদম হাওয়ার পাপ ধারনা করা হয় পুরুষ বংশধারার মাধ্যমে প্রজন্মান্তরে প্রবাহিত হয় – অগাষ্টিনের মতে পুরুষের বীর্যের মাধ্যমে এটি বংশগত ভাবে চলতে থাকে; এটি কোন ধরনের নৈতিকতার দর্শন, যা সকল শিশুকে দন্ডায়িত করে, এমন তাদের জন্মের আগেও, দুর অতীতের কোন পুর্বপুরুষের পাপ বংশগতভাবে তাদের উপর অর্পিত হয়? অগাষ্টিন, কিন্তু নিজেকে সঠিকভাবে তার নিজেকে পাপের ব্যপারে একজন ব্যক্তিগত বিশেষজ্ঞ হিসাবে ভাবতেন, এবং অরিজিনাল সিন শব্দদ্বয়কে তিনি প্রথম ব্যবহার করেছিলেন

তার আগে এই পাপটি পরিচিত ছিল ‘ancestral sin’ বা পুর্বপুরুষের পাপ নামে; অগাষ্টিনের যুক্তি তর্ক এবং নানা বক্তব্য আমার কাছে আদি খৃষ্ট ধর্মতত্ত্ববিদদের অতিমাত্রায় পাপ নিয়ে চিন্তা করার বিষয়টিকে প্রমান করে; তাদের সার্মনে বা ধর্মকথনে পাতার পর পাতা তারা ব্যায় করতে পারতেন,তারায় খচিত আকাশের বা পর্বতমালা এবং সবুজ বনভুমি বা ভোরের পাখিদের সমবেত সঙ্গীত বন্দনা করে; এসব কদাচিৎ উল্লেখ করেছেন তারা, কিন্তু খৃষ্টধর্মের মুল নিশানা অতিমাত্রায় পাপ পাপ পাপ পাপ পাপ পাপ পাপ; কি বাজে একটা চিন্তা যা কারো জীবনে প্রাধান্য বিস্তার করে থাকতে পারে; স্যাম হারিস (Sam Harris) দারুনভাবে তার Letter to a Christian Nation এ বিষয়টি ব্যবচ্ছেদ করেছেন এভাবে: ”আপনার প্রধান চিন্তা আপাতদৃষ্টে মনে হচ্ছে যে মহাবিশ্বের সৃষ্টিকর্তা অসন্তুষ্ট হবেন এমন কিছু কাজে... যা মানুষ করে যখন তারা নগ্নাবস্থায় থাকে; আপনাদের এই অতি শিষ্টাচারপনা মানুষের কষ্টের অতিরিক্ত বোঝায় প্রতিনিয়ত যোগান দিচ্ছে;

কিন্তু এখন, স্যাডো ম্যাসোকিজম বা ধর্ষমর্ষকামীতা বিষয়টি দেখা যাক; ঈশ্বর নিজেকে পুণর্জন্ম দেন মানুষ, জীসাস হিসাবে; তার উদ্দেশ্য, যেন তাকে নির্যাতন নীপিড়ন এবং দন্ড দিয়ে হত্যা করা হয় আদমের সেই বংশগত পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য; যখন থেকেই পল এই বীতস্পৃহা সৃষ্টি কারী মতবাদটি ব্যাখ্যা করেছেন, তখন থেকেই জীসাসকে উপাসনা করা হচ্ছে মানবজাতির সকল পাপের ত্রাণকর্তা হিসাবে; আদমের সেই অতীত পাপের জন্যই না, ভবিষ্যতের ঘটবে এমন সব পাপের জন্যও, ভবিষ্যতের মানুষ সেই পাপ করার সিদ্ধান্ত নিক বা না নিক !;

একটি ভিন্ন দিক, বহু মানুষের যা মনে হয়েছে যে, যাদের মধ্যে রবার্ট গ্রেভস ও তার মহাকাব্যিক উপাখ্যান King Jesus ও অন্তর্ভুক্ত, হতভাগ্য জুডাস ইসকারিওট ইতিহাসের অবিচারই শুধু পেয়ে এসেছেন, যখন তার বিশ্বাসঘাতকতা

সৃষ্টিকর্তার মহাজাগতিক পরিকল্পনারই একটি প্রয়োজনীয় অংশ ছিল মাত্র; একই কথা বলা যাবে জীসাসের অভিযুক্ত হত্যাকারীদের ক্ষেত্রেও; যদি জীসাস নিজেই চান তিনি বিশ্বাসঘাতকার স্বীকার হয়ে হত্যাকারীদের হাতে হত্যার শিকার হবেন, যেন তিনি আমাদের সবার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে পারেন, তাহলে ব্যপারটা বরং পক্ষপাতদুষ্ট মনে হয় না যে, যারা কিনা নিজেদের পাপ থেকে অবমুক্ত মনে করেন, তারা আবার সেজন্য জুডাস এবং পরবর্তীতে যুগে যুগে ইহুদী নীপিড়নে লিপ্ত হন? আমি ইতিমধ্যেই উল্লেখ করেছিলাম আগে অধ্যায়ে, নন ক্যানোনিকাল গসপেল সংগ্রহের একটি দীর্ঘ তালিকা; একটি পান্ডুলিপি যা দাবী করা হয় জুডাসের হারিয়ে যাওয়া গসপেল, অতি সম্প্রতি অনুদিত হয়েছে এবং ফলাফলে বেশ প্রচারও পেয়েছ; এর আবিষ্কার সংক্রান্ত পরিস্থিতিটি বিতর্কিত, কিন্তু এটি আত্মপ্রকাশ করে মিসরে, ৭০ এর বা ৬০ এর দশকের কোন সময়ে; এবং কপ্টিক হরফে লেখা, প্যাপিরাসের ৬২ টি পাতায়; কার্বন ডেট করে জানা গেছে এটির উৎপত্তি ৩০০ খৃষ্টাব্দর আশেপাশে, কিন্তু এটি সম্ভবত লেখা হয়েছে আগের একটি গ্রীক পান্ডুলিপি অনুকরণে; এর লেখক যিনি হোন না কেন, গসপেলটি দেখা হয়েছে জুডাস ইসকারিওটের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে; এবং সেখানে যে প্রস্তাবটি করা হয়েছে, জুডাস জীসাসের সাথে বিশ্বাসঘাতকা করেছিল জীসাসের নির্দেশে, জীসাসই স্বয়ং তাকে সেই ভুমিকা পালন করতে বলেছিলেন; পুরোটাই ছিল জীসাসের ক্রুশবিদ্ধ হয়ে আত্মবিসর্জন বা মৃতুবরণ করে মানবজাতিকে তার সকল পাপ থেকে মুক্তি দেয়ার পরিকল্পনার একটি অংশ মাত্র; যত অপ্রীতিকর সেই মতবাদ হোক না কেন, স্পষ্টতই এটি এর পর থেকে বিশ্বাসঘাতক হিসাবে জুডাসের চরিত্রহরনের অস্বস্তিকর বিষয়টিকে সন্দেহের মধ্যে ফেলে দেয়;

আমি খৃষ্টধর্মের কেন্দ্রীয় মতবাদ হিসাবে আদি পাপের প্রায়শ্চিত্তর কথা উল্লেখ করেছি একটি হিংস্র, কলুষিত বিদ্বেষপুর্ণ ধর্ষ–মর্ষকামী এবং বীতস্পৃহা সৃষ্টিকারী একটি মতবাদ হিসাবে; চুড়ান্ত উন্মাদনা বলে এটিকে আমাদেরও বর্জন করা উচিৎ কিন্তু এটির সর্বব্যাপী পরিচিতি আর বিস্তার আমাদের বস্তুনিষ্ঠ বিচার করা ক্ষমতাকে খানিকটা ভোতা করে দেয়; যদি ঈশ্বর আমাদের পাপ ক্ষমা করতেই চেয়ে থাকেন, কেন শুধু সেগুলো মাফ করে দিলেন না নিজ ক্ষমতা বলে, কি দরকার ছিল তার নিজেকে নীপিড়ন করে, ক্রুশবিদ্ধ হয়ে মৃত্যুদন্ডাদেশ মাথায় পেতে নেবার কি দরকার ছিল তার মুল পরিশোধ হিসাবে; এবং সেকারনেই ঘটনাচক্রে তিনি ইহুদীদের ভবিষ্যতের প্রজন্মকেও দন্ডিত করেন জীসাসের হত্যাকারী হিসাবে ভয়াবহ পগ্রোম (ইহুদীদের প্রতি হিংস্র গন আক্রমন) এবং নিপীড়ন নির্যাতন আর হত্যার দন্ডাদেশে; সেই বংশপরম্পরার পাপটিও কি বীর্যের মাধ্যমে ভবিষ্যত প্রজন্মের মধ্যে বিস্তার করেছিল?

পল, ইহুদী স্কলার গেজা ভেরমেস এর মতে, স্পষ্টতই সেই প্রাচীন ইহুদী ধর্মতত্ত্বীয় মুল নীতিতে আকন্ঠ মজে ছিলেন : রক্ত ছাড়া কোন প্রায়শ্চিত্ত সম্ভব না; সত্যি তার Epistle to the Hebrews (৯:২২) বা হিব্রু জাতির প্রতি তার চিঠিতে, তিনি সেরকম কথাই বলেছিলেন; প্রগতিশীল নৈতিকতাবাদীদের পক্ষে আজ কোন ধরনের প্রতিহিংসা মুলক শাস্তির মুলনীতিকে সমর্থন করা কঠিন, নীরিহ মানুষকে শাস্তি বা স্কেপগোট তত্ব, যেখানে নিরপরাধ মানুষকে দন্ডিত করা হয় অন্য অপরাধীর অপরাধের জন্য, সেটার তো প্রশ্নই আসে না; যে কোন ক্ষেত্রেই (কারো এমন ভাবনা হওয়াটা স্বাভাবিক), ঈশ্বর আসলে কাকে তার ক্ষমতা দেখিয়ে দৃষ্টি আকর্ষন করার চেষ্টা করছেন? সম্ভবতই নিজেকেই – বিচারক এবং জুরি.. এমন কি দন্ডের শিকার; সব গুছিয়ে বললে, আদম, এই তথাকথিত প্রকৃত বা মুল পাপের মুল পাপী, তার তো কোন অস্তিত্বই ছিল: একটা বিব্রতকর সত্য– যে বিষয়টি সম্বন্ধে পল এর অজ্ঞতা ক্ষমাযোগ্য কিন্তু অনুমান করা সম্ভব বিষয়টি সর্বজ্ঞ ঈশ্বর (এবং জীসাস, যদি আপনি বিশ্বাস করেন তিনি ঈশ্বর) এর অজানা থাকার কথা না; যা মৌলিকভাবে এই সম্পুর্ণ প্যাচানো বাজে গল্পটির মুল বিষয়টিকে ভিত্তিহীন করে দেয়; ওহ... কিন্তু অবশ্যই,আদম আর হাওয়ার গল্পতো শুধু প্রতীকি ছিল, তাই না? প্রতিকী ? তাহলে নিজেকে দেখানোর জন্য বা ইমপ্রেস করার জন্য ”অস্তিত্বহীন” এক মানুষের ”প্রতীকি” একটি পাপের জন্য সবার প্রতিনিধি হয়ে শাস্তি হিসাবে জীসাস তার নিজের উপর নিপীড়নের ঘটনাটা ঘটিয়ে ছিলেন এবং নিজের মৃত্যুদন্ড নিশ্চিৎ করে ছিলেন; আমি যেমনটা বলেছিলাম চুড়ান্ত পাগলামী, এবং খুবই জঘন্যরকম অপ্রীতিকর;

বাইবেল বিষয়ে আলোচনা শেষ করার আগে, আমি এর নৈতিক শিক্ষার সহ্য করার অনুপযুক্ত একটি বিশেষ দিক সম্বন্ধে আলোচনা করতে চাই; খৃষ্টানরা খুব কদাচিৎ অনুধাবন করতে পারেন যে অন্যদের প্রতি তাদের বেশীর ভাগ নৈতিক বিবেচনা, যা আপাতদৃষ্টিতে ওল্ড এবং নিউ টেষ্টামেন্ট উভয়ই প্রোমোট করেছে, মুলত খুবই সীমাবদ্ধ নির্দিষ্ট অন্ত গ্রোত্রের প্রতি প্রয়োগ করার জন্য সৃষ্টি হয়েছিল, Love thy neighbour বা আপনার প্রতিবেশীদের ভালোবাসুন, এর অর্থ আমরা এখন যা করছি তা কিন্তু আগে ছিল না, এর অর্থ ছিল শুধুমাত্র আরেকজন ইহুদীকে ভালোবাসো; এই বিষয়টির বিস্তারিত ব্যাখ্যা করছে আমেরিকার চিকিৎসক এবং বিবর্তনীয় নৃতত্ত্ববিদ জন হারটাঙ (John Hartung), তিনি অসাধারন একটি পেপার লিখেছিলেন অন্ত- গ্রুপ (In-group) নৈতিকতার বিবর্তন ও বাইবেলের ইতিহাস নিয়ে; যেখানে তিনি জোর দিয়েছিলেন এর অপর পিঠটিরও, বহি: গ্রুপ বা Out-group নৈতিকতার;

*((আমার জানা আছে যে, স্কাম্পিং বা scrumping’ শব্দটা যুক্তরাষ্ট্রের পাঠকদের কাছে সুপরিচিত নয়; কিন্তু আমি নিজে অপরিচিত আমেরিকান শব্দ পড়তে ভালোবাসি, এবং এগুলো খোজার মাধ্যমে আমার শব্দভান্ডারের পরিধিও বাড়ে, আমি ইচ্ছা করেই কিছু ধর্ম সংক্রান্ত শব্দ ব্যবহার করেছি এই কারনে; scrumping নিজেই একটি বেশ ব্যপক অর্থবহ একটি mot juste বা সঠিক শব্দ; এর অর্থ কিন্তু চুরি না; এর একমাত্র অর্থ হচ্ছে আপেল চুরি, শুধুমাত্র আপেল চুরি, কোন একটি শব্দ এতো নির্দিষ্ট হবার উদহারণ বিরল; স্বীকার করতেই হবে জেনেসিসের গল্প নির্দিষ্ট করে বলে দেয়নি যে ফলটি আসলে আপেল কিনা, কিন্তু দীর্ঘদিনের প্রচলিত ধারনাই সেটাই))

রিচার্ড ডকিন্স এর দি গড ডিল্যুশন : সপ্তম অধ্যায় (তৃতীয় পর্ব)

By K M Hassan

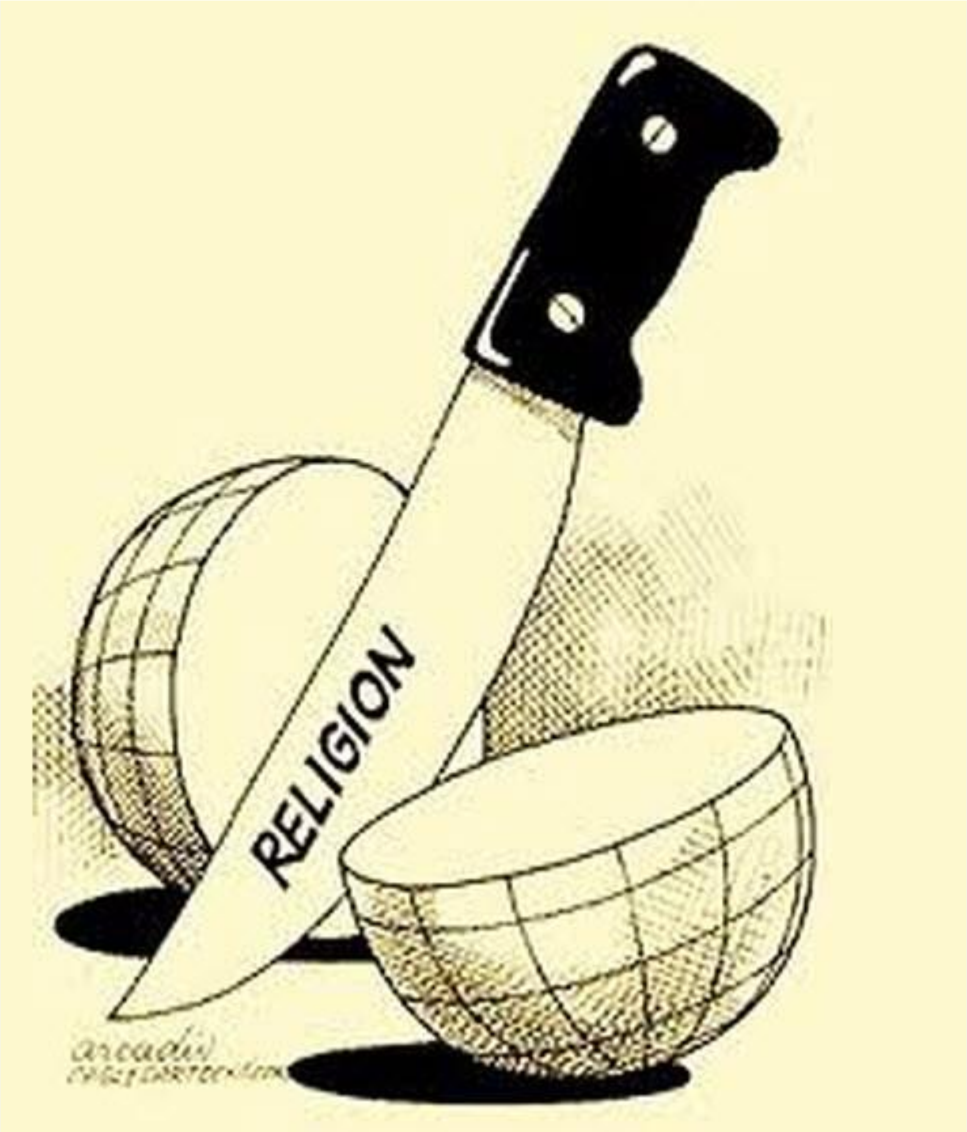
RELIGION
arcadio
CAGLECARTOONS.COM

ছবি সুত্র: ইন্টারনেট

রিচার্ড ডকিন্স এর দি গড ডিলুশন : সপ্তম অধ্যায় (তৃতীয় পর্ব)

(অনুবাদ প্রচেষ্টা: কাজী মাহবুব হাসান)

The God Delusion by Richard Dawkins

প্রথম অধ্যায়
দ্বিতীয় অধ্যায়
তৃতীয় অধ্যায়
চতুর্থ অধ্যায় (প্রথম পর্ব), চতুর্থ অধ্যায় (দ্বিতীয় পর্ব),
চতুর্থ অধ্যায় (তৃতীয় পর্ব), চতুর্থ অধ্যায় (চতুর্থ পর্ব), চতুর্থ অধ্যায় (শেষ পর্ব)
পঞ্চম অধ্যায় (প্রথম পর্ব), পঞ্চম অধ্যায় (দ্বিতীয় পর্ব), পঞ্চম অধ্যায় (তৃতীয় পর্ব)
পঞ্চম অধ্যায় (চতুর্থ পর্ব), পঞ্চম অধ্যায় (পঞ্চম পর্ব), পঞ্চম অধ্যায় (ষষ্ঠ পর্ব)

ষষ্ঠ অধ্যায় (প্রথম পর্ব) ; ষষ্ঠ অধ্যায় (দ্বিতীয় পর্ব); ষষ্ঠ অধ্যায় (শেষ পর্ব)
সপ্তম অধ্যায় (প্রথম পর্ব) ; সপ্তম অধ্যায় (দ্বিতীয় পর্ব)

‘পবিত্র’ গ্রন্থ এবং যুগের সাথে বদলে যাওয়া নৈতিকতার জাইটগাইষ্ট বা যুগধর্ম

তোমার প্রতিবেশীকে ভালোবাসো বা LOVE THY NEIGHBOUR

জন হারটাঙ (John Hartung) এর খানিকটা তীর্যক রসিকতা তার রচনাটির শুরু থেকেই দৃশ্যমান, যেখানে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিনাঞ্চলের একটি ব্যাপটিষ্ট উদ্যোগের কথা বলেছিলেন, যারা নরকে কয়জন অ্যালাবামাবাসী আছে তার সংখ্যা গোনার চেষ্ঠা করছিল; নিউ ইয়র্ক টাইমস আর নিউজডে দৈনিকে এর রিপোর্ট বলছে, এই সংখ্যা প্রায় ১.৮৬ মিলিয়ন হতে পারে বলে অনুমান করা হয়েছে একটি গোপন পদ্ধতি অনুসারে, যেমন মেথডিষ্টরা রোমান ক্যাথলিকদেন চেয়ে বেশী সম্ভাবনা আছে নরক থেকে ত্রান লাভ করার এমন একটি প্রাকধারণা ছিল, অন্যদিকে মুলত সবাই, যারা কোন চার্চের সাথে যুক্ত না, তাদের নরকে যাওয়া ছাড়া বাচার কোন উপায় রাখেননি তারা।এইসব মানুষগুলো এই অত্যধিক আত্মতৃপ্তি আজ প্রতিফলিত হয় রাপচার নামের বিভিন্ন ওয়েব সাইটগুলোয়; যেখানে লেখক সবসময়ই পুরোপুরি নিশ্চিৎভাবে ধরে নিয়েছেন, যখন ”শেষ সেই সময়” আসবে, তিনি স্বর্গে ”অদৃশ্য” হওয়া মানুষেদের একজন হবেন; ‘Rapture Ready’ র লেখকের লেখা থেকে একটি বৈশিষ্টমুলক উদহারন, এই ধারার অন্যতম কদর্য ছলধার্মিক নমুনা: “যদি রাপচার এর ঘটনাটি ঘটে, যা আমার অনুপস্থিতির কারন হবে, তাহলে ট্রিবুলেশন সেইন্টদের (Tribulation saints) দায়িত্ব নিতে হতে হবে এই সাইটির একটি মিরর সাইট বা এই সাইটটি আর্থিক সহায়তা করার জন্য (আপনি হয়তো জানেন না এই বাক্যে ‘tribulation saints’ এর অর্থ কি, এটা নিয়ে চিন্তা করার কোন কারন নেই, আপনার অনেক ভালো কিছু করার আছে এর বদলে);

হারটাঙ এর বাইবেল ব্যাখ্যা প্রস্তাব করছে যে, বইটি খৃষ্টানদের মধ্যে কোন এধরনের অতিরিক্ত আত্মতৃপ্তির সুযোগ রাখেনি; জীসাস তার এই অন্ত – গ্রুপ সদস্যরা, যাদের রাপচারের মাধ্যমে রক্ষা করা হবে, তা শুধু কঠোরভাবে ইহুদীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, যেক্ষেত্রে তিনি ওল্ড টেষ্টামেন্ট এর ঐতিহ্যকে অনুসরন করছিলেন, এর বাইরে তার কিছু জানাও ছিলনা তখন; হারটাঙ স্পষ্টভাবে দেখান যে, “তুমি হত্যা করবে না” বা “Thou shalt not kill”, এই নির্দেশটির কখনোই সেই অর্থ ছিল না , এটির অর্থ আমাদের কাছে এখন যেমন; এর অর্থ হচ্ছে, খুব নির্দিষ্টভাবে, তোমরা কোন ইহুদী হত্যা করবে না বা Thou shalt not kill Jews; এবং ঐ সব কমান্ডমেন্ট বা নির্দেশগুলো যা আপনার প্রতিবেশী (thy neighbour) বিষয়টির উল্লেখ করেছে, তারাও সমভাবে সুনির্দিষ্ট , এই ”প্রতিবেশী’ মানে আরেকজন ইহুদী; মোজেস মাইমোনাইডস (Moses Maimonides), অত্যন্ত সন্মানিত দ্বাদশ শতকের একজন র‍্যাবাই এবং ডাক্তার, এর বিষদ ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন এভাবে, ”কাউকে হত্যা করবে না” র অর্থ হচ্ছে : ’যদি কেউ একজন ইসরায়েলাইটকে হত্যা করে, সে ধর্মগ্রন্থর নিষিদ্ধ নির্দেশগুলোর প্রতি নেতিবাচক আচরণ বা অমান্য করে; কারন ধর্মগ্রনহ বলছে , তোমরা হত্যা করবে না, যদি কেউ ইচ্ছামুলকভাবে কোন স্বাক্ষীর উপস্থিতিতে কাউকে হত্যা করে, তাকে তরবারী দিয়ে শিরোচ্ছেদ করে শাস্তি দেয়া হবে; মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন যে কোন অবিশ্বাসীকে হত্যা করার জন্য কাউকে মৃত্যুদন্ড দেয়া হবে না;” মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন বা বলার অপেক্ষা রাখে না !!

হারটাঙ সানহেড্রিন (Sunhedrin) (ইহুদী সুপ্রীম কোর্ট, যা উচু পদমর্যাদার যাজকদের সমন্বয়ে গঠিত;) এর কিছু উদ্ধৃতি উল্লেখ করেন যা একই ধরনের অপরাধে এমন কাউকে দায়মুক্ত করে, হাইথেটিকালী ভুলক্রমে যখন কেউ কোন পশু বা অবিশ্বাসীকে খুন করতে গিয়ে কোন ইসরায়েলাইট হত্যা করে বসে, এই বিদ্রুপাত্মক নৈতিকতার ধাধা একটি ভালো বিষয়েরও অবতারণা করেন; কি হবে যদি সে এমন একটি পাথর ছুড়ে মারে নয়জন অবিশ্বাসী আর একজন ইসরায়েলাইট একটি গ্রুপের দিকে এবং দুর্ভাগ্যক্রমে যদি ইসরায়েলাইটই তাতে হত হয়? হুম, কঠিন! কিন্তু উত্তরও প্রস্তুত, তার দায়মুক্ততার ব্যাপারটা নিশ্চিৎ করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত আসবে তথ্যটি থেকে, যা বলছে অধিকাংশ অবিশ্বাসী ছিল সেখানে;

হারটাঙ অনেকগুলো একই বাইবেলের কোটেশন ব্যবহার করেছিলেন, যা এই অধ্যায়ে আমি ব্যবহার করেছি; মোজেস, জশুয়া এবং জাজেসদের প্রতিশ্রুত ভুমি বিজয় সম্পর্কে, ব্যাপারে; আমি সতর্কতার সাথে স্বীকার করে নিয়েছি, যে ধার্মিক মানুষগুলো বাইবেলের মত একইভাবে চিন্তা করেনা,; আমার কাছে এই বিষয়টি প্রতীয়মান করছে যে, আমাদের নৈতিকতাগুলো, আমরা ধার্মিক হই বা না হই, এসেছে ভিন্ন উৎস থেকে; এবং সেই অন্য উৎস, সেটা যাই হোক না কেন, আমাদের সবার জন্য যা উন্মুক্ত, ধর্ম বা ধর্মহীনতা কোন ব্যপারই সেখানে প্রভাব ফেলে না; কিন্তু হারটাঙ একজন ইসরায়েলি মনোবিজ্ঞানী জর্জ টামারিন (George Tamarin) এর একটি ভয়ঙ্কর গবেষনার কথা উল্লেখ করেছিলেন; গবেষনাটিতে টামারিন সহস্রাধিক ইসরায়েলী স্কুলের আট থেকে চৌদ্দ বছর বয়স্ক শিশুদের সামনে বুক অব জশুয়ায় (Book of Joshua) বর্নিত জেরিকোর যুদ্ধের (Battle of Jericho) বর্ণনা তুলে ধরেন:

জশুয়া তার অনুগত মানুষদের বলেন, ’চিৎকার করে বলো, মহান প্রভু ঈশ্বর তোমাদেরকে এই শহর প্রদান করেছেন এবং এই শহর ও তার মধ্যে সব কিছু ঈশ্বরের প্রতি বিসর্জনের লক্ষ্যে ধ্বংশ করা হবে… কিন্তু সব রৌপ্য এবং স্বর্ণ এবং ব্রোন্জের পাত্র ও লোহা মহান প্রভুর কাছে পবিত্র, সেগুলো মহান প্রভুর ধনভান্ডারে যোগ করা হবে……;’ এরপর তারা পুরোপুরি ভাবে শহরটির সবকিছু ধ্বংশ করে, পুরুষ, নারীদের উভয়ই ..তরুনদের আর বয়োবৃদ্ধদের, পালিত ষাড়, ভেড়া, গাধাদের সবকিছুই ধ্বংশ করা হলো তলোয়ারের ধারালো আঘাতে; পুরো শহরটাকে তারা আগুন দিয়ে প্রজ্বলিত করে, পুড়িয়ে দেয় এর মধ্যে যা ছিল সব কিছু, শুধুমাত্র রৌপ্য, সোনা এবং ব্রোন্জ আর লোহার পাত্রগুলো ছাড়া , যা তারা ঈশ্বরের ধণভান্ডারে জমা করে;

এরপর তামারিন শিশুদেরএকটি সাধারন নৈতিকতার প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন: ’তোমরা কি মনে করো যে, জশুয়া আর ইসরায়েলাইটরা কি কাজটা ঠিক করেছিল? উত্তর হিসাবে পছন্দ করার তাদের সুযোগ দেয়া হয়েছিল তিনটির যে কোন একটি : এ (পুরো সম্মতি), বি (আংশিক সম্মতি) এবং সি(পুরোপুরি অসম্মতি); এই সার্ভের ফলাফলে ছিল স্পষ্ট মেরুকরণের চিহ্ন: শতকরা ৬৬ ভাগ পুরো সম্মতির পক্ষে,২৬ ভাগ পুরো অসম্মতির পক্ষে এবং বরং কিছু কম প্রায় শতকরা ৮ শতাংশর অবস্থান মধ্যম, আংশিক সম্মতির স্বপক্ষে; এখানে প্রথম গ্রুপ, পুরো সম্মতির স্বপক্ষে উল্লেখ করা তিনটি টিপিকাল উত্তর দেয়া হলো:

আমার মতে জশুয়া এবং ইসরায়েলের সন্তানরা সঠিক আচরণ করেছিল, এবং এর কারন হচ্ছে: ঈশ্বর তাদের এই ভুমি দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন এবং তাদের অনুমতি দিয়েছেন এই দেশটি জয় করবার , তারা যদি সেভাবে কাজ না করতো বা কাউকে হত্যা না করতো, তাহলে বিপদের সম্ভাবনা রয়ে যেত ইসরায়েলের সন্তানদের গয়িম (Goyim) এর সাথে মিশে যাওয়ার;

আমার মতে জশুয়া ঠিক কাজই করেছিলেন, একটি কারন হচ্ছে ঈশ্বর নিজেই তাকেই নির্দেশ দিয়েছেন সব মানুষকে নিশ্চিহ্ন করতে যাতে, যেন ইসরায়েল এর অন্য গোত্ররা তাদের সাথে না মিশে যেতে পারে এবং তাদের খারাপ জীবনাচরণ না শিখতে পারে;

জশুয়া ভালো কাজ করেছিলেন কারন যে মানুষরা এই দেশে বাস করতো তাদের ধর্ম ছিল ভিন্ন এবং যখন জশুয়া তাদের হত্যা করে, সে তাদের ধর্মকে পৃথিবী থেকে মুছে দেয়;

জশুয়ার গনহত্যার স্বপক্ষে এ ধরনের যুক্তি প্রতিটি ক্ষেত্রেই ধর্মীয় প্রকৃতির ; এমনকি যাদের উত্তর ’সি’, অর্থাৎ পুরোপুরি অসম্মতির কথা বলেছে, কিছু কিছু ক্ষেত্রে তারা ধর্মের বিষয়টির হালকা ভাবে এনেছে; একটি শিশু যেমন জশুয়ার জেরিকো বিজয়ে এ অসম্মতি দিয়েছে, কারন তার মতে এটা করতে হলে তাকে জেরিকোতে তাকে ঢুকতে হবে:

আমি মনে করি কাজটা খারাপ হয়েছিল, যেহেতু আরবরা অপবিত্র, সুতরাং কেউ যদি সেই অপবিত্র ভুমিতে প্রবেশ করে, সে নিজেও অপবিত্র হয়ে যাবে এবং তাদের উপর বিদ্যমান অভিশাপেরও ভাগীদার হবে সে;

আরো দুজন যারা পুরোপুরি অসম্মতি জানিয়েছিল, তাদের কারন হচ্ছে, জশুয়া সবকিছু ধ্বংশ করেছিল, সম্পত্তি এবং গবাদীপশু সহ, সেই সম্পদ ইসরায়েলাইটদের জন্য কিছুই তিনি রাখেননি;

আমি মনে করি জশুয়া ঠিক কাজ করেননি,তারা কিছু গবাদী পশু ধ্বংশ না করে নিজেদের জন্য রাখতে পারতেন ;

আমি মনে করি জশুয়া ঠিক কাজটি করেননি, তিনি জেরিকোর সম্পদ বিনষ্ট না করতে পারতেন কারন তিনি যদি সম্পদ ধ্বংশ না করতেন সেগুলো ইসারায়েলের সন্তানদেরই হতো;

আবারো, সাধু মাইমোনাইডেস, প্রায়শই জ্ঞানের পান্ডিত্যর জন্য যার উদ্ধৃতি হিসাবে ব্যবহৃত হয়, কোন সন্দেহ নেই এই বিষয়ে তার অবস্থান কি ছিল; ’সাত জাতিকে ধ্বংশ করার জন্য এটি হ্যা বাচক নির্দেশ ছিল, যেমনটি এটি নির্দেশ করেছে : তোমরা তাদের পুরোপুরি ধ্বংশ করব ‘, কেউ যদি তাদেরকে হত্যা না করে যখন সে পারে, তাহলে সে সরাসরি নির্দেশটি অমান্য করে, যেমন বলা হয়েছে: তোমরা এমন কিছুকে জীবিত রক্ষা করবে না যারা শ্বাস নেয়;

মাইমোনাইডেস এর ব্যতিক্রম তামারিন এর পরীক্ষার সেই শিশুরা সবারই যথেষ্ট বয়স কম, নিষ্পাপ, সম্ভবত সে বন্য মনোভাব তারা প্রকাশ করছে, তা সম্ভবত তাদের পিতামাতার বা সেই সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর চিন্তাধারার প্রভাব, যেখানে তারা প্রতিপালিত হচ্ছে; আমার মনে হয়, প্যালেস্টাইনীয় শিশুদের ক্ষেত্রেও, যারা যুদ্ধ বিদ্ধস্ত দেশে বসবাস করছে, তারাও সম্ভবত বীপরিত অভিমুখী ও একই মতামত দিতে পারে; এই বিবেচনাগুলোয় আমাকে হতাশাগ্রস্থ করে তোলে; বিষয়টি ধর্মের বিশাল শক্তিকে প্রদর্শন করছে বলেই অনুভুত হয় আমার কাছে এবং বিশেষ করে ধর্মীয় পরিমন্ডলে বেড়ে ওঠা শিশুদের ক্ষেত্রে, তাদের মধ্যে মানুষের মধ্যে ভেদাভেদ এবং ঐতিহাসিক শত্রুতা এবং বংশগতভাবে জীঘাংসাকে লালন করার বিশেষ প্রক্রিয়াটিতে; আমি বাধ্য হচ্ছি মন্তব্য করতে যে,তামারিন এর গবেষনায় উত্তর গ্রুপ এ’র প্রতি তিন জন উত্তরদাতার দুজনই মন্তব্য করেছে জাতিগত মিশ্রনের অশুভ প্রতিক্রিয়ার কথা, অপরদিকে তৃতীয় মন্তব্যটি জোর দিয়েছে কোন ধর্মকে নিশ্চিহ্ন করতে সেই ধর্মর মানুষ হত্যার গুরুত্বর উপর;

তামারিন তার এক্সপেরিমেন্ট এ একটি বিস্ময়কর কন্ট্রোল গ্রুপও পরিচালনা করেন, ভিন্ন ১৬৮ জন ইসরায়েলী শিশুদের একটি গ্রুপকে বুক অব জশুয়া থেকে একই অংশ পড়তে দেয়া হয় , তবে যেখানে জশুয়ার নামের বদলে নাম দেয়া হয় জেনারেল লিন এবং ইসরায়েল এর বদলে সেখানে লেখা হয়া প্রায় ৩০০০ বছর আগের কোন চীনা রাজ্যর নাম; এবার এই এক্সপেরিমেন্টের ফলাফল হলো বীপরিত, মাত্র ৭ শতাংশ সম্মতি দিল জেনারেল লিন এর আচরনের সাথে, অপরদিকে ৭৫ শতাংশই দ্বিমত পোষন করে জেনারেল লিন এর এই কাজের সঠিকতা নিয়ে; অন্যার্থে যখনই তাদের আনুগত্য জুডাইজম থেকে সরিয়ে রাখা হয় এই হিসাব থেকে, বেশীর ভাগ শিশুই একমত হয় আধুনিক মানুষ যে নৈতিকতার বিচার সম্বন্ধে ধারনা পোষন করে তার সাথে; জশুয়ার সেই কর্মটি একটি বর্বরোচিত গনহত্যা ছাড়া আর কিছু নয়; কিন্তু কোন নির্দিষ্ট ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গী থেকে এটি সম্পুর্ণ ভিন্ন অনুভুত হয়; আর এই বৈষম্যটা শুরু হয় জীবনের শুরু থেকে; ধর্মই মুল বিভাজন সৃষ্টিকারী এখানে শিশুদের এই গনহত্যাকে নিন্দা করা আর সমর্থন করার মধ্যে;

হারটাঙ এর পেপারের বাকী অংশে, তিনি নিউ টেষ্টামেন্ট নিয়ে আলোচনা করেন, তার মুল বক্তব্যর একটি সংক্ষিপ্ত রুপ এভাবে দেয়া যেতে পারে : জীসাসও সেই একই অন্ত– গ্রুপ নৈতিকতার অনুসারী, যার সাথে যুক্ত গ্রুপ বহির্ভুতদের প্রতি শত্রুভাবাপন্নতা; যে বিষয়টি ওল্ড টেষ্টামেন্ট এ স্বাভাবিক নিয়ম হিসাবে ধরা হয়েছে; জীসাস

একজন অনুগত ইহুদী ছিলেন; পলই হচ্ছে সেই ব্যক্তি যিনি আবিষ্কার করেছেন কিভাবে ইহুদী ঈশ্বরের ধারনাটি ইহুদী নয় এমন জনগোষ্ঠীর কাছে নিয়ে যাওয়া যায়; হারটাঙ কোন রাখঢাক না করেই আমার চেয়ে সাহসী উচ্চারণ করেছেন," জীসাস তার কবরে নাড়া চড়া করে উঠতেন যদি তিনি জানতেন যে পল তার পরিকল্পনাটা কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন;"

বুক অব রিভিলেশন (Book of revealation) নিয়ে হারটাঙ বেশ মজা করেছেন, যা নিসন্দেহে বাইবেল এর সবচেয়ে আজব বই; বলা হয় বইটি লিখেছেন সেন্ট জন এবং Ken's Guide to the Bible সুন্দরভাবে যা বলেছেন; যদি তার এপিস্টল কে দেখা যায় জন গাজা খেয়েছেন, তাহলে রিভিলেশনে হবে জন পুরো অ্যাসিড বা এল এস ডির উপরে ছিলেন; হারটাঙ দুটো ভার্সে (রিভিলেশন), যেখানে পরিত্রান (sealed) পাওয়া মানুষের সংখ্যা (যা অন্য কিছু সেক্ট যেমন জীহোভাস উইটনেস , যাদের কাছে এই sealed শব্দটি হচ্ছে উদ্ধারপ্রাপ্ত) সীমাবদ্ধ ১৪৪,০০০ এ; হারটাঙ এর বক্তব্য হলো তাদের সবাইকে ইহুদী হতে হবে, ১২ টি গোত্রের প্রতিটি গোত্র থেকে ১২,০০০; কেন স্মিথ আরো খানিকটা গভীরে ব্যাখ্যা করে উল্লেখ করেন যে, ১৪৪,০০০ নির্বাচিত মানুষ হবে তারা যারা তাদেরকে কোন রমনীর সংসর্গে এসে নিজেদের দুষিত করেননি; যার সম্ভবত অর্থ হতে পারে, এদের কেউ নারী হতে পারবে না, বেশ, এমন কিছু আমাদের প্রত্যাশা করতে শিখেছি;

হারটাঙ এর পেপারে আরো অনেক কিছু আছে, আমি শুধু আরো একবার এটি পড়ার জন্য প্রস্তাব দিব; এবং উদ্ধৃতির মধ্যে পুরো ব্যাপারটির সার সংক্ষেপ করবো:

বাইবেল হচ্ছে অন্ত বা ইন গ্রুপ নৈতিকতার একটি নীলনকশা, গনহত্যার, অন্য গ্রোত্রের মানুষদের দাস হিসাবে বন্দী করার এবং পৃথিবীতে প্রাধান্য বিস্তার করার সব নির্দেশ সহ; বাইবেল কিন্ত অশুভ না এর উদ্দেশ্যর কারনে বা খুন হত্যা, নিষ্ঠুরতা এবং ধর্ষনকে গৌরবমন্ডিত করার অপরাধের জন্য, বহু প্রাচীন কাহিনীও ঠিক একই কাজ করেছে, যেমন, ইলিয়াড, অ্যাইসল্যান্ডের সেই গাথা, প্রাচীন সিরিয়াবাসীদের কাহিনী এবং প্রাচীন মায়াদের খোদাই করে রাখা ইতিহাস; কিন্তু কেউই ইলিয়াডকে বিক্রি করার চেষ্টা করছে না নৈতিকতার ভিত্তি হিসাবে, এবং সমস্যাটা সেখানেই; বাইবেল বিক্রি এবং কেনা হয় একটি গাইড হিসাবে, কেমন করে মানুষ তাদের জীবন কাটাবে সেই নির্দেশ সম্বলিত একটি বই হিসাবে; এবং এটি সারা বিশ্বে আপাতত সবচেয়ে বেশী বিক্রিত একটি বই, বেস্ট সেলার;

যদি কেউ ভাবেন যে ঐতিহ্যবাহী জুডাইজমে শুধু নিজস্ব অন্ত গোত্র সংকীর্ণতা আছে, তাহলে আইজাক ওয়াটস (১৬৭৪ –১৭৪৮) এর লেখা একটি হিম বা প্রার্থনা সঙ্গীত লক্ষ্য করা যাক:

Lord, I ascribe it to Thy Grace,
And not to chance, as others do,
That I was born of Christian Race
And not a Heathen or a Jew

আমাকে যা বিস্মিত করে এই অংশটিতে শুধু এক্সক্লুসিভনেস বা নিজেদের অনন্যতার যে দাবী করা হয়েছে সেটা নয় বরং এর যুক্তিটা; যেহেতু অসংখ্য মানুষ খৃষ্টান ছাড়াও আরো অনেক ধর্মে জন্মগ্রহন করেছেন, তাহলে কিভাবে ঈশ্বর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ভবিষ্যতে কোন মানুষগুলোর বিশেষভাবে তার পছন্দের ধর্মে জন্ম হবে? কেন আইজাক ওয়াট বা সেই মানুষগুলো. যাদের তিনি কল্পনা করেছেন তার স্তবসঙ্গীত গাইছে, তাদের কেন বিশেষ খাতির করা হবে? যাই হোক না কেন, আইজাক ওয়াট এর মাতৃগর্ভে ভ্রুণ হিসাবে যাত্রা শুরু করার আগে, সত্বার আসলে কি প্রকৃতি থাকতে হবে যা তার বিশেষ সুনজর পেতে পারে? গভীরতম বিষয়তো বটে তবে অবশ্যই অসীম গভীর নয়, বিশেষ করে যে মন ধর্মতত্ত্বের চিন্তায় অভ্যস্থ তাদের কাছে; আইজাক ওয়াট এর এই স্তব সঙ্গীত মনে করিয়ে দেয় গোড়া এবং রক্ষনশীল (কিন্তু সংস্কার হয়েছে বা রিফর্মড নয়) পুরুষ ইহুদীরা যা আবৃত্তি করার জন্য শেখেন,

তাদের তিনটি দৈনন্দিন প্রার্থনার সময় পড়ার জন্য; ’আপনার অসীম করুণা ,আমাকে ইহুদী ছাড়া আর কিছু না বানানোর জন্য. আপনার অসীম করুনা আমাকে রমনী বানাননি, অনেক কৃতজ্ঞতা আপনি আমাকে ক্রিতদাস বানাননি;”

ধর্ম নি:সন্দেহে বিভাজন সৃষ্টিকারী একটি শক্তি এবং এর বিরুদ্ধে এটি অন্যতম প্রধান অভিযোগ; কিন্তু প্রায়ই এবং সঠিকভাবেই বলা হয়, ধর্মীয় বিভিন্ন গোষ্ঠীর কিংবা উপগোষ্ঠীর মধ্যে যে যুদ্ধ এবং দ্বন্দ, সেগুলো কিন্তু খুব সময়ই বা কদাচিৎ আসলে ধর্মতাত্ত্বিক মতানৈক্য থেকে সৃষ্টি হয়; যখন উত্তর আয়ারল্যান্ডে উলস্টার প্রোটেষ্টান্ট প্যারামিলিটারী মিলিশিয়া সদস্য কোন ক্যাথলিককে হত্যা করে, সে কিন্তু সগোতক্তি করে না, নে এটাই তোর প্রাপ্য, ট্রান্সসাবস্টানশিয়ানিষ্ট (ক্যাথলিক মাসের সময় রুটি এবং মদ জীসাসের শরীর ও রক্তে রুপান্তর হবার মতবাদ বিশ্বাসী), মারিওল্যাটরাস (জীসাসের কমারী মা মেরীর প্রতি অতি ভক্তি প্রকাশ বা পুজা করা), ধুপ এর গন্ধ ছড়ানো বেজন্মা!‘, কারন খুব সম্ভবত সে অন্য কোন ক্যাথলিকের হাতে নিহত হওয়া অন্য কোন প্রটেষ্ট্যান্ট এর খুনের বদলা নিচ্ছে, কয়েক প্রজন্ম ধরে বিদ্যমান থাকা সহিংস জীঘাংসার কারনে; – ধর্ম কেবল একটি লেবেল বা তকমা এখানে, অন্ত গ্রুপ/বহি গ্রুপ এর মধ্যকার শত্রুতা ও প্রতিশোধ স্পৃহার মানসিকতার, যা অন্য কোন লেবেল এর চেয়ে বেশী খারাপ হতে হবে এমন আবশ্যিকতা নেই যদিও, যেমন গায়ের চামড়ার রং, ভাষা বা পছন্দের ফুটবল দল এবং যখন অন্য কোন লেবেল থাকে না তখন ধর্মর লেবেল সেই শুন্য স্থানটি পুরণ করে;

অবশ্যই উত্তর আয়ারল্যান্ডের সমস্যা রাজনৈতিক, একটি গ্রুপের অন্য গ্রুপকে অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিকভাবে শোষন সেখানে সত্যিকারের বাস্তবতা বহু শতাব্দীব্যাপী ; যেখানে দীর্ঘদিনের অবিচারের প্রতি সত্যিকারের ক্ষোভের অস্তিত্ব আছে, যা মনে হয় ধর্মর সাথে খুব সামান্যই সম্পর্কযুক্ত; শুধু মাত্র সেটা গুরুত্বপুর্ণ এবং সর্বস্তরে বিষয়টিকে উপেক্ষা করা হয়েছে; কারন ধর্ম ছাড়া কোন লেবেল ই সেখানে ছিল না, যেটা দিয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া যায় কাকে নীপিড়ন করতে হবে এবং কার উপর সেই নিপীড়নের পাল্টা প্রতিশোধ নিতে হবে; এবং উত্তর আয়ারল্যান্ডে সত্যিকারের সমস্যা হচ্ছে এই লেবেলটি উত্তরাধিকার সুত্রে বহু প্রজন্ম প্রজেন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে বহন করে চলেছে, ক্যাথলিকরা, যাদের পিতামাতা, প্রপিতামহ এবং প্রপ্রপিতামহ ক্যাথলিক স্কুলে যাতায়াত করেছেন, তারা তাদের সন্তানদেরও ক্যাথলিক স্কুলে পাঠিয়েছেন, প্রোটেষ্ট্যান্ট, যার পিতামাতা, প্রপিতামহ এবং প্রপ্রপিতামহ যেমন গিয়েছিলেন প্রোটেষ্ট্যান্ট স্কুলে , তাদের অনুসরণ করে তাদের সন্তানরাও প্রোটেষ্ট্যান্ট স্কুলে যাতায়াত করেছে; এই দুই সেট মানুষ, যাদের একই চামড়ার রঙ, একই ভাষা,একই জিনিসের প্রতি আগ্রহ, কিন্তু তার আসলে যেন দুটি ভিন্ন প্রজাতির অন্তর্ভুক্ত, এত গভীর তাদের ঐতিহাসিক বিভাজন; এবং ধর্ম ছাড়া, বা ধর্মীয় পৃথকীকৃত শিক্ষাব্যবস্থা ছাড়া, সেখানে সেই পার্থক্যটাই থাকার কথা না; কসোভো থেকে প্যালেস্টাইন, ইরাক থেকে সুদান, উলস্টার থেকে ভারতীয় উপমহাদেশ, ভালো করে যেকোন জায়গায় খেয়াল করুন, আপনি দেখতে পাবেন প্রতিদ্বন্দী গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে বিদ্যমান অমিমাংসাযোগ্য শত্রুতা এবং হিংস্র আক্রমনাত্মক সংঘর্ষ; আমি গ্যারান্টি দিতে পারবো না, যে আপনি ধর্মকে প্রধান লেবেল হিসাবে পাবেন অন্ত আর বহি গ্রুপের মধ্যে পার্থক্যসুচক হিসাবে; তবে আত্মবিশ্বাসের সাথে বাজী রাখার মতই নিশ্চিৎ ভাবে বলা সম্ভব;

ভারতে, দেশভাগের সময়, এক মিলিয়নের বেশী মানুষ গনহত্যার স্বীকার হয়েছিলেন, হিন্দু মসুলমান ধর্মীয় দাঙ্গায় (এবং প্রায় ১৫ মিলিয়ন মানুষ গৃহচ্যুত হয়েছিলে); ধর্ম ছাড়া আর কোন চিহ্ন নেই তাদের শনাক্ত করার জন্য, যা দিয়ে কাউকে চিহ্নিত করা যায়, কাকে হত্যা করতে হবে; অবশেষে ধর্ম ছাড়া তাদের মধ্যে পার্থক্য করার মতো আর কিছুই অবশিষ্ট থাকেনি; সম্প্রতি ঘটে যাওয়া এমন একটি ধর্মীয় গনহত্যার প্রতিক্রিয়া বিচলিত হয়ে সালমান রুশদীন একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন, ‘Religion, as ever, is the poison in India’s blood’ শিরোনামে, তার শেষ অনুচ্ছেদটি এখানে উল্লেখ করছি:

এইসব কিছুকে বা এই সব অপরাধ যা সারা পৃথিবীতে ধর্মের ভয়ঙ্কর নামে প্রতিটি দিন সংঘটিত হচ্ছে, তাদের শ্রদ্ধা করার মত কি আছে? কত অনায়াসে, এবং কত ভয়াবহ পরিনতি সহ ধর্ম তাদের বিশ্বাস বা টোটেমকে স্থাপন করে এবং আমরাও কত বেশী উদগ্রীব থাকি তার জন্য হত্যা করতে; এবং আমরা যখন কাজটি যথেষ্ট পরিমান নিয়মিত করতে থাকি, এর ক্রমশ ক্ষীনতর হয়ে আসা প্রভাব আরো সহজ করে দেয় কাজগুলোর পুণরাবৃত্তি করতে;

সুতরাং ভারতে সমস্যা পরিণত হয়েছে পৃথিবীর সমস্যায়, ভারতে যা ঘটেছে তা ঘটেছে ঈশ্বরের নামে; এই সমস্যার নামই ঈশ্বর;

আমি অস্বীকার করছি না যে, অন্ত গ্রুপ বা কোন গোষ্ঠীর অভ্যন্তরে অনুগাত্য এবং গোষ্ঠী বহির্ভুতদের প্রতি সহিংসতা প্রদর্শনে মানবতার শক্তিশালী প্রবণতা এমনকি ধর্ম ছাড়াও টিকে থাকবে; প্রতিদ্বন্দী ফুটবল টীমের সমর্থকরা এই বিষয়টির একটি জলজ্যান্ত প্রমান হতে পারেন; এমনকি ফুটবল সমর্থকরাও ধর্মীয় ধারায় কখনো কখনো বিভক্ত হয়, যেমন গ্ল্যাসগো রেন্জারস এবং গ্ল্যাসগো সেল্টিকদের ক্ষেত্রে; ভাষা (যেমন বেলজিয়ামে), রেইস বা বর্ণে এবং গোত্র (বিশেষ করে আফ্রিকায়) বিভাজনের গুরুত্বপুর্ণ টোকেন হতে পারে; কিন্তু ধর্ম কমপক্ষে তিনটি উপায়ে তার সৃষ্ট ক্ষতিগুলোকে আরো ক্ষতিকর আর বাড়িয়ে তোলে ..

১ শিশুদের লেবেল বা চিহ্নিত করার মাধ্যমে, শিশুদের বর্ণনা করা হয়, ক্যাথলিক শিশু বা প্রটেষ্টান্ট শিশু ইত্যাদি, খুবই অল্প বয়স থেকে, এবং অবশ্য যথেষ্ট কম বয়স, যখন তারা ধর্ম সম্বন্ধে নিজেদের মন স্থির করার মত কোন ক্ষমতাই থাকে না (আমি এই শিশু নির্যাতনের বিষয়টি আলোচনা করবো নবম অধ্যায়ে);

২ বিভাজিত স্কুল: শিশুদের শিক্ষা দেয়া শুরু হয় সাধারনত খুবই অল্প বয়স থেকে, ধর্মীয় গোষ্ঠী অভ্যন্তরের সদস্যদের দিয়ে এবং পৃথকভাবে অন্য শিশুদের থেকে, যাদের পরিবার হয়তো অন্য ধর্মর অনুসারী; মোটেও বাড়াবাড়ি হবে না এাট বলা যে, উত্তর আয়ারল্যান্ডের সমস্যা একটি প্রজন্মেই শেষ হয়ে যেতে পারতো,, যদি পৃথক স্কুলিং বা শিক্ষা ব্যবস্থা যদি অবলুপ্ত করা যেত;

৩ ”গোষ্ঠী বহির্ভুত বিয়ের’ বিরুদ্ধে সামাজিক টাবু বা প্রতিষিদ্ধতা: এটি বংশগতভাবে সংঘর্ষ এবং প্রতিশোধ স্পৃহাকে জিইয়ে রাখে দ্বন্দরত গ্রুপগুলোর মধ্যে মিশ্রনে বাধা সৃষ্টি করার মাধ্যমে; আন্তবর্ণ বিবাহ, যদি অনুমিত হতো, স্বাভাবিকভাবে এটি বিদ্যমান শত্রুতাকে কমিয়ে দিতো;

উত্তর আয়ারল্যান্ডে গ্লেনার্ম গ্রামে আনট্রিম আর্লদের মুল জমিদারী বা ক্ষমতার কেন্দ্র; আমাদের স্মরণকালের স্মৃতিকেই একবার তৎকালীন আর্ল, একটি অভাবনীয় কাজ করে বসেন: তিনি একজন ক্যাথলিক রমনীকে বিয়ে করেছিলেন, সাথে সাথে গ্লেনার্ম এর ঘরে ঘরে শোকের চিহ্ন হিসাবে পর্দা নামিয়ে দেয়া হয়; অন্য ধর্মে বিয়ে করার ভয় ধার্মিক ইহুদীদের মধ্যেও প্রবল; বেশ কিছু ইসরায়েলী শিশু মন্তব্য করেছিল তামারিনের ইতিমধ্যে উল্লেখিত সার্ভেটিতে (উপরের উদ্ধতি উল্লেখ করা হয়েছে) যে জশুয়ার জেরিকো যুদ্ধর প্রতি তাদের সমর্থনে, প্রথমেই ভিন্ন জাতি গোষ্ঠী ধর্মের সংমিশ্রনের সমস্যা উল্লেখ করে; যখন ভিন্ন ধর্মের মানুষ বিয়ে করে, উভয় দিক থেকে এই ‘মিশ্র বিয়ে’ সম্বন্ধে আশঙ্কার কথা উচ্চারণ করা হয় এবং কখনো এই দীর্ঘ বিতর্ক হয় এই বিয়ের সন্তানরা কিভাবে প্রতিপালিত হবে সেই বিষয়ে; আমি যখন শিশু এবং অ্যাঙলিকান চার্চের আলো বহন করে বেড়াচ্ছি, আমার মনে আছে আমি হতবাক হয়েছিলাম, একটি নিয়মের কথা শুনে, যে যখন রোমান ক্যাথলিক কোন অ্যাঙলিকান কে বিয়ে করে, তাদের সন্তানদের সবসময় বড় করতে হবে ক্যাথলিক হিসাবে; আমি সহজে বুঝতে পারি কেন একজন যাজক, যে কোন গ্রুপের হোক না কেন, এই শর্ত আরোপের জন্য চাপ দেবেন, তবে আমি বুঝতে পারি না (এখনও না) এই অসাম্যতাটা কেন? অ্যাঙলিকান যাজকরা এর বিরুদ্ধে তাদের সমরুপী শর্ত জুড়ে দিয়ে পাল্টা জবাব দেন না কেন? খানিকটা কম নিষ্ঠুর, আমান যা মনে হয়, আমার পুরোনো চ্যাপলেইন এবং বেটইয়েমান (Betjeman) এর আওয়ার পাদ্রে (Our Padre) আসলে অতি নীরিহ তুলনামুলকভাবে;

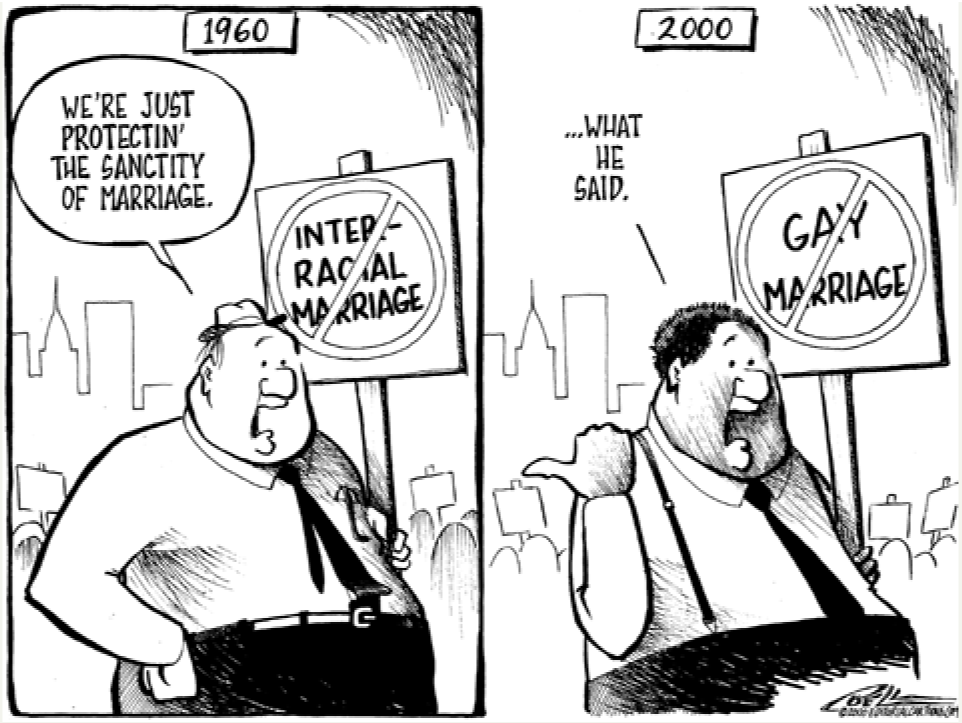

কার্টুন সুত্র: ইন্টারনেট

সমাজবিজ্ঞানীরা সার্ভে করে দেখেছেন ধর্মীয় হোমোগ্যামী (Homogamy বা এই ধর্মের কাউকে বিয়ে করা) এবং হেটেরোগ্যামী (Heterogamy বা অন্য ধর্মের কাউকে বিয়ে করা) দুটি অবস্থাকে; ইউনিভার্সিটি অব টেক্সাস, অস্টিন এর গবেষক নরভাল ডি গ্লেন (Norval D Glenn) ১৯৭৮ সাল পর্যন্ত বেশ কিছু গবেষনাকে সংগ্রহ করে নতুন করে পর্যালোচনা করেন; এবং তার উপসংহার হলো ধর্মীয় হোমোগ্যামীর একটি উল্লেখযোগ্য প্রবণতা আছে খৃষ্ট ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে (প্রটেষ্টান্টরা বিয়ে করে প্রটেষ্ট্যান্টদের, ক্যাথলিকরা কাথলিকদের, যা সার্ভের ফলাফলে সাধারন boy next door ইফেক্টে পরিসংখ্যানগত দিক থেকেও অনেক বাড়তি) তবে হোমোগ্যামির সবচে বেশী হার দেখা যায় ইহুদীদের মধ্যে; সার্ভেটির বিবাহিত ৬২০১ জন উত্তরদাতাদের মধ্যে, ১৪০ জন ছিলেন যারা তাদের ইহুদী বলে পরিচিতি দেন, যাদের ৮৫.৭ শতাংশ বিয়ে করেছেন অন্য ইহুদী ধর্মাবলম্বী কাউকে; যা সম্ভাব্য প্রত্যাশিত করা হয় এমন স্বধর্মের বিয়ের হার থেকেও অনেক বেশী; অবশ্য কারো কাছে এটি আশ্চর্য জনক কিছু মনে হয়নি; কারন ধার্মিক ইহুদীদের অসবর্ণ বিয়ে করতে বিশেষভাবে নিরুৎসাহিত করা হয়; এবং ট্যাবু বা প্রতিষিদ্ধ টি দেখা যায় ইহুদীদের কৌতুকে, যেখানে মায়ে রা তাদের ছেলেদের সাবধান করে দিচ্ছেন, সোনালী চুলের সুন্দরী নারীরা ফাদ পেতে অপেক্ষা করছে তাদের ধরতে; যুক্তরাষ্টের তিনজন রাবাই বা ইহুদী যাজকদের বৈশিষ্টমুলক মন্তব্য:

আমি অসবর্ণ বিবাহ পরিচালনা করতে অস্বীকৃতি জানাই;

আমি পরিচালনা করি যদি দম্পতি সিদ্ধান্ত নেয় তারা তাদের সন্তানকে ইহুদী হিসাবে প্রতিপালন করবে;

আমি পরিচালনা করি যদি দম্পতি বিবাহপুর্ব পরামর্শ গ্রহন করতে রাজি হয়;

একজন খৃষ্ট যাজকের সাথে একই সাথে কোন বিয়ে পরিচালনা করার মত রাবাই খুবই দুষ্প্রাপ্য, এবং তার চাহিদা অনেক বেশী;

এমনকি ধর্ম যদি নিজে আর কোন ক্ষতিও না করে, এর স্বেচ্ছাচারী আর কৌশলে সাবধানতার সাথে গড়ে তোলা মানুষে মানুষে বিভাজন –নিজ গোষ্ঠীর সদস্যদের প্রতি পক্ষপাতিত্ব আর গোষ্ঠী বহির্ভুতদের প্রতি প্রদর্শিত শত্রুভাবাপন্ন মনোভাবের প্রাকৃতিক আর স্বাভাবিক প্রবণতাকে পরিকল্পিত আর উদ্দেশ্যমুলকভাবে উস্কে দেয়াই যথেষ্ট এটিকে পৃথিবীতে একটি গুরুত্বপুর্ণ অশুভ শক্তি হিসাবে রুপান্তরিত করার জন্য;

রিচার্ড ডকিন্স এর দি গড ডিল্যুশন : সপ্তম অধ্যায় (চতুর্থ পর্ব)

By K M Hassan

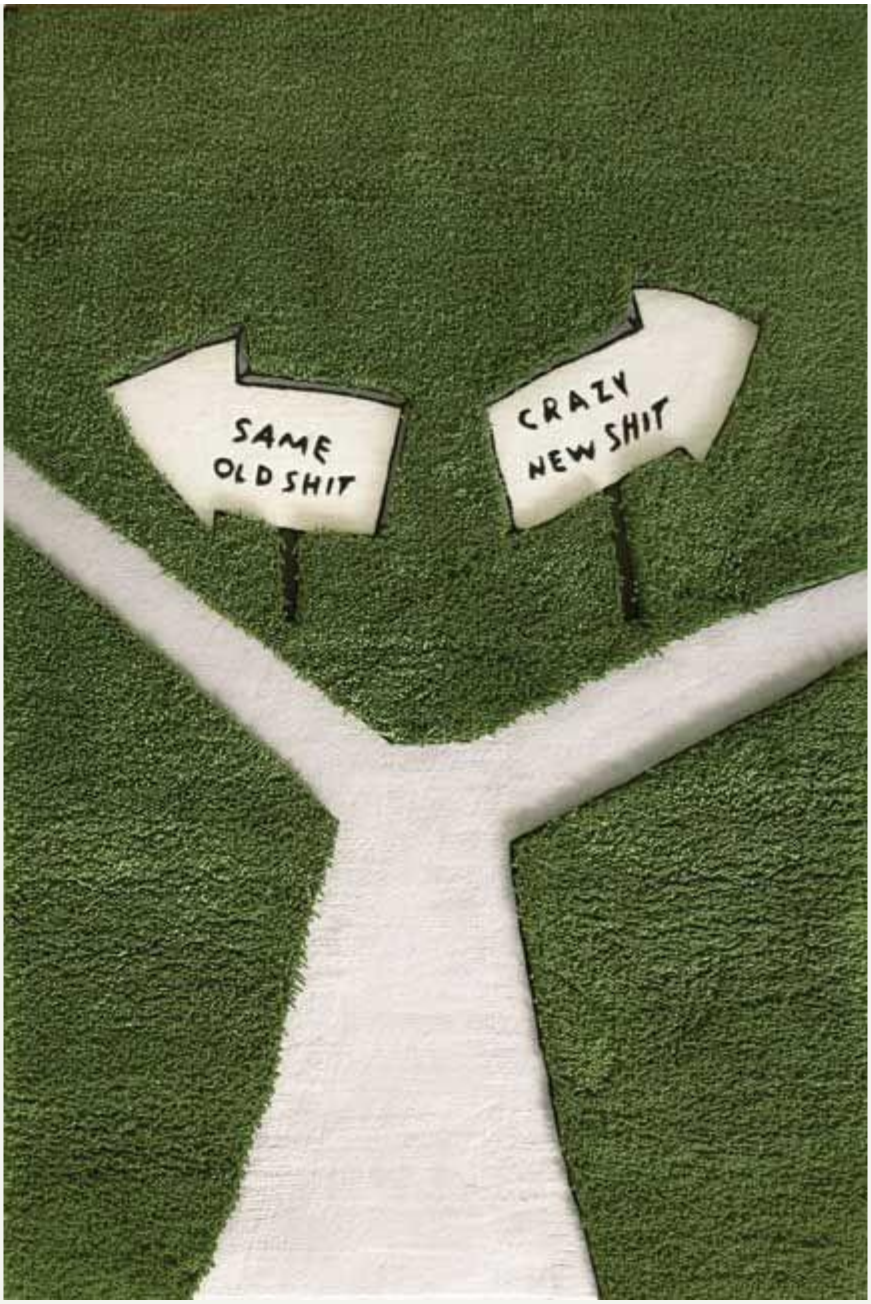
SAME
OLD SHIT
CRAZY
NEW SHIT

শিল্পী ড্যান গোল্ডেন (Dan Golden) ডিজাইন করা একটি কার্পেট

রিচার্ড ডকিন্স এর দি গড ডিল্যুশন : সপ্তম অধ্যায় (চতুর্থ পর্ব)

(অনুবাদ প্রচেষ্টা: কাজী মাহবুব হাসান)

The God Delusion by Richard Dawkins

প্রথম অধ্যায়
দ্বিতীয় অধ্যায়
তৃতীয় অধ্যায়

চতুর্থ অধ্যায় (প্রথম পর্ব) , চতুর্থ অধ্যায় (দ্বিতীয় পর্ব) ,
চতুর্থ অধ্যায় (তৃতীয় পর্ব) , চতুর্থ অধ্যায় (চতুর্থ পর্ব) , চতুর্থ অধ্যায় (শেষ পর্ব)
পঞ্চম অধ্যায় (প্রথম পর্ব), পঞ্চম অধ্যায় (দ্বিতীয় পর্ব) , পঞ্চম অধ্যায় (তৃতীয় পর্ব)
পঞ্চম অধ্যায় (চতুর্থ পর্ব) , পঞ্চম অধ্যায় (পঞ্চম পর্ব) ,পঞ্চম অধ্যায় (ষষ্ঠ পর্ব)
ষষ্ঠ অধ্যায় (প্রথম পর্ব) ; ষষ্ঠ অধ্যায় (দ্বিতীয় পর্ব); ষষ্ঠ অধ্যায় (শেষ পর্ব)
সপ্তম অধ্যায় (প্রথম পর্ব) ; সপ্তম অধ্যায় (দ্বিতীয় পর্ব) ; সপ্তম অধ্যায় (তৃতীয় পর্ব)

‘পবিত্র’ গ্রন্থ এবং যুগের সাথে বদলে যাওয়া নৈতিকতার জাইটগাইষ্ট বা যুগধর্ম

মোরাল জাইটগাইস্ট (Zeitgeist*): নৈতিকতার যুগধর্ম

এই অধ্যায় শুরু হয়েছিলো যে বিষয়টি প্রদর্শন করে, তা হলো, আমরা নৈতিকতার ভিত্তি – এমনকি আমাদের মধ্যে যারা ধার্মিক- হিসাবে কোন পবিত্র গ্রন্হর উপর নির্ভরশীল নই, আমরা যতই সেটা কল্পনা করতে ভালোবাসি না কেন; তাহলে, কিভাবে আমরা সিদ্ধান্ত নেই, কোন ঠিক আর কোনটা ভুল? আমরা যেভাবেই এই প্রশ্নের উত্তর দেই না কেন, অন্তত একটি ঐক্যমত আছে ভালো বা খারাপ বিবেচনা করে আমরা আসলেই যা করছি সে বিষয়ে; যে ঐক্যমতটি বিস্ময়করভাবে সর্বজনীন; এবং এই ঐক্যমতটির কোন সুস্পষ্ট সম্পর্ক নেই ধর্মের সাথে; যদিও এটি সম্প্রসারিত করা সম্ভব ধার্মিকদের ক্ষেত্রেও, তারা তাদের নৈতিকতা ধর্ম থেকে এসেছে বা আসেনি, যাই ভাবুন না কেন; উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম অবশ্য যেমন, আফগান তালিবান এবং তাদের সমতুল্য যুক্তরাষ্ট্রের উগ্র খৃষ্টবাদীরা ছাড়া, বেশীর ভাগ মানুষই একটি উদার নৈতিকতার মুলনীতিগুলোর সাথে অন্ততপক্ষে মৌখিকভাবে তাদের সমর্থন প্রদান করে; আমরা বেশীর ভাগ মানুষই অপ্রয়োজনীয় কোন কষ্টের কারন নই; আমরা বিশ্বাস করি স্বাধীন মত প্রকাশের অধিকারে, এবং সেই অধিকারকে রক্ষা করাকে জরুরী মনে করি, এমনকি যখন সেটা আমাদের মতের সাথে মেলে না; আমরা আমাদের কর প্রদান করি, প্রতারণা করিনা,হত্যা করি না, ইনসেস্ট বা অজাচারে লিপ্ত নই, এমন কিছু অন্য কারো সাথেই করি না, যা আমরা চাইনা অন্যরাও আমাদের সাথে তা করুক; এই ভালো নৈতিক মুল নীতিগুলো পবিত্র গ্রন্হেও পাওয়া যাবে, তবে সেগুলো লুকিয়ে আছে আরো অনেক কিছুর সাথে , যা কোন ভদ্র সুশীল মানুষের পক্ষে মেনে নেয়া অসম্ভব; এবং পবিত্র কোন গ্রন্থই আমাদের এমন কোন নিয়ম নীতি বাতলে দেয় না, যা দিয়ে আমরা খারাপ কোন নীতির সাথে ভালো নীতির পার্থক্য করতে পারি;

আমাদের ঐক্যমতের মুলনীতিগুলো প্রকাশ করার একটি উপায় হচ্ছে নুতন বা নিউ টেন কম্যান্ডমেন্টস; বেশ কিছু মানুষ এবং প্রতিষ্ঠান এটি করার প্রচেষ্টা করেছেন; যেটা উল্লেখযোগ্য সেটা হচ্ছে তারা সবাইই বরং প্রায় একই রকম ফলাফলের পৌছে ছিলেন; তারা যেটা তৈরী করেছিলেন,তা তাদের সময়েরেই নৈতিকতার প্রতিচ্ছবি, তারা যে যুগে বেচে ছিলেন সেই সময়ের বৈশিষ্টসুচক; নীচে আমি এই যুগের দশটি কমান্ডমেন্ট এর একটি সেট উল্লেখ করলাম, যা একটি নীরিশ্বাদীদের ওয়েবসাইট থেকে সংগ্রহ করা করেছি:

অন্য কারো সাথে এমন কোন আচরণ করা থেকে বিরত থাকুন, যে আচরণ অন্যদের কাছে আপনি প্রত্যাশা করেন না;

যেকোন কাজে, আন্তরিকভাবে সবসময় চেষ্টা করুন কোন ক্ষতি না করতে;

সকল মানুষ, জীবিত প্রানী এবং সাধারণভাবেই পুরো পৃথিবীর সবকিছুর সাথেই ভালোবাসা,সততা, বিশ্বাস এবং শ্রদ্ধার সাথে আচরণ করুন;

কখনোই কোন অশুভ কিছু দেখলে উপেক্ষা করবেন না বা ন্যায় বিচার করা থেকে কখনোই পিছিয়ে আসবেন না, কিন্তু সবসময় প্রস্তুত থাকবেন, কোন খারাপ কাজর জন্য অবলীলায় আন্তরিকভাবে দোষ স্বীকার এবং সততার সাথে করা কোন অনুশোচনাকে ক্ষমা করে দেবার জন্য;

জীবনে বাচুন আনন্দ আর অসীম বিস্ময়ের অনুভুতি নিয়ে;

সবসময় চেষ্টা করুন নতুন কিছু শেখার জন্য,

সবকিছুকে যাচাই করুন, বাস্তব তথ্যর সাথে সবসময় আপনার নিজস্ব ধারনাকে যাচাই করে দেখুন, দীর্ঘদিন ধরে লালন করা কোন বিশ্বাসকে পরিত্যাগ করতে প্রস্তুত থাকুন যদি বাস্তব তথ্য প্রমানের সাথে তা অসামন্জষ্যপুর্ণ হয়;

কখনোই কাউকে বাধা দেবার চেষ্টা বা ভিন্ন মত থেকে নিজেকে দুরে সরিয়ে নেবেন না, সবসময় অন্যদের আপনার সাথে একমত না হবার অধিকারকে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করবেন;

আপনার নিজস্ব যুক্তি এবং অভিজ্ঞতাগুলোকে ভিত্তি করে আপনার নিজস্ব মতামত গড়ে তুলুন, অন্যদের অন্ধভাবে অনুসরণ করা থেকে নিজেকে বিরত রাখুন;

সবকিছুকেই প্রশ্ন করুন;

এই ক্ষুদ্র তালিকাটি কোন মহান জ্ঞানী সাধু বা নবী বা পেশাজীবি কোন নৈতিকতা বিশেষজ্ঞর লেখা নয়; খুব সাধারন একজন ওয়েব লগার হচ্ছেন এর রচয়িতা, বর্তমান যুগে একটি সুন্দর নৈতিক জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় মুলনীতিগুলোকে সার সংক্ষেপ করে প্রকাশ করা আন্তরিক প্রচেষ্ঠা; একটি সার্চ ইন্জিনে নিউ টেন কমান্ডমেন্ট টাইপ করে আমি এটাই খুজে পেয়েছিলাম প্রথম, এবং ইচ্ছা করেই আমিও আর খুজিনি; মুল বিষয়টি হলো, এধরনের কোন তালিকা যে কোন সাধারন, ভদ্র মানুষই করবেন, সবাই যদিও ঠিক একই দশটির তালিকা করবেন না। দার্শনিক জন রলস (John Rawls) হয়তো এমন কিছু যোগ করতে পারেন তালিকায়: 'সবসময় নিজের নিয়ম তৈরী করে নিন যেন আপনার জানা নেই, সামাজিক প্রাধান্য বিস্তারে আপনার অবস্থান কোথায়;' ইনুইটদের (Inuit) একটি সামাজিক প্রথা, খাদ্য ভাগাভাগি করে নেবার একটি সিস্টেম আছে যা রলের এই নীতির প্র্যাকটিকাল একটি উদহারণ হতে পারে: যে ব্যক্তিটি খাদ্য কেটে ভাগাভাগি করে, সে সবচেয়ে শেষে তার অংশটি পছন্দ করার সুযোগ পাবে;

আমার নিজের সংশোধিত টেন কম্যান্ডমেন্টস উপররে তালিকা থেকে বেশ কয়টি নির্বাচন করবো এবং আরো কয়েকটি যোগ করার চেষ্টা করবো:

আপনার যৌন জীবন উপভোগ করার চেষ্টা করুন (যতক্ষন এটি অন্য কারো ক্ষতি করছে না) এবং অন্যদেরকে তাদের জীবন উপভোগ করতে দিন ব্যক্তিগতভাবে তাদের যে ধরনের পছন্দ থাকুক না কেন; যা আপনার চিন্তার বিষয় নয়;

লিঙ্গ,বর্ণ (এবং যতটুকু সম্ভব) প্রজাতির উপর ভিত্তি করে কাউকে নির্যাতন বা বৈষম্যমুলক আচরণ করা থেকে বিরত থাকুন

আপনার শিশুদের কোন মতবাদে দীক্ষিত করার থেকে বিরত থাকুন, তাদেরকে শেখান, নিজে কিভাবে চিন্তা করতে হবে, কিভাবে মুল্যায়ন করতে হবে উপস্থিত প্রমানকে এবং শেখান কিভাবে আপনার সাথে দ্বিমত পোষন করতে হবে;

ভবিষ্যতকে মুল্য দিন, আপনার নিজের জীবনের সময়কালের চেয়ে বেশী;

কোনটি অগ্রাধিকার পাচ্ছে সেই ছোট খাট বিষয়গুলো নিয়ে চিন্তা করার দরকার নেই, মুল কথা হলো আমরা সবাই প্রায় সামনের দিকে এগিয়ে গেছি এবং সেই বাইবেলে বর্নিত সময় থেকে এই অগ্রসর হবার পরিমানটাও অনেক বিশাল; দাসত্ব, যা বাইবেলে এবং ইতিহাসের প্রায় পুরো সময় ধরেই স্বাভাবিক হিসাবেই ধরে নেয়া হয়েছে , সভ্য সব দেশগুলো থেকেই বিলুপ্ত করা হয়েছে উনবিংশ শতাব্দীতে; প্রায় সব সভ্য দেশই স্বীকার করে নিয়েছে যা কিনা ১৯২০ সাল পর্যন্ত সর্বজনীনভাবে অস্বীকৃত ছিল.. যে কোন নারীদের ভোটাধিকার বা জুরি হিসাবে তাদের দায়িত্ব পালনের অধিকার হচ্ছে যে কোন পুরুষের সমান; আজকের যুগে অগ্রসর জ্ঞানালোকপ্রাপ্ত সমাজে বা কোন সভ্য দেশেই (যে ক্যাটাগরীতে অবশ্যই কিছু দেশ, যেমন সৌদি আরব অন্তর্ভুক্ত নয়) নারীদের আর সম্পত্তি হিসাবে গণ্য করা হয় না, বাইবেলে বর্ণিত সময়ে স্পষ্টতই তারা যেভাবে গন্য হতেন; যে কোন আধুনিক আইন আলাদত আব্রাহামকে শিশু নির্যাতনের জন্য বিচার করতো এবং যদি সে আসলেই আইজাককে উৎসর্গ করার পরিকল্পনাটা শেষ পর্যন্ত কার্যকর করতো, তাহলে তার বিচার হতো প্রথম ডিগ্রী হত্যার জন্য; কিন্তু তার সময়ের নৈতিকতায়, তার আচরণ পুরোপুরিভাবে প্রশংসার দাবীদার, কারন ঈশ্বরের নির্দেশই মোতাবেক তিনি কাজ করেছিলেন; ধার্মিক হই বা না হই, আমরা সবাই বদলে গেছি ব্যপকভাবে কোনটা সঠিক আর কোন ভুল সে সম্বন্ধে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গীতে; এই পরিবর্তনের প্রকৃতিটা আসলেই কি, আর এটি পরিচালিত করে কি?

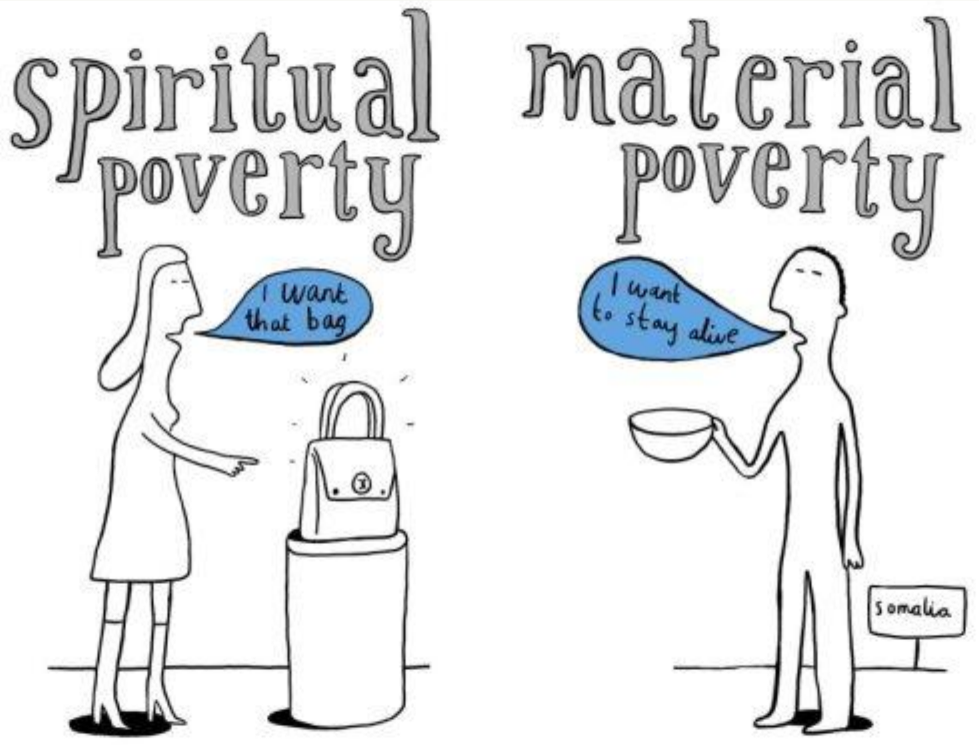

(ছবি সুত্র)

যে কোন সমাজে খানিকটা রহস্যময় একধরনের ঐক্যমতের অস্তিত্ব আছে, যা পরিবর্তিত হয় কয়েক দশকের সময়ের পরিক্রমায় এবং যার জন্য একটি ধার করা জার্মান শব্দ জাইটগাইস্ট (Zeitgeist) ব্যবহার করা খুব একটা বাড়াবাড়ি হবে বলে মনে হয় না, শব্দটির অর্থ spirit of the times বা যুগ ধর্ম; আমি বলেছিলাম নারীদের ভোট দেবার অধিকার পৃথিবীর যে কোন গণতন্ত্রে এখন সর্বজনীন; কিন্তু এই সংস্কার কিন্তু অপেক্ষাকৃত বেশ সাম্প্রতিক, নীচে কিছু সময়কাল দেয়া হলো বিভিন্ন দেশের, যখন নারীরা তাদের ভোটাধিকার অর্জন করেছিলেন:

নিউজীল্যান্ড	১৮৯৩
অষ্ট্রেলিয়া	১৯০২
ফিনল্যান্ড	১৯০৬
নরওয়ে	১৯১৩
যুক্তরাষ্ট্র	১৯২০
ব্রিটেন	১৯২৮
ফ্রান্স	১৯৪৫
বেলজিয়াম	১৯৪৬
সুইজারল্যান্ড	১৯৭১
কুয়েত	২০০৬

বিংশ শতাব্দী ধরে বিস্তৃত এই সময়গুলো পরিবর্তিত হতে থাকা জাইটগাইস্ট বা যুগধর্মের একটি পরিমাপক; আরেকটি উদহারন হলে জাতি বা বর্ণ বা রেস নিয়ে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী; আজকের মানদন্ডে বিচার করলে বিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে ব্রিটেনের সবাইকে (এবং অন্য অনেক দেশেও) বর্ণবাদী হিসাবে বিচার করা যেতে পারে; প্রায় বেশীর ভাগ সাদা চামড়ার মানুষরা বিশ্বাস করতেন কালো চামড়ার মানুষরা (যে শ্রেনীতে তারা ভীষন বৈচিত্রময় আফ্রিকাবাসীদের, এবং তাদের সাথে সম্পর্কযুক্ত নয় এমন গোষ্ঠী, যেমন ভারতীয়, অষ্ট্রেলীয় এবং মেলানেশিয়া দ্বীপবাসীদের অন্তর্ভুক্ত করতেন) তাদের তুলনায় সবদিক থেকে নীচু স্তরের, শুধুমাত্র – নিজের শ্রেষ্ঠত্বকে জাহির করার লক্ষ্যে – তাদের ছন্দজ্ঞান ছাড়া; ১৯২০ সালে জেমস বন্ড সমতুল্য অনেকের শৈশবের হিরো ছিলেন কেতাদুরস্ত বুলডগ ড্রামন্ড; একটি উপন্যাসে, The Black Gang এ ড্রামন্ড ’ইহুদী বিদেশী এবং অন্যান্য অপরিষ্কার মানুষ’ এর কথা উল্লেখ করেছেন, The Female of the species এ এর চুড়ান্ত দৃশ্যে ড্রামন্ড খুব চালাকভাবে নিজেকে ছদ্মবেশে সাজিয়েছিল পেড্রো হিসাবে, প্রধান ভিলেন এর কৃষ্ণাঙ্গ চাকর হিসাবে; পাঠক এবং ভিলেনের কাছে নিজের নাটকীয় আত্মপ্রকাশের সময়, অর্থাৎ পেড্রো যে আসলে ড্রামন্ড নিজেই, তিনি কিন্তু বলতে পারতেন, ‘তুমি ভেবেছো আমি পেড্রো, কিন্তু তুমি বুঝতে পারোনি, আমি তোমার প্রধান শত্রু ড্রামন্ড, কালো রঙ মেখেছি’; তার বদলে তিনি এই শব্দগুলো বাছাই করেছিলেন, ’সব দাড়ি মিথ্যা না, কিন্তু সব নিগারদের গায়ে গন্ধ আছে; এই দাড়ি মিথ্যা নয় আর এই নিগারের গায়ে কোন গন্ধ নেই; সুতরাং আমি ভাবছি কোথাও না কোথাও কিছু গন্ডগোল আছে;’ আমি এটি পড়েছি ১৯৫০ এর দশকে, প্রায় এটি লেখার তিন দশক পর এবং তখনও কোন অল্প বয়সী কিশোরের (কোন মতে) এই বই পড়ে শিহরিত হওয়া সম্ভব এর নাটকীয়তায় এবং বর্ণবাদের দিকে নজর না দিয়ে; এ যুগে এটা অকল্পনীয়;

টমাস হেনরী হাক্সলী (Tomas Henry Huxley), তার সময়ের মানদন্ডে একজন প্রগতিশীল, উদার পন্থী মানুষ; কিন্তু তার সময় আমাদের সময় না; এবং ১৮৭১ সালে তিনি লিখেছিলেন:

কোন যুক্তিশীল মানুষ, সব তথ্য ভালোভেবে জেনে, বিশ্বাস করতে পারেন যে, একজন গড়পড়তা নিগ্রো একজন শেতাঙ্গর সমতুল্য বা আরো অসম্ভব, তার তুলনায় শ্রেষ্ঠ হতে পারে; এবং যদি এটি সত্যি হয়, সত্যি স্পষ্টতই অবিশ্বাস্য যে, যখন তার সমস্ত অক্ষমতা অপসারণ করা হয় এবং আমাদের প্রোগন্যাথাস (যাদের চোয়াল সামনের

দিকে বেশী বেরিয়ে থাকে) আত্মীয়রা যদি নিরপেক্ষ একটি ক্ষেত্র পায় কোন ধরনের পক্ষপাতিত্ব ছাড়া, সেই সাথে নির্যাতনকারী শোষকের অনুপস্থিতি, তারা তাহলে সফলতার সাথে তাদের চেয়ে অপেক্ষাকৃত বড় মস্তিষ্ক এবং ছোট চোয়াল বিশিষ্ট প্রতিদ্বন্দীদের সাথে প্রতিদ্বন্দিতা করতে পারবে, এমন কোন প্রতিযোগিতায়, যেখানে চিন্তার লড়াই হবে, কামড়ের না; সভ্যতার প্রাধান্য পরম্পরায় সবচেয়ে উচু জায়গাটি অবশ্যই আমাদের গাড় চামড়ার স্বজনদের নাগালের অনেক বাইরে;

স্বাধারনত: ভালো ঐতিহাসিকরা অতীতের কোন বক্তব্যকে তাদর নিজেস্ব সময়ের মানদন্ডে বিচার করেন না; আব্রাহাম লিঙ্কন, হাক্সলীর মতই, তার সময়ের তুলনায় অনেক অগ্রসর ছিলেন; কিন্তু রেস বা বর্ণ সংক্রান্ত তার মতামত আমাদের সময়ে তুলনায় বর্ণবাদী মনে হতে পারে; ১৮৫৮ সালে স্টিফেন এ ডগলাসের সাথে তার বিতর্কর কিছু অংশ পড়া যাক:

আমি বলবো, আমি এখন কিংবা কখনোই কোনভাবেই সাদা এবং কালো, এই দুটি রেস বা বর্ণের মধ্যে সামাজিক এবং রাজনৈতিক সমতা আনার লক্ষ্যে কোন পরিবর্তনের পক্ষে ছিলাম না, এবং আমি এখন কিংবা কখনই নিগ্রোদের ভোটার বা জুরির কাজের জন্য অধিকার প্রদানের পক্ষে ছিলাম না, এছাড়া তাদের কোন প্রতিনিধিত্ব শীল দ্বায়িত্বে এবং সাদাদের সাথে তাদের অসবর্ণ বিবাহেরও সমর্থন করিনা; এবং উপরন্তু আমি বলবো, সাদা ও কালো বর্ণের মানুষদের মধ্যে শারীরিক পার্থক্য আছে, যা আমি বিশ্বাস করি চিরকালের মত দুটি জাতিকে সামাজিক ও রাজনৈতিক সমতায় বাস করা থেকে বিরত রাখবে চিরকাল; এবং যেহেতু তারা এভাবে বসবাস করতে পারবে না, সুতরাং যতক্ষন তারা একসাথে সহাবস্থান করবে, উর্ধতন এবং অধস্তন এই দুটি অবস্থান অবশ্যই থাকতে হবে; এবং আমি আর যে কোন মানুষের মতই এই উর্ধতন অবস্থানটিকে শেতাঙ্গ বর্ণের মানুষের জন্য নির্দিষ্ট করার স্বপক্ষে;

যদি হাক্সলী এবং লিংকন আমাদের সময়ে জন্মগ্রহন ও শিক্ষিত হতেন, আমাদের মধ্যে তারাই হয়তো সবার প্রথমে ঘৃণায় কুকড়ে উঠতেন আমাদের সবার সাথে তাদের নিজেদের ভিক্টোরিয়ান সময়কালের চিন্তাধারা এবং নৈতিকতায় ভারাক্রান্ত কন্ঠ শুনে; আমি তাদের উদ্ধৃতি ব্যবহার করলাম শুধু মাত্র বোঝাতে যে, কিভাবে আসলে যুগে যুগে সময়ের পরিক্রমায় নৈতিকতার ধর্ম বা জাইটগাইষ্ট অগ্রসর হয়েছে সামনের দিকে; যদি এমনকি হাক্সলী যিনি তার সময়ের অন্যতম সেরা উদারপন্থী মানুষ ছিলেন এবং এমনকি লিঙ্কন, যিনি দাসদের মুক্ত করেছিলেন, এধরনের কথা বলতে পারেন, তাহলে চিন্তা করে দেখুন গড়পড়তা ভিক্টোরিয়ান যুগের মানুষরা কি ভাবতেন; অষ্টাদশ শতাব্দীর দিকে গেলে, অবশ্যই সবার জানা যে, ওয়াশিংটন, জেফারসন এবং জ্ঞানালোকপ্রাপ্ত যুগের প্রগতিশীল মানুষরা প্রত্যেকেই ক্রীতদাসের মালিক ছিলেন; জাইটগাইষ্ট অগ্রসর হয়েছে, ক্রমাগত নিরবিচ্ছিন্নভাবে যে আমরা অনেক সময় ব্যপারটাকে স্বাভাবিক ধরে নেই এবং ভুলে যাই যে পরিবর্তন আসলেই একটি সত্যিকারের ফেনোমেনন তার নিজের যোগ্যতাতেই;

আরো অগনিত উদহারন আছে, যখন প্রথম নাবিকরা মরিশাস দ্বীপে পা রেখেছিলেন, এবং নীরিহ প্রানী ডোডো পাখীদের দেখেছিলেন, তাদের কাছে আর কিছু মনে হয়নি শুধুমাত্র তাদের পিটিয়ে মারা ছাড়া; তারা এমনকি তাদের খাবারের জন্যও তারা হত্যা করেনি (তাদের খাবার অযোগ্য বলে বর্ণনা করা হয়েছে); স্পষ্টতই এই নীরিহ আত্মরক্ষায় অক্ষম, সহজে পোষ মানানো যায়, উড়তে অক্ষম পাখীটিতের মাথায় বাড়ি দিয়ে হত্যা করা তাদের জন্য কোন একটা কিছু করার মত কাজ ছিল হয়তো; আজকের যুগে এমন ব্যবহার অকল্পনীয়, ডোডোর মত কোন আধুনিক সমতুল্য প্রানীর বিলুপ্তি , এমনকি কোন দুর্ঘটনায়ও যদি তা ঘটে থাকে, বা ইচ্ছামুলকভাবে মানুষের দ্বারা হত হলে তো বটেই, তাকে ট্রাজেডি হিসাবে গন্য করা হয়;

আজকের সাংস্কৃতিক পরিবেশের মানদন্ডে বলা যেতে পারে এরকম একটি ট্রাজেডী, সাম্প্রতিক সময়ে Thylacinus বা তাসমানিয়ার উলফ (Tasmanian wolf) দের বিলুপ্তি হবার ঘটনাটিকে; বর্তমানে তাদের অবলুপ্তি নিয়ে বিলাপ করা হয় অথচ ১৯০৯ সাল পর্যন্ত তাদের হত্যা করলে মোটা অঙ্কের পুরষ্কারের ব্যবস্থা ছিল; আফ্রিকা নিয়ে

ভিক্টোরিয়ীয় যুগের উপন্যাসে ‘হাতি’, ’সিংহ’ এবং ’অ্যান্টিলোপ’ (লক্ষ্য করুন বিশেষভাবে গুরুত্বপুর্ণ একবচনের ব্যবহার) ছিল গেম বা শিকার করার মত প্রানী; এবং এদের সাথে কি করা হতো তখন, দ্বিতীয়বার চিন্তা না করে তাদের হত্যা করা হতো গুলি করে; এই হত্যা খাদ্যের জন্য না, আত্মরক্ষার জন্য না; শুধু শিকারের খেলার রোমাঞ্চ অনুভব করার জন্য; কিন্তু সেই যুগ ধর্ম বা জাইটগাইস্টও বদলে গেছে; স্বীকার করতে হবে, এখনও ধনবান ব্যক্তিরা, সাধারণত: বসে থাকার জীবনযাত্রায় অভ্যস্থ শিকারী খেলোয়াড়রা তাদের ল্যান্ড রোভার গাড়ীর নিরাপত্তায় বসে থেকে হয়তো আফ্রিকার প্রানীদের হত্যা করতে পারেন এখনও এবং তাদের স্টাফ করা মাথা নিয়ে বাড়ী যেতে পারেন; কিন্তু তার জন্য তাদের চড়া মুল্য পরিশোধ করতে হয়, এবং নির্বিচারে সবার ঘৃণার পাত্র হন তারা; বন্য প্রানী সংরক্ষন এবং পরিবেশ সুরক্ষা বিষয়টি একই নৈতিকতার গ্রহনযোগ্য মুল্যে পরিণত হয়েছে একসময় যেভাবে সাবাথের পবিত্রতা রক্ষা বা মুর্তি পুজা না করার কাজটিকে যেভাবে নৈতিকতার অবস্থান হিসাবে গন্য করা হতো;

সুইঙ্গিং ষাটের দশক তারুণ্য আর উদারপন্থী আধুনিকতার জন্য কিংবদন্তীসম; কিন্তু সেই দশকের শুরুতেই একজন ব্যারিষ্টার, Lady Cbatterley’s Lover এর অশ্লীলতার বিরুদ্ধে করা মামলার সময় তখনও জুরিদের জিজ্ঞাসা করতে পারতেন, ‘আপনারা কি আপনাদের অল্পবয়সী পুত্র, কন্যাদের – কারন ছেলেদের মত মেয়েরাও পড়তে পারে (আপনি কি বিশ্বাস করতে পারেন, তিনি সত্যি এই কথা বলেছেন) এই বই পড়তে সম্মতি দেবেন? এমন কোন বই কে কি আপনার ঘরে জায়গা দেবেন? এই বইটাকে এমন কি আপনি আপনার স্ত্রী কিংবা চাকরদের পড়ার অনুমতি দেবেন’? তার শেষ প্রশ্নটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য একটি উদহারন, যা প্রদর্শন করছে কি দ্রুত যুগের ধর্মের বা জাইটগাইষ্টের পরিবর্তন হয়েছে;

ইরাকে যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধে সাধারন মানুষের হতাহতের ঘটনার জন্য সর্বব্যাপী নিন্দিত হয়েছে অথচ এই হত্যার সংখ্যা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে নিহতদের সংখ্যার তুলনায় বহু গুনে কম; নৈতিকভাবে কোনটি গ্রহনযোগ্য তার মানদন্ডটি মনে হচ্ছে ধীরে ধীরে স্থির একটি গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে, পরিবর্তিত হচ্ছে দ্রুত; ডোন্যাল্ড রামসফেল্ড এর কথা শুনতে আজ এত অসহ্য আর অসংবেদশীল মনে হয়, অথচ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় তার এই কথাগুলো শুনতে সংবেদনশীল পরদু:খে কাতর ‘ব্লিডিং হার্ট’ লিবারেল বলেই মনে হোত; মধ্যবর্তী দশকগুলো কিছু পরিবর্তন হয়েছে; আমাদের সবার মধ্যেও সেই পরিবর্তন এসেছে; এবং এই পরিবর্তনের কারণ ধর্ম না; ধর্ম ছাড়াই এটাই ঘটেছে, ধর্মের কারণে নয়;

আর এই পরিবর্তনে একটি স্থিতিশীল দিকও শনাক্ত করা সম্ভব, যা আমরা বেশীর ভাগ মানুষই চিহ্নিত করবো উন্নতি হিসাবে; এমনকি অ্যাডলফ হিটলার, ব্যপকভাবে মানুষের ধারনায় যে ব্যক্তিটিকে বলা হয় চুড়ান্ত অশুভ র অজানা একটি জগতের দিকে পৃথিবীকে নিয়ে যাচ্ছিলেন, তিনিও ক্যালিগুলা বা গেনজিস খানের এর সময়ে নিষ্ঠুরতায় আদৌ চোখে পড়ার মত কোন কিছু হবার যোগ্য হতেন না; কোন সন্দেহ নেই হিটলার গেনজিস খান এর চেয়ে বেশী মানুষের জীবন কেড়ে নিয়েছেন, কিন্তু তার কাছে সেটা করার জন্য বিংশ শতাব্দীর প্রযুক্তি ছিল; এবং হিটলার কি সবচেয়ে বেশী আনন্দ পেতেন, যেমন গেনজিস খান স্বীকার করেছিলেন, তার হত্যার শিকারদের ‘কাছের আর প্রিয় মানুষদের অশ্রু সিক্ত ’দেখাটা তার তীব্রতম আনন্দের কাজ ছিল; আমরা হিটলারের অশুভ কাজের মাত্রার পরিমাপ করি আজকের এই যুগের মানদন্ডে, আর নৈতিকতার জাইটগাইষ্ট বা যুগ ধর্ম অনেকটুকু এগিয়েছে সেই ক্যালিগুলার সময় থেকে, ঠিক যেমন করে প্রযুক্তিও এগিয়েছে; আমাদের সময়ের মানদন্ডেই হিটলারকে বিশেষ ভাবে অশুভ একটি চরিত্র মনে হয়;

আমার জীবনকালেই, বহু মানুষ কোন চিন্তা ভাবনা ছাড়াই অবজ্ঞা আর অপমানসুচক নাম এবং জাতীয় স্টেরিওটাইপের আদান প্রদান করেছে: Frog, Wop, Dago, Hun, Yid, Coon, Nip, Wog ইত্যাদি; আমি দাবী করছি এধরনের শব্দগুলো ভাষা থেকে অদৃশ্য হয়ে গেছে এখন, তবে ব্যপকভাবেই ভদ্র সভ্য মানুষের স্তরে ব্যপকভাবে এসব শব্দগুলো ব্যপকভাবে নিন্দনীয়; নিগ্রো শব্দটা, যদিও এটি ব্যবহৃত হতে শুরু হয় অপমানসুচক শব্দ হিসাবে নয়, তবে শব্দটির উপস্থিতি দিয়ে যে কোন ইংরেজী গদ্যের লেখার সময়কাল নির্ধারণ করা যেতে পারে; নানা ধরনের

প্রেজুডিস এর উপস্থিতি হচ্ছে আসলেই কোন লেখার সময়কাল সমন্ধে ধারনা দিতে পারে; তার নিজের সময় কেমব্রিজের একজন শ্রদ্ধেয় ধর্মতত্ত্ববিদ এ সি বুকে (A. C. Bouquet) তার Comparative Religion বইটিতে ইসলামের উপর তার অধ্যায়টি এভাবে শুরু করতে পারতেন, সেমাইট বা আরব প্রাকৃতিক বা স্বাভাবিকভাবে একেশ্বরবাদী না, উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে যা ভাবা হতো, সে আসলে অ্যানিমিষ্ট বা সর্বপ্রাণ মতবাদী;'

সংস্কৃতির ব্যতিক্রম বর্ণ বা জাত নিয়ে এই বাহুল্যতা এবং সুস্পষ্ট ভাবে একবাচনের ব্যবহার ('The Semite . . . He is an animist'), যা সমগ্রজাতির বহুত্বতাকে কেবল একটি টাইপে এনে সীমাবদ্ধ করার প্রচেষ্টা হয়তো কোন মানদন্ডে চুড়ান্ত ঘৃণাকর না, তবে তারা পরিবর্তিত হতে থাকা জাইটগাইষ্ট বা যুগধর্মের ক্ষুদ্র সুচক; কেমব্রিজের ধর্মতত্ব বা অন্য যে কোন বিষয়ের কোন অধ্যাপক আজ আর এই শব্দগুলো ব্যবহার করবেন না; পরিবর্তিত হতে থাকা নৈতিকতার যুগধর্মের এই সুক্ষ্ম আভাসগুলো আমাদের বলছে বুকে তার এই লেখাটি বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি কোন সময়েরও আগে লিখেছিলেন, এবং আসলে সেই সময়কাল ১৯৪১;

আরো চার দশক পেছনে যান, এই পরিবর্তিত মানদন্ড আরো নির্ভুলভাবে দৃশ্যমান হবে; এর আগের একটি বইয়ে আমি এইচ জি ওয়েলস (H. G. Wells) এর ইউটোপিয়ান NewRepublic থেকে কিছু উদ্ধৃতি ব্যবহার করেছিলাম; আমি আবারও তা করবো কারন এটি আমি যা বলতে চাচ্ছি তার একটি হতবাক করার মতই দৃষ্টান্ত হতে পারে:

> এবং এই নিউ রিপাবলিক কিভাবে অধস্তন বর্ণ বা রেসের সদস্যদের সাথে আচরণ করবে? কেমন ভাবে এটি কৃষ্ণাঙ্গদের সাথে আচরণ করবে? ...পীত বর্ণের মানুষদের সাথে? এবং ইহুদীদের সাথে? এই সব কালো,বাদামী, ময়লা সাদা আর পীত বর্ণের মানুষদের দঙ্গল, যার নতুন দায়িত্ব পালনের দক্ষতায় যারা কোন কাজে আসবে না? বেশ, পৃথিবী হচ্ছে পৃথিবী, এটি কোন দাতব্য প্রতিষ্ঠান নয় এবং আমি ধরে নিচ্ছি তাদের সেখানে কোন জায়গা নেই, সেখান থেকে তাদের বিদায় নিতে হবে.... এবং সেই সাথে নতুন রিপাবলিক থেকে বিদায় নিতে হবে এই সব মানুষদের নৈতিকতার পদ্ধতিগুলোকে; বিশ্বব্যাপী যে নৈতিকতার পদ্ধতিটি প্রাধান্য বিস্তার করবে, তা গঠন করা হবে মুলত মানবতার মধ্যে যা কিছু সুন্দর, ভালো এবং কর্মক্ষম, সুগঠিত বলবান শরীর এবং স্পষ্ট ও শক্তিশালী মন সৃষ্টি করার পরিবেশ সৃষ্টি করে দেবার লক্ষ্যে; এবং প্রকৃতি এতদিন যে প্রক্রিয়া কাজ করে এসেছে এই পৃথিবীকে সেই রুপ দেবার লক্ষ্যে, যেখানে কোন দুর্বলতাকে প্রতিহত করা হয় আরো দুর্বলতাকে জন্ম দেয়া থেকে .. তা হচ্ছে মৃত্যু...নতুন রিপাবলিকে মানুষদের ... এমন একটি আদর্শ থাকবে যা এই লক্ষ্যে কোন হত্যাকে অর্থবহ করে তুলবে;

এটা লেখা হয়েছিল ১৯০২ সালে, এবং ওয়েলসকে তার সময় প্রগতিশীল হিসাবে গন্য করা হতো; ১৯০২ সালে এ ধরনের দৃষ্টিভঙ্গী কিংবা মনোভাব, যদিও ব্যপকভাবে সমর্থিত ছিল না, তা সত্ত্বেও তখনও ডিনার পার্টির তর্কের বিষয় হিসাবে সহনীয় ও গ্রহনযোগ্য ছিল; আধুনিক পাঠকরা এর ব্যতিক্রম, আক্ষরিক অর্থেই এ ধরনের কোন লেখা পড়লে হতবাক হয়ে পড়বেন ; আমরা অনুধাবন করতে বাধ্য হবো, হিটলার যদিও জঘন্য ছিল, তা সত্ত্বেও সে কিন্তু তার সময়ের জাইটগাইষ্টের বাইরে ছিল না পুরোপুরি, যা আমাদের অবস্থান থেকে এখন যেমন তাকে মনে হয়; কত দ্রুত জাইটগাইষ্ট বা যুগের ধর্ম বদলে যায়; এটি সমান্তরালে এগিয়ে যায় একটি প্রশস্ত ফ্রন্ট হিসাবে সমস্ত শিক্ষিত পৃথিবীতে;

কোথা থেকে তাহলে এই সামাজিক চেতনায় এই সম্মিলিত আর স্থির গতিতে হতে থাকা পরিবর্তনগুলো আসে? এর উত্তর দেবার দায়ভার আমার উপরে ন্যস্ত না; আমার উদ্দেশ্য পুরনে এটুকু যথেষ্ট যে, নিশ্চয়ই এই পরিবর্তন ধর্ম থেকে আসে না; যদি কোন একটি তত্ব দেবার জন্য আমার উপর চাপ দেয়া হয়, আমি বিষয়টি নিয়ে এভাবে আগাতে চাই: আমাদের ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন, কেন এই বদলে যেতে থাকা নৈতিক জাইটগাইষ্ট এত ব্যপক এবং প্রশস্তভাবে এই সাথে সংঘটিত হয় অগনিত মানুষের মধ্যে সারা বিশ্ব জুড়ে, একটি সর্বজনীন রুপ নিয়ে; এবং আমাদের ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন এর পরিবর্তনের স্থির দিকটিকেও;

প্রথমে, এত অসংখ্য মানুষের মধ্যে এটি একই সাথে বা সিনক্রোনাইজ বা সমন্বয় হয়ে কিভাবে ঘটে? এটি একটি মন থেকে অন্য একটি মনে বিস্তার লাভ করে বিভিন্ন বারের, বা ডিনার পার্টির কথপোকথনে, বই এবং বই সমালোচনার মাধ্যমে, খবরের কাগজ বা টিভি সম্প্রচারের মাধ্যমে এবং হাল সময়ে ইন্টারনেট এর মাধ্যমে; নৈতিকতার পরিবেশ পরিবর্তনের সংকেত পাওয়া যায় দৈনিক পত্রিকার সম্পাদকীয়তে, রেডিও টকশোতে, রাজনৈতিক বক্তৃতায়, কিংবা কমেডিয়ানদের কৌতুক নকশায়, সোপ অপেরার সংলাপে, পার্লামেন্টে ভোটের মাধ্যমে আইন বানানোর প্রক্রিয়ায়, এবং আইনব্যাখ্যা করে বিচারকের প্রদত্ত সিদ্ধান্তে; একভাবে এটিকে বলা যায় মীম পুলে মীম এর হারের রদবদলের মাধ্যমে কিন্তু সেই বিষয়ে আমি বিস্তারিত আলোচনায় যাবো না এখন;

আমাদের মধ্যে কেউ কেউ পরিবর্তিত নৈতিকতার জাইটগাইষ্ট বা যুগ ধর্মের অগ্রসরমান ঢেউ এর খানিকটা পেছনে পড়ে আছে আর কেউ খানিকটা এগিয়ে আছে; কিন্তু একবিংশ শতাব্দীতে বেশীর ভাগই আমরা সবাই প্রায় একই জায়গায় দলবেধে অবস্থান করছি, যা মধ্যযুগের আমাদের মত মানুষদের তুলনায় অনেক সামনে; বা আব্রাহামের সেই সময় থেকে বা এই সাম্প্রতিক কালের ১৯২০ সালের চেয়েও; পুরো পরিবর্তনের এই ঢেউটা সামনের দিকে এগুচ্ছে এবং আগের শতাব্দীর সামনে সারির পথপ্রদর্শক বা ভ্যানগার্ডরা (টি এইচ হাক্সলী যেমন একটি স্পষ্ট উদহারণ) পরবর্তী শতাব্দীর বহু পেছনে থাকা মানুষগুলোরও পেছনে অবস্থান করে; অবশ্যই এই অগ্রসর যাত্রা কখনোই মসৃণ উত্থান না বরং আকাবাকা করাতের দাতের মত উচু নীচু; এছাড়া স্থানীয় এবং সাময়িক কিছু প্রতিবন্ধকতা বা সেটব্যাকও আছে, যেমন ২০০০ এর প্রথম দশকের শুরুর দিকে যুক্তরাষ্ট্রে তাদের সরকারের দ্বারা যেভাবে এর যাত্রা ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে; কিন্তু সময়ের বড় পরিমাপে পরিবর্তনের প্রগতিশীল প্রবণতা সুস্পষ্ট এবং যা অব্যাহত থাকবেই;

এই স্থির দিক নির্দেশনায় মদদ জোগাচ্ছে কোন শক্তি? আমাদের অবশ্যই অবহেলা করা চলবে না, একক ব্যক্তি হিসাবে আমাদের কিছু নেতাদের চালিকা শক্তি হিসাবে ভুমিকার কথা, যারা সময়ে অনেক অগ্রসর ছিলেন, একটি অবস্থান নিয়ে আমাদের বাকী সবাইকে প্রনোদনা যুগিয়েছেন তাদের সাথে সামনে এগিয়ে যেতে: যুক্তরাষ্ট্রে বিভিন্ন রেস বা শেতাঙ্গ এবং কৃষ্ণাঙ্গদের মধ্যে বর্ণবৈষম্যর যুগে সমতার কথা লালন করেছেন মার্টিন লুথার কিং এর মত যোগ্য রাজনৈতিক নেতারা এবং বিনোদন ও ক্রীড়া জগতের অনেক সদস্যরা যেমন পল রোবসন, সিডনী পোয়াটিয়ের, জেসি ওয়েন্স এবং জ্যাকী রবিনসন; ক্রীতদাস আর নারীদের মুক্তি এবং অধিকার আদায়ের সংগ্রামে মুল অনুঘটকের দায়িত্ব পালন করেছে অনেক ক্যারিশমাটিক নেতা নেত্রীরা; এই সব নেতৃত্ব দানকারী মানুষরা ছিলেন কেউ কেউ ধার্মিক, কেউ আবার ধার্মিক ছিলেন না; যারা ধার্মিক ছিলেন তাদের কেউ ভালো কাজ করেছিলেন কারণ তারা ধার্মিক ছিলেন, আর অন্যান্য ক্ষেত্রে ধর্ম শুধু ঘটনাচক্রে তাদের সংশ্লিষ্ট ছিল; যদিও মার্টিন লুথার কিং খৃষ্টান ছিলেন একজন, তিনি তার অহিংস আন্দোলনের মাধ্যমে সিভিল ডিসঅবিডিয়েন্স বা সামাজিক প্রত্যাখান বা বয়কটের আন্দোলনের শিক্ষা নিয়েছিলেন সরাসরি মহাত্মা গান্ধী থেকে, যিনি খৃষ্টান ছিলেন না;

তারপরও, উন্নত শিক্ষা ব্যবস্থা, বিশেষ করে, অন্য ধর্ম আর বর্ণের এবং লিঙ্গের সব মানুষদের সাথে নিয়ে আমাদের এই বিশ্বমানবতা এই ধারনা সম্বন্ধে আমাদের বোধের আর জানার ব্যাপ্তি বাড়ার বিষয়টি – এই দুটি গভীর, অনেকটাই নাড়ীর মত মুল ধারনার উৎস ছিলে জীববিজ্ঞান , বিশেষ করে বিবর্তন; কৃষ্ণাঙ্গ মানুষ আর নারীরা এবং নাৎসী জার্মানীতে ইহুদী আর জিপসীরা খারাপ আচরনের শিকার হয়েছে তার একটি কারন ছিল তাদের পুরোপুরি মানুষ হিসাবে মনে করা হতো না; দার্শনিক পিটার সিংগার তার *Animal Liberation* বইটিতে সবচেয়ে সুন্দর করে ব্যাখ্যা দিয়েছেন সে দৃষ্টিভঙ্গী সমর্থন করে যে আমাদের স্পেসিসইজম (প্রজাতির উপর নির্ভর করে মানুষের বৈষম্যমুলক খারাপ আচরণ বিশেষ করে যা প্রকাশ হয় বিভিন্ন প্রানীদের অপব্যবহার ও তাদের প্রতি নিষ্ঠুরতা প্রদর্শনের মাধ্যমে) এর পরবর্তী যুগে প্রবেশ করতে হবে যেখানে সকল প্রজাতি যাদের মস্তিষ্কের ক্ষমতা আছে ভালো আচরণ বোঝা তাদের সাথে মানবিক আচরণ করতে হবে; হয়তো এটি আভাস দিচ্ছে ভবিষ্যতের শতাব্দীতে নৈতিকতার জাইটগাইষ্ট কোন দিকে দিক বরাবর পরিবর্তিত হবে; প্রাকৃতিক ভাবেই এটি আগের সংস্কারগুলো যেমন ক্রীতদাস প্রথার বিলুপ্তি এবং নারীদের মুক্তির মতই একটি অবস্থান হবে;

আমার সখের মনোবিজ্ঞান বা সামাজিক বিজ্ঞানের জ্ঞানের সীমাবদ্ধতার কারনে মানতে হবে আমার পক্ষে ব্যাখ্যা করা সম্ভব না কেন নৈতিকতার জাইটগাইষ্ট এভাবে প্রশস্ত ব্যপকভাবে একই সাথে সম্মিলিতভাবে সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে; আমার ব্যাখ্যার জন্য আপাতত এতটুকু যথেষ্ট যে, বিষয়টি বাস্তব একটি সত্য, এটি পরিবর্তিত হচ্ছে এবং এটি ধর্ম দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে না এবং অবশ্যই ধর্মগ্রন্হ বা স্ক্রিপচারের মাধ্যমে তো নয়ই; হয়তো এটিও মধ্যাকর্ষনের মত কোন একক শক্তি নয় বরং জটিল বহুমাত্রিক শক্তিগুলো অন্তর্মিলনের একটি ফলাফল, যেমন সেই শক্তির মত যা মুরের সুত্রকে পরিচালিত করে, যা কম্পিউটারের ক্ষমতার ক্রমবর্ধমান বৃদ্ধিকে ব্যাখ্যা করে; যে কারণই হোক না কেন, জাইটগাইষ্ট এর অগ্রগতির বিষয়টি যথেষ্ট সেই দাবীটির ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত করার জন্য যে, আমাদের ঈশ্বরের প্রয়োজন আছে ভালো হবার জন্য বা কোনটা ভালো সেটা নির্ধারণ করার সিদ্ধান্ত নেবার জন্য

রিচার্ড ডকিন্স এর দি গড ডিল্যুশন : সপ্তম অধ্যায় (শেষ পর্ব)

By K M Hassan

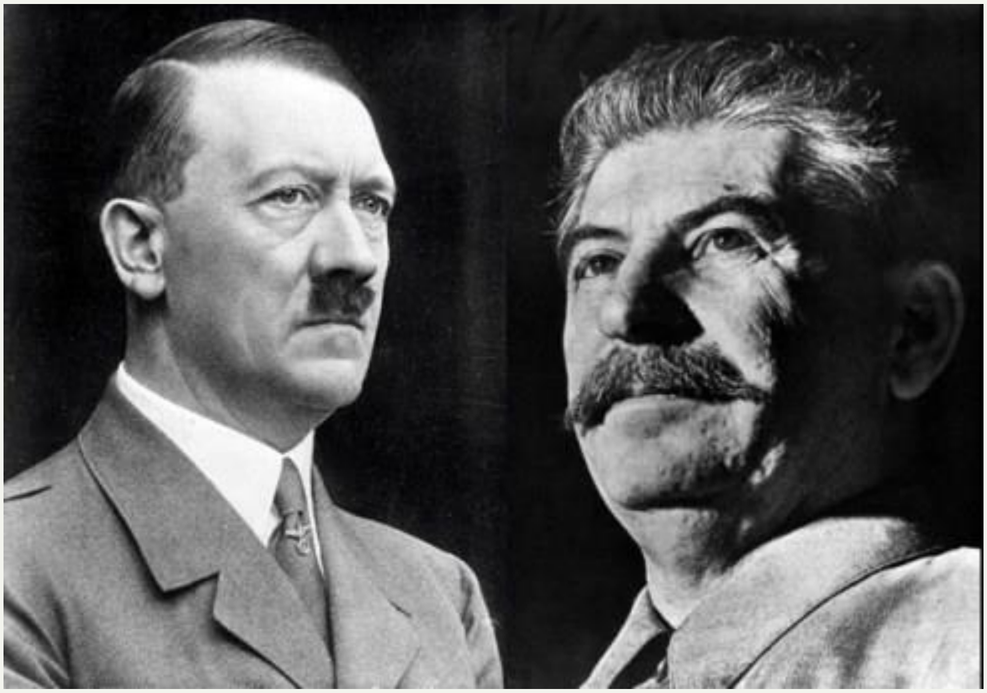

ছবি: হিটলার আর স্ট্যালিন

রিচার্ড ডকিন্স এর দি গড ডিল্যুশন : সপ্তম অধ্যায় (শেষ পর্ব)
(অনুবাদ প্রচেষ্টা: কাজী মাহবুব হাসান)

The God Delusion by Richard Dawkins

প্রথম অধ্যায়
দ্বিতীয় অধ্যায়
তৃতীয় অধ্যায়
চতুর্থ অধ্যায় (প্রথম পর্ব) , চতুর্থ অধ্যায় (দ্বিতীয় পর্ব) ,
চতুর্থ অধ্যায় (তৃতীয় পর্ব) , চতুর্থ অধ্যায় (চতুর্থ পর্ব) , চতুর্থ অধ্যায় (শেষ পর্ব)
পঞ্চম অধ্যায় (প্রথম পর্ব), পঞ্চম অধ্যায় (দ্বিতীয় পর্ব) , পঞ্চম অধ্যায় (তৃতীয় পর্ব)
পঞ্চম অধ্যায় (চতুর্থ পর্ব) , পঞ্চম অধ্যায় (পঞ্চম পর্ব) ,পঞ্চম অধ্যায় (ষষ্ঠ পর্ব)
ষষ্ঠ অধ্যায় (প্রথম পর্ব) ; ষষ্ঠ অধ্যায় (দ্বিতীয় পর্ব); ষষ্ঠ অধ্যায় (শেষ পর্ব)
সপ্তম অধ্যায় (প্রথম পর্ব) ; সপ্তম অধ্যায় (দ্বিতীয় পর্ব) ; সপ্তম অধ্যায় (তৃতীয় পর্ব) ;
সপ্তম অধ্যায় (চতুর্থ পর্ব)

‘পবিত্র’ গ্রন্থ এবং যুগের সাথে বদলে যাওয়া নৈতিকতার জাইটগাইষ্ট বা যুগধর্ম

কেন হিটলার আর স্ট্যালিন ? তারা কি নাস্তিক ছিল না?

জাইটগাইষ্ট হয়তো অগ্রসর হচ্ছে এবং সাধারণত এটি অগ্রসর হচ্ছে প্রগতিশীল একটি দিক বরাবর, কিন্তু আমি বলেছিলাম আকাবাকা উচু নীচু পথে এর উত্থান পতন, এবং বেশ কিছু ভয়ঙ্কর পশ্চাদপসরনের মত বিপর্যয়ের ঘটনাও ঘটেছে; উল্লেখযোগ বিপর্যয়গুলো, ভয়ঙ্কর সেই নৈতিকতার অধ:পতনের মুল কারণ বিংশ শতাব্দীর সব স্বৈরাচারী একনায়করা; গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হলো আগে পার্থক্য করতে হবে, হিটলার আর স্ট্যালিন এর মত মানুষদের অশুভ উদ্দেশ্য এবং তাদের হাতে থাকা সেই অসীম ক্ষমতাটিকে, যা দিয়ে তারা তাদের ইচ্ছা চরিতার্থ করেছিল; আমি ইতিমধ্যেই লক্ষ্য করেছি যে হিটলারের পরিকল্পনা এবং উদ্দেশ্যগুলো স্বপ্রতীয়মানভাবেই রোমের সম্রাট ক্যালিগুলা – বা কয়েকজন ওটোমান সুলতানদের পরিকল্পনা এবং উদ্দেশ্যগুলোর তুলনায় বেশী অশুভ ছিল না, যাদের অকল্পনীয় নৃশংস আচরনের কাহিনী বর্নিত আছে নোয়েল বারবার এর Lords of the Golden Horn এ; হিটলারের হাতে বিংশ শতাব্দীর অস্ত্র আর যোগাযোগের প্রযুক্তি ছিল; তাসত্ত্বেও হিটলার আর স্ট্যালিন দুজনেই অত্যন্ত খারাপ দুজন মানুষ;

হিটলার আর স্ট্যালিন তো নাস্তিক ছিলেন, এ বিষয়ে আপনার কি বলার আছে? ধর্ম বিষয়ে দেয়া প্রতিটি পাবলিক লেকচারের পরে এবং বেশী ভাগ রেডিও ইন্টারভিউর পরে এই প্রশ্নটি আমাকে করা হয়েছে; প্রশ্নটা আমাকে করা হয় খানিকটা আগ্রাসী মনোভাব নিয়ে, এবং যা ঘৃন্যভাবে দুটি ধারনাকে বহন করে (১) হিটলার ও স্ট্যালিন শুধু নাস্তিক ই নয় (২) তারা যে জঘন্য কাজগুলো করেছে তার কারন হচ্ছে তারা নাস্তিক ছিলেন; ধারণা (১) টি স্ট্যালিনের জন্য সত্য, কিন্তু হিটলারের ব্যাপারে সন্দেহ আছে; কিন্তু এই ধারনা আর যাই হোক অপ্রাসঙ্গিক কারন ধারনা (২) হচ্ছে ভুল, মিথ্যা; এবং এটি অবশ্যই অযৌক্তিক যদি চিন্তাটি (১) নং ধারনা থেকে আসে; এমনকি যদি আমরা মেনেও নেই হিটলার আর স্ট্যালিনের দুজনেরই নাস্তিক ছিলেন, তাদের দুজনেরও গোফ ছিল, যেমন সাদ্দাম হুসেন এরও ছিল; তাহলেই বা কি? গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটি কিন্তু এটা না যে, খারাপ (অথবা ভালো) কোন মানুষ ধার্মিক অথবা নাস্তিক কিনা; খারাপ লোকদের মাথা গুনে তাদের এই দুই প্রতিদ্বন্দী গ্রুপে ভাগ করে তাদের খারাপ কাজের তালিকা করার কাজ আমাদের না; নাৎসীদের বেল্টের বাকলে খোদাই করা ‘Gott mit uns’ (বা God with us) এই সত্যটি কিছুই প্রমান করেনা, অন্ততপক্ষে আরো অনেক দীর্ঘ আলোচনা ছাড়া; হিটলার আর স্ট্যালিন নাস্তিক ছিলেন কি ছিলেন না সেটা বিষয় না, বরং নাস্তিকতা পদ্ধতিগতভাবে মানুষকে খারাপ কাজ করতে বাধ্য করে কি করে না সেটা; সামান্যতম প্রমানই নেই যা সমর্থন করে নাস্তিকতা মানুষেকে খারাপ কাজ করতে প্রভাবিত করে;

সন্দেহের কোন অবকাশ নেই, আসলেই স্ট্যালিন একজন নাস্তিক ছিলেন; তিনি তার শিক্ষাদীক্ষা পেয়েছেন একটি অর্থোডক্স চার্চের সেমিনারীতে (যেখানে অর্থোডক্স যাজকতের প্রশিক্ষন দেয়া হয়), তার মা কখনো তার সেই হতাশা কাটাতে পারেননি, কেন তার ছেলে ধর্ম যাজক হলো না তিনি যেমন চেয়েছিলেন; যে বিষয়টি, অ্যালেন বুলোক এর মতে স্ট্যালিনকে বেশ আনন্দ দিত, হয়তো যাজক হিসাবে তার ট্রেনিং এর অভিজ্ঞতা তাকে রুশ অর্থোডক্স চার্চ, খৃষ্টধর্ম এবং সামগ্রিক ভাবে ধর্মের কট্টর বিরোধীতে রুপান্তরিত করেছিল; কিন্তু কোন প্রমান নেই তার নাস্তিকতা তাকে নিষ্ঠুর কাজগুলো করার জন্য প্রণোদনা যুগিয়েছে; তার আগের ধর্মীয় প্রশিক্ষনও সম্ভবত তা করেনি, যদি না, অবশ্য সেমিনারীতে চুড়ান্ত বিশ্বাসকে প্রশ্নাতীত শ্রদ্ধা, কঠোর কর্তৃত্ব এবং সেই বিশ্বাস, ফলাফলই কাজ সম্পাদনের প্রক্রিয়াটির যৌক্তিতাকে প্রমান করে, এমন কিছু শেখানোর মাধ্যমে তা ঘটে থাকে;

আর হিটলার যে নাস্তিক এই কাহিনী খুবই যত্ন সহকারে পরিকল্পনা করে প্রচার করা হয়েছে, এমন ভাবে যে এখন অনেক মানুষই তা বিশ্বাস করেন কোন প্রশ্ন করা ছাড়াই; এবং মুল সত্যকে তোয়াক্কা করে নিয়মিত আর ব্যাপকভাবে বিষয়টি প্রচার করছেন ধর্মবাদীরা; কিন্তু আসল সত্য এত স্পষ্ট নয় কোনভাবেই; হিটলারে জন্ম হয়েছিল ক্যাথলিক একটি পরিবারে, তিনি ক্যাথলিক স্কুলেই পড়াশুনা করেছিলেন শৈশবে; যদিও বিষয়টি এককভাবে গুরুত্বপুর্ণ না, তিনিও খুব সহজে ধর্মকে পরিত্যাগ করতে পারেন পরবর্তীতে, যেমন স্ট্যালিন রুশ অর্থোডক্স বিশ্বাসকে পরিত্যাগ করেছিলেন টিফলিস থিওলজীকাল সেমিনারী ছাড়ার পরপরই; কিন্তু হিটলার কখনোই আনুষ্ঠানিকভাবে ক্যাথলিসিজম পরিত্যাগ করেননি, তার সমস্ত জীবনে যথেষ্ট ইঙ্গিত আছে তিনি ধার্মিক ছিলেন, যদিও ক্যাথলিক না, তিনি কোন একটি স্বর্গীয় সত্বার প্রতি তার বিশ্বাস কখনোই পরিত্যাগ করেননি; যেমন তার Mein Kampf এ তিনি বলেছেন যে, তিনি যখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ঘোষনার খবর শোনেন, ”আমি হাটু গেড়ে বসে পড়ি এবং স্বর্গীয় সত্বাকে ধন্যবাদ আমার সমস্ত হৃদয় দিয়ে, এরকম একটি সময়ে আমাকে বেচে থাকার অনুমতি দিয়ে ধন্য করার জন্য;’ কিন্তু তখন ১৯১৪, তার বয়স মাত্র ২৫; হয়তো বা তিনি বদলে গিয়েছিলেন পরে?

১৯২০ সালে যখন হিটলারের বয়স ৩১, তার খুব কাছের সহযোগী রুডলফ হেস,পরবর্তীতে যিনি ডেপুটি ফুহরার হয়েছিলেন, বাভারিয়ার প্রধান মন্ত্রীকে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন, ’আমি ব্যক্তিগতভাবে হের (জনাব) হিটলারকে খুব ভালো ভাবে চিনি, এবং আমি তার বেশ ঘনিষ্ট একজন, তার একটি অসাধারন মর্যাদাপুর্ণ চরিত্র আছে, যা গভীর দয়ায় পুর্ণ, ধার্মিক এবং একজন উত্তম ক্যাথলিক;” অবশ্যই এটা বলা যেতে পারে, যেহেতু হেস ’মর্যাদাপুর্ণ চরিত্র’ বা ’গভীর দয়ায় পুর্ণ’ ইত্যাদি বিশেষনগুলো ব্যবহারে এত জঘন্যভাবে ভুল করেছেন, হয়তো তিনি ভালো ক্যাথলিক অংশটাও ভুল করেছিলেন; হিটলারের কোন কিছু ভালো বলা রীতিমত কঠিন একটি কাজ; যা আমাকে মনে করিয়ে দেয়, হাস্যকরভাবে দু:সাহসী সেই যুক্তির কথা, যা আমি শুনেছিলাম হিটলার নিশ্চয়ই একজন নাস্তিক ছিলেন এই মতবাদের স্বপক্ষে; নানা উৎস থেকে পুনরোল্লেখ করে , হিটলার একজন খারাপ মানুষ, খৃষ্টধর্ম ভালো হবার শিক্ষা দেয়, সুতরাং হিটলার খৃষ্টান হতে পারেন না কোন ভাবেই; গোয়েরিং হিটলার সম্বন্ধে মন্তব্য করেছিলেন,’ শুধু মাত্র একজন ক্যাথলিকই পারে জার্মানীকে ঐক্যবদ্ধ করতে;’ আমার কি মনে করে নিতে হবে যে তিনি এমন কেউ যিনি প্রতিপালিত হয়েছেন ক্যাথলিক হিসাবে , তবে বিশ্বাসী ক্যাথলিক ছিলেন না তিনি কোনদিনও;

১৯৩৩ সালে বার্লিনে একটি ভাষন দেবার সময় হিটলার বলেছিলেন, ‘আমরা সে বিশ্বাসে পৌছেছি যে, মানুষ এই ধর্ম বিশ্বাসের প্রয়োজন আছে,সুতরাং আমরা নাস্তিকতাবাদের আন্দোলনের বিরুদ্ধে আমাদের যুদ্ধ শুরুর ঘোষনা করেছি; এবং এটি শুধুমাত্র তাত্বিক কোন ঘোষনা সা, আমরা এটি অবশ্যই নির্মুল করে ছাড়বো;’ এটি হয়তো শুধু মাত্র ইঙ্গিত দেয়, অন্য অনেকের মতই, হিটলার কোন বিশ্বাসকে বিশ্বাস করতেন; ১৯৪১ সালে জানা যায় তিনি তার অ্যাডজুট্যান্ট, জেনেরেল গেরহার্ড ইঙ্গেল কে বলেছিলেন, ’আমি আমৃত্যু ক্যাথলিক হয়েই থাকবো;’

এমনকি যদি তিনি সত্যিকারের বিশ্বাসী খৃষ্টান নাও হয়ে থাকেন, হিটলার অবশ্যই খুবই ভিন্ন ধরনের কেউ হবেন, যদি খৃষ্ট হত্যাকারী হিসাবে ইহুদীদের দোষ দেবার দীর্ঘদিনের খৃষ্টান ঐতিহ্য তাকে প্রভাবিত করে না থাকে;

মিউনিখে ১৯২৩ সালের এক ভাষনে হিটলার বলেছিলেন, প্রথম কাজ হবে (জার্মানীকে) ইহুদীদের হাত থেকে বাচানো, যারা আমাদের দেশটাকে ধ্বংশ করছে, জার্মানীকে আমরা সেই কষ্ট সহ্য করা থেকে রক্ষা করতে চাই, যেমন আরেকজন করেছিলেন, ক্রুশ বিদ্ধ হয়ে মৃত্যুকে বরণ করার মাধ্যমে;” জন টোল্যান্ড (তার Adolf Hitler: The Definitive Biography বইটিতে লিখেছেন হিটলারের ধর্মীয় অবস্থান কি ছিল ফাইনাল সল্যুশন (বন্দী সকল ইহুদীকে হত্যা করার নাৎসী সিদ্ধান্ত) এর সময়টাতে:

তখনও রোমের চার্চের একজন ভালো সদস্য, যদি এর হায়ারার্কি বা প্রাধান্য পরম্পরা বিষয়টি তার পছন্দের ছিলনা, তবে তিনি তার মধ্যে এর সেই শিক্ষাটি ধারণ করে রেখেছিলেন যে, ইহুদীরাই ঈশ্বরকে হত্যা করেছিল; সে কারনে ইহুদী নিধনযজ্ঞ সংগঠিত করা সম্ভব হয়েছিল বিবেক এর সামান্যতম দংশন ছাড়াই, কারন সেখানে হিটলার শুধু ঈশ্বরের প্রতিশোধ নেবার হাত হিসাবে কাজ করেছেন – যতক্ষন তা করা সম্ভব হয়েছে নৈর্ব্যাক্তিক ভাবে, কোন নিষ্ঠুরতা ছাড়াই;

ইহুদীদের প্রতি খৃষ্টানদের ঘৃণা শুধুমাত্র ক্যাথলিকদের ঐতিহ্যই না, মার্টিন লুথার সমভাবে তীব্র ইহুদী বিদ্বেষী; তার Diet of Worms এ তিনি বলেছেন, ’সমস্ত ইহুদীকে জার্মানী থেকে বিতাড়িত করা উচিৎ’; এবং On the Jews and their Lies নামে তিনি পুরো একটা বইও লিখেছিলেন, যা সম্ভবত হিটলারকে প্রভাবিত করেছিল; লুথার ইহুদীদের বর্ণনা করেছিলে বিষধর সাপের কুন্ডলী বলে এবং সেই একই শব্দ হিটলারও ব্যবহার করেছিলেন তার ১৯২২ সালের উল্লেখযোগ্য একটি বক্তৃতায়, যেখানে তিনি বেশ কয়েকবার উল্লেখ করেছিলেন যে তিনি খৃষ্ট ধর্মাবলম্বী;

blockquote> খৃষ্টান হিসাবে আমার অনুভুতি একজন যোদ্ধা হিসাবে আমাকে আমার প্রভু আর ত্রাণকর্তার দিকে নির্দেশনা দেয়; এটি আমাকে নির্দেশ করে সেই মানুষটির প্রতি, যিনি একবার একাকীত্বে, তার অল্প কিছু অনুসারী পরিবেষ্টিত হয়ে, শনাক্ত করেছিলেন যে এই সব ইহুদীরা আসলে কি এবং সবাইকে আহবান করেছিলেন এদের সাথে যুদ্ধ করতে এবং তারা, ঈশ্বরের সত্য, কষ্ট সহ্যকারী হিসাবে না বরং যোদ্ধা হিসাবে সর্বশ্রেষ্টই ছিলেন, খৃষ্টান হিসাবে অসীম ভালোবাসা, এবং একজন মানুষ হিসাবে আমি বাইবেল এর এই সব অনুচ্ছেদগুলো পড়ি যা আমাদের বলে, কিভাবে আমাদের প্রভু অবশেষে উদ্যত হয়েছিলেন প্রতিরোধে তার সর্বশক্তি দিয়ে এবং চাবুক হাতে নিয়ে এইসব অভিশপ্ত শয়তানের বিষধর সাপের দঙ্গলকে বহিষ্কার করেছিলেন উপসনালয় থেকে; কি অসাধারন ছিল ইহুদী বিষাক্ততার বিরুদ্ধে তার সেই যুদ্ধ ; আজ দুই হাজার বছর পর, গভীর আবেগের সাথে আমি চিহ্নিত করতে পারছি আগের চেয়ে আরো বেশী ভালোভাবে সেই সত্যটাকে যে, এর জন্য তাকে তার রক্ত দিতে হয়েছে ক্রশের উপর; খৃষ্টান হিসাবে আমার দ্বায়িত্ব, আমি যেন নিজেকে প্রতারিত হবার কোন সুযোগ না দেই, আমার কর্তব্য হচ্ছে সত্য আর ন্যায় বিচারের জন্য যুদ্ধ করা; এবং যদি কোন কিছু পারে প্রদর্শন করতে যে আমরা সঠিক দায়িত্ব পালন করছি, সে হবে সেই কষ্ট যা প্রতিদিনই পুন্জীভুত হচ্ছে; কারন খৃষ্টান হিসোবে আমার আরো দায়িত্ব আছে আমার নিজেদের জনগনের প্রতি কর্তব্য পালন করার;

যদিও জানা কষ্টসাধ্য যে,হিটলার এই বিষধর সাপের কুন্ডলী কথাটা আসলে কোথায় পেয়েছিলেন লুথারের লেখা থেকে না সরাসরি ম্যাথিউ ৩:৭ থেকে,যেভাবে লুথার সম্ভবত পেয়েছিলেন;এছাড়া ইহুদী নিপীড়ন যে ঈশ্বরের ইচ্ছার একটি অংশ এই থীমটিতে হিটলার ফিরে এসেছেন তার Mein Kampf এ : ‘যেহেতু আজ আমি বিশ্বাস করি যে, আমি কাজ করছি সর্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্তার ইচ্ছানুযায়ী: নিজেকে ইহুদীদের কাছ থেকে সুরক্ষা করে; আমি আমার প্রভুর নামেই যুদ্ধ করছি;’ এটি ১৯২৫ সালের ঘটনা;একই কথা আবার বলেন ১৯৩৮ সালে রাইখস্টাগ (জার্মান পার্লামেন্ট) একটি ভাষনের সময়;এবং এই একই কথা তার জীবনে তিনি বহুবার বলেছেন বিভিন্ন সময়ে,

এই ধরনের তার উক্তিগুলোকে অন্যসময়ে করা তার অন্য উক্তিগুলোর সাথে ভারসাম্য খুজে নিতে হবে যেমন তার সেক্রেটারী যে কথাগুলো লিপিবদ্ধ করেছিলেন *Table Talk* এ,যেখানে হিটলার আবার তীব্রভাবে অখৃষ্টীয় দৃষ্টিভঙ্গীর কথা বলেছেন,যা তার সেক্রেটারী লিপিবদ্ধ করেছিলেন;নীচের উক্তিগুলো সব যেমন ১৯৪১ এর সময় করেছিলেন:

যে সবচেয়ে বিশাল আঘাতটিকে মানবতাকে সহ্য করতে হয়েছে তা হলো খৃষ্টধর্মের আগমন;বলশেভিজম হচ্ছে খৃষ্টধর্মের একটি অবৈধ সন্তান;দুটোই ইহুদীদের আবিষ্কার;ধর্মের ব্যাপারে পৃথিবীতে পরিকল্পিত মিথ্যার সুচনা করেছিল খৃষ্ট ধর্ম.......

প্রাচীন পৃথিবী কেন এত পবিত্র,বিশুদ্ধ,ভারহীন আর শান্তিপুর্ণ ছিল কারন তারা দুটি বিশাল ভয়াবহ অভিশাপের কথা জানতেন না,পক্স (Small Pox) আর খৃষ্টধর্ম;

যখন সব বলা শেষ হয়ে যায়,আমাদের আশা করার কোন কারনই নেই যে,ইতালীয় আর স্পেনীয়রা তাদের নিজেদের খৃষ্টধর্মর মাদকাসক্তি থেকে মুক্ত করবে;আসুন আমরাই শুধু একটি মাত্র জাতি হই, যারা এই রোগের বিরুদ্ধে প্রতিষেধকের ব্যবহারের মাধ্যমে নিজেদের মুক্ত হতে পেরেছে;

হিটলারের Table Talk এ আরো এধরনে বহু উদ্ধৃতি আছে,যা প্রায়ই খৃষ্টধর্মকে বলশেভিজমের সাথে সমতুল্য হিসাবে উল্লেখ করেছে;কখনো তুলনামুলক সমরুপ আলোচনা এসেছে কার্ল মার্কস এবং সেন্ট পল প্রসঙ্গে;এবং কখনোই তিনি ভোলেনই যে তারা দুজনেই ইহুদী (যদিও হিটলার খুব অদ্ভুত ভাবে দৃঢ় বিশ্বাস করতেন যীশু নিজে ইহুদী ছিলেন না);সম্ভাবনা আছে ১৯৪১ সাল অবধি হিটলারের হয়তো কোন এক ধরনে ধর্ম ত্যাগের বিষয়টি ঘটেছে বা খৃষ্টধর্ম সম্পর্কে তার মোহমুক্তি হয়েছে;বা এই পরস্পর বিরোধী এ ধরণের বক্তব্য কি শধুমাত্র আমাদের জানাচ্ছে যে,হিটলার একজন সুযোগ সন্ধানী মিথ্যাবাদী,যার কোন কথা বিশ্বাস করার মত নয়,যে কোন দিকেই?

তর্ক করা যেতে পারে,তার নিজের বক্তব্য বা তার কাছের সহযোগীদের দেয়া তথ্যে সত্বে,হিটলার আসলে ধার্মিক ছিলেন না কিন্তু তার শ্রোতা ও দর্শকদের মনের ধর্মীয় ভাবকে তিনি দুরভিসন্ধীর সাথে অপব্যবহার করেছিলেন; তিনি হয়তো নেপোলিয়নের সাথে একমত ছিলেন,যিনি বলেছিলেন, ‘ধর্ম হচ্ছে চমৎকার একটি জিনিস, যা দিয়ে সাধারন মানুষকে শান্ত করে রাখা যায়’; বা সেনেকা দি ইয়োঙ্গার এর সাথে,যিনি বলেছিলেন,’সাধারণ মানুষ ধর্মকে গন্য করে সত্য হিসাবে,জ্ঞানীরা মিথ্যা হিসাবে এবং শাসকরা শোষনের উপযোগী হিসাবে;‘কেউই অস্বীকার করবে না যে হিটলারের পক্ষে এমন অসৎ হওয়া খুবই সম্ভব;যদি তার আসলে উদ্দেশ্য হয় ধার্মিক হবার ভান করা,আমাদের নিজেদের অবশ্যই মনে করিয়ে দেয়া প্রয়োজন সেক্ষেত্রে হিটলারের নৃশংসতার কাজগুলো কিন্তু সে নিজেই একা হাতেই করেনি;সেই বর্বরোচিত ভয়াবহ ঘটনাগুলো ঘটিয়েছিল তার নির্দেশ মানা সৈন্যরা ও তাদের অফিসাররা,যাদের বেশীর ভাগই অবশ্যই খৃষ্টান ছিলেন;

আসলে জার্মান জনগোষ্ঠীর খৃষ্টধর্ম, আমরা আলোচনা করছি সেই হাইপোথিসিসটির ভিত্তিতে অবস্থিত– যে হাইপোথিসিসটি ব্যাখ্যা করবে, হিটলারে আপাতদৃষ্টিতে লোক দেখানো অনান্তরিক ধর্মীয় মনোভাবের প্রচারণা বা হয়তো হিটলার ভেবেছিলেন,তার হয়তো খৃষ্টধর্মের প্রতি কোন টোকেন হিসাবে হলেও কিছু সহমর্মিতা প্রকাশ করা উচিৎ,নয়তো তার দু:শাসন চার্চ থেকে যে সমর্থন পেয়েছিল,সেটা পেত না;চার্চের এই সমর্থন বহুরুপে দেখা গেছে সেই সময়ে,যার মধ্যে আছে পোপ পায়াস ১২ র নাৎসীদের প্রতি একটি দৃঢ় অবস্থান নেবার আহবানের প্রতি ক্রমাগত প্রত্যাখান করে যাওয়ার ব্যাপারটি – আধুনিক চার্চের জন্য যা এখনও যথেষ্ট পরিমান বিব্রতকর একটি অধ্যায়;

হয় খৃষ্ট ধর্ম নিয়ে হিটলারের সাফাই গাওয়াটা ছিল আন্তরিক ছিল অথবা তিনি তার খৃষ্টধর্ম প্রীতি নিয়ে ভান করেছিলেন তার নিজের উদ্দেশ্য পুরনের লক্ষ্যে – যেমন সফলভাবে জার্মান খৃষ্টান ও ক্যাথলিক চার্চের কাছ থেকে সাহায্য আদায় করেছিলেন; যে কোন ভাবেই হিটলারে শাসনের ভয়াবহ অশুভ দিকগুলোকে কোনভাবেই নাস্তিকতার কারনে ঘটেছে বলে এমনটি দাবী করা যাবে না;

এবং এমনকি যখন তিনি ধর্মের বিরুদ্ধে মন্তব্য করেছিলেন,হিটলার প্রভিডেন্স বা ঐশ্বরিক স্বর্গীয় সত্তা সংক্রান্ত শব্দগুলো তার ভাষায় ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকেননি: রহস্যময় একটি সত্বা,তিনি বিশ্বাস করতেন,তাকে বিশেষ ভাবে নির্বাচন করেছে জার্মানীকে নের্তৃত্ব দেবার জন্য;তিনি এটিকে মাঝে মাঝে বলতেন প্রভিডেন্স,কোন কোন সময় ঈশ্বর; ১৯৩৮ সালে আনসলুস (Anschluss , অষ্ট্রিয়া এবং জার্মানীর রাজনৈতিক পুনর্মিলন) এর পরে যখন ভিয়েনায় হিটলার বিজয়ীর বেশ প্রত্যাবর্তন করেন,তার উচ্ছসিত বক্তৃতায় ঈশ্বরের প্রসঙ্গ এসেছে এই প্রভিডেনস এর ছদ্মবেশে: ‘আমি বিশ্বাস করি এটা ঈশ্বরের ইচ্ছা একটা বালককে এখান থেকে রাইখে প্রেরণ করেছিলেন,তাকে সেখানে বড় হবার সুযোগ করে দিয়েছিলেন,তাকে হিসাবে উন্নীত করেছিলেন জাতির নেতা হিসাবে,যেন সে তার জন্মভুমিকে আবার রাইখের সাথে যুক্ত করার জন্য নেতৃত্ব দিতে পারে;“

১৯৩৯ সালে মিউনিখে আততায়ীর হাত থেকে সামান্যর জন্যে বেচে যাবার পর কিন্তু হিটলার স্বর্গীয় শক্তিকে ধন্যবাদ দিয়েছিলেন সেদিন তার সিডিউলে সামান্য পরিবর্তন করার মাধ্যমে তার জীবন রক্ষা করার জন্য;’এখন আমি সম্পুর্ণ সন্তুষ্ট; আমি যে বিরগারব্রাউকেলার সময়ের একটু আগেই ছেড়ে এসেছিলাম সেটা হচ্ছে দৈব ইচ্ছার একটি ইঙ্গিত, আমাকে আমার লক্ষ্যে পৌছাতে সাহায্য করার জন্য;এই ব্যর্থ হত্যা প্রচেষ্টার পর মিউনিখ এর আর্চবিশপ কার্ডিনাল মাইকেল ফাউলহাবের নির্দেশ দেন তার ক্যাথেড্রালে Te Deum বা ঈশ্বরে প্রশস্তি সঙ্গীত গাওয়ার ব্যবস্থা করা হবে,’আর্চডাওসিস এর পক্ষ থেকে ফুয়েরারের সৌভাগ্যক্রমে বেচে যাওয়ার জন্য স্বর্গীয় ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানানো উদ্দেশ্যে’;বেশ কিছু হিটলারের অনুসারী,যেমন গোয়েবেলস চেষ্টার কোনই ক্রটি করেননি খোদ নাৎসি মতবাদকে নিজের যোগ্যতারয় একটি ধর্মে রুপান্তরিত করতে;নীচের কথাগুলো ইউনাইটেড ট্রেড ইউনিয়নস এর প্রধানের যার প্রার্থনার মত একটি রুপ আছে,ছন্দ আছে খৃষ্ট প্রভুর প্রতি প্রার্থনার মত (আমাদের পিতা) বা ক্রিড এর মত:

অ্যাডলফ হিটলার ! আমরা শুধুমাত্র আপনার সাথে একাত্মতা ঘোষনা করছি; আমরা আমাদের প্রতিজ্ঞা নবায়ন করতে চাই এই মুহুর্তে: এই পৃথিবীতে আমরা শুধু বিশ্বাস করি অ্যাডলফ হিটলারকে; আমরা বিশ্বাস করি ন্যাশনাল সমাজতন্ত্র (নাৎসী পার্টি) আমাদের জনগনের জন্য একমাত্র রক্ষাকারী বিশ্বাস; আমরা বিশ্বাস করি স্বর্গে একজন প্রভু ঈশ্বর আছেন, যিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন, আমাদের পথ প্রদর্শন করেছেন, আমাদের নির্দেশনা দিয়েছেন এবং আমাদের দৃশ্যতই আশীর্বাদ করেছেন; এবং আমরা বিশ্বাস করি যে এই প্রভু ঈশ্বর অ্যাডলফ হিটলারকে প্রেরণ করেছেন যেন জার্মানী চিরকালের জন্য শক্তিশালী ভিত্তিতে পরিণত হতে পারে;

স্ট্যালিন নাস্তিক ছিলেন, হিটলার সম্ভবত নাস্তিক ছিলেন না, কিন্তু এমনকি তিনি যদি নাস্তিকও হতেন, তাহলেও স্ট্যালিন/হিটলার বিতর্কের শেষ কথা খুবই সাধারণ; কোন একক ব্যক্তি নাস্তিক হয়তো খারাপ কাজ করতে পারেন, কিন্তু তারা নাস্তিকতার নামে কোন অশুভ কাজ করেন না; স্ট্যালিন এবং হিটলার অত্যন্ত খারাপ কাজ করেছেন, যথাক্রমে গোড়া মতবাদ আর কট্টরপন্থী মার্ক্সবাদের নামে এবং উন্মত্ত ও অবৈজ্ঞানিক ইউজেনিকস তত্বে যা খানিকটা মিশ্রিত ছিল ভাগনারীয় (Wagner) পাগলামী; তবে ধর্মীয় যুদ্ধ আসলেই ধর্মের নামেই লড়াই করা হয়; এবং ইতিহাসে তাদের উপস্থিতি ভয়ঙ্কর ভাবে নিয়মিত; আমি এমন কোন যুদ্ধের কথা মনে করতে পারছি না যা নাস্তিকতার নামে লড়াই করা হয়েছে; আর কেনই বা তা হবে? কোন যুদ্ধের উদ্দেশ্য থাকতে পারে অর্থনৈতিক লালসা, রাজনৈতিক অভিলাষ, জাতি কিংবা বর্ণগত সংস্কার, গভীরভাবে লালন করা কোন দু:খ দুর্দশা বা প্রতিশোধ কিংবা কোন জাতির নিয়তি নির্ধারণে দেশপ্রেম জনিত বিশ্বাস; এবং কোন যুদ্ধের আরো সম্ভাব্য কারণ হচ্ছে কারো ধর্মের প্রতি অনঢ় বিশ্বাস যে আদের ধর্মটি একমাত্র সত্যিকারের ধর্ম; যা আরো দৃঢ় করে প্রবিত্র বই গুলো যা কোন রাখ ঢাক না রেখেই সকল অবিশ্বাসী এবং অন্য ধর্মের বিশ্বাসীদের মৃত্যুদন্ডে দন্ডিত করেছে, এবং স্পষ্টভাবে প্রতিজ্ঞা করেছে যে ঈশ্বরের যোদ্ধারা শহীদদের স্বর্গে প্রবেশ করবে সরাসরি। স্যাম হ্যারিস, প্রায়ই ঠিক নিশানা বরাবর যিনি আঘাত করে থাকেন, তার The End of Faith বইয়ে লিখেছিলেন:

ধর্মীয় বিশ্বাসের বিপদ হচ্ছে যে এটি খুব সাধারন কোন মানুষকে এর উন্মত্ততার সুফল ভোগ করার সুযোগ করে দেয় এবং তাদেরকে মনে করা হয় পবিত্র; কারন প্রতিটি নতুন প্রজন্মর শিশুদের শেখানো হয় ধর্মীয় মতবাদ আর প্রস্তাবনার যৌক্তিকতা প্রমানের কোন প্রয়োজন পড়ে না, যেভাবে আমরা অন্য সব প্রস্তাবনার জন্য আবশ্যিকভাবে যৌক্তিকতা খুজি; মানব সভ্যতা এখনও সম্পূর্ণ যুক্তিহীনদের যোদ্ধা দ্বারা অবরুদ্ধ হয়ে আছে; আমরা এমনকি এখনও আমাদের হত্যা করছি, প্রাচীন এক সাহিত্যের জন্য; কে ভেবেছিল এরকম দু:খজনউদ্ভট কোন কিছু সম্ভব হতে পারে?

আর এর ব্যতিক্রম, কেনই বা একজন যুদ্ধে যাবে অনুপস্থিত কোন একটি বিশ্বাসের জন্য?

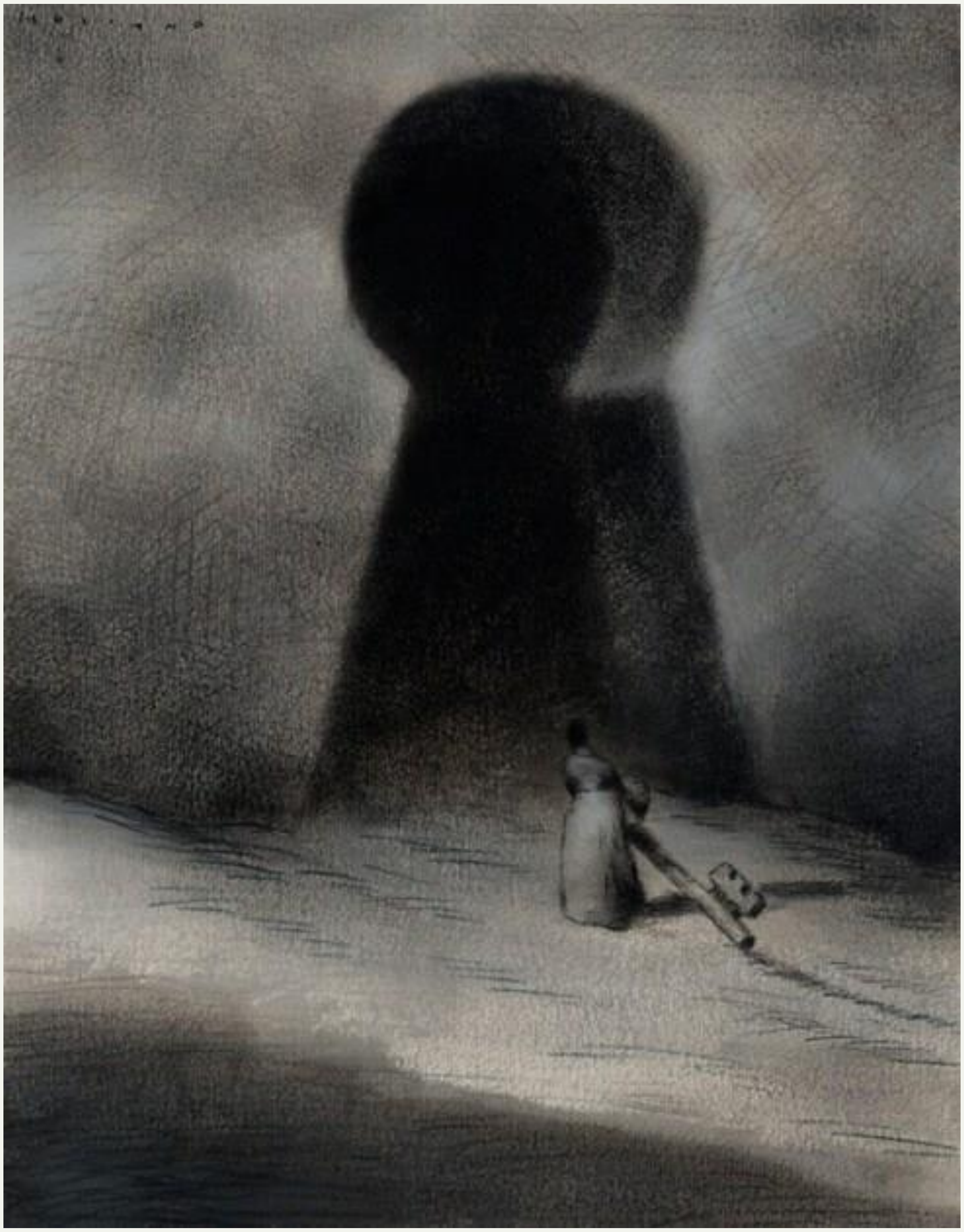

ব্রাড হল্যান্ড একটি ড্রইং

সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত

রিচার্ড ডকিন্স এর দি গড ডিল্যুশন : অষ্টম অধ্যায় (প্রথম পর্ব)

By K M Hassan

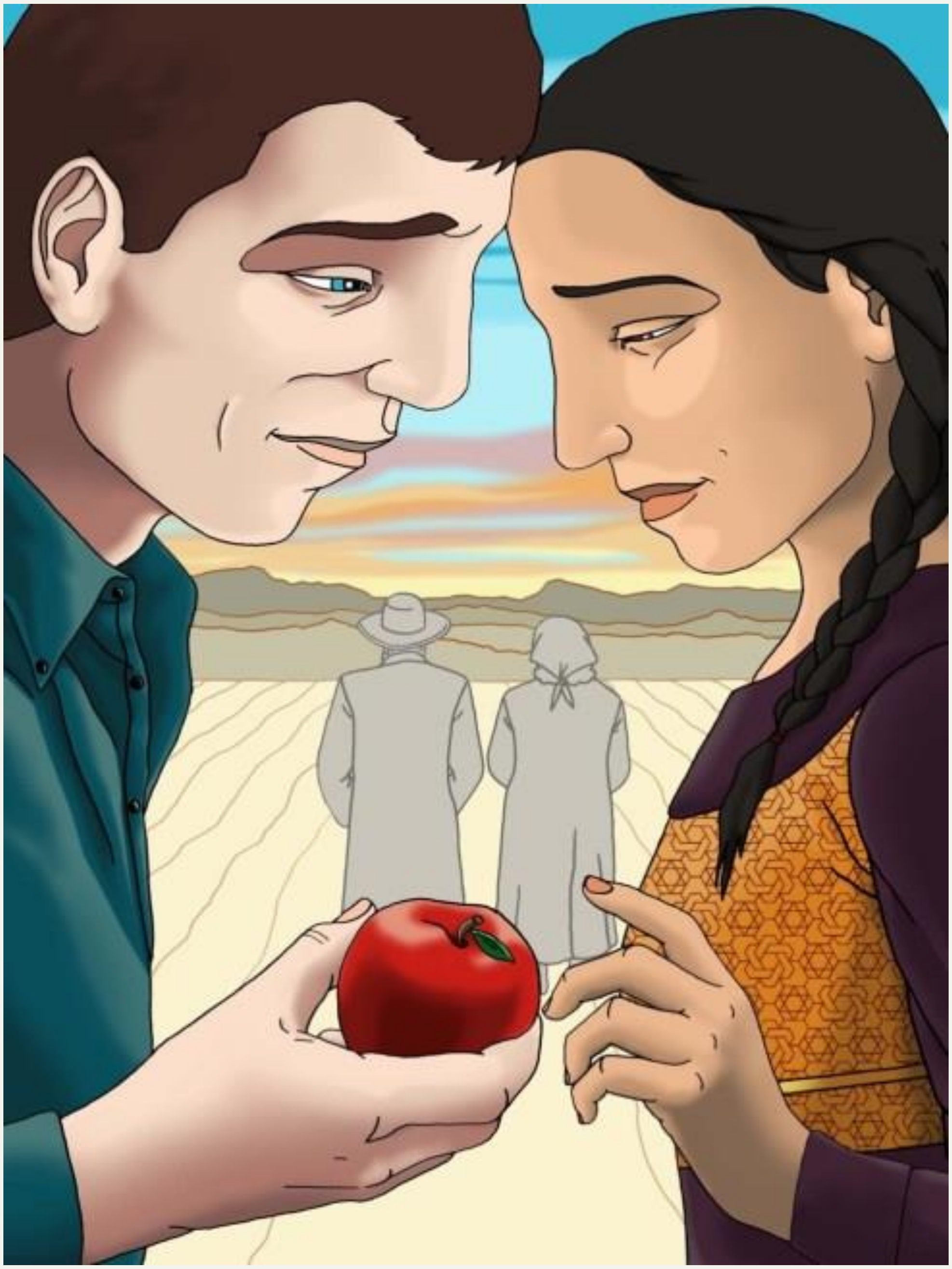

ছবি: গ্রেগরী ফেরান্ড (*Gregory Ferrand*) এর একটি ইলাসট্রেশন : ছবিটি একেছিলেন ইসরায়েলী লেখক

সাভইয়ন লিবরেখট (*Savyon Liebrecht*) এর নাটক
Apples from the Desert এর পোষ্টার হিসাবে (graphite and colored in Photoshop); ছবিটির মুল বক্তব্য পুরাতনদের বয়ে চলা অযৌক্তিক ট্রাডিশন আর বংশগত ঘৃণাকে পেছনে ফেলে নতুন করে জীবনের মুল্যকে অনুধাবন করে শান্তিকে আলিঙ্গন করার একটি স্বপ্ন।

রিচার্ড ডকিন্স এর দি গড ডিল্যুশন : অষ্টম অধ্যায় (প্রথম পর্ব)

(অনুবাদ প্রচেষ্টা: কাজী মাহবুব হাসান)

The God Delusion by Richard Dawkins

প্রথম অধ্যায়
দ্বিতীয় অধ্যায়
তৃতীয় অধ্যায়
চতুর্থ অধ্যায় (প্রথম পর্ব), চতুর্থ অধ্যায় (দ্বিতীয় পর্ব),
চতুর্থ অধ্যায় (তৃতীয় পর্ব), চতুর্থ অধ্যায় (চতুর্থ পর্ব), চতুর্থ অধ্যায় (শেষ পর্ব)
পঞ্চম অধ্যায় (প্রথম পর্ব), পঞ্চম অধ্যায় (দ্বিতীয় পর্ব), পঞ্চম অধ্যায় (তৃতীয় পর্ব)
পঞ্চম অধ্যায় (চতুর্থ পর্ব), পঞ্চম অধ্যায় (পঞ্চম পর্ব),পঞ্চম অধ্যায় (ষষ্ঠ পর্ব)
ষষ্ঠ অধ্যায় (প্রথম পর্ব); ষষ্ঠ অধ্যায় (দ্বিতীয় পর্ব); ষষ্ঠ অধ্যায় (শেষ পর্ব)
সপ্তম অধ্যায় (প্রথম পর্ব); সপ্তম অধ্যায় (দ্বিতীয় পর্ব); সপ্তম অধ্যায় (তৃতীয় পর্ব);
সপ্তম অধ্যায় (চতুর্থ পর্ব); সপ্তম অধ্যায় (শেষ পর্ব)

ধর্মের সমস্যাটা আসলে কি? ধর্ম কেন এত হিংস্র ?

ধর্ম আসলেই মানুষকে বিশ্বাস করাতে পেরেছে যে, একজন অদৃশ্য স্বত্তার অস্তিত্ব আছে – আকাশে যিনি বসবাস করেন –আপনি যা কিছু করছেন, প্রতিটি দিনের প্রতিটি মিনিটে, সব কিছুই তিনি দেখছেন। এবং এই অদৃশ্য স্বত্তার কাছে দশটি কর্মের একটি বিশেষ তালিকা আছে, যা তিনি চান আপনারা অবশ্যই সেসব কিছু যেন না করেন; এবং যদি আপনি সেই দশটি নিষেধাজ্ঞার কোন একটি অমান্য করেন, তাহলে তার বানানো একটি বিশেষ জায়গা আছে, গন গনে আগুন আর কালো ধোয়ায় পরিপুর্ণ, পুড়িয়ে যন্ত্রনা আর নির্যাতন করার একটি জায়গা; সেখানে তিনি আপনাকে পাঠাবেন থাকতে এবং যন্ত্রনা সহ্য করতে এবং পুড়তে এবং শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মরার উপক্রম হতে এবং আপনি সেখানে অনন্তকালের জন্য নিরন্তর ভাবে যন্ত্রণায় চিৎকার করতে থাকবেন আর কেবল কাদতে থাকবেন... কিন্তু তিনি আপনাকে ভালোবাসেন: জর্জ কারলিন

বৈশিষ্টগত প্রকৃতির কারনেই কোন ধরনের মুখোমুখি দ্বন্দেই আমি তেমন সুবিধা করতে পারিনা। আর আসলেই আমি মনে করিনা শত্রুভাবাপন্ন হয়ে, কোন সত্য অনুসন্ধান করার প্রক্রিয়াটা আদৌ উপযোগী হতে পারে ; এবং আমি নিয়মিতভাবেই আনুষ্ঠানিক নানা বিতর্কে অংশ নেবার জন্য আমন্ত্রন প্রত্যাখ্যান করে থাকি; আমি একবার আমন্ত্রিত হয়েছিলাম তৎকালীন এডিনবরার ইয়র্ক এর আর্চ বিশপ এর সাথে একটি আনুষ্ঠানিক বিতর্কে। নিজেকে এর জন্য বেশ সন্মানিত মনে করেছিলাম, এবং আমন্ত্রনটি সাদরে গ্রহন করেছিলাম। সেই বিতর্কের পর বিশিষ্ট ধার্মিক পদার্থ বিজ্ঞানী রাসেল স্ট্যানার্ড তার Doing Away with God? বইটিতে Observer পত্রিকায় সেই বিষয়ে তার লেখা একটি চিঠি পুণ:মুদ্রন করেন:

মহাশয়, অতিরিক্ত তৃপ্তিময় শিরোনাম ‘God comes a poor Second before the Majesty of Science’ এর অধীনে, আপনার বৈজ্ঞানিক সংবাদদাতা জানাচ্ছেন যে (তাও আবার ইষ্টার রোববারের মত একটি দিনে) কিভাবে ধর্ম ও বিজ্ঞান বিষয়ক একটি বিতর্কে রিচার্ড ডকিন্স ইয়র্কের আর্চবিশপের উপর কিভাবে ‘গুরুতর বুদ্ধিবৃত্তিক আক্রমন’ করেছিলেন। আমাদের জানানো হয়েছে, ’কুৎসিৎ আত্মপ্রসাদের হাসি হাসা’ নাস্তিকরা’ এবং ’সিংহরা ১০ এবং খৃষ্টানরা শুন্য;’

ধার্মিক বিজ্ঞানী স্ট্যানার্ড এভাবেই Observer এর কাছে একটানা বয়ান দিতে থাকেন যে, কিভাবে সেই পত্রিকাটি তার সাথে আমার এবং বার্মিংহামের বিশপ ও বিখ্যাত কসমোলজিষ্ট স্যার হেরমান বন্ডির রয়্যাল সোসাইটিতে পরবর্তী একটি সাক্ষাৎকারের কথা উল্লেখ করতে ব্যর্থ হয়েছে, যে সাক্ষাৎকারটা কোন প্রতিদ্বন্দীতা মুলক বিতর্ক আকারে হয়নি, এবং তার ফলাফলে সেই আলোচনা অপেক্ষাকৃত বেশী গঠনমুলক হয়েছিল; আমি শুধু একমত হতে পারি, প্রতিদ্বন্দীতামুলক বিতর্কের ফরমাটের প্রতি তার স্পষ্ট নিন্দাজ্ঞাপনে জানানোর সাথে।

বিশেষ করে, আমার বই A Devil’s Chaplain এ যে কারনগুলো আমি উল্লেখ করেছিলাম, কিছু সব নির্দিষ্ট কারনেই আমি কোন সৃষ্টিবাদী বা ক্রিয়েশনিষ্টদের সাথে কোন বিতর্কে অংশগ্রহন করতে চাইনা; ((আমার আসলে সেই দু:সাহস নেই সে কারনগুলো উল্লেখ করে আমন্ত্রন প্রত্যাখান করার, অন্তত একটি কারন যা আমার সবচেয়ে প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিক সহকর্মী ব্যবহার করেন সচরাচর, যখনই কোন সৃষ্টিবাদী তার সাথে কোন আনুষ্ঠানিক বিতর্ক আয়োজন করার চেষ্টা করে, (আমি তার নাম বলবো না, তবে তার বাক্যটি অষ্ট্রেলীয় বাচনভঙ্গীতে পড়তে হবে) : ”এটা তোমার জীবন বৃত্তান্তে বেশ ভালো দেখাবে, আমারটায় ততটা না।’))

যদিও যুদ্ধং দেহী কোন প্রতিযোগিতার প্রতি আমার সুস্পষ্ট অপছন্দ থাকা সত্বেও, কোন না কোন এক ভাবে আমি ধর্মের প্রতি তীব্র বিতৃষ্ণার এবং আক্রমনাত্মক একটি মনোভাবের খ্যাতি অর্জন করে ফেলেছি; আমার সহকর্মীরা যারা একমত যে, ঈশ্বরের কোন অস্তিত্বই নেই এবং যারা একমত যে নৈতিক হবার জন্য আমাদের ধর্মের কোন প্রয়োজনীয়তা নেই, এবং আমরা ধর্ম এবং নৈতিকতার মুল শিকড়কে ধর্মের বাইরের একটি ভাষায় ব্যাখ্যা করতে পারি, তারাও মৃদু বিস্ময়কর একটি ধাধা নিয়ে আমাকে পাল্টা প্রশ্ন করেন: তুমি কেন এত ধর্মের বিরুদ্ধে এত বিদ্বেষপুর্ণ মনোভাব পোষন করো বলোতো ? ধর্মের আসলে সমস্যাটা কি? আসলেই কি ধর্ম এত বেশী ক্ষতি করে যে, আমাদের এর বিরুদ্ধে সক্রিয় হয়ে যুদ্ধ করতে হবে? কেন আমরা আমাদের মত থাকি না, আর তাদেরকে তাদের মত ছেড়ে দিচ্ছি না তাদের মত করে জীবন কাটাতে, যেমন আমরা করে থাকি রাশিচক্র যেমন বৃষ আর বৃশ্চিক রাশির সাথে, বা ক্রিষ্টাল শক্তি আর লেই লাইন এর ক্ষেত্রে ? এরা সব কি সেই সব উদ্ভট ধ্যানধারনারই একটি না, যা কোন ক্ষতি করছে না আমাদের?

আমি হয়তো এর উত্তরে বলি যে এধরনে বৈরী আচরন যা আমি কিংবা অন্যান্য নাস্তিকরা মাঝে মাঝে ধর্মের বিরুদ্ধে প্রদর্শন করে তা শুধু লিখিত বা উচ্চারিত শব্দের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। আর শুধুমাত্র ধর্মতাত্বিক মতভিন্নতার কারনে আমি কিন্তু কাউকে বোমা মেরে হত্যা করার ইচ্ছা পোষন করছি না, বা শিরোচ্ছেদ করতে বা আগুনে পুড়িয়ে ক্রশে চড়িয়ে মারতেও চাইছি না বা কোন উচু দালানের দিকে উড়োজাহাজ চালাতে চাইছি না; কিন্ত আমার প্রশ্নকর্তারা সাধারণত সেখানেই তাদের কথা থামান না, তিনি হয়তো আরো বলতে পারেন এমন কোন কিছু: ”তোমার এই বিদ্বেষপুর্ণ মনোভাব কি তোমাকে একজন ’মৌলবাদী নাস্তিক’ হিসাবে চিহ্নিত করছে না, ঠিক তোমার মতানুযায়ী তুমিও তো একই ভাবে উগ্র আর গোড়া, যুক্তরাষ্ট্রে বাইবেল বলয়ে বসবাসকারীরা যেমন তাদের মতামতে গোড়া আর উগ্র?

প্রথমেই আমার প্রতি এই মৌলবাদীতার অভিযোগকে আগে পরিহার করার প্রয়োজন বোধ করছি, কারন এই অভিযোগ আমার প্রতি হতাশাজনকভাবে সর্বজনীন।

মৌলবাদিতা এবং বিজ্ঞানের বিরুদ্ধে নাশকতামুলক তৎপরতা:

মৌলবাদীরা বিশ্বাস করেন যে তারাই ঠিক কারন সেই সত্যটিকে তারা কোন একটি পবিত্র গ্রন্থে পড়েছেন এবং আগে থেকেই, তারা জানেন, কোনকিছুই সেই ধারনকৃত লালিত বিশ্বাস থেকে তাদেরকে একচুলও নাড়াতে পারবে না। প্রবিত্র গ্রন্হের সত্য হচ্ছে একধরনের এক্সিয়ম বা কোন প্রমান বা যুক্তি ছাড়াই যাকে সত্য বলে মেনে নেয়া হয়, যা কখনোই কোন যৌক্তিক আলোচনার উপসংহার না। যাই হোক না কেন পবিত্র গ্রন্থ অবশ্যই সত্যি, এমন কি যখন যথেষ্ট প্রমান এর বীপরিতে। বিরুদ্ধ সেই প্রমানগুলোই অবশ্যই ছুড়ে ফেলে দিতে হবে, কারন পবিত্র গ্রন্থ অবশ্য মান্য। অথচ ঠিক এর বীপরিত, হচ্ছি আমি, একজন বৈজ্ঞানিক হিসাবে কোন কিছুতে বিশ্বাস স্থাপন করি (যেমন ধরুন বিবর্তন প্রক্রিয়া), সেটা প্রবিত্র গ্রন্থে পড়েছি বলে তা কিন্তু না বরং আমি বিশ্বাস করি কারন আমি এর স্বপক্ষে সব প্রমানগুলোর বিশ্লেষন ও পর্যালোচনা করেছি এবং আসলেই দুটো মধ্যে পার্থক্য অনেক বেশী। বিবর্তন সংক্রান্ত কোন বই এ বিশ্বাস স্থাপন করা হয় এ জন্য না যে তারা পবিত্র গ্রন্থের মত কোন কিছু, বরং তাদের বিশ্বাস করা হয় কারন সেই বইগুলোতে সাধারণত পরস্পরকে মজবুত বা দৃঢ় করে এমন অগনিত প্রমান উপস্থাপন করে থাকে। নীতিগতভাবে, কোন একজন পাঠক চাইলেই সেই প্রমানগুলো পরীক্ষা করে দেখতে পারবেন। বিজ্ঞানের কোন বইয়ে যখন ভুল হয়, কেউ না কেউ একসময় সেই ভুলটি উদঘাটন করে এবং এর পরবর্তী সংস্করনগুলোতে সেই ভুলটি সংশোধন করা হয়। এবং খুবই স্পষ্টভাবে আমরা এমন কিছু কোন ধর্মগ্রন্থর সাথে হতে দেখিনা।

দার্শনিকরা, বিশেষ করে সৌখিন দার্শনিকরা যাদের অল্প কিছু দর্শন সম্বন্ধে লেখাপড়া আছে এবং আরো বিশেষভাবে যারা সাংস্কৃতিক আপেক্ষিকতাবাদ বা কালচারাল রিলেটিভিজম দ্বারা সংক্রমিত তারা হয়তো বা এই পর্যায়ে ক্লান্তিকর একটি রেড হেরিং দেখাবেন বা মুল বিষয়টিকে পাশ কাটিয়ে যাবার প্রচেষ্টায় একটি ভ্রান্ত যুক্তি প্রস্তাব করতে পারেন: একজন বিজ্ঞানীর 'স্বাক্ষ্য প্রমানের' উপর বিশ্বাসটাইতো কোন মৌলবাদী বিশ্বাসের মতই একটি বিষয়। এই বিষয়টি নিয়ে আমি আমার অন্য কিছু লেখায় বিশদ আলোচনা করেছি আগে, এখানে শুধু সংক্ষিপ্তভাবে তার কিছুটা পুনরাবৃত্তি করবো। সৌখিন দার্শনিকের টুপি মাথায় দিয়ে আমরা যা কিছ দাবী করি না কেন, আমরা সবাই আমাদের জীবনে প্রমানের উপর বিশ্বাস স্থাপন করি। যদি আমি কোন হত্যার জন্য অভিযুক্ত হই, বিবাদী পক্ষের আইনজীবি আমাকে কঠোর ভাবে জিজ্ঞেস করবেন, অপরাধ সংঘটিত হবার আগের রাত্রে আমি শিকাগোতে ছিলাম এই কথাটি সত্যি কিনা। আমি এখানে দর্শনের যুক্তি দিয়ে এমন কোন উত্তর দিয়ে কিন্তু পাশ কাটিয়ে যেতে পারবো না, যেমন: "এটা নির্ভর করছে আপনি 'সত্যি' বলতে কি বোঝাচ্ছেন সেই বিষয়টার উপর," কিংবা কোন নৃতাত্বিক বা আপেক্ষিকতাবাদী আবেদন দিয়ে , যেমন, "শুধুমাত্র আপনার পশ্চিমা বৈজ্ঞানিক 'ছিলাম' অর্থে আমি শিকাগোতে ছিলাম সেদিন;"; বঙ্গোলীজদের এই 'কোথাও থাকার ধারনাটি' সম্পূর্ণ ভিন্ন, সে অনুযায়ী আপনি সত্যি 'কোথাও আছেন' বলতে বোঝাবে, আপনি হচ্ছেন সুগন্ধী তেল মর্দন করা নির্বাচিত একজন বয়োবৃদ্ধ , যিনি ছাগলের শুকনো অন্ডকোষ থেকে নস্যি নেবার যোগ্যতা রাখেন;"

হতে পারে বিজ্ঞানীরা মৌলবাদী, 'সত্য' বলতে কি বোঝায় যখন সেটি কোন বিমুর্ত উপায়ে সংজ্ঞায়িত করা হয়; কিন্তু সেঅর্থেও বাকীরাও কিন্তু সেরকমই মৌলবাদী। আমি যখন বলছি নিউজিল্যান্ড এর অবস্থান হচ্ছে দক্ষিন গোলার্ধে তার চেয়ে আবার আমি যখন বলছি বিবর্তন সত্যি, তা কিন্তু কোন অংশেই আমাকে বেশী মৌলবাদী হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করছে না। আমরা বিবর্তনে বিশ্বাস করি কারন এর স্বপক্ষে অসংখ্য স্বাক্ষ্য প্রমান আছে এবং আমরা এটিকে অবশ্যই দ্রুত প্রত্যাখান করতে দ্বিধা বোধ করবো না, যদি নতুন কোন স্বাক্ষ্য প্রমান আমাদের হাতে আসে যা কিনা বিবর্তনকে সম্পূর্ণ ভুল প্রমানিত করে; কোন সত্যিকারের মৌলবাদী এভাবে কোন কথা কখনোই বলবেন না।

খুবই সহজ তীব্র আবেগ আর মৌলিবাদীতা, এই দুটি বিষয়কে একই মনে করে সংশয়াচ্ছন্ন হওয়া। আমাকে যথেষ্ট আবেগ তাড়িত মনে হতে পারে আমি যখন মৌলবাদী কোন সৃষ্টিবাদী বা ক্রিয়েশনিষ্টদের বিরুদ্ধে বিবর্তনের পক্ষে

লড়াই করি, কিন্তু এর কারন তাদের মৌলবাদের প্রতিদ্বন্দী এটি আমার কোন মৌলবাদ তা কিন্তু না; এর কারন বিবর্তনের স্বপক্ষে প্রশ্নাতীতভাবে অত্যন্ত দৃঢ় অসংখ্য স্বাক্ষ্য প্রমান আছে এবং আমি আবেগময় একটি হতাশার শিকার হই যখন দেখি আমার বিরোধী পক্ষ সেটি অনুধাবন করতে ব্যর্থ হচ্ছেন বা সাধারণত যা হয়ে থাকে, প্রমানগুলোর দিকে তারা নজর দিতেই অস্বীকার করেন, শুধুমাত্র যার কারন যখন এটি তাদের পবিত্র গ্রন্থর সাথে ভিন্নমত পোষন করছে। আমার সেই আবেগ আরো জোরালো হয়, যখন আমি দেখি এই সব দুর্ভাগা মৌলবাদীরা এবং তারা যাদের প্রভাবিত করছে তারা ঠিক কতটুকু ’বঞ্চিত’ হচ্ছেন বিবর্তনের ধারনাটি অনুধাবন না করতে পারার জন্য। বিবর্তনের সত্যগুলো এবং সেই সাথে অন্যান্য বৈজ্ঞানিক সত্যগুলো প্রত্যেকটি অত্যন্ত গভীরভাবে বিস্ময়কর এবং সুন্দর। আসলেই কতুটকু দুর্ভাগ্যজনক যদি তা না জেনেই কাউকে মরতে হয়! অবশ্যই সেই বিষয়টি আমাকে তীব্র আবেগাক্রন্ত করে ফেলে, আর কেনই বা সেটা করবে না? কিন্তু বিবর্তনে আমার বিশ্বাস কখনোই মৌলবাদ সমতুল্য না আর এটি কোন অন্ধ বিশ্বাসও না, কারন আমি জানি আমার মন পরিবর্তন করতে কি প্রয়োজন এবং আমি আনন্দের সাথেই তা করবো যদি প্রয়োজনীয় প্রমান মেলে।

এবং এরকম ঘটনা বহু ঘটেছেও। আগে আন্ডারগ্রাজুয়েট ছাত্র থাকাকালীন অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রানী বিজ্ঞান বিভাগের একজন সন্মানিত নেতৃস্থানীয় বিশেষজ্ঞর গল্প বলেছিলাম, বহু বছর ধরে তিনি অত্যন্ত আবেগের সাথেই বিশ্বাস করতেন এবং পড়াতেন যে গলজি অ্যাপারাটাস (প্রানী কোষের অভ্যন্তরে একটি আনুবীক্ষনীক অঙ্গানু) এর আসলে বাস্তবে কোন অস্তিত্ব নেই: একটি বিভ্রম বা ভুল করে মনে করা কোন একটি বৈশিষ্ট। প্রতি সোমবার বিকেলে প্রানী বিজ্ঞান বিভাগের একটি প্রথা ছিল যে সমস্ত ডিপার্টমেন্ট একজন ভিজিটিং লেকচারারের সেমিনারে অংশ নেবে। একটি সোমবারে আমাদের অতিথি ছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের একজন কোষ বিজ্ঞানী, যিনি সম্পুর্ন বিশ্বাসযোগ্য সাক্ষ্য প্রমান সহ আমাদের জানান যে গলজি অ্যাপারাটাস বলে আসলেই কোষের অভ্যন্তরে অঙ্গানু আছে। সেই বক্তৃতার শেষে সেই বৃদ্ধ অধ্যাপক হল ভর্তি মানুষের সামনে এসে যুক্তরাষ্ট্রের বিজ্ঞানীর সাথে হাত মেলালেন এবং বেশ আবেগের সাথে বলেন, ”আমার প্রিয় সহকর্মী, আপনাকে আমি ধন্যবাদ জানাতে চাই, গত পনেরো বছর ধরে আমি ভুল জানতাম;” আমরা সবাই তখন হাততালি দিয়ে উঠেছিলাম তীব্র জোরে। কোন মৌলবাদী কখনোই তা করবে না। এবং প্রায়োগিক ক্ষেত্রে অনেক বিজ্ঞানীও হয়তো তা করবেন না, কিন্তু সব বিজ্ঞানী অন্তত সায় দেবে এটিকে আদর্শ হিসাবে চিহ্নিত করে। যার ব্যতিক্রম রাজনীতিবিদরা কিন্তু তা করবেন না কখনোই, তারা হয়তো বলবেন এগুলো হচ্ছে মত একেবারে উল্টোদিকে ঘুরিয়ে নেয়া বা ডিগবাজী মারা। একটু আগেই বর্ণনা করা এই ঘটনাটির স্মৃতি এখনও আমাকে আবেগতাড়িত করে।

একজন বৈজ্ঞানিক হিসাবে, আমি মৌলবাদী ধর্মের প্রতি বৈরী মনোভাব পোষন করি কারন এটি সক্রিয়ভাবে বৈজ্ঞানিক সব উদ্যোগকে কলুষিত করছে। ধর্ম আমাদের শেখায় আমাদের যেন আমাদের মন পরিবর্তন না করি, মহাবিশ্বে যত বিস্ময়কর জিনিস জানার আছে আমরা যেন সেগুলো সম্বন্ধে জানার কোন আগ্রহ অনুভব কিংবা সক্রিয়ভাবে জানার চেষ্টা করি; এটি বিজ্ঞানকে দুর্বল করে, আমাদের বুদ্ধিমত্তাকে দুর্বল করে দেয়। আমার জানা মতে এর সবচেয়ে দু:খজনক উদহারন হচ্ছে, যুক্তরাষ্ট্রের ভুতত্ত্ববিদ কার্ট ওয়াইস, যিনি এখন যুক্তরাষ্ট্রের টেনেসির ডেটনে ব্রায়ান কলেজের সেন্টার ফর অরিজিনস রিসার্চ এর পরিচালক। কলেজটির নাম ব্রায়ান হবার কারন কিন্তু কোন দুর্ঘটনা নয়, এর নামকরণ হয়েছে উইলিয়াম জেনিংস ব্রায়ান এর নামানুসারে, যিনি বিজ্ঞান শিক্ষক জন স্কোপস এর বিরুদ্ধে মামলা করেছিলেন বিখ্যাত ১৯২৫ সালের ডেটন ’মাঙ্কি ট্রায়াল’ এ। ওয়াইস তার শৈশবের স্বপ্ন পুর্ণ করতে পারতেন কোন একটি সত্যিকারের বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক হয়ে, যার মটো হয়তো হতো ’বিশ্লেষনাত্মক ভাবে চিন্তা করতে হবে’, ব্রায়ান কলেজের ওয়েবসাইটের অক্সিমোরোনের মত কোন কিছু না ‘বিশ্লেষনী মনোভাব এবং বাইবেল এর মত চিন্তা করুন‘; ওয়াইস শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ভুতত্ত্ববিদ্যায় ডিগ্রী অর্জন করেছিলেন এবং এরপর আরো দুটি উষ্চতর ডিগ্রী নেন ভুতত্ত্ববিদ্যা এবং জীবাশ্মবিদ্যায় হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে (কোন অংশেই যা কম নয়), যেখানে তিনি স্টিফেন ডে গুল্ড এর ছাত্র ছিলেন (আরো বিশাল একটি ব্যাপার); তিনি খুবই যোগ্য এবং

মেধাবী তরুণ বিজ্ঞানী ছিলেন, প্রকৃত কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞান পড়ানো এবং গবেষনা করবেন, তার জীবনের এমন স্বপ্ন পুরণের পথেই তিনি অগ্রসর হচ্ছিলেন।

ঠিক তখনই একটি দুর্ঘটনা ঘটে। এই আঘাতটি বাইরে থেকে না, তার ভিতর থেকেই এসেছিল..তার নিজের মনে, যে মন মারাত্মকভাবে দুর্বল হয়েছিল একটি মৌলবাদী ধর্মের ছত্রছায়ায় তার বেড়ে ওঠার কারনে, যে মৌলবাদী বিশ্বাস তাকে বাধ্য করে পৃথিবী –তার শিকাগো ও হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় ভুতাত্বিক পড়াশুনার বিষয় – দশ হাজার বছরের চেয়ে কম প্রাচীন তা বিশ্বাস করার জন্য। যথেষ্ট বুদ্ধিমান ছিলেন তিনি বোঝার মতো যে, তার ধর্মবিশ্বাস আর বিজ্ঞান একটি মুখোমুখি সংঘর্ষের দিকে এগুচ্ছে এবং তার মনের ভিতরেও সেই দ্বন্দও ক্রমশ প্রকট হয়েছিল এবং একদিন তিনি আর সহ্য করতে পারেননি; একদিন ব্যপারটা সমাধান করার জন্য একটি কাচি হাতে বাইবেলে নিয়ে বসলেন, তিনি পুরো বাইবেলের যে অংশগুলোকে বাদ যেতে হবে যদি পৃথিবী সম্বন্ধে তার বৈজ্ঞানিক ধারনা সত্য হয়ে থাকে, সেগুলো আক্ষরিক অর্থে কাটতে বসলেন; এই অতিমাত্রায় সৎ আর কষ্টকর অনুশীলনের পর, তার বাইবেল এর আসলে খুব কম অংশই অক্ষত ছিল যে,

> যতই চেষ্টা করিনা কেন আমি, সারা ধর্মগ্রন্থ জুড়ে অক্ষত মার্জিন থাকার সুবিধা সত্বেও আমার পক্ষে বাইবেলটা দুই ভাগে ভাগ না হয়ে যাওয়া ছাড়া ধরতেই পারছিলাম না; আমাকে সিদ্ধান্ত নিতেই হবে বিবর্তন আর ধর্মগ্রন্থের মধ্যে কোনটা আমি বেছে নেব। হয় ধর্মগ্রন্থ সত্যি এবং বিবর্তন ভুল বা বিবর্তন সত্যি এবং আমাকে অবশ্যই বাইবেল ছুড়ে ফেলতে হবে। ঠিক সেই মহুর্তে, সেই রাতে আমি ঈশ্বরের কথা মেনে নেই এবং এর পরিপন্থী সবকিছুকে প্রত্যাখান করি, বিবর্তন সহ। এবং এভাবে,অনেক দু:খ সাথে বিজ্ঞানে আমার সব স্বপ্ন আর আশাকে আগুনে ছুড়ে ফেলি।

বিষয়টি আমাকে দারুন ব্যাথিত করে; কিন্তু অন্যদিকে গলজি অ্যাপারাটাসের গল্পটি আমাকে আন্দোলিত করে মুগ্ধতায় আর শ্রদ্ধায়, কার্ট ওয়াইস এর কাহিনী আসলে করুণারই উদ্রেক করে.. করুনা এবং বিতৃষ্ণা। তার নিজের পেশাগত জীবন আর তার জীবনের সুখের প্রতি এই আঘাত তার নিজেরই দেয়া.. তা এত বেশী অপ্রয়োজনীয় ছিল.. সহজেই তা এড়ানো সম্ভব ছিল। শুধু তাকে বাইবেলকে ছুড়ে ফেলে দিতে হতো বা তিনি সেটাকে প্রতিকী বা রুপকভাবে ব্যাখ্যা করতেন, যেমন করে বিভিন্ন ধর্মতাত্বিকরা করে থাকেন। তবে তার বদলে তিনি মৌলবাদীদের মতই কাজটি করলেন এবং বিজ্ঞানকে ছুড়ে ফেলে দেন তার জীবন থেকে..সেই সাথে প্রমান এবং যুক্তি, তার সব স্বপ্ন আর আশাগুলো;

হয়তো মৌলবাদীদের মধ্যে অনন্য একটি উদহারন , কার্ট ওয়াইস সৎ ছিলেন, অতিমাত্রায় সৎ একজন মানুষ, যার সততা তাকে কষ্ট দিয়েছে এবং ধ্বংশ করেছে। তাকেই টেম্পলটন পুরষ্কার দেয়া উচিৎ, তিনি হয়তো এর প্রথম সত্যিকারের যোগ্য পুরষ্কৃত কেউ হতে পারতেন। ওয়াইস সবার সামনে যে বিষয়টি নিয়ে আসেন, সেটা গোপনে সবার চোখের আড়ালে ঘটছে সবসময়ই, সাধারনত সকল মৌলবাদীদের মনে, যখন তারা বৈজ্ঞানিক স্বাক্ষ্য প্রমানের মুখোমুখি হন, যা তাদের দৃঢ় ভাবে ধারন করা মতামতের সাথে ভিন্নমত পোষন করে। তার কাহিনী উপসংহারটি লক্ষ্য করুন:

> যদিও একটি কয়েক হাজার বছর বয়সী তরুন পৃথিবীকে মেনে নেবার জন্য প্রয়োজনীয় বৈজ্ঞানিক কারণ আছে, তবে আমি একজন ইয়াং আর্থ ক্রিয়েশনিষ্ট কারন ধর্মগ্রন্থ থেকে পাওয়া আমার ধারনা; আমি যেমন আমার অধ্যাপকদের সাথে যা আলাপ করেছি বহু বছর আগে,যখন কলেজে ছিলাম, যদি এই মহাবিশ্বের সব প্রমান সৃষ্টিবাদের বিরুদ্ধে যায়, আমি হবো প্রথম ব্যক্তি সেটা স্বীকার করার জন্য, তারপরও আমি সৃষ্টিবাদী থাকবো কারন ঈশ্বরের নিজের কথায় তারই ইঙ্গিত দিচ্ছে, এবং এখানেই আমাকে অবশ্যই দাড়াতে হবে।

তিনি সম্ভবত লুথারকে উদ্ধৃতি দিয়েছিলেন তার শেষ সিদ্ধান্তের স্থির হয়ে দাড়ানোর কথা বলতে, যেমন লুথার তার নিজের মুল বক্তব্যকে ভিটেনবুর্গ এর চার্চের দরজায় যেমন লাগিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু হতভাগা কুর্ট ওয়াইস আমাকে বরং ১৯৮৪ সালের উইনস্টোন স্মিথ এর কথাই বেশী মনে করিয়ে দেয়, যে কিনা যদি বিগ ব্রাদার বলেন দুই আর দুই যোগ করলে পাচ হবে, তাই বিশ্বাস করার জন্য প্রাণান্তকর প্রচেষ্ঠা করেছিলেন (উনস্টোন স্মিথ জর্জ ওরওয়েল এর Nineteen Eighty-Four উপন্যাসের মুখ্য চরিত্র); যদিও উইনস্টোন, নির্যাতিত হয়েছিলেন; ওয়াইস এই ভিন্নচিন্তার হেতু কিন্ত অবশ্যম্ভাবী শারীরিক নির্যাতনের শঙ্কা নয় বরং অন্য একটি অবশ্যম্ভাবী বাধ্যবাধকতা ছিল তার জন্য – আপাতদৃষ্টিতে কারো কারো কাছে যা অনস্বীকার্য ও শিরোধার্য – তা হলো ধর্মীয় বিশ্বাস: তর্কসাপেক্ষে যা মানসিক নিপীড়নেরই আরেকটি একটি রুপ। আমি ধর্ম সম্বন্ধে বৈরী মনোভাব পোষন করি কারন কার্ট ওয়াইস এর সাথে এটি যা করেছে এবং ধর্ম যদি হার্ভার্ডি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষিত কোন ভুতত্ত্ববিদের সাথে এমন করতে পারে তাহলে চিন্তা করে দেখুন অন্য কোন সাধারন মানুষতের, যাদের সেই মেধাও নেই এবং প্রতিরোধ করার মত কোন প্রস্তুতিও নেই, তাদের ক্ষেত্রে তাহলে এটি কি করতে পারে।

অগনিত নিরীহ, উৎসাহী, কৌতুহলী, আর পরিষ্কার ভালো মনের তরুন শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষাকে ধ্বংশ করতে মৌলবাদী ধর্ম বদ্ধপরিকর। আর অমৌলবাদীদের তথাকথিত ’মৃদু’ আর ’কান্ডজ্ঞানসম্পন্ন’ ধর্ম হয়তো তা করছে না ঠিকই, তবে অবশ্যই এটি পৃথিবীকে মৌলবাদীদের জন্য নিরাপদ করে তুলছে, খুব শৈশব থেকেই শিশুদের একটি মন্ত্র শিখিয়ে, সেটা হচ্ছে: প্রশ্নাতীত অন্ধ বিশ্বাস হচ্ছে একটি মহৎ গুন।

রিচার্ড ডকিন্স এর দি গড ডিল্যুশন : অষ্টম অধ্যায় (দ্বিতীয় পর্ব)

By K M Hassan

ছবি: হাগিং বোম্ব (ক্রেইগ ব্যারীর (*Kreig Barrie*) একটি ইলাসট্রেশন)

রিচার্ড ডকিন্স এর দি গড ডিলুশন : অষ্টম অধ্যায় (দ্বিতীয় পর্ব)

(অনুবাদ প্রচেষ্টা: কাজী মাহবুব হাসান)

The God Delusion by Richard Dawkins

প্রথম অধ্যায়
দ্বিতীয় অধ্যায়
তৃতীয় অধ্যায়
চতুর্থ অধ্যায় (প্রথম পর্ব) , চতুর্থ অধ্যায় (দ্বিতীয় পর্ব) ,
চতুর্থ অধ্যায় (তৃতীয় পর্ব) , চতুর্থ অধ্যায় (চতুর্থ পর্ব) , চতুর্থ অধ্যায় (শেষ পর্ব)
পঞ্চম অধ্যায় (প্রথম পর্ব), পঞ্চম অধ্যায় (দ্বিতীয় পর্ব) , পঞ্চম অধ্যায় (তৃতীয় পর্ব)

পঞ্চম অধ্যায় (চতুর্থ পর্ব) , পঞ্চম অধ্যায় (পঞ্চম পর্ব) ,পঞ্চম অধ্যায় (ষষ্ঠ পর্ব)
ষষ্ঠ অধ্যায় (প্রথম পর্ব) ; ষষ্ঠ অধ্যায় (দ্বিতীয় পর্ব); ষষ্ঠ অধ্যায় (শেষ পর্ব)
সপ্তম অধ্যায় (প্রথম পর্ব) ; সপ্তম অধ্যায় (দ্বিতীয় পর্ব) ; সপ্তম অধ্যায় (তৃতীয় পর্ব) ;
সপ্তম অধ্যায় (চতুর্থ পর্ব) ; সপ্তম অধ্যায় (শেষ পর্ব)
অষ্টম অধ্যায় (প্রথম পর্ব)

ধর্মের সমস্যাটা আসলে কি? ধর্ম কেন এত হিংস্র ?

মোরাল অ্যাবসোল্যুটিজম** বা চুড়ান্তবাদীতার অন্ধকার রুপ:

আগের অধ্যায়ে যখন সময়ের সাথে পরিবর্তিত হওয়া নৈতিকতার যুগধর্ম বা জাইটগাইষ্ট কে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করছিলাম, আমি উদারপন্থী, জ্ঞানালোকপ্রাপ্ত, সুশীল মানুষদের সর্বজনীন ঐকমতের একটি ধারনার কথা উল্লেখ করেছিলাম; আমি একটু বেশী মাত্রায় আশাবাদী ধারনা করেছিলাম যে ‘আমরা’ সবাই অন্তত মোটা দাগে সেই ঐকমতের সাথে সংহতি অনুভব করি, কেউ কেউ হয়তো অন্যদের চেয়ে বেশী এবং আমি এই আমরা বলতে মনে করেছিলাম.. বেশীর ভাগ মানুষ যাদের এই বইটি পড়ার সম্ভাবনা আছে, ধর্ম সংক্রান্ত বিশ্বাসে তাদের যে অবস্থানই থাকুক না কেন। কিন্তু অবশ্যই একেবারে সবাই যে একমত তা কিন্তু না (এবং সবাই যে আমার এই বইটি পড়ার ইচ্ছা পোষন করবেন তাও কিন্তু না); সুতরাং স্বীকার করতেই হবে স্বৈরাচারবাদ এখনও তার মৃত্যু থেকে অনেক দুরে। আসলেই, আজ এখনও বিশ্বজুড়ে এটি বিশাল সংখ্যক মানুষের মনে রাজত্ব করছে, সবচে বিপদজ্জনক ভাবে মুসলিম বিশ্বে এবং অংকুরিত হতে থাকা যুক্তরাষ্ট্রের ধর্মতন্ত্রে (কেভিন ফিলিপস এর American theocracy নামের বইটি দেখুন); প্রায় সবসময়ই এধরনের চুড়ান্তবাদীতা বা অ্যাবসোলিউটিজমের মুল উৎস হচ্ছে শক্তিশালী ধর্মীয় বিশ্বাস। এবং ধর্ম যে পৃথিবীতে একটি অশুভ শক্তি এমন প্রস্তাবের এটি মুলত প্রধান কারন।

ওল্ড টেষ্টামেন্টে সবচেয়ে নৃশংসতম শাস্তির বিধান রাখা হয়েছিল ব্লাসফেমী বা ধর্ম নিন্দার জন্য এবং এটি এখনও কিছু দেশে সক্রিয়। পাকিস্থানের পেনাল কোড এর ২৯৫-সি সেকশন এই ’অপরাধের’ জন্য মৃত্যুদন্ডের বিধান আছে। ২০০১ সালে ১৮ আগষ্ট, ডা: ইউনুস শেখ, একজন চিকিৎসক শিক্ষক ব্লাসফেমীর জন্য মৃত্যুদন্ডে দন্ডিত হয়েছিলেন। নির্দিষ্ট অপরাধটির জন্য এই আইনে তিনি অভিযুক্ত হয়েছিলেন সেটি হলো: তিনি তার শিক্ষার্থীদের নাকি বলেছিলেন ৪০ বছর বয়সে তার নিজের ধর্ম আবিষ্কারের পুর্বে নবী মোহাম্মদ মুসলিম ছিলেন না। তার ১১ জন শিক্ষার্থী তার এই ধরনের কথা বলার অপরাধের জন্য কর্তৃপক্ষের কাছে তার নামে অভিযোগ করেছিল। পাকিস্থানে ব্লাসফেমী আইনটি সাধারনত: ব্যবহার করা হয় খৃষ্ট ধর্মাবলম্বীদের বিরুদ্ধে, যেমন অগাষ্টিন আশিক কিংরি মাসিহ, যাকে ফয়সালাবাদে ২০০০ সালে মৃত্যুদন্ড দেয়া হয়েছিল। একজন খৃষ্ট ধর্মাবলম্বী হিসাবে মাসিহ তার মুসলিম প্রেমিকাকে বিয়ে করার কোন অনুমতি ছিল না – অবিশ্বাস্যভাবে- পাকিস্থানী (এর ইসলামী) আইন কোন মুসলিম রমনীকে কোন অমুসলিমকে বিয়ে করার অনুমতি দেয় না। সুতরাং তিনি ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত হবার চেষ্টা করেন এবং সেটা করতে গিয়ে তিনি অভিযুক্ত হন এই ধর্মগ্রহনের জন্য তার নিশ্চয়ই নীচ কোন উদ্দেশ্য আছে এমন একটি অভিযোগে। আমি যে রিপোর্ট পড়েছি সেটা থেকে স্পষ্ট নয় যে, এটাই কি তার মুল অপরাধ ছিল নাকি নবীর নিজের নৈতিকতা নিয়ে তার কোন মন্তব্য যা তিনি করেছিলেন বলেও তাকে অভিযুক্ত করা হয়েছিল। যাই হোক, অন্য যে কোন দেশে, যাদের আইন ধর্মীয় গোড়ামী মুক্ত, সেখানে এধরনের কোন অপরাধের শাস্তি হিসাবে মৃত্যুদন্ড কল্পনা করা অসম্ভব।

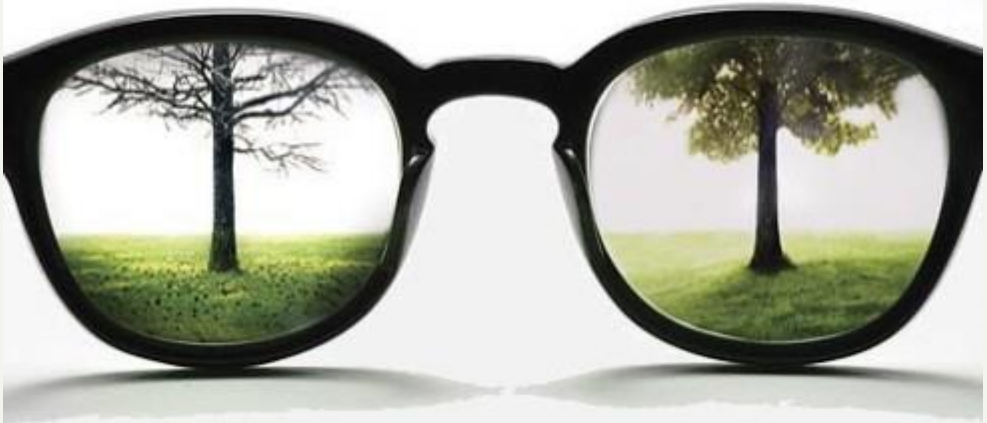

ছবি: ডিজাইন Henry Sene Yee, ফটোগ্রাফ: Jon Shireman| Steven Lukes এর বই Moral Relativism এর প্রচ্ছদ থেকে সম্পাদনা করে।

২০০৬ সালে আফগানিস্থানে, আব্দুল রহমান মৃত্যুদন্ডে দন্ডিত হন খৃষ্টান ধর্ম গ্রহন করার জন্য। কাউকে কি তিনি খুন করেছিলেন ? বা আহত করেছিলেন হিংস্র কোন উপায়ে, নাকি তিনি কোন কিছু চুরি বা ধ্বংশ করেছিলেন কিছু? নাহ, শুধুমাত্র একটি কাজই তিনি করেছিলেন: তিনি তার মন পরিবর্তন করেছিলেন, তার নিজের ভিতরে এবং ব্যক্তিগতভাবে তিনি তার মন পরিবর্তন করেছিলেন; তিনি কিছু ধারনা আর চিন্তা তার মনে পোষন করেছিলেন যা তার দেশের ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের পছন্দ হয়নি। এবং মনে রাখতে হবে এই আফগানিস্থান কিন্তু তালিবানদের আফগানিস্থান না বরং হামিদ কারজাই এর মুক্ত আফগানিস্থান, যুক্তরাষ্ট্রের নের্তৃত্বে যৌথ বাহিনী যে সরকারকে ক্ষমতায় বসিয়েছিল। জনাব রহমান মৃত্যুদন্ডের হাত থেকে রেহাই পেয়েছিলেন, তবে শুধুমাত্র আত্মরক্ষার

জন্য নিজেকে মানসিক ভারসাম্যহীন বলে দাবী করে এবং প্রবল আন্তর্জাতিক চাপের মুখে। গোড়া ইসলামী কর্তব্য পালন করতে অতিউৎসাহী গুন্ডাদের হাত থেকে নিজের প্রান বাচাতে বর্তমানে তিনি রাজনৈতিক আশ্রয়ে ইতালীতে। তালিবান শাসন মুক্ত করা আফগানিস্থানের সংবিধানের এটি এখনও একটি ধারা হিসাবে বিদ্যমান, ধর্মত্যাগের শাস্তি মৃত্যুদন্ড। অ্যাপোস্টেসি বা ধর্মত্যাগ, মনে রাখতে হবে, কিন্তু কোন ধরনের সত্যিকারের মানুষের উপর ঘটানো বা কোন সম্পদের ক্ষতি করা না। জর্জ অরওয়েল এর 1984 এর শব্দ ব্যবহার করে যদি বলি এটি বিশুদ্ধভাবে চিন্তা জগতের অপরাধ বা থটক্রাইম এবং ইসলামিক আইন অনুযায়ী এর শাস্তি মৃত্যুদন্ড। আরেকটি উদহারন, ১৯৯২ সালের ৩ সেপ্টেম্বর..সাদিক আব্দুল কারিম মালল্লাহ র ক্ষেত্রে যেমন মৃত্যুদন্ড কার্যকর হয়েছিল। আইনগতভাবে তাকে ধর্মনিন্দা এবং ধর্মত্যাগে দোষী সাব্যস্ত হবার পর, সৌদি আরবে জনসমক্ষে তাকে শিরোচ্ছেদ করা হয়।

আমি একবার টেলিভিশনে সম্প্রচারিত একটি বিতর্কে মুখোমুখি হয়েছিলাম স্যার ইকবাল সাকরানি র; যার কথা আমি প্রথম অধ্যায়ে উল্লেখ করেছিলাম, যাকে বলা হয় বৃটেনের নের্তৃত্বস্থানীয় মধ্যপন্থী মুসলিম। তাকে চ্যালেন্জ করেছিলাম ধর্মত্যাগ বা অ্যাপোস্ট্যাসির সাজা মৃত্যুদন্ড নিয়ে। তিনি খবু কসরত করে আমার প্রশ্নের পাশ কাটিয়ে যান প্রথাটি না স্বীকার করে বা এর বিরুদ্ধে কোন নিন্দা না জানিয়ে। তিনি বার বার মুল বিষয় থেকে সরে যাচ্ছিলেন, বিষয়টি গুরুত্বপুর্ণ কিছু না বলে। এই হচ্ছে সেই মানুষ যাকে বৃটিশ সরকার নাইট উপাধি দিয়েছিলে, আন্ত:বিশ্বাস সম্পর্ক উন্নয়নে গুরুত্বপুর্ণ ভুমিকা রাখার জন্য।

কিন্তু খৃষ্টান ধর্মেও কোন আত্মতুষ্টির জায়গা নেই। এই বৃটেনে প্রায় সাম্প্রতিক ১৯২২ সালে জন উইলিমার গোটকে নয় মাসের সশ্রম কারাদন্ডে দন্ডিত করা হয়েছিল ধর্মনিন্দা করার জন্য: তিনি জীসাসকে একটি ভাড় এর সাথে তুলনা করেছিলেন। প্রায় অবিশ্বাস্য যে এখনও বৃটেন এর আইনে ধর্মনিন্দার আইনটি বিদ্যমান। ২০০৫ সালে একটি খৃষ্টান গ্রুপ বিবিসি র বিরুদ্ধে এই ব্লাসফেমীর অভিযোগ আনার চেষ্টা করেছিল Jerry Springer, the Opera সম্প্রচার করার জন্য।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে যুক্তরাষ্টে ‘আমেরিকান তালিবান’ শব্দটি সৃষ্টি হবার অপেক্ষায় ছিল উদগ্রীবভাবে। দ্রুত আপনি গুগল সার্চ করলে দেখবেন কমপক্ষে এক ডজন ওয়েব সাইট তা করেছে। যুক্তরাষ্ট্রর ধর্মীয় নেতা, ধর্মবিশ্বাস নির্ভর রাজনীতিবিদদের যে পরিমান উদ্ধৃতি তারা সংগ্রহ করেছে তা ভয়াবহভাবে মনে করিয়ে দেয় আফগান তালিবান, আয়াতোল্লাহ খোমেনী এবং সৌদি আরবের ওয়াহাবী কর্তৃপক্ষর সংকীর্ণ মানসিকতা, নির্মম নৃশংসতা আর চুড়ান্ত কুৎসিত মনোভাবকে। ’দি আমেরিকান তালিবান’ নামে ওয়েব পেজটি বিশেষ ভাবে সমৃদ্ধ কুৎসিৎভাবে জঘন্য আর উন্মত্ত সব উদ্ধৃতিতে। যার শুরুতেই আছে সেরাটি যার উৎস অ্যান কোলটার নামে একজন; আমার সহকর্মীরা আমাকে বোঝাতে সক্ষম হয়েছে যা কোন গাজাখুরী বানানো মন্তব্য না, এটি আবিষ্কার করেছিল The Onion পত্রিকা: ’আমাদের উচিৎ অন্য দেশগুলোকে আক্রমন করে তাদের সব নেতাদের হত্যা করা ও তাদের খৃষ্ট ধর্মে রুপান্তরিত করা।”

এছাড়া এধরনের আরো কিছু অতুলনীয় মানসিকাপুর্ণ উদ্ধৃতির নমুনা হচ্ছে, যেমন কংগ্রেস সদস্য বব ডরনান বলেছিলেন: ’গে বা Gay শব্দটি ব্যবহার করবেন না যদি না সেটি Got AIDS Yet (বা এখনও এইডস হয়নি) বাক্যটির শব্দসংক্ষেপ না হয়।’ এছাড়া জেনারেল উইলিয়াম জি বয়কিনস বলেছিলেন, ”জর্জ বুশ যুক্তরাষ্ট্রের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটারদের দিয়ে নির্বাচিত হননি, তাকে নিয়োগ দিয়েছেন স্বয়ং ঈশ্বর।’ এছাড়াও আছে একটি পুরোনো বিখ্যাত রোন্যাল্ড রিগ্যান শাসনামলের পরিবেশ নীতির বিখ্যাত সেক্রেটারীর: ’আমাদের পরিবেশকে সুরক্ষা করার কোন দরকার নেই, খৃষ্টের দ্বিতীয় আগমন আসন্ন।’ আফগান তালিবান আর আমেরিকান তালিবান হচ্ছে উৎকৃষ্ট উদহারন কি ঘটে যখন মানুষ তাদের ধর্মগ্রন্থকে আক্ষরিক ভাবে এবং অতিরিক্ত গুরুত্বের সাথে প্রশ্নাতীতভাবে অনুসরণ করে। ওল্ড টেষ্টামেন্ট এর ধর্মতন্ত্রের অধীনে জীবন কত ভয়াবহ হতে পারে তার একটি আধুনিক সংস্করণ

দেখতে পাই আমরা এখানে। কিম্বার্লী ব্লেকার তার বই The Fundamentals of Extremism: The Christian Right in America তে খৃষ্টান তালিবানদের (যদিও এই নামে না) বিপজ্জনক রুপটার বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন।

________________________________ চলবে

** ((((মোরাল অ্যাবসোল্যুটিজম (Moral absolutism) বা চুড়ান্তবাদীতা একটি এথিকাল বা নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী, যা দাবী করে, কোন একটি কাজ হয় চুড়ান্তভাবে সঠিক অথবা চুড়ান্তভাবে ভুল, সেই কাজটি সম্পাদনের পেছনে যে উদ্দেশ্য, পরিস্থিতি বা তার পরিনাম যাই হোক না কেন। যেমন চুরি করা সবসময়ই অনৈতিক হিসাবে গন্য করা হবে এই দৃষ্টিভঙ্গীতে, এমন কি যদি সেই চুরি করা হয় কোন ক্ষুধার্ত পরিবারের জীবন বাচাতে। নরমেটিভ এথিকাল তত্ত্বগুলো যেমন, consequentialism, কনসিকোয়েনসাশিলম বা পরিণতিবাদ এর সাথে মোরাল অ্যাবসোল্যুটিজম অবস্থানটি খুবই ভিন্ন, consequentialism, যেমন দাবী করছে মোটা দাগে কোন কাজের নৈতিকতা নির্ভর করছে সেই কাজটি কোন পরিস্থিতিতে করা হয়েছিল এবং তার পরিনতি কি হয়েছিল। মোরাল অ্যাবসোল্যুটিজম এর সাথে moral universalism (যাকে moral objectivism ও বলা হয়ে থাকে) এর পার্থক্য আছে। moral universalism দাবী করছে কোন কাজটি ন্যায় এবং অন্যায় তা প্রথা বা মতামত থেকে স্বাধীন (যা ঠিক moral relativism বা নৈতিক আপেক্ষিকতাবাদের বীপরিত) তবে তাদের যে পরিস্থিতি বা পরিনতি থেকে স্বাধীন হতে হবে এমন আবশ্যিকতা নেই (যা Moral absolutism এর ক্ষেত্রে ঘটে থাকে); Moral universalism আবার moral absolutism এর সাথে সামনজষ্যপুর্ণ হতে পারে তবে সেটি মাঝে মাঝে consequentialism এর জায়গাও নিতে পারে। লুই পজম্যান এর সংজ্ঞায়: Moral absolutism হচ্ছে কমপক্ষে একটি মুলনীতি যা কখনোই লঙ্ঘন করা যাবে না, আর Moral objectivism হচ্ছে কোন একটি কাজের নৈতিকভাবে গ্রহনযোগ্যতার ব্যাপারে একটি বাস্তব সত্যর উপস্থিতি আছে: এই বাস্তব সত্যটি শুধুমাত্র সামাজিক প্রথা এবং ব্যক্তিগত গ্রহনযোগ্যতার উপর নির্ভর করে না; নৈতিক তত্ত্বগুলো অধিকার আর কর্তব্যর উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন, যেমন ইমানুয়েল কান্টের deontological ethics যা প্রায়শই Moral absolutism এর উদহারন, যেমন অসংখ্য ধর্মীয় নৈতিক নির্দেশগুলো Moral absolutism এর উদহারন))))))

রিচার্ড ডকিন্স এর দি গড ডিল্যুশন : অষ্টম অধ্যায় (তৃতীয় পর্ব)

By K M Hassan

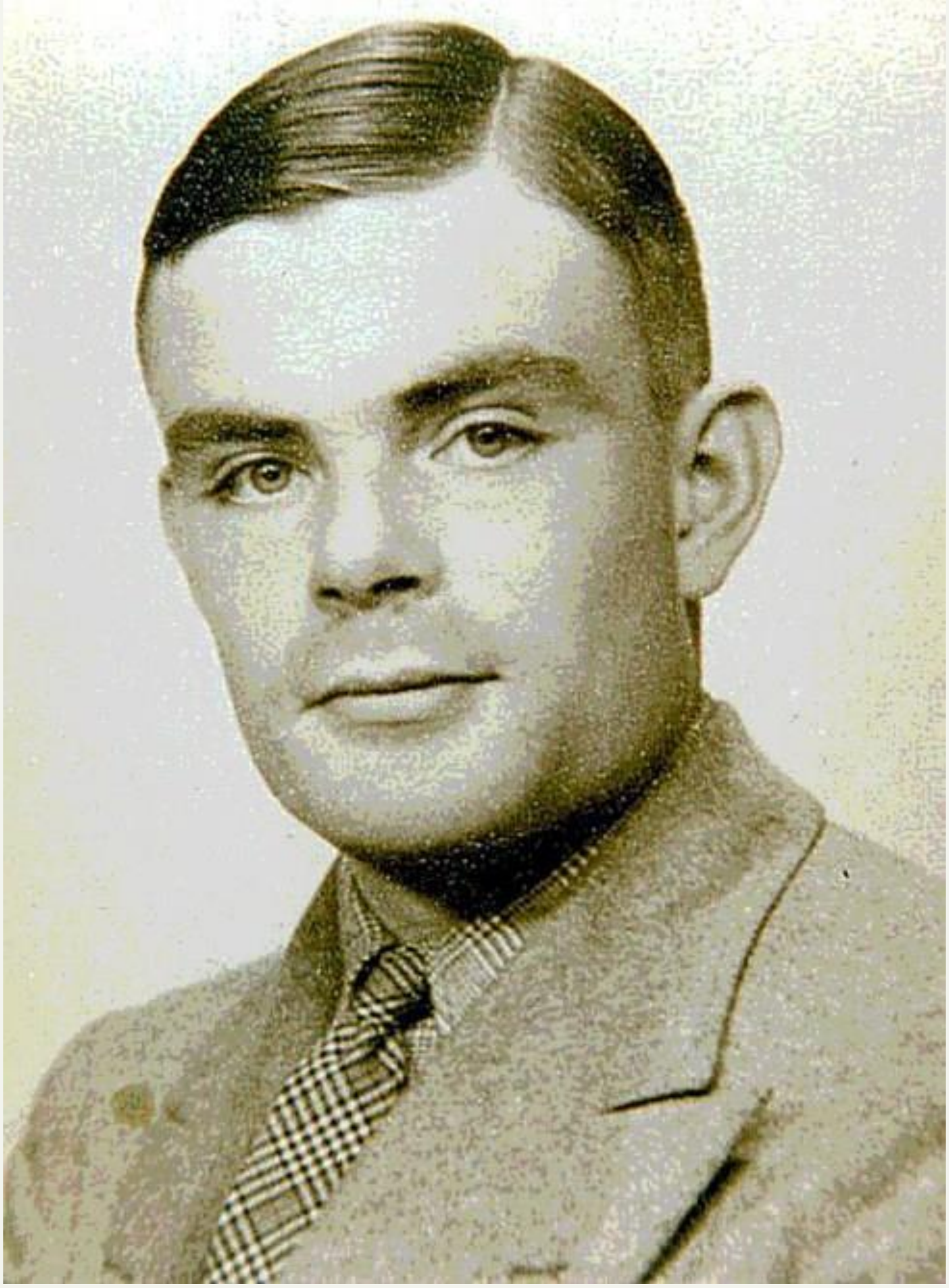

ছবি: অ্যালান টিউরিং (*Alan Mathison Turing*, 23 June 1912 – 7 June 1954), ১৯৫৪ সালে বৃটিশ গনিতজ্ঞ অ্যালান ট্যুরিং, জন ভন নিউমান এর সাথে যিনি কম্পিউটারের জনক হিসাবে স্বীকৃতি পাওয়ার দাবী রাখেন, আত্মহত্যা করেছিলেন তার ব্যাক্তিগত জীবনে সমকামীতার জন্য অভিযুক্ত হবার পর।

রিচার্ড ডকিন্স এর দি গড ডিলুশন : অষ্টম অধ্যায় (তৃতীয় পর্ব)
(অনুবাদ প্রচেষ্টা: কাজী মাহবুব হাসান)

The God Delusion by Richard Dawkins

প্রথম অধ্যায়
দ্বিতীয় অধ্যায়
তৃতীয় অধ্যায়
চতুর্থ অধ্যায় (প্রথম পর্ব) , চতুর্থ অধ্যায় (দ্বিতীয় পর্ব) ,
চতুর্থ অধ্যায় (তৃতীয় পর্ব) , চতুর্থ অধ্যায় (চতুর্থ পর্ব) , চতুর্থ অধ্যায় (শেষ পর্ব)
পঞ্চম অধ্যায় (প্রথম পর্ব), পঞ্চম অধ্যায় (দ্বিতীয় পর্ব) , পঞ্চম অধ্যায় (তৃতীয় পর্ব)
পঞ্চম অধ্যায় (চতুর্থ পর্ব) , পঞ্চম অধ্যায় (পঞ্চম পর্ব) ,পঞ্চম অধ্যায় (ষষ্ঠ পর্ব)
ষষ্ঠ অধ্যায় (প্রথম পর্ব) ; ষষ্ঠ অধ্যায় (দ্বিতীয় পর্ব); ষষ্ঠ অধ্যায় (শেষ পর্ব)
সপ্তম অধ্যায় (প্রথম পর্ব) ; সপ্তম অধ্যায় (দ্বিতীয় পর্ব) ; সপ্তম অধ্যায় (তৃতীয় পর্ব) ;
সপ্তম অধ্যায় (চতুর্থ পর্ব) ; সপ্তম অধ্যায় (শেষ পর্ব)
অষ্টম অধ্যায় (প্রথম পর্ব) ; অষ্টম অধ্যায় (দ্বিতীয় পর্ব)

ধর্মের সমস্যাটা আসলে কি? ধর্ম কেন এত হিংস্র ?

ধর্মবিশ্বাস এবং সমকামীতা:

তালিবানদের অধীনে আফগানিস্থানে সমকামিতার আইনী শাস্তির বিধান ছিল মৃত্যুদন্ড, তা কার্যকর করার জন্য তাদের রুচি অনুযায়ী যে পদ্ধতি তারা অনুসরন করতো তা হলো অভিযুক্তকে কোন একটা পাচিলের নীচে মাটিতে জীবন্ত কবর দিয়ে তার উপরে পাচিলটা ঠেলে ফেলে দেয়া। এই 'অপরাধটি' একান্তই ব্যক্তিগত একটি ব্যাপার, যা দুজন সম্মত প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে ঘটে যারা অন্য কারো কোন ক্ষতি করেনি, আমরা এখানে আবার দেখতে পাই ধর্মীয় চুড়ান্তবাদীতার একটি বৈশিষ্টসুচক উদহারণ। আমার নিজের দেশ ইংল্যান্ডও এক্ষেত্রে তাদের নাক উচু করার কোন অধিকার নেই। বিস্ময়করভাবে ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত ব্যক্তিগত জীবনে সমকামীতাকে চিহ্নিত করা হতো শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসাবে। ১৯৫৪ সালে বৃটিশ গনিতজ্ঞ অ্যালান ট্যুরিং, জন ভন নিউমান এর সাথে যিনি কম্পিউটারের জনক হিসাবে স্বীকৃতি পাওয়ার দাবী রাখেন, আত্মহত্যা করেছিলেন তার ব্যক্তিগত জীবনে সমকামীতার জন্য অভিযুক্ত হবার পর। স্বীকার করে নিচ্ছি যে ট্যুরিংকে কোন পাচীলের নীচে জীবন্ত কবর দিয়ে পাচিল চাপা দেয়া হয়নি ট্যাঙ্ক এর সাহায্যে। তবে তাকে দুটো বিকল্প দেয়া হয়েছিল, দুই বছরের কারাদন্ড (কল্পনা করা খুবই সহজ যে জেলখানায় অন্য কয়েদীরা তার সাথে কেমন ব্যবহার করতো) অথবা হরমোন ইনজেকশনের একটি কোর্স যাকে বলা যেতে পারে রাসায়নিক কাসট্রেশন এর সমান যা তার স্তনের আকারও বাড়াতো। তার সর্বশেষ এবং ব্যক্তিগত পছন্দ ছিল সায়ানাইড ইনজেক্ট করা একটি আপেল।

জার্মান সেনাবাহিনীর অত্যন্ত্য জটিল এনিগমা কোড এর রহস্য খুজে বের করার ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ভুমিকা পালনকারী এই বুদ্ধিজীবি, নাৎসীদের পরাজিত করার ক্ষেত্রে যিনি তর্কসাপেক্ষে আইসেন হাওয়ার এবং চার্চিলের চেয়ে বেশী অবদান রেখেছিলেন। ব্লেচলী পার্কে ট্যুরিং ও তার 'আল্ট্রা' সহকর্মীদের কল্যানে মিত্রবাহিনীর জেনারেলরা যারা যুদ্ধের মাঠে ছিলেন, তারা জার্মান পরিকল্পনার কথা জার্মান জেনারেলদের তা কার্যকর করার বহু আগে থেকে জানতে পেরেছিলেন তাদের পাঠানো সব এনিগমা কোডের বার্তার মর্মোদ্ধার করার মাধ্যমে। যুদ্ধের পর, ট্যুরিং এর দ্বায়িত্ব আর যখন অতি গোপনীয় ছিলনা, তাকে জাতির ত্রানকর্তা হিসাবে তাকে নাইটহুড দিয়ে সন্মানিত করার কথা উচিৎ ছিল। কিন্তু তার পরিবর্তে এই ভদ্র, অসাধারন প্রতিভাটিকে তার জাতি ধ্বংস করেছিল, একটা অপরাধের জন্য, যে তথাকথিত অপরাধ সংঘটিত হয়েছে ব্যাক্তিগতভাবে তার একান্ত জীবনে, কারো কোন ক্ষতি যে অপরাধে ঘটেনি। আবারো সেই নির্ভুল বৈশিষ্টমুলক চিহ্ন ধর্মবিশ্বাস ভিত্তিক নৈতিকতাবাদের, যেখানে একজন ধর্মবাদী অতি উৎসাহে অন্য মানুষরা তাদের ব্যক্তিগত জীবনে কি করছে (এমন কি কি চিন্তা করছে) তার নজরদারী করতে বাড়তি আগ্রহ প্রদর্শন করে থাকে।

আমেরিকার তালিবানদের' সমকামীতার প্রতি দৃষ্টিভঙ্গী ধর্মীয় চুড়ান্তবাদীতার শ্রেষ্টতম উদহারন। রেভারেন্ড জেরী ফালওয়েল এর কথা শুনুন, যিনি লিবার্টি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা: 'এইডস সমকামীদের জন্য শুধুমাত্র ঈশ্বরের শাস্তিই কেবল না, এটি সমকামিতা সহ্য করার জন্য পুরো সমাজেরও জন্য ঈশ্বর প্রদত্ত শাস্তি।' এধরনের মানুষের সম্বন্ধে আমার প্রথম যেটা নজরে আসে সেটা হলো তাদের বিস্ময়কর খৃষ্টিয় মহানুভবতা। কোন ধরনের একজন ভোটার আসলেই ধর্মীয় গোড়ামীতে পুর্ণ, কোন কিছু সম্বন্ধে সঠিক কোন জ্ঞান না থাকা এমন একজনকে সিনেটর, যেমন নর্থ ক্যারোলাইনার রিপাবলিকান জেসী হেমস কে নির্বাচিত করে যেতে পারে বছরের পর বছর? যে মানুষটা ব্যাঙ্গ করে বলেছিলেন, 'The New York Times আর Washington Post নিজেরাই আক্রান্ত সমকামীদের দ্বারা, সেখানে প্রায় প্রত্যেকেই সমকামী।' এর উত্তর আমার মনে হয়, তার ভোটারটা আসলেই সে ধরনের মানুষ যারা নৈতিকতাকে সংকীর্ণ ধর্মীয় দৃষ্টিকোন থেকেই দেখেন, এবং আর যারা তাদের মত একই চুড়ান্তবাদী বিশ্বাস ধারন করে না,তাদেরকে তারা হুমকি হিসাবে মনে করেন।

আমি এর আগে প্যাট রবার্টসনকে উদ্ধৃতি দিয়েছিলাম, যিনি ক্রিষ্চিয়ান কোয়ালিশনের প্রতিষ্ঠাতা। ১৯৮৮ সালে তিনি রিপাবলিকান দলের সম্ভাব্য প্রেসিডেন্ট পদে মনোনয়নে ক্ষেত্রে একজন সম্ভাব্য প্রার্থী ছিলেন এবং প্রায় ৩০ লক্ষ স্বেচ্ছাসেবককে তিনি তার প্রচারনার কাজে ব্যবহার করেছিলেন, সেই সাথে সমতুল্য পরিমান আর্থিক পৃষ্ঠপোষকতাও তার ছিল: কি পরিমান জনসমর্থন আছে এমন একজন মানুষের প্রতি যার স্বভাবসুলভ কিছু মন্তব্য যেমন: '(সমকামীরা) চার্চে আসতে চায় এবং চার্চ সার্ভিসকে ব্যহত করতে চায় চারিদিকে রক্ত ছড়িয়ে এবং মানুষকে এইডস এ আক্রান্ত করার মাধ্যমে এবং যাজকদের মুখে থুতু দেবার জন্য।' বা (প্লানড প্যারেন্টহুড) শিশুদের সেচ্ছাচারী যৌনকর্মে উদ্বুদ্ধ করছে, মানুষকে অবৈধ সম্পর্ক স্থাপন, সব ধরনের পশুকাম, সমকামিতা, ইত্যাদ নানা কাজে লিপ্ত হতে উৎসাহ দিচ্ছে –যার প্রত্যেকটি কাজ বাইবেল এ গর্হিত।' রবার্টসন এর নারীদের প্রতি মনোভাবও, আফগান তালিবানদের কৃষ্ণ হৃদয়ও উষ্ণ করবে: 'আমি জানি নারীদের এই কথা শুনতে খারাপ লাগবে কিন্তু যদি আপনারা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন, তাহলে অবশ্যই পুরুষের শ্রেষ্ঠত্ব, আপনার স্বামী, আপনাদের মেনে নিতে হবে। পুরো সংসারের মাথায় আছেন যীশুখৃষ্ট আর স্ত্রীর উপরে আছেন তার স্বামী এবং এটাই এভাবে হবে, আর কোন কথা নেই এর উপর।'

ক্যাথলিকস ফর ক্রিশ্চিয়ান পলিটিক্যাল অ্যাকশন এর সভাপতি গ্যারী পটার বলেন, 'যখন খৃষ্টান সংখ্যাগরিষ্ঠরা এই দেশের ক্ষমতা নেবে তখন আর কোন শয়তানের প্রার্থনা ঘর থাকবে না। আর কোন অবাধ পর্ণোগ্রাফির বিতরণ হবে না, সমকামীদের অধিকার নিয়ে আর কোন কথা নেই। খৃষ্টীয় সংখ্যাগরিষ্ঠরা ক্ষমতা দখলের পর, বহুজাতিবাদ বা প্লুরালিজমকে দেখা হবে অনৈতিক এবং অশুভ হিসাবে এবং রাষ্ট্র এমন কাউকে কোন ধরনের 'অশুভ'কাজ করার অনুমতি দেবে না। এই উদ্ধৃতি থেকে খুব পরিষ্কার এই অশুভ কাজ এর অর্থ এই না যে এমন কিছু করা, যা অন্য মানুষর উপর কোন খারাপ প্রভাব ফেলতে পারে,এটি বোঝাচ্ছে ব্যক্তিগত চিন্তা এবং কাজ যা তথাকথিত খৃষ্ঠীয় সংখ্যাগরিষ্ঠদের মনের মত না।

ওয়েষ্টবোরো ব্যাপ্টিষ্ট চার্চের যাজক ফ্রেড ফেল্পস আরেকজন, যিনি খুবই তীব্রভাবে সমকামী বিরোধী, যখন মার্টিন লুথার কিং এর বিধবা পত্নী মারা যান, তার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সময় পাষ্টর ফ্রেড একটি সমাবেশ এর আয়োজন করে সেখানে তার ব্যানারে লেখা ছিল, 'ঈশ্বর সমকামীদের ও সমকামী সমর্থকদের ঘৃণা করে, সুতরাং ঈশ্বর করেটা স্কট কিং কেও ঘৃণা করেন এবং এখন তিনি তাকে নরকের আগুনে পোড়াচ্ছেন, যেখানে আগুন কখনো নেভে না এবং তার দগ্ধ হবার যন্ত্রণার ধোয়া উপরে উঠে আসবে অনবরতকাল।' ফ্রেড ফেল্পকে পাগল বলে পাত্তা না দেয়া খুব সহজ, কিন্তু তার আছে প্রচুর মানুষের সমর্থন, যারা সম্পদশালী। তার নিজের ওয়েবসাইট অনুযায়ী ফেল্প ১৯৯১ সাল থেকে মোট ২০০০০ সমকামী বিরোধী সমাবেশের আয়োজন করেছেন যুক্তরাষ্টও,কানাডা, জর্ডান এবং ইরাক (হিসাবে প্রায় গড়ে প্রতি চারদিনে একটি), যেখানে তার ছাপানো স্লোগানের মধ্যে অন্যতম 'THANK GOD FOR AIDS'; তার ওয়েবসাইটের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট হচ্ছে একটি হিসাব বা টালি, যা কোন বিশেষ একজন সমকামী

মারা গেলে কত দিন সে নরকের আগুনে পুড়ছে সেই দিন সংখ্যা প্রদর্শন করে। সমকামীতার প্রতি মানসিকতা ধর্ম অনুপ্রানিত নৈতিকতার অনেককিছুই স্পষ্ট করে দেয়, সেই একই রকম নৈতিকতা আমরা দেখি গর্ভপাত ও মানুষের জীবনে পবিত্রতা বিষয়ক কিছু উদহারনে;

রিচার্ড ডকিন্স এর দি গড ডিল্যুশন : অষ্টম অধ্যায় (চতুর্থ পর্ব)

By K M Hassan

ছবি: Jon Krause এর একটি ইলাসট্রেশন, Pro Choice:Reproductive rights

রিচার্ড ডকিন্স এর দি গড ডিল্যুশন : অষ্টম অধ্যায় (চতুর্থ পর্ব)
(অনুবাদ প্রচেষ্টা: কাজী মাহবুব হাসান)

The God Delusion by Richard Dawkins

প্রথম অধ্যায়
দ্বিতীয় অধ্যায়
তৃতীয় অধ্যায়
চতুর্থ অধ্যায় (প্রথম পর্ব), চতুর্থ অধ্যায় (দ্বিতীয় পর্ব),
চতুর্থ অধ্যায় (তৃতীয় পর্ব), চতুর্থ অধ্যায় (চতুর্থ পর্ব), চতুর্থ অধ্যায় (শেষ পর্ব)
পঞ্চম অধ্যায় (প্রথম পর্ব), পঞ্চম অধ্যায় (দ্বিতীয় পর্ব), পঞ্চম অধ্যায় (তৃতীয় পর্ব)
পঞ্চম অধ্যায় (চতুর্থ পর্ব), পঞ্চম অধ্যায় (পঞ্চম পর্ব), পঞ্চম অধ্যায় (ষষ্ঠ পর্ব)
ষষ্ঠ অধ্যায় (প্রথম পর্ব); ষষ্ঠ অধ্যায় (দ্বিতীয় পর্ব); ষষ্ঠ অধ্যায় (শেষ পর্ব)
সপ্তম অধ্যায় (প্রথম পর্ব); সপ্তম অধ্যায় (দ্বিতীয় পর্ব); সপ্তম অধ্যায় (তৃতীয় পর্ব);
সপ্তম অধ্যায় (চতুর্থ পর্ব); সপ্তম অধ্যায় (শেষ পর্ব)
অষ্টম অধ্যায় (প্রথম পর্ব); অষ্টম অধ্যায় (দ্বিতীয় পর্ব); অষ্টম অধ্যায় (তৃতীয় পর্ব)

ধর্মের সমস্যাটা আসলে কি? ধর্ম কেন এত হিংস্র ?

ধর্মবিশ্বাস এবং মানব জীবনের পবিত্রতা

মানব ভ্রুণ মানব জীবনেরই একটি উদহারণ। সুতরাং চুড়ান্তবাদী ধর্মীয় আলোকে গর্ভপাত হচ্ছে প্রশ্নাতীতভাবে গর্হিত একটি কাজ: পুরোদস্তুরভাবে একটি হত্যাকান্ড। আমি ঠিক নিশ্চিৎ না, বিষয়টি আমি কিভাবে ব্যাখ্যা করবো, আমার নিজস্ব এবং সংগৃহীত কিছু পর্যবেক্ষন হচ্ছে অনেকেই যারা ভ্রুণহত্যার বিরুদ্ধে তীব্রভাবে প্রতিবাদ করে থাকেন , সাধারনত দেখা যায় পুর্ণবয়স্ক কোন মানুষ হত্যা করার ব্যাপারে আবার তাদের উৎসাহের কোন ঘাটতি নেই। নিরপেক্ষভাবে বলতে হলে নিয়মানুযায়ী এটি রোমান ক্যাথলিকদের জন্য আবার প্রযোজ্য নয়, গর্ভপাতের বিরুদ্ধে সবচেয়ে যারা উচ্চকন্ঠ ও প্রতিবাদমুখর; নব্য গোড়া খৃষ্টান জর্জ ডাবলিউ বুশ যদিও আজকের সময়ে ধর্মীয় প্রভাবশালী অবস্থানের একটি বৈশিষ্টসুচক উদহারন; তিনি এবং তারা, মানব জীবন রক্ষা করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ যতক্ষন না পর্যন্ত এটি কোন ভ্রুণ (বা দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে এমন জীবন); এমন কি সেটা করার প্রচেষ্টায় তারা চিকিৎসা বিজ্ঞানের গবেষনাকে বাধা দিতেও সর্বদা প্রস্তুত, অন্যথায় যে গবেষনা হয়তো নিশ্চয়ই বহু মানুষের জীবন বাচাতে পারতো। মৃত্যুদন্ডের বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট অবস্থানের কারন কারো কারো কাছে অবশ্যই মানব জীবনের প্রতি সন্মান। ১৯৭৬ সাল থেকে যখন যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রীম কোর্ট মৃত্যুদন্ডের উপর প্রদত্ত নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে নেয়, টেক্সাস মোট ৫০ টি রাজ্যের প্রদত্ত মোট মৃত্যুদন্ডের এক তৃতীয়াংশ কার্যকর করেছিল; এবং সেই রাজ্যের ইতিহাসে অন্য যে কোন গভর্ণরের চেয়ে জর্জ বুশই সবচেয়ে বেশী মৃতুদন্ডের আদেশে সই করেছিলেন, গড়ে প্রায় প্রতি ৯ দিনে ১ টি। হয়তো তিনি শুধু তার দ্বায়িত্ব পালন করেছিলেন, তার রাজ্যের আইন অনুযায়ী কাজ করেছিলেন? কিন্তু CNN এর সাংবাদিক টাকার কার্লসন এর সেই বিখ্যাত রিপোর্টের কি অর্থ করতে পারি তাহলে? কার্লসন, যিনি নিজে মৃত্যুদন্ডের সমর্থক, হতবাক হয়েছিলেন গভর্ণরের কাছে মৃত্যুদন্ডপ্রাপ্ত একজন নারী বন্দীর প্রান ভিক্ষা করার বুশের পরিহাসমুলক অনুকরণ করা দেখে। ‘দয়া করুন’ বুশ নাকি সুরে কেদে তার ঠোট মিথ্যা হতাশার কষ্টে সরু করে বলেন, ’আমাকে হত্যা করবেন না।’ হয়তো এই নারী খানিকটা বেশী সহমর্মিতা পেতেন যদি তিনি মনে করিয়ে দিতেন কোন না কোন একসময় তিনিও ভ্রুণ ছিলেন। ভ্রুণ নিয়ে ভাবনা আসলেই ধর্মবিশ্বাসী বহু মানুষের মনেই খুব অদ্ভুত প্রভাব ফেলে। কলকাতার মাদার তেরিজা শান্তির জন্য নোবেল পুরষ্কার গ্রহন করার সময় তার ভাষনে মন্তব্য করেন: ’শান্তির সবচেয়ে বড় বিনাশকারী হচ্ছে গর্ভপাত ‘ কি ? এরকম উদ্ভট চিন্তা করা কোন মহিলার অন্য যে কোন বিষয়ের মতামতকে গুরুত্বের সাথে নেয়া কি আদৌ সম্ভব, শান্তিতে নোবেল প্রাইজ পাবার মত কোন যোগ্যতা তার আছে কিনা সেটা না হয় বাদই দিলাম? যদি কারো

পবিত্রভাবে ভন্ডামীপুর্ণ মাদার তেরিজার কথায় মন গলে যাবার সম্ভাবনা আছে, তাদের ক্রিষ্টোফার হিচেন্স এর The Missionary Position: Mother Teresa in Theory and Practice বইটি অবশ্যই পড়ে দেখা উচিৎ।

আমেরিকার তালিবানের প্রসঙ্গে ফিরে আসি আবার, এবার রানডাল টেরীর কথা শুনুন, যিনি অপারেশন রেসক্যু'র প্রতিষ্ঠাতা, যে প্রতিষ্ঠানটি নারীদের গর্ভপাতের সেবা যারা দেয়, তাদের ভয় ভীতি দেখায়, ‘ যখন আমি বা আমার মত কেউ, এই দেশ চালাবে, তখন আপনাদের জন্যে এ দেশ ছেড়ে পালানোই উত্তম হবে, কারন আমরা আপনাদের খুজে বের করবো, বিচার করবো এবং মৃত্যুদন্ড দেবো, আর আমি আমার প্রত্যেকটি কথা সত্যি করে বলছি; তাদের বিচার ও মৃত্যুদন্ড যেন নিশ্চিৎ হয় সেটা আমি আমার মিশনের একটি অংশ করে নেব।’ টেরী এখানে সেই সব চিকিৎসকদের কথা বলছেন, যারা গর্ভপাতের সেবা প্রদান করেন। এবং তার খৃষ্টীয় মনোভাব ও অনুপ্রেরণা তার এই বক্তব্যেই সুস্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে।

’আমি চাই আপনারা আপনাদের উপর দিয়ে অসহিষ্ণুতার স্রোত প্রবাহিত হতে দিন, হ্যা..ঘৃনা উত্তম, আমাদের লক্ষ্য একটি খৃষ্টীয় জাতি; আমাদের বাইবেল নির্দেশিত কিছু কর্তব্য আছে, ঈশ্বর আমাদের আহবান করেছেন এই দেশটি জয় করে নিতে। আমরা বহুজাতি আর বহুমতবাদ চাইনা, আমাদের লক্ষ্য খুব সাধারন। আমাদের ঈশ্বরের আইন, টেন কম্যান্ডমেন্ট মোতাবেক একটি খৃষ্টীয় জাতি বানাতে হবে, কোন ক্ষমাপ্রার্থনা না আর।’

এরকম একটি খৃষ্টীয় ফ্যাসিবাদী রাষ্ট্র অর্জন করার আকাঙ্খা পুরোপুরিভাবে আমেরিকান তালিবানদের বৈশিষ্ট। পৃথিবীর অন্য প্রান্তে ফ্যাসিবাদী ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য তীব্র কামনা করা অন্য মানুষগুলোর প্রায় হুবুহ প্রতিলিপি। এখনও রানডাল টেরী ক্ষমতায় আসীন হতে পারেননি। এই লেখার সময় (২০০৬) আমেরিকার রাজনৈতিক দৃশ্যপট পর্যবেক্ষনকারী এমন কেউই ততটা আত্মবিশ্বাসী হয়ে সে কথা বলতে পারেননি ।

কোন একজন পরিনামবাদী (consequentialist) বা উপযোগিতাবাদী (utilitarian) সম্ভবত গর্ভপাতের ব্যাপারটা খুবই ভিন্ন ভাবে দেখবেন, ফলাফল বা কাজটির পরিনাম ও এবং এর সৃষ্ট কষ্টকে ওজন করার মাধ্যমে। ভ্রুণ কি কোন কষ্ট অনুভব করতে পারে? (সম্ভবত না যদি এর গর্ভপাত করে ফেলা হয়, স্নায়ুতন্ত্র আবির্ভাবের আগেই, এবং এমন কি যদি ভ্রুণের বয়স এমনও হয় যে তার স্নায়ুতন্ত্র আছে, সেক্ষেত্রেও এটি নিশ্চিৎভাবে কম কষ্ট সহ্য করবে, যেমন ধরুন একটি কসাইখানায় একটি পুর্ণবয়স্ক গরু যে কষ্ট সহ্য করে) ; গর্ভবতী রমনী বা তার পরিবার কি কষ্ট সহ্য করতে পারে, যদি সেই গর্ভপাতটি না করা হয়? খুবই সম্ভাবনা আছে সেটি হবার; এবং যাই হোক না কেন, যেহেতু ভ্রুণের কোন স্নায়ুতন্ত্র থাকে না, সেক্ষেত্রে মায়ের পুর্ণগঠিত স্নায়ুতন্ত্রকে কি আমাদের বেশী গুরুত্ব দেয়া উচিৎ না এখানে?

এখানে অস্বীকার করা হচ্ছে না যে পরিনতিবাদীদের হয়তো নানা কারন থাকতে পারে গর্ভপাতের বিরোধিতা করার জন্য। ’পিচ্ছিল ঢালু’ যুক্তি ব্যবহার করতে পারেন পরিনতিবাদীরা (যদিও আমি এই ক্ষেত্রে তা করতাম না) ; হয়তো ভ্রুণরা কোন কষ্ট পায় না, কিন্তু যে সংস্কৃতি মানুষের জীবন কেড়ে নেয়াকে সহ্য করে, তার অন্য ভয়ঙ্কর পরিনতির মুখোমুখি হবার ঝুকি থাকে: কোথায় সেটা শেষ হবে? শিশুহত্যায়? জন্মাবার মুহুর্তটাই যদি এই নিয়মগুলোকে সংজ্ঞায়িত করতে একটি প্রাকৃতিক রুবিকন বা চুড়ান্ত সীমারেখা নির্দেশ করে এবং যুক্তি দেয়া যেতে পারে ভ্রুন ক্রমবিকাশের শুরুর দিকে ঠিক এই সীমানার মত আগের কোন সীমারেখা নির্দেশ করা কোন পর্যায় খুজে বের করা কঠিন। এই ’পিচ্ছিল ঢালু’ যুক্তি তাই আমাদের সংকীর্ণভাবে ব্যাখ্যা দেয়া উপযোগিতাবাদের চেয়ে হয়তো বেশী জন্মমুহুর্তকে নির্দিষ্ট করে দেয় অপেক্ষাকৃত বেশী গুরুত্ব দেয়ার জন্য।

ইচ্ছামৃত্যু বা ইউথানাসিয়া র বিরুদ্ধে যুক্তিও এধরনে পিচ্ছিল বক্তব্যের উপর দাড়িয়ে। আমরা একটি কাল্পনিক উদ্ধৃতি আবিষ্কার করি নৈতিকতাবাদের একজন দার্শনিকের কাছ থেকে: ’আপনি যদি ডাক্তারদের জীবনের প্রান্তসীমায় উপস্থিত এমন রোগীদের যন্ত্রনা থেকে মুক্তি দেবার অনুমতি দেন, তাহলে দেখা যাবে প্রত্যেকে তাদের মাতামহদের

হত্যা করার ফন্দি আটবে টাকা পাওয়ার জন্য; আমরা দার্শনিকরা হয়তো চুড়ান্তবাদিতা থেকে মুক্ত হতে পেরেছি, কিন্তু সমাজের কিছু চুড়ান্ত নীতি দরকার শৃঙ্খলার প্রয়োজনেই, যেমন ’তোমরা হত্যা করবে না,’ নতুবা আমরা কোথায় থামবো তার কোন নিশানা থাকবে না। কোন কোন পরিস্থিতিতে চুড়ান্তবাদীতা হয়তো, অপেক্ষাকৃত কম আদর্শ পৃথিবীতে অবশ্যই সব ভুল কারনগুলোর জন্যই একেবারে অবুঝ নিরীহ পরিনতিবাদের চেয়ে অপেক্ষাকৃত ভালো পরিনতি প্রদান করে ! আমাদের দার্শনিকদের হয়তো বেশ ভোগান্তি পোহাতে হতো, বেওয়ারিশ মৃত কোন ব্যাক্তিকে, যেমন যাদের জন্য কেউ শোক করার নেই, রাস্তায় মরে পড়ে থাকা এমন কোন নরমাংস খাওয়া নিষিদ্ধ করার জন্য; কিন্তু ’পিচ্ছিল ঢালু’র সেই যুক্তি অনুযায়ী নরমাংস ভোজনের প্রতি নৈতিকতাবাদী চুড়ান্তবাদী প্রতিষিদ্ধ অত্যন্ত মুল্যবান যা আমাদের হারানো ঠিক হবে না।’

’পিচ্ছিল ঢালু’ এই যুক্তি হয়তো দেখা যেতে পারে যেখানে পরিনতিবাদীরা একধরনের পরোক্ষ চুড়ান্তবাদীতা পুণঃআমদানী করেছে, কিন্তু গর্ভপাতের বিরুদ্ধে ধর্মীয় শত্রুরা এই সব ’পিচ্ছিল ঢালু’ যুক্তির কোন তোয়াক্কা করে না। তাদের জন্য বিষয়টা আরো সরল; যে কোন একটি ভ্রুণই হচ্ছে একটি শিশু, একে মারা মানেই হত্যা, ব্যাস আর কোন কথা নেই, আলোচনা খতম। কিন্তু এই চরমপন্থী অবস্থান থেকে পরবর্তী অনেক কিছুরই উৎস। তাদের দাবী, শুরুতেই বলা যায় যেমন এমব্রায়োনিক (ভ্রুণাতাত্বিক) স্টেম সেল গবেষনা অবশ্যই বন্ধ করতে হবে, কারন এর ভ্রুণ কোষের মৃত্যুর কথা জড়িত, যদিও চিকিৎসা বিজ্ঞানে এর ভুমিকা অপরিসীম হবারই সম্ভাবনা। অসঙ্গতিটা স্পষ্ট হয়, যখন আপনি চিন্তা করবেন, যে সমাজ ইতিমধ্যেই শরীরের বাইরে ল্যাবরেটরীতে ডিম্বানু নিষিক্তকরণ বা আইভিএফ (IVF) বা (in vitro fertilization) মেনে নিয়েছে, যেখানে ডাক্তাররা নিয়মিতভাবেই নারীদের ডিম্বাশয়কে হরমোনের মাধ্যমে উত্তেজিত করে বাড়তি ডিম্বানু তৈরী করার জন্য, যাদের শরীরের বাইরে নিষিক্ত করা হয়। এই পক্রিয়ায় এমনকি এক ডজন কার্যকর জাইগোট তৈরী করা সম্ভব। যার মধ্যে দুটি বা তিনটিকে হয়তো জরায়ুতে স্থাপন করা হয়। আশা করা হয় এখান থেকে একটি অথবা সম্ভবত দুটি বেচে যাবে। সুতরাং আইভিএফ (IVF) সম্ভাব্য ভ্রুণকে এই পক্রিয়ার দুটি ধাপে হত্যা করে এবং স্বাভাবিক ভাবে সমাজে কিন্তু এ বিষয়ে কোন দ্বিমত নেই। পচিশ বছর ধরে, আইভিএফ (IVF) একটি মানসম্পন্ন প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে অনেক সন্তানহীন দম্পতি তাদের জীবনে আনন্দ খুজে পেয়েছেন।

যদিও ধর্মীয় চরমপন্থীদের আইভিএফ নিয়েও সমস্যা থাকতে পারে। ২০০৫ এ গার্ডিয়ান প্রত্রিকার ৩ জুন সংখ্যায় একটা অদ্ভুত গল্প ছিল ‘Christian couples answer call to save embryos left by IVF’ শিরোনামে; গল্পটি একটি সংস্থা যার নাম Snowflakes যারা আইভিএফ ক্লিনিক থেকে বাড়তি ডিম্বানুগুলো রক্ষা করার চেষ্টা করছে বলে দাবী করছে: ওয়াশিংটন স্টেট এর একটি নারীর মন্তব্য করেন, ‘আমরা সত্যি অনুভব করেছি যে, ঈশ্বর আমাদের দায়িত্ব দিয়েছেন এই সব ভ্রুণগুলোকে –এইসব জন্ম না নেয়া শিশুদের যেন আমরা একটি বাচার সুযোগ দেই।’ যার চতুর্থ সন্তানের জন্ম হয়েছে ‘গোড়া খৃষ্ঠানদের এই টেষ্টটিউব শিশুদের জগতের সাথে অপ্রত্যাশিত যোগসুত্রতার ফসল’ হিসাবে। এই সম্পর্কের ব্যাপারে চিন্তিত মহিলার স্বামী চার্চের মুরুব্বীদের সাথে কথা বললে তারা জানান, ’আপনি যদি ক্রীতদাসদের মুক্ত করতে চান,তাহলে ক্রিতদাসের ব্যবসায়ীদের সাথে আপনাদের বাণিজ্য করতে হবে।’ আমি ভাবছি এই মানুষগুলো কি বলতো যদি তারা জানতো যে বেশীর ভাগ নিষিক্ত ভ্রুণই স্বতস্ফুর্তভাবে গর্ভপাত হয়ে যায়। সম্ভবত এটাকে দেখা যেতে পারে একটি প্রাকৃতিক ’মান নিয়ন্ত্রন’ প্রক্রিয়া হিসাবে।

একটি বিশেষ ধরনের ধার্মিক মনই শুধু একগুচ্ছ আনুবীক্ষনিক কোষ হত্যা করার সাথে একজন পুর্ণবয়স্ক ডাক্তারকে হত্যা করার মধ্যে কোন পার্থক্য খুজে পায়না। আমি এর আগেই রানডাল টেরীর উদ্ধৃতি এবং অপারেশন রেসক্যু র কথা উল্লেখ করেছি; মার্ক জুয়ের্গেনসমায়ার, তার শিহরণ জাগানো বই Terror in the Mind of God এ রেভারেন্ড মাইকেল ব্রে এবং তার বন্ধু রেভারেন্ড পল হিল এর একটি ফটোগ্রাফ প্রকাশ করেছিল, সেখান তাদের হাতে ছিল একটি ব্যানার, যা বলছে, ‘নিষ্পাপ শিশুদের হত্যা করা থেকে রক্ষা করাটি ভুল?’ তাদের দুজনকে দেখতে ভালোই লাগছিল, বেশ কেতাদুরস্ত দুই তরুন, মুখে হাসি, পরণে সাদামাটা তবে ভালো পোষাক, যা পুরোপুরি

ব্যতিক্রম কোন নিষ্পলক তাকিয়ে থাকা কোন উন্মাদের তুলনায়। তারপরও তারা এবং তাদের ‘আর্মি অব গডে’র বন্ধুরা নানা অ্যাবরশন ক্লিনিকে আগুন লাগিয়ে বেড়াতেন নিয়মিত, এবং গর্ভপাতের সাথে জড়িত ডাক্তারদের খুন করার ইচ্ছা তারা কখনোই গোপন করেননি। ১৯৯৪ সালে ২৯ জুলাই ফ্লোরিডার পেন্সাকলায় ক্লিনিকের সামনে পল হিল শট গানের গুলিতে হত্যা করেন ডা: জন ব্রিটন এবং তার দেহরক্ষী জেমস ব্যারেটকে; এরপর তিনি আত্মসমর্পন করেন এবং পুলিশকে বলেন যে, তিনি ডাক্তারকে হত্যা করেছেন ভবিষ্যতের অনাগত সব ‘নিষ্পাপ শিশু’দের হত্যাকান্ড থেকে বাঁচাতে।

মাইকেল ব্রে এধরনের হত্যাকান্ডকে সমর্থন করেছেন বেশ গোছানো ভাষায় যেখানে তার নৈতিক অবস্থানের শ্রেষ্ঠত্ব দাবী করার বিষয়টি স্পষ্ট ছিল, যা আমিও খুজে পেয়েছি, যখন ধর্ম নিয়ে একটি টেলিভিশন প্রামান্য চিত্রর জন্য কলোরাডো স্প্রিং এর একটি পার্কে আমি তার সাক্ষাৎকার নিয়েছিলাম ((প্রানী মুক্তিবাদীরাও, যারা প্রানীদের নিয়ে কাজ করা মেডিকেল গবেষকদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসের হুমকি দিয়ে থাকেন, তারাও এমন একটি সুউচ্চ নৈতিক অবস্থানে আসীন আছেন বলে দাবী করে থাকেস)); গর্ভপাতের বিষয়টিতে আসার আগে ব্রে’র বাইবেল ভিত্তিক নৈতিকতার পরিমাপটি আমি বোঝার চেষ্টা করেছিলাম কিছু প্রাথমিক প্রশ্ন করে, যেমন আমি উল্লেখ করেছিলাম যে বাইবেল এর আইন ব্যাভিচারের শাস্তি দেয় পাথর ছুড়ে মৃত্যুদন্ড দেবার মাধ্যমে। আমি আশা করেছিলাম এই বিশেষ উদহারনটি তিনি অস্বীকার করবেন অগ্রহনযোগ্য বলে, কিন্তু তিনি আমাকে অবাক করেছিলেন। আনন্দের সাথে একমত হয়ে বলেন, যথাযথ আইনী প্রক্রিয়ার পর ব্যাভিচারীদের মৃত্যুদন্ড দেয়া উচিত। আমি তারপর তাকে বললাম যে পল হিল, ব্রের পুর্ণ সমর্থন সহ আইনী প্রক্রিয়া কিন্তু মেনে চলেননি এবং তার নিজের হাতেই আইন তুলে নিয়েছিলেন এবং ডাক্তারকে হত্যা করেছিলেন। ব্রে তার সহকর্মী যাজককে পুর্ণ সমর্থন দিলেন আগেও যেমন করেছিলেন যখস জুয়েরগেনমায়ার্স তার সাক্ষাৎকার নিয়েছিলেন, তিনি উচিৎ শাস্তি হিসাবে একজন অবসরপ্রাপ্ত ডাক্তার আর এখনও কর্মরত একজন ডাক্তারকে হত্যা করার পার্থক্য ব্যাখ্যা করেছিলেন, তার মতে পরের ক্ষেত্রে এটি একটি নিশ্চিৎ উপায় কোন কর্মরত ডাক্তারকে নিয়মিত শিশু হত্যা থেকে বিরত রাখার ক্ষেত্রে। এরপর আমি তাকে বলি, যদিও কোন সন্দেহ নেই পল হিলের বিশ্বাস আন্তরিক কিন্তু সবাই যদি ব্যক্তিগত বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে সমাজে বিদ্যমান আইন না মেনে তাদের নিজেদের হাতে আইন তুলে নেয় তাহলে অবশ্যই সমাজে নৈরাজ্য নেমে আসবে । সেক্ষেত্রে সঠিক উপায়টি কি গনতান্ত্রিকভাবে আইনটি পরিবর্তন করার চেষ্টা করা না ? এই প্রশ্নের প্রত্যুত্তরে ব্রে বলেন: বেশ, এটাই সমস্যা যখন আমরা যে আইন দেখছি সেগুলোতো সত্যিকারের আইন না, বিশেষ করে যখন আইন হয় মানুষের তৈরী তাৎক্ষনিকভাবে, খামখেয়ালীভাবে, যেমনটা আমরা দেখি তথাকথিত গর্ভপাত অধিকারের আইন, যা বিচারকরা জনগনের উপর চাপিয়ে দিয়েছে। এরপর আমরা যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান এবং আইন কোথা থেকে আসে তা নিয়ে বিতর্ক করেছিলাম; এসব বিষয়ে ব্রে’র দৃষ্টিভঙ্গী অনেকটাই জঙ্গী মুসলিমদের মতই, যারা কিনা বৃটেনে বসবাস করে সদম্ভে ঘোষনা দেয় তারা শুধু শরীয়া আইনই স্বীকার করবে, গনতান্ত্রিকভাবে সৃষ্ট আইন না, যা তারা যে দেশে বসবাস করতে এসেছে সেই দেশের আইনের মুল ভিত্তি।

ডা: ব্রিটন এবং তার দেহরক্ষীকে হত্যা করার জন্য ২০০৩ সালে পল হিল এর মৃত্যুদন্ড কার্যকর হয়, তিনি তার মৃত্যুর আগে আবারো বলেন, তার যদি আবার জন্ম হয় তিনি একই কাজ করবেন অনাগত শিশুদের রক্ষা করার জন্য। অত্যন্ত আশবাদী হয়ে তিনি অপেক্ষা করেছিলেন তার বিশ্বাস এর জন্য জীবন দিতে। সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন, ‘আমি বিশ্বাস করি আমাকে মৃত্যুদন্ড দেবার মাধ্যমে রাষ্ট্র আমাকে শহীদের মর্যাদা দেবে।‘ ডানপন্থী গর্ভপাত বিরোধীরা তার মৃত্যুদন্ডের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, বিক্ষোভ করেছিলেন। যার সাথে যোগ দেয় মৃত্যুদন্ড বিরোধী একটি অশুভ অপবিত্র বামপন্থী জোটের সাথে যারাতৎকালীন ফ্লোরিডার গভর্ণর জেব বুশকে আহবান করেন, পল হিলকে শহীদ না বানাতে। তারা তাদের যুক্তির পক্ষে প্রস্তাব করেন, বিচারিক প্রক্রিয়ায় পল হিলকে হত্যা করলে আসলে আরো বেশী হত্যাকান্ডকে উৎসাহ দেয়া হবে, যদি মনে করা হয় মৃত্যুদন্ড এধরনের অপরাধ নিরুৎসাহিত করবে তাহলে এধরনের মৃতুদন্ডে ঠিক তার বিপরীত প্রতিক্রিয়াই ঘটবে। হিল নিজেই হাসি মুখে মৃতুদন্ড কার্যকর হবার কক্ষে গিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন, ’আমি স্বর্গে অনেক পুরষ্কার পাবো, আমার তার অপেক্ষা করছি’ এবং তিনি প্রস্তাব

করেন অন্যরা যেন তার হিংস্র কাজটি কাজটি অব্যাহত রাখে। পল হিল এর শহীদত্ব পাবার প্রেক্ষিতে প্রতিশোধমুলক আক্রমন হতে পারে এমন শঙ্কায় পুলিশও বেশ সতর্ক ছিল, এবং এই কেসে র সাথে জড়িত বেশ কয়েকজনই বুলেট সহ হুমকি বার্তা পেয়েছিলেন।

এই পুরো বিভৎস ঘটনার সুত্রপাত ঘটেছে বিষয়টি বোঝার জন্য প্রয়োজনীয় দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য থেকে। কিছু মানুষ তাদের ধর্মবিশ্বাসের জন্য মনে করেন, গর্ভপাত হচ্ছে হত্যা এবং সেই ভ্রুণের অধিকার রক্ষার্থে, যাদের তারা শিশু বলে দাবী করেন, হত্যা করতেও পিছ পা হন না। অন্যদিকে গর্ভপাতের স্বপক্ষে আন্তরিক কিছু সমর্থক আছেন, যাদের হয় ভিন্ন কোন ধর্মীয় বিশ্বাস আছে বা কোন ধর্মই তারা মানেন না, যার সাথে যুক্ত হয়েছে সুস্পষ্টভাবে সুচিন্তিত পরিনতিবাদী নৈতিকতা। তারাও তাদের নিজেদের আদর্শবাদী ভাবেন, প্রয়োজনের সময় অসুস্থকে চিকিৎসা সেবা দেওয়া, অন্যথায় বিপজ্জনক হাতুড়ে ডাক্তারের কাছে জীবনের ঝুকি নিয়ে তারা সেই সেবাটি নেবার জন্য বাধ্য হবেন; উভয় পক্ষই একে অপরকে দেখছে খুনী হিসাবে বা হত্যার উৎসাহদাতা হিসাবে। উভয় পক্ষই, তাদের নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গীতে একই ভাবে আন্তরিক;

একটি প্রজনন স্বাস্থ্য সেবাদানকারী ক্লিনিকের মুখপাত্রী বলছেন, পল হিল হচ্ছেন একজন বিপদজ্জনক সাইকোপ্যাথ, উন্মত্ত খুনী। কিন্তু পল হিলের মত মানুষরা তাদের নিজেদেরকে বিপদজ্জনক সাইকোপ্যাথ বলে মনে করেন না। তারা নিজেদেরকে ভালো এবং নীতিবান মানুষ হিসাবেই মনে করেন, যারা ঈশ্বরের নির্দেশনা মেনে চলেন। আসলেই আমি মনে করিনা পল হিল একজন সাইকোপ্যাথ, শুধুমাত্র একজন অতি ধার্মিক। বিপদজ্জনক,,হ্যা, কিন্তু সাইকোপ্যাথ না, বিপজ্জনকভাবে ধার্মিক ; তার ধর্মবিশ্বাসের ব্যাখ্যায় হিল পুরোপুরি সঠিক এবং নৈতিক অবস্থানে ছিলেন যখন তিনি ডা: ব্রিটনের উপর গুলি ছোড়েন। হিলের সমস্যা বা অসুখটা হলো ধর্মীয় বিশ্বাস নিজেই। মাইকেল ব্রে ও , আমি যখন তার সাথে দেখা করেছিলাম, আমার তাকে সাইকোপ্যাথ মনে হয়নি; আমার আসলে তাকে বেশ পছন্দ্ও হয়েছে, আমার মনে হয়েছে তিনি সৎ এবং আন্তরিক একটি মানুষ, মৃদুভাষী এবং চিন্তাশীল কিন্তু দু:খজনকভাবে তার মনকে আক্রান্ত করেছে বিষাক্ত ধর্মীয় অর্থহীন সব ধারনা।

গর্ভপাতে বিরুদ্ধবাদী সব শক্ত সমর্থকরা প্রায় সবাই গভীরভাবে ধর্মবিশ্বাসী। গর্ভপাতের আন্তরিক সমর্থনকারীরা, ব্যাক্তিগত ভাবে তারা ধার্মিক কিংবা ধার্মিক নন, যাই হোন কেন তারা ধর্মীয় গন্ডির বাইরে একটি পরিনতিবাদী নৈতিকতাবাদী দর্শনের অনুসারী, হয়তো তারা জেরেমি বেনথামের প্রশ্নটি তাদের চিন্তায় নিয়ে আসতে পেরেছেন, ‘তারা কি কষ্ট অনুভব করে?’ পল হিল ও মাইকেল ব্রে কোন ভ্রুণ হত্যা আর ডাক্তার হত্যার মধ্যে কোন নৈতিক পার্থক্য দেখতে পান না, শুধুমাত্র তাদের কাছে ভ্রুণটি হলো একটি নিষ্পাপ শিশু। পরিনতিবাদীরা এখানে অনেক পার্থক্য দেখতে পান, ব্যাঙাচীদের মতই অনেকটা দেখতে একটি প্রাথমিক পর্যায়ের ভ্রুণের সামান্যই অনুভব করার ক্ষমতা আছে ; অন্যদিকে একজন ডাক্তার হচ্ছেন পুর্ণবয়ষ্ক জীবন্ত মানুষ, আশা আকাঙ্খা ভালোবাসা, ভয় সহ তিনি মানবীয় জ্ঞানের বিশাল এক ভান্ডার, যার গভীর ভাবে আবেগতাড়িত হবার ক্ষমতা আছে। এছাড়া খুব সম্ভবত একজন বিধ্বস্ত বিধবা ও এতিম সন্তান কিংবা বৃদ্ধ পিতা মাতাও আছেন যারা তাকে অনেক ভালোবাসেন।

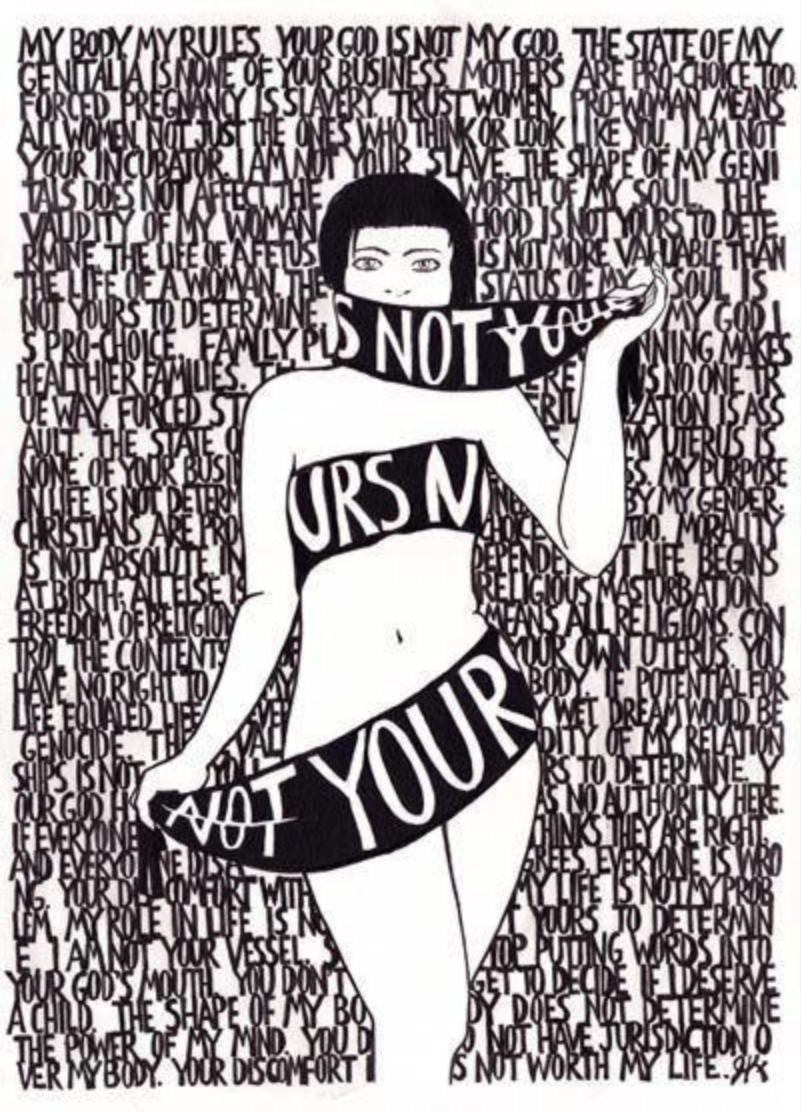
MY BODY MY RULES. YOUR GOD IS NOT MY GOD. THE STATE OF MY
GENITALIA IS NONE OF YOUR BUSINESS. MOTHERS ARE PRO-CHOICE TOO.
FORCED PREGNANCY IS SLAVERY. TRUST WOMEN. PRO-WOMAN MEANS
ALL WOMEN NOT JUST THE ONES WHO THINK OR LOOK LIKE YOU. I AM NOT
YOUR INCUBATOR. I AM NOT YOUR SLAVE. THE SHAPE OF MY GENI
TALS DOES NOT AFFECT THE WORTH OF MY SOUL. THE
VALIDITY OF MY WOMAN HOOD IS NOT YOURS TO DETE
RMINE. THE LIFE OF A FETUS IS NOT MORE VALUABLE THAN
THE LIFE OF A WOMAN. THE STATUS OF MY SOUL IS
NOT YOURS TO DETERMINE. MY GOD I
S PRO-CHOICE. FAMILY PL NNING MAKES
HEALTHIER FAMILIES. RE IS NO ONE TR
UE WAY. FORCED ST ERIL ZATION IS ASS
AULT. THE STATE O MY UTERUS IS
NONE OF YOUR BUSI SS. MY PURPOSE
IN LIFE IS NOT DETERM BY MY GENDER.
CHRISTIANS ARE PRO CHOICE TOO. MORALITY
IS NOT ABSOLUTE. IN DEPENDE T LIFE BEGINS
AT BIRTH; ALL ELSE IS RELIGIOUS MASTURBATION.
FREEDOM OF RELIGION MEANS ALL RELIGIONS. CON
TROL THE CONTENTS YOUR OWN UTERUS. YOU
HAVE NO RIGHT TO BODY. IF POTENTIAL FOR
LIFE EQUALED LIFE Y WET DREAM WOULD BE
GENOCIDE. THE DITY OF MY RELATION
SHIPS IS NOT RS TO DETERMINE. Y
OUR GOD H S NO AUTHORITY HERE.
IF EVERYONE THINKS THEY ARE RIGHT,
AND EVERYONE DIS REES, EVERYONE IS WRO
NG. YOUR DISCOMFORT WITH MY LIFE IS NOT MY PROB
LEM. MY ROLE IN LIFE IS N T YOURS TO DETERMIN
E. I AM NOT YOUR VESSEL. STOP PUTTING WORDS INTO
YOUR GOD'S MOUTH. YOU DON'T GET TO DECIDE IF I DESERVE
A CHILD. THE SHAPE OF MY BODY DOES NOT DETERMINE
THE POWER OF MY MIND. YOU D NOT HAVE JURISDICTION O
VER MY BODY. YOUR DISCOMFORT IS NOT WORTH MY LIFE.
S NOT YOU
URS N
NOT YOUR

ছবি: হিথার ফ্রিম্যান এর Not Yours..

পল হিল সত্যিকারের দীর্ঘমেয়াদী, কষ্ট অনুভব করতে সক্ষম এমন স্নায়তন্ত্র বিশিষ্ট মানুষকে কষ্ট দিয়েছেন। তার আক্রান্ত ডাক্তারের শিকাররা এসব কিছু করতে পারেনা। কারন শুরুর পর্যায়ে ভ্রুণ এর কোন স্নায়তন্ত্র নেই, সুতরাং তার কোন কষ্ট অনুভব করার উপায়ও নেই নিশ্চিৎ ভাবে। এমন কি পরবর্তী পর্যায়ে করা গর্ভপাতের ভ্রুণ, যাদের স্নায়তন্ত্র আছে তারা কষ্ট অনুভব করবে, যদিও সব ধরনের কষ্ট দেয়াটাই বড় বেশী নিন্দনীয় – তবে তারা যে কষ্ট পায় সেটার কারন তারা যে মানুষ তা কিন্তু নয়। কোন ভাবে সাধারন যুক্তিতে ধারনা করা সম্ভব না যে মানুষের ভ্রুণ যে কোন বয়সে সমবয়সী একটি গরু বা ভেড়ার ভ্রুণ অপেক্ষা বেশী কষ্ট অনুভব করে। এবং যথেষ্ট কারন আছে মনে করা যে সব ভ্রুণ, মানুষ বা অন্য কিছু, অনেক কম কষ্ট পায় একজন পুর্ণবয়স্ক গরু বা ভেড়া জবাইখানায় যে যন্ত্রণা সহ্যকরে, বিশেষ করে আচার আনুষ্ঠানিকতাপুর্ণ জবাইখানায়, যেখানে তাদের পুর্ণ সজাগ থাকতে হবে আনুষ্ঠানিকভাবে তাদের গলা কাটার জন্য।

যন্ত্রণা বা কষ্ট সহ্য করার বিষয়টি পরিমাপ করা কঠিন এবং এর ব্যাখ্যা নিয়ে অবশ্যই যুক্তিতর্ক করা যেতে পারে। কিন্তু সেটি আমার আলোচনার মুল বিষয়টি পরিবর্তন করেনা, যা ধর্ম নিরেপক্ষ পরিনতিবাদী এবং ধর্মীয়

চূড়ান্তবাদী নৈতিকতার দার্শনিকদের মধ্যে পার্থক্যটাকে নির্দেশ করে(((এটি অবশ্য, সব সম্ভাবনা শেষ করে দেয় না, আমেরিকার খৃষ্ঠানদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ গর্ভপাতের ব্যাপারে কোন চূড়ান্তবাদী মনোভাব পোষন করেন না এবং তারা এর পক্ষে, যেমন দেখুন Religious Coalition for Reproductive Choice,
at http://www.rcrc.org/.))))। একটি গ্রুপ চিন্তা করেন, ভ্রুণটি কষ্ট পেতে পারে কিনা। অন্যটি ভাবে তারা মানুষ কি না। ধর্মীয় নৈতিকতাবাদীদের দেখা যায় বিতর্ক করেন যেমন, কখন একটি বিকাশমান ভ্রুণ একটি ব্যক্তিতে পরিণত হয় –একজন মানুষ? সেক্যুলার নৈতিকতাবাদীরা খুব সম্ভবত জিজ্ঞাসা করবেন, এটি মানুষ কিনা সেটা ভাবার দরকার নেই (একগুচ্ছ কোষের জন্য এর অর্থই বা কি?) আসলে ঠিক কোন বয়সে যে কোন একটি বিকাশমান ভ্রুণ, সেটা যে কোন প্রজাতিরই হোক না কেন, কষ্ট অনুভব করার ক্ষমতা অর্জন করে ?

রিচার্ড ডকিন্স এর দি গড ডিল্যুশন : অষ্টম অধ্যায় (পঞ্চম পর্ব)

By K M Hassan

ছবি: *Jon Krause* এর একটি ইলাসট্রেশন,

রিচার্ড ডকিন্স এর দি গড ডিল্যুশন : অষ্টম অধ্যায় (পঞ্চম পর্ব)

(অনুবাদ প্রচেষ্টা: কাজী মাহবুব হাসান)

The God Delusion by Richard Dawkins

প্রথম অধ্যায়
দ্বিতীয় অধ্যায়
তৃতীয় অধ্যায়
চতুর্থ অধ্যায় (প্রথম পর্ব) , চতুর্থ অধ্যায় (দ্বিতীয় পর্ব) ,
চতুর্থ অধ্যায় (তৃতীয় পর্ব) , চতুর্থ অধ্যায় (চতুর্থ পর্ব) , চতুর্থ অধ্যায় (শেষ পর্ব)
পঞ্চম অধ্যায় (প্রথম পর্ব), পঞ্চম অধ্যায় (দ্বিতীয় পর্ব) , পঞ্চম অধ্যায় (তৃতীয় পর্ব)
পঞ্চম অধ্যায় (চতুর্থ পর্ব) , পঞ্চম অধ্যায় (পঞ্চম পর্ব) ,পঞ্চম অধ্যায় (ষষ্ঠ পর্ব)
ষষ্ঠ অধ্যায় (প্রথম পর্ব) ; ষষ্ঠ অধ্যায় (দ্বিতীয় পর্ব); ষষ্ঠ অধ্যায় (শেষ পর্ব)
সপ্তম অধ্যায় (প্রথম পর্ব) ; সপ্তম অধ্যায় (দ্বিতীয় পর্ব) ; সপ্তম অধ্যায় (তৃতীয় পর্ব) ;
সপ্তম অধ্যায় (চতুর্থ পর্ব) ; সপ্তম অধ্যায় (শেষ পর্ব)
অষ্টম অধ্যায় (প্রথম পর্ব) ; অষ্টম অধ্যায় (দ্বিতীয় পর্ব) ; অষ্টম অধ্যায় (তৃতীয় পর্ব) ;
অষ্টম অধ্যায় (চতুর্থ পর্ব)

ধর্মের সমস্যাটা আসলে কি? ধর্ম কেন এত হিংস্র ?

দি গ্রেট বীটহোভেন ফ্যালাসী:

সাধারনত গর্ভপাত বিরোধীদের এই মৌখিক শব্দের দাবা খেলায় পরবর্তী পদক্ষেপ হচ্ছে খানিকটা এরকম: মুল বিষয়টি কিন্তু এই মহুর্তে মানুষের ভ্রুণ কোন কিছু অনুভব করতে পারে কি পারেনা, সেটি না, কথা হচ্ছে এর সেটি করার সম্ভাব্য ক্ষমতাটি। গর্ভপাতের ফলে এই ভ্রুণটি ভবিষ্যতে তার সম্ভাব্য একটি পুর্ণ মানব জীবন পাবার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবে, এধারনাটি তাদের বাকস্বর্বস্ব যুক্তিকে নির্দেশিত করে যার চুড়ান্ত নির্বুদ্ধিতা এর অসততার অভিযোগের প্রত্যুত্তরে একমাত্র অজুহাত হতে পারে; আমি সেই প্রখ্যাত গ্রেট বিটহোভেন ফ্যালাসী বা ভ্রান্ত যুক্তির কথা বলছি। বেশ কয়েকটি সংস্করণ আছে এই ফ্যালাসিটির। পিটার এবং জীন মেদাওয়ার (স্যার পিটার মেদাওয়ার ১৯৬০ সালে চিকিৎসা বিজ্ঞানে নোবেল পুরষ্কার জয় করেছিলেন) তাদের The Life Science এ নিম্নোক্ত সংস্করণটির সুত্র হিসাবে উল্লেখ করেছিলেন নরমান সেন্ট জন স্টেভাস (এখন লর্ড সেন্ট জন) এর নাম; যিনি একজন বৃটিশ সংসদ সদস্য, সুপরিচিত একজন রোমান ক্যাথলিক মুখপাত্র, তিনি আবার এটি সংগ্রহ করেছে মরিস বারিঙ (১৮৭৪-১৯৪৫) এর সংগ্রহ থেকে, একজন প্রখ্যাত ব্যক্তি যিনি রোমান ক্যাথলিকে ধর্মান্তরিত হয়েছিলেন এবং ক্যাথলিকদের অন্যতম শক্তিশালী সমর্থক জি কে চেষ্টারটন এবং হিলেয়ার বেলক এর নিকট সহযোগী। তিনি দুটি চিকিৎসকের মধ্যে একটি কাল্পনিক কথোপকথনের মাধ্যমে যুক্তিটি গড়ে তুলেছিলেন:

একটি গর্ভপাতের বিষয়ে আমি আপনার মতামত চাইছি;
বাবাটির সিফিলিস আছে, মায়ের আছে যক্ষা, যে চারটি সন্তান তাদের আছে ইতিমধ্যে তার প্রথমটি অন্ধ, দ্বিতীয়টি মারা গেছে,তৃতীয়টি মুক এবং বধির, চতুর্থটিরও যক্ষা আছে..
এই অবস্থায় আপনি হলে কি করতেন?
আমি গর্ভপাত করাতাম।
তাহলে তো আপনি বীটহোভেন কে হত্যা করবেন;

ইন্টারনেট জুড়ে অসংখ্য তথাকথিত গর্ভপাত বিরোধী ওয়েব সাইট আছে যারা এই হাস্যকর কাহিনী বার বার ব্যবহার করেছে এবং ঘটনাচক্রে তারা তাদের খেয়াল খুশী মত মুল্য সত্য বক্তব্যটিকেও বিকৃত করেছেন, আরো একটি সংস্করণ শুনুন: 'আপনি যদি কোন রমনীকে চেনেন যিনি ইতিমধ্যেই আটটি সন্তানের জননী এবং আবারো গর্ভবতী.. যার তিন জন বধির, দুজন অন্ধ, একজন মানসিকভাবে বিকলাঙ্গ, যার কারণ তার সিফিলিস আছে, আপনি

কি তাকে গর্ভপাত করার পরামর্শ দেবেন?' এর উত্তর যদি হ্যা হয় তাহলে কিন্তু আপনি অনাগত একজন বীটহোভেনকে খুন করলেন। কিংবদন্তীর এই বিবরণটি বিখ্যাত সুরস্রষ্টাকে পঞ্চম থেকে নবম স্থানে নিয়ে এসেছে তার জন্মক্রমকে, বধির হিসাবে জন্ম নেবার সংখ্যাকে তিন এ উন্নীত করেছে, অন্ধর সংখ্যা দুই এ, বাবার বদলে মাকে সিফিলিস এ আক্রান্ত হওয়া হিসাবে দেখিয়েছে। মোট ৪৩ টা ওয়েবসাইট যেখানে আমি এই গল্পটির নানা রুপ খুজেছিলাম, সেখানে এটির উৎস হিসাবে মরিস বারিং না বরং ইউসিএলএ (UCLA) মেডিকেল স্কুল একজন অধ্যাপক এল আর আগনিউ কে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে, যিনি এই গল্পটা নাকি তিনি তার ছাত্রদের উভয় সংকটের একটি বিষয় হিসাবে বলতেন, যেন তাদের তিনি বলতে পারেন, 'শুভেচ্ছা আপনি এই মুহূর্তে বীটহোভেনকে হত্যা করলেন।' আমরা খানিকটা দয়া পরবশ হয়ে এল আর অ্যাগনিউকে ছাড় দিতে পারি তার অস্তিত্বের বিষয়টি নিয়ে সন্দেহ পোষন করার জন্য –তবে বিস্ময়কর ব্যাপারটা হচ্ছে কিভাবে আরবান বা শহুরে এই কিংবদন্তীগুলো গড়ে ওঠে। আমি খুজে পাইনি এই কিংবদন্তীর কাহিনীটির শুরুটা কোথায়.. এটি বারিং শুরু করেছিলেন নাকি এর উৎপত্তি আরো আগে।

তবে এটি আবিষ্কৃত সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। পুরোপুরি মিথ্যা একটি কাহিনী। আসল সত্যিটা হলো লুদভিগ ভান বীটহোভেন নবম শিশু যেমন ছিলেন না তেমনি তিনি পঞ্চমও ছিলেন না, তিনি ছিলেন সবার বড়, একেবারে সঠিক করে বললে দ্বিতীয় সন্তান, কারন তার বাবা মার প্রথম সন্তান খুব শৈশবেই মারা যান, যা খুব স্বাভাবিক ছিল সেই সময়ে, এবং যত দুর জানা যায় আদৌ অন্ধ, মুক বা বধির বা মানসিকভাবে বিকলাঙ্গ ছিলেন না। এমন কোন প্রমান নেই যে তার বাবা মা সিফিলিসে আক্রান্ত ছিলেন, তবে এটা ঠিক তার মা পরে মারা গিয়েছিলেন যক্ষায় ভুগে। যখন যক্ষার প্রকোপও ছিল বেশী।

সুতরাং আসলে পুরো ব্যপারটি কাল্পনিক..বলা যায় আরবান লিজেন্ড, কল্পকথা, ইচ্ছাকৃতভাবে কিছু স্বার্থান্বেষী মহল এটি ছড়িয়েছে, কিন্তু এটি যে মিথ্যা সেটি কিন্তু মুল বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করে না... এমনকি এটি যদি মিথ্যা নাও হয়, এর থেকে দাড় করানো এই যুক্তিটি খুবই দুর্বল একটি যুক্তি। পিটার এবং জীন মেডাওয়ারের কোন প্রয়োজন ছিল না এই যুক্তিটি ভ্রান্ত প্রমান করার জন্য এই কাহিনীর সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ পোষন করতে। এই ঘৃণ্য ছোট যুক্তিটির পেছনে বক্তব্যগুলো ভয়ঙ্করভাবে ভুল। যদি না প্রস্তাব করা হয় একজন যক্ষাক্রান্ত মা এবং সিফিলিস আক্রান্ত বাবার সম্পর্ক পৃথিবীর একজন অনন্য সঙ্গীত প্রতিভার জন্ম নেবার সাথে কোন না কোনভাবে কার্যকারনজনিত যোগসুত্র আছে। এবং তারা একজন বীটহোভেনকে জন্ম দেয়া থেকে বঞ্চিত হবে যতটা না গর্ভপাতের কারনে ততটাই সঙ্গম থেকে বিরত থাকার কারনে। মেদাওয়ার দম্পতির সংক্ষিপ্ত বিরক্তি মিশ্রিত প্রত্যাখ্যানটি উত্তর দেয়া অসম্ভব (রোনাল্ড ডাল এর একটি গল্প থেকে প্লট ধার নিয়ে বলতে পারি, গর্ভপাত না করানোর সেই একই ঘটনাক্রমে নেয়া সিদ্ধান্ত ১৮৮৮ সালে আমাদের অ্যাডলফ হিটলারকে উপহার দিয়েছিল), কিন্তু আপনার সামান্যতম খানিকটা বুদ্ধিমত্তা থাকা প্রয়োজন – বা হয়তো কোন ধরনের ধর্মীয় আবহে প্রতিপালিত না হয়ে থাকলে এই বিষয়টি বোঝা সম্ভব না। যে ৪৩ টি বাছাই ওয়েব গর্ভপাত বিরোধী বা প্রো লাইফ সাইটে বীটহোভেন এর কাহিনীটির কোন না একটি সংস্করণ প্রকাশ করেছে যা এই লেখার সময় গুগল সার্চে খুজে পেয়েছি, তাদের একটিও এই যুক্তির মধ্যে ভুল বা অযৌক্তিক বিষয়টি ধরতে পারেননি। এবং তাদের প্রত্যেকটি (সবগুলোই ধর্মীয় ওয়েব সাইট) এই ভ্রান্ত যুক্তির মোহে আকর্ষিত হয়েছেন, বর্শির টোপ খেয়েছেন..পুরোপুরি। তাদের একটি আবার মেদাওয়ারকে স্বীকৃতি দিয়েছে এর উৎস হিসাবে। এই মানুষগুলো তাদের ধর্মবিশ্বাস বান্ধব যে কোন ভুলকে বিশ্বাস করার জন্য এতটাই উদগ্রীব.. তারা এমনকি খেয়াল করেননি যে মেদাওয়ার এই যুক্তিটি প্রস্তাব করেছিলেন শুধুমাত্র এটির ভুল ধরে নাকচ করে দেবার জন্য।

ছবি: Jon Krause এর একটি ইলাসট্রেশন,

এবং মেদাওয়ার সঠিকভাবে ব্যপারটা দেখিয়েছেন যে মানুষের সম্ভাবনা বা পোটেনশিয়াল যুক্তিটির উপসংহার হচ্ছে যে, আমরা যখনই যৌন সঙ্গম করার সুযোগ গ্রহন করতে ব্যর্থ হই আমরা তখনই একটি মানব আত্মাকে তার অস্তিত্ব পাবার সম্ভাবনা থেকে বঞ্চিত করি। যে কোন উর্বর জুটির সঙ্গমের আহবানের প্রতিটি প্রত্যাখ্যান..এই প্রো লাইফ বা জীবনের পক্ষে বেসামাল যুক্তিতে সম্ভাব্য একটি শিশু হত্যা। এমনকি কারো ধর্ষিত না হবার চেষ্টাও সম্ভাব্য কোন শিশু হত্যার সমান প্রতিনিধিত্ব করে (এবং কথা প্রসঙ্গে .. বহু প্রো লাইফ এর সমর্থকরা যে মহিলা এমনকি নৃশংসভাবে ধর্ষিত হয়েছে তাদেরও গর্ভপাতের অধিকার থেকে বঞ্চিত করতে চায়); বীটহোভেন যুক্তি, আমরা স্পষ্ট দেখতে পারি, খুবই দুর্বল একটি যুক্তি। এর পরাবাস্তব নির্বুদ্ধিতা মোটামুটি পুরোটাই ফুটে উঠেছে.. মাইকেল পালিন এর গাওয়া সেই চমৎকারে গানটিতে ‘Every sperm is sacred, শতাধিক শিশুর কোরাস সহ এই গানটি মন্টি পাইথন সিরিজের এর ছায়াছবি The Meaning of Life এ ছিল (আপনি যদি এখনও না দেখে থাকেন দয়া করে একবার দেখুন); এই তথাকথিত মহান বীটহোভেন ভ্রান্ত যুক্তিটি একটি বৈশিষ্টসুচক উদহারন হদে পারে

কিভাবে যুক্তির গোলকধাধায় আমরা সবকিছু গোলমাল করে ফেলি যখন আমাদের মন ধর্ম অনুপ্রাণিত চুড়ান্তবাদীতায় সংশয়াচ্ছন্ন থাকে।

ভালো করে লক্ষ্য করুন যে প্রো লাইফ (Pro-life) আসলে কিন্তু সামগ্রিকভাবেই প্রো লাইফই বোঝাচ্ছেনা আদৌ। এর আসল অর্থ হচ্ছে প্রো হিউম্যান লাইফ বা শুধুমাত্র মানুষের জীবনের স্বপক্ষে ; Homo sapiens প্রজাতির কিছু কোষকে বিশেষভাবে এই অধিকার প্রদান করার বিষয়টি বিবর্তনের ধারনার সাথে সামন্জষ্যপুর্ণ না। স্বীকার করতেই হবে, বিষয়টি আদৌ বেশীর ভাগ গর্ভপাত বিরোধীদের জন্য চিন্তার কোন বিষয় না। তারা এমনিতেই বোঝেন না বিবর্তন একটি বাস্তব সত্য ! কিন্তু আমি সে যুক্তিটি বিজ্ঞান কিছুটা বোঝেন এমন কিছু গর্ভপাত বিরোধী সক্রিয় আন্দোলনকারীদের সুবিধার্থে ব্যাখ্যা করতে চাই।

বিবর্তনীয় দৃষ্টিভঙ্গীটি খুব সরল। কোন ভ্রূণ কোষের মানুষ নির্দিষ্ট বৈশিষ্টাবলী এর উপর চুড়ান্ত বিচ্ছিন্নভাবে কোন নৈতিক অবস্থা আরোপ করতে পারেনা, এটি পারে না কারন শিম্পান্জি এবং আরো দুরবর্তী, পৃথিবীর সকল প্রজাতির সাথে আমাদের বিবর্তনীয় বংশধারার একটি ধারাবাহিকা আছে। এবং এটি বোঝার জন্য.. কল্পনা করুন একটি অন্তবর্তী কোন প্রজাতিদের, ধরা যাক Australopithecus afarensis, ধরুন তারা সুযোগ পেল বেচে থাকার এবং দুর্গম কোন আফ্রিকার কোন প্রান্তে তাদের খুজে পাওয়াও গেল, তাদেরকে কি মানুষ হিসাবে পরিগনিত করা হবে কি ? নাকি হবে না ? আমার মত পরিণতিবাদীদের কাছে এই প্রশ্নের কোন উত্তর প্রত্যাশা করা উচিৎ না, কারন এর উপর তাদের কিছুই নির্ভর করে নেই। আমাদের জন্য এটাই যথেষ্ট যে আমারা সম্মানিত এবং বিস্মিত হবো একটি নতুন ’লুসি’র সাথে দেখা করার সুযোগ পেয়ে; তবে অন্যদিকে চুড়ান্তবাদীরা অবশ্যই এই প্রশ্নের উত্তর দিতে বাধ্য; ’শুধুমাত্র মানুষ হবার’ কারনে যারা মানুষের উপর তাদের অনন্য এবং বিশেষ নৈতিকতার মুলনীতি আরোপ করে মানুষকে একটি অনন্য এবং একটি বিশেষ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করে। হয়তো যদি এর উত্তর দিতে তারা কোন তীব্র চাপের মুখে পড়ে, তারাও সম্ভবত বর্ণবাদী শ্বেতাঙ্গদের দক্ষিন আফ্রিকার মত কোন আদালত প্রতিষ্ঠা করবে, শুধুমাত্র একটি সিদ্ধান্ত নিতে, এই নির্দিষ্ট জীবটি ’মানুষ’ হিসাবে ছাড়পত্র পেতে পারে কিনা?

এমনকি যদিও একটি স্পষ্ট উত্তর হয়তো পাওয়ার চেষ্টা করা যেতে পারে Australopithecus দের জন্য, কিন্তু ধীর ক্রমান্বয়ে ধারাবাহিকতা জৈববৈজ্ঞানিক বিবর্তনের একটি অনস্বীকার্য বৈশিষ্ট, যা আমাদের বলছে, অবশ্যই ’কিছু’ অন্তবর্তীকালীন প্রজাতি আছে যারা প্রান্তসীমার যথেষ্ট কাছাকাছি কোথাও অবস্থান করে, যার ফলে তারা নৈতিকতার মুলনীতিটা অস্পষ্ট করে দিয়ে ভেঙ্গে দিতে পারে এর চুড়ান্তবাদী অবস্থানটি। এই বিষয়টিকে ভালোভাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে বরং এটা বলে যে বিবর্তন প্রক্রিয়ায় কোন প্রাকৃতিক সীমানার অস্তিত্ব নেই। আর এই সীমানা আছে এমন একটি বিভ্রম সৃষ্টি হবার কারন আসলে বিবর্তনীয় অন্তর্বর্তীকালীন রুপগুলো ঘটনাক্রমে সব বিলুপ্ত হয়েছে। অবশ্যই, তর্ক করা যেতে পারে, মানুষরা অন্য যে কোন প্রজাতির তুলনায় অনেক বেশী কষ্ট অনুভব করতে পারে। এটি হয়তো সত্যিও হতে পারে এবং আমরা আইনসঙ্গতভাবেই মানুষকে বিশেষ মর্যাদা দেই এই কারনে। কিন্তু বিবর্তনের ধারাবাহিকতা আমাদের বলছে এরকম কোন চুড়ান্ত পৃথকীকরণ বলে কিছু নেই। চুড়ান্তবাদীদের নৈতিকতাবাদী বৈষম্যতা বিবর্তনের সত্যতাকে পুরোপুরি নাকচ করে দেয়; হয়তো এই সত্যটা নিয়ে একধরনের সচেতন অস্বস্তি হয়তো সত্যিই হতে পারে সৃষ্টিবাদীদের বিবর্তনকে বিরোধীতা করার প্রধানতম কারন: তারা যা ভয় পায়, সেটা হলো তাদের বিশ্বাসে নৈতিকতার একটি পরিনতি হবে। তাদের এই চিন্তাটা ভুল, তবে যাই হোক, নৈতিকভাবে পছন্দনীয় এমন বিবেচনা দ্বারা প্রকৃত পৃথিবী সম্বন্ধে স্বাক্ষ্যপ্রমান সহ কোন সত্য ফ্যাক্ট পরিবর্তিত হয়ে যাবে এমন চিন্তা করাটা আসলেই খুব উদ্ভট।